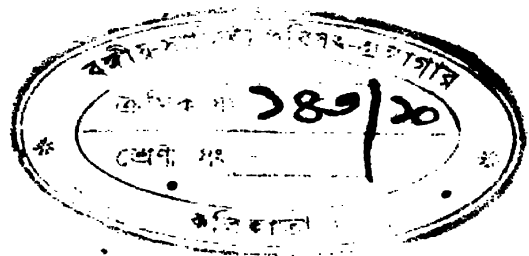
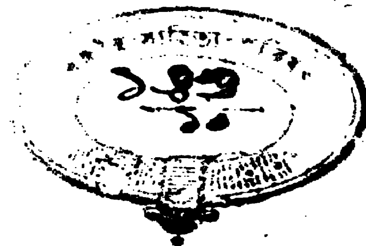




REGISTERED No. C. 102.



কৃষক

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসনের মুখপত্র

বৈশাখ, ১৩১৮।

মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধয়ঃ ।
মাধ্বীর্গাবোভবন্তুনঃ ॥

কলিকাতা ;
[illegible] বহুবাজার ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে
শ্রীশশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা, ১২৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, দি ফিনিক্স প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
এস, এইচ্, রহমান দ্বারা মুদ্রিত।



সূচী পত্র।

(কৃষক, বৈশাখ, ১৩১৬ সাল।)

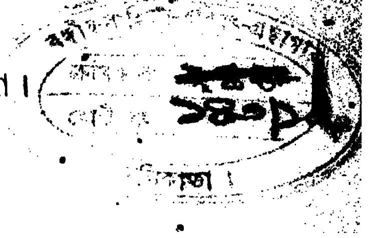
[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।
গ্রাম্যব্যাঙ্ক বা কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি ...	[illegible]
নব বর্ষ(?)শ্রী ...	[illegible]
ভারতীয় কৃষি-সমিতির কার্য্যবিবরণী ১৯০৮—০৯ ...	১২
জাতীয় বিদ্যামন্দিরে প্রদর্শনী ...	১৪
কার্ত্তিকশালি ধান্য ...	১৭
আমেরিকায় ভারতের শ্রমজীবী ...	১৯
পত্রাদি ...	২১
প্রাদেশিক কৃষি সংবাদ ...	২১
সার-সংগ্রহ ...	২২
বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য ...	২৪
বাগানের মাসিক কার্য্য ...	২৫

REGISTERED No. C. 152.

কৃষক।

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।



দশম খণ্ড,—১ম সংখ্যা।



সম্পাদক—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর্, এ, এস্।

বৈশাখ, ১৩১৬।

কলিকাতা ; ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে
শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা ; ১৯৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, দি মিলার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
এস, এইচ, রহমান দ্বারা মুদ্রিত।





কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১০ম খণ্ড। | বৈশাখ, ১৩১৬ সাল। | ১ম সংখ্যা।

গ্রাম্যব্যাঙ্ক বা কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী। *

(যৌথ ঋণদান সমিতি।)

অল্প সুদে ঋণলাভ, ভারতবর্ষের কৃষির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। কৃষকেরা শতকরা ২৫৲ টাকা হইতে ৫০৲ টাকা হার সুদে টাকা কর্জ্জ করিয়া থাকে। সে ক্ষেত্রে মূলধনের উপর অন্ততঃপক্ষে শতকরা ২৫৲ টাকার অধিক (সময়-বিশেষে ৫০৲ টাকার অধিক) লাভ না হইলে, তাহাদের কোনই উন্নতির আশা থাকে না। অতএব সুবুদ্ধি সাবধান কৃষকেরা যদি শতকরা ১২॥০ টাকার অনধিক সুদে মূলধন যোগাড় করিতে না পারে, তবে আমাদের সুবৃহৎ কৃষিবিভাগের প্রয়োজনীয়তা অনেক পরিমাণে নিস্ফল বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। অধুনা ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশে এক একটি কৃষিবিভাগ স্থাপনোদ্দেশ্যে বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে। সেই কৃষিবিভাগ-গুলির সহিত অন্যান্য কৃষি-প্রধান দেশের কৃষিবিভাগ-সমূহের অবশ্যই তুলনা করা যাইতে পারে না। এদেশের কৃষি-বিভাগের পরিপুষ্টিসাধনের ব্যবস্থা সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন করিতে হইলে, এখন দশ পাঁচ বৎসর সময়ের আবশ্যক; তবে কৃষি-বিভাগের উদ্যমে কৃষক সাধারণের যাহাতে বিশেষ উপকার হয়, তজ্জন্য অল্প সুদে তাহাদিগকে টাকা কর্জ্জ দেওয়ার পক্ষে চেষ্টা করার -এই উপযুক্ত সময় উপস্থিত। অল্প সুদে কৃষকদিগকে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থাই কৃষিবিভাগের উন্নতির ভিত্তি; আর সেই জন্যই আলোচ্য বিষয়ের এতাদৃশ প্রয়োজনীতা।

এতৎসম্বন্ধে প্রধানতঃ দুইটী বিষয়ের প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। আমাদিগকে এরূপ কোনও উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে,—যাহাতে অল্প সুদে টাকা সরবরাহ করা যায়, অথচ তজ্জন্য (সেই অল্পহারের সুদের প্রলোভনে) ঋণ গ্রহণে প্রশ্রয় দেওয়া না হয়। ফলতঃ আমাদিগকে এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে প্রজাগণ মূলধনের জন্য টাকা লইয়া ঋণভারে অধিকতর ভারাক্রান্ত না হন। বলা বাহুল্য, এই সমস্যাই কঠোর সমস্যা; এই সমস্যার সমাধানই বিশেষ আয়াস-সাধ্য। যখন কৃষকদিগের ঋণ-বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হয়, তখনও অল্প সুদে

---

* সুরাটে শিল্প-সমিতির অধিবেশনে পঠিত হইবার জন্য মিঃ ডবলউ আর, গোলে আই, সি, এস, লিখিত প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ।

ঋণ-দানের সমস্যা সমাধান করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। যদিও ঐ আইনে অনেক উপকার-সাধন হইয়াছে, তথাপি উহা দ্বারা যে প্রকৃত সমস্যার সমাধান হইয়াছে, তাহা কোনক্রমেই বলা যায় না। গ্রাম্য ঋণদাতাদিগের সম্পূর্ণরূপ উচ্ছেদ-সাধন যে ঐ আইনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ইহা অবশ্য কেহই মনে করিবেন না। কেননা সূত্রধর, ক্ষৌরকার এবং রজকগণের ন্যায় গ্রাম্য মহাজন-গণও গ্রাম্য-জনসমাজের বিশেষ প্রয়োজনীয়; এবং তাঁহাদিগের সাহায্য ব্যতীত কৃষকগণের কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহই অসম্ভব। তবে আমাদিগকে এখন এইমাত্র দেখিতে হইবে,—ভারতবর্ষের পল্লী-গ্রামসমূহে কৃষকদিগকে কিসে অল্প সুদে ঋণ দেওয়া যাইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে ঋণদাতাদিগের ব্যবসায় একচেটিয়া; সুতরাং তাঁহারা যদি আপনা-দের সুবিধার সম্পূর্ণরূপ ব্যবহার করেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া উচিত নহে। বিশেষতঃ ঋণদাতা উত্তমর্ণগণ সময়ে সময়ে লাভও করেন, সময়ে সময়ে ক্ষতিগ্রস্তও হন; কিন্তু আমরা যাহা করিতে চাই, তাহার উদ্দেশ্য,—ক্ষতির সম্ভাবনাকে দূর করা, অপিচ সুবুদ্ধি সাবধান কৃষকগণকে অপরিমিত হারের সুদের দায় হইতে রক্ষা করা! অমিতব্যয়ী অপরিণামদর্শী কৃষকদিগের নিকট অনেক সময় টাকা মারা যায় বলিয়া, মহাজনগণ অন্য সকলের ঘাড়ে অধিক সুদ চাপাইয়া, সেই ক্ষতি পূরণ করিয়া লন। সেরূপ আর না হইতে পারে,—ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য। নচেৎ রায়তগণ যে বিনা সুদে টাকা পাইবে এবং মহাজনগণের যে অস্তিত্বই থাকিবে না,—এমন কোনও কল্পনা আদৌ আমাদের মনে স্থান পায় নাই। উত্তমর্ণ-দিগের মূলধন ন্যায়ানুমোদিত প্রকৃতপথে পরি-চালিত হয় এবং প্রতি বৎসর তাঁহারা যে অসীম ক্ষতিগ্রস্ত হন, তাহা অপনীত হয়,—ইহাই আমা-দের উদ্দেশ্য। এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা অনিশ্চিত সন্দেহজনক জামিন লইয়া টাকা ধার দিয়া প্রকারান্তরে জুয়া খেলা খেলিতে চাহেন। আমরা কিন্তু সেরূপ অনিশ্চিত জামিনের উপর ঋণদানে দ্যূতক্রীড়ায় জয়লাভের প্রশ্রয় দেওয়াকে—কোন ক্রমেই ন্যায়সঙ্গত পন্থা বলিয়া মনে করি না। আমরা বুঝি,—উপযুক্ত জামিনে ন্যায়সঙ্গতভাবে ঋণদানই কৃষির পক্ষে শ্রেয়ঃ।

আমরা বিশ্বাস করি, কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি স্থাপন দ্বারাই এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

যাঁহারা এই দেশকে এবং ইহার অধিবাসী-গণকে ভাল বাসেন, তাঁহাদের নিকট আমাদের উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয় হইবে। সকলের সাহায্যই সাদরে গৃহীত হইবে। আমরা অর্থ চাই না; আমরা কেবল চাই—লোক। গ্রামবাসীরা চায় এরূপ হারে সুদ দিতে, যাহাতে মহাজনগণ মূলধন-নিয়োগে আকৃষ্ট হন; কিন্তু আমরা চাই লোক—যাঁহারা আমাদের এই কো-অপারেটিভ সোসাইটির নিয়ম-প্রণালী জন-সাধারণকে বুঝাইয়া দিতে পারেন এবং জনসাধারণ যাহাতে সেই মত কাজ করে তদ্রূপ উপদেশ দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারেন।

তিন বৎসর পূর্ব্বে এক আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। সেই আইনে কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি স্থাপন সম্ভবপর হইয়া আসে। বার বৎসর ধরিয়া একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায় যে উদ্দেশ্যে ধীরভাবে কার্য্য করিয়া আসিতেছিল, এক্ষণে তাহারই ফল প্রত্যক্ষীভূত। এ সম্প্রদায় যে কেবলমাত্র সরকারী লোক দ্বারা গঠিত তাহা নহে; ইহাতে দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী অনেক ভারতবর্ষীয় এবং ইউরোপীয় ভদ্রলোক আছেন। এক্ষণে ভারতবর্ষে যে সকল কেন্দ্রিক (সেণ্টাল central) নাগরিক (urban) ও গ্রাম্য (rural) সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে ২৫ লক্ষ টাকার উপর তহবিল মজুত আছে। গত বৎসর ঐ সমিতি সমূহে অন্যূন ৩৭ লক্ষ টাকার কাজ চলিয়াছিল। কিন্তু সে কথা থাক! আজ আমি কেবলমাত্র গ্রাম্যসমিতিসমূহে কত কাজ করিয়াছে, তাহাই দেখাইতেছি। গ্রাম্যসমিতিসমূহ নিয়োজিত সমস্ত টাকাই কৃষকগণকে কিম্বা কৃষি উৎপন্ন দ্রব্যে সম্পুর্ণ নির্ভরশীল শিল্পীগণকে তাহাদিগের কার্য্য চালাইবার জন্য দেওয়া হইয়াছে। গত তিন বৎসরের কার্য্যের ফলে, এক্ষণে ভারতবর্ষে ৭১৫টি গ্রাম্যসমিতি স্থাপিত হইয়াছে এবং সেই সমিতি সমূহের মূলধন দাঁড়াইয়াছে—প্রায় ১১ লক্ষ টাকা। ঐ টাকার অর্দ্ধেক সমিতির সভ্যগণের চাঁদার দ্বারা, সিকি টাকা গভর্ণমেণ্টের নিকট কর্জ্জ লইয়া এবং বাকী সিকি টাকা বাহিরের লোকের নিকট হইতে কর্জ্জ লইয়া সংগৃহীত হইয়াছে। গত বৎসর প্রায় বার লক্ষ টাকা ধার দেওয়া হইয়াছিল, এবং তত্ত্বাবধানের সমগ্র খরচ বাদে, সাত হাজার টাকা মাত্র ব্যয় পড়িয়াছিল। সমস্ত বৎসরের মধ্যে কোনও দেনাই আদায় হইবে না বলিয়া, হিসাবের খাতায় অনাদায়ী খাতে বাদ দেওয়া হয় নাই। ফলে ক্ষতি কিছুই হয় নাই; পরন্তু বৎসরের শেষে কেবলমাত্র অর্দ্ধ লক্ষ টাকা হাতে সঞ্চিত রাখা হইয়াছিল।

ঋণ-সমিতির কার্য্যপ্রণালীর কৃতকার্য্যতা প্রথমে স্যার ফ্রেডারিক নিকলসনের চিত্তাকর্ষণ করে। তদনুসারে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি মান্দ্রাজে কৃষি ব্যাঙ্ক স্থাপন বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করেন। পরিশেষে তাঁহারই পরিশ্রমের ফলে ভারতবর্ষে এতৎসম্বন্ধে এই উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

আমি ঐ সকল প্রণালীর প্রত্যেক বিবরণ বিবৃত করিবার ইচ্ছা করি না। বহুদর্শিতার ফলে অধুনা যে প্রণালী ভারতবর্ষের ন্যায় কৃষিজীবী গ্রাম্য-জনসমাজের পক্ষে উপযুক্ত প্রতিপন্ন হইয়াছে, কেবলমাত্র সেই প্রণালীটির অর্থাৎ রাইফিসেন সমিতির বিষয়টি আলোচনা করিতেছি। এই সমিতিই যে ভারতবর্ষের পল্লিগ্রামসমূহের পক্ষে উপযুক্ত, ইহাই স্যার ফ্রেডারিক নিকলসনের মত, এবং এই মতই তিনি তাঁহার সুবৃহৎ রিপোর্টে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি সংক্রান্ত আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে স্বতন্ত্র যে কমিটি গঠিত হইয়া এই প্রশ্ন সম্বন্ধে তর্ক ও বিচার করিয়াছিলেন, সেই কমিটিরও এই মত; এবং এই মত যে ভ্রান্তিশূন্য, বহুদর্শিতা দ্বারা তাহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে।

যে সকল কৃষক আপন আপন ঋণ গ্রহণ শক্তির সার্থকতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য দলবদ্ধ হয়, এবং যে সকল উপকার এককের পক্ষে পাওয়া অসম্ভব, কিন্তু সমষ্টির পক্ষে পাওয়া সম্ভব—সেই সকল উপকার পাইবার জন্য যে সকল কৃষক দলবদ্ধ হয়, সাধারণতন্ত্রভাবে শাসিত সেই সকল কৃষকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলসমূহকে রাইফিসেন সমিতি বলে। প্রত্যেক লোকের কোনও না কোন জামিন আছেই; অন্ততঃ প্রত্যেক লোকের পরিচিত ব্যক্তিগণের মধ্যে সৎস্বভাব, খ্যাতি প্রভৃতির ন্যায় এমন কোনও গুণালঙ্কৃত হইবার ক্ষমতা আছে—যদ্দ্বারা তাঁহাকে বিশ্বাস করা যাইতে পারে। তাঁহার অর্থ না থাকিতে পারে, সম্পত্তি না থাকিতে পারে; কিন্তু লোকের সহিত ব্যবহারে সততা প্রদর্শন করিবার জন্য চরিত্র সংস্কারের ক্ষমতা তাঁহার নিশ্চয়ই আছে। যাঁহারা ভারতবর্ষের পল্লীগ্রামের বিষয় জানেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, পল্লীগ্রামে সততাগুণালঙ্কৃত ব্যক্তির সংখ্যা অল্প নহে। অধিকাংশ কৃষক তাহাদের নিজ গ্রামে তাহাদের প্রতিবাসিগণের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়া থাকে, এবং সেই সৎস্বভাবই 'কো-অপারেটিভ ক্রেডিটের' ভিত্তি।

এই সকল সমিতিতে মূলধনের অংশ বিক্রয়ের ব্যবস্থা না থাকায়, লভ্যাংশ বিভাগেরও আশঙ্কা নাই। সকলের স্বার্থই সমান; সুতরাং ঋণদাতা ঋণগৃহীতার মধ্যে এখানে কোনই শত্রুতা নাই। সকলেরই ইহাতে কাজ করা স্বার্থ; সুতরাং কাহাকেও তজ্জন্য বেতন দেওয়া হয় না।

এই সমিতি হইতে প্রাপ্ত ঋণলব্ধ অর্থ হইতে সকলেই যথেষ্ট লাভবান হইতে পারিবেন। সাধারণভাবে এই সমিতির কার্য্যাকার্য্যে যেমন সকলেরই দায়িত্ব আছে, ইহার তত্ত্বাবধানেও তেমনই সকলেরই ক্ষমতা আছে। সমিতি যে টাকা ধার করিতে ইচ্ছা করে,—উহা তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণ; যেহেতু এই সমিতির প্রত্যেক সভ্য তাঁহার প্রতিবাসীর প্রতি স্বতঃপরত, এরূপ লক্ষ্য রাখেন,—যাহাতে তাঁহাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয়। যদি কোন সভ্য টাকার অসদ্ব্যবহার করেন, তাহা হইলে অপর সভ্যগণ ঋণদাতাকে জানাইয়া দেন। ইহাতে তাঁহাদিগকেও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না, এবং কর্জ্জের টাকারও অসদ্ব্যবহার হয় না। প্রত্যেকেরই উপর এইরূপ অসীম দায়িত্ব ন্যস্ত না থাকিলে, সকলেরই স্বার্থরক্ষা অসম্ভব হইত। এই স্বার্থের জন্যই অধিক বেতনযোগ্য লোকগণ বিনা বেতনে অধিকতর সুন্দরভাবে এই সমিতির কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

সভ্যগণের মধ্যে মতানৈক্য ঘটিলে এই সমিতি যে কোনও মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। কিন্তু ইহা যাহাতে ভাঙ্গিয়া না যায়, তজ্জন্য এই সমিতির সভ্যগণকে এক বাধনে বাঁধিতে একটী রিজার্ভ ফণ্ড করা হইয়াছে। যে হারে টাকা ধার করা হয়, তাহা অপেক্ষা যে হারে টাকা ধার দেওয়া হয়, সে হার অবশ্য বেশী; এবং সেই লাভ হইতেই এই স্বতন্ত্র ভাণ্ডার (ফণ্ড) স্থাপিত হইয়াছে। সেই ভাণ্ডারে কাহারও বিশেষ কোনও অংশ না থাকায় তাহাতে সভ্যগণের সকলেরই স্বার্থ সমান। উহা সমস্ত সভ্যগণেরই সম্পত্তি; সুতরাং কোনও এক জন সভ্য তাহাতে কখনই কোনও লভ্য অংশের দাবী করিতে পারেন না। সেই স্থায়ী ভাণ্ডার (রিজার্ভ ফণ্ড) যে কেবল দায়িত্ব-বন্ধনের মূলধন, তাহা নহে; উহা সভ্যগণকে একত্রে একসূত্রে বাঁধিবারও একটী দৃঢ়তম বন্ধন। যেহেতু, যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন লোক ইহার সভ্য থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই স্থায়ী ভাণ্ডারে তাহার স্বার্থ আছে।

যে বিধির উপর রাইফিসেন-সমিতি স্থাপিত, তাহা আমি পূর্ব্বেই আপনাদিগকে বলিয়াছি; এই বার কোথা হইতে মূলধন সংগ্রহ করা হইবে ইহাই বিবেচ্য বিষয়। অধিকাংশ সভ্যই স্বার্থের জন্য যোগদান করে। তাহারা টাকা জমা দেয় না; কেবল টাকা ধার করিতে আইসে। বাহির হইতে মূলধন সংগ্রহ করিতে হইবে—এই চেষ্টাই প্রথমতঃ এই নূতন সমিতি প্রতিষ্ঠার প্রধান প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যতক্ষণ না বিশ্বাস উৎপন্ন করিতে পারা যায়, ততক্ষণ মূলধন পাওয়া কঠিন; এবং মূলধন ব্যতিরেকে বিশ্বাস উৎপন্ন করাও কঠিন। যাহা হউক, দায়গ্রহণেচ্ছুক ঋণদাতা সহজেই পাওয়া যায়, এবং গভর্ণমেণ্টেরও সাহায্য দানে আগ্রহ আছে। এখন প্রয়োজন—স্থানীয়—মূলধন এবং সুলভ মূলধনের কল্যাণে সঞ্চয়ক্ষম সভ্যগণের নিজের সঞ্চিত ধন আকর্ষণ করা। উত্তম কার্য্যভিত্তি না পাইলে, কেহই কখনও উন্নতি করিতে পারে না। যখন সমিতির বিশ্বস্ততা প্রতিপন্ন হয়, তখন সমিতি যে হারে সুদ দিতে ইচ্ছুক, তাহাতেই স্থানীয় মূলধন প্রাপ্ত হইতে পারিবে। এ বাঙ্গালা দেশের স্থানীয় অবস্থানুসারে শতকরা ১২॥০ সাড়ে বার টাকা হইতে ১৮৸০ পৌনে উনিশ টাকা পর্য্যন্ত সুদের হারে টাকা পাওয়া যাইতে পারে—দেখিয়াছি। আশা হয়, আমাদের চেষ্টায় কৃতকার্য্যতার সঙ্গে সঙ্গে এই হারও কমিয়া যাইবে।

যে জামিনে মূলধন সরবরাহ করা যায়, প্রথমে তাহার সার্থকতা প্রতিপাদনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি। যত দিন না সভ্যগণ যথেষ্ট উপকার প্রাপ্তির বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হন, ততদিন সুদের হার কখনই কম হইবে না, এবং স্থানীয় লোকেরাও মূলধন সরবরাহে আকৃষ্ট হইবে না। ফলতঃ উত্তমর্ণগণ যাহাতে তাঁহাদের টাকার ন্যায্য সুদ পাইতে পারেন, তাহারই ব্যবস্থা করিয়া স্থানীয় ঋণদাতৃগণের টাকা সেই প্রণালীতে নিয়োগ করাই এই সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য। ঋণ আদান-প্রদান সম্বন্ধে এইরূপ সতর্কতার যদি ব্যবস্থা না হইত, তাহা হইলে একজন লোক তাহার যথাসর্ব্বস্ব গ্রাম্যবাসীদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া প্রায়ই যে বিপদে পড়িত, তাহার সম্ভাবনাই খুব বেশীই ছিল। কিন্তু সে আশঙ্কা কিসে দূরীভূত হয়, সেই বিষয়ই আমি আপনাদিগকে বলিতেছি। তদ্বিষয়ে আমার প্রথম বক্তব্য এই যে, এই সমিতি কেবল-মাত্র ইহার সভ্যগণের মধ্যেই আপন কার্য্য সীমাবদ্ধ রাখে। বাহিরের লোককে ঋণপ্রদান নিষিদ্ধ। যে গ্রামের প্রত্যেক লোক আপন প্রতিনিধিগণকে জানে, সেই গ্রামেই এই সমিতির কার্য্য সীমাবদ্ধ। জামিন যতই ভাল হউক না কেন, বাহিরের লোককে এই সমিতিতে ভর্ত্তি করা হয় না। ভ্রমপ্রমাদজনিত বিপদের সম্ভাবনা পদে পদে; বাহিরের লোকের উপর গ্রাম্য জনসমাজের কোন অধিকার নাই। সুতরাং গ্রামের মধ্যে যদি কোনও লোক বিশ্বাসের উপযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকেই সভ্যরূপে গ্রহণ করা যাইতে

পারে; অপিচ, গ্রামেরই কোনও লোক যদি সভ্য হইবার উপযুক্ত না হয়, তাহা হইলে সেও বিশ্বাসের যোগ্য নয়। সমিতিতে কাহাকেও ভর্ত্তি করা না করার ক্ষমতা সভ্যগণেরই উপর ন্যস্ত আছে। সুতরাং এই কঠোর নিয়ম সত্ত্বেও তাঁহারা যদি কোনও লোককে সমিতিতে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাহার প্রতিবাসীগণ যে তাহাকে বিশ্বাস করেন, ইহাই বুঝিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ,—প্রত্যেক সভ্যকে কর্জ্জ পাইবার পূর্ব্বে তাঁহার অবস্থা বিবৃত করিয়া অপর সভ্যগণকে জানাইতে হইবে। তিনি ঐ টাকা লইয়া কি করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা অবশ্যই বলিতে হইবে। তখন তাঁহাকে কর্জ্জ দেওয়া নিরাপদ কিনা এবং তাঁহার বাস্তবিক কি পরিমাণে কর্জ্জ প্রয়োজন, সভ্যগণ তাহার মীমাংসা করিবেন। তৃতীয়তঃ—যে কথা জানাইয়া টাকা কর্জ্জ লওয়া হইবে, ঋণগ্রহীতা সভ্য সেই টাকা সেই কাজেই খরচ করিতে বাধ্য। যদি তিনি তাহা না করেন, তাহা হইলে সভ্যগণ তাঁহাকে ঐ টাকা ফেরত দিতে বলিবেন; কারণ, অন্যমতে ব্যয়ে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকিতে পারে। চতুর্থতঃ,—প্রত্যেক সভ্যকে ঋণ পরিশোধের জন্য দুইজন সভ্যকে জামিন দিতে হইবে, ঋণগ্রহীতা ঐ ঋণের টাকা খরচ কিসে করেন, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবার জন্য প্রতিভূ সভ্যদ্বয়ের উপর বিশেষ ভার দেওয়া হইবে। সভ্যগণ সকলকেই এই দায়িত্ব লইতে বাধ্য করেন। যিনিই যখন ধার করিবেন, তাঁহাকেই তখন এইরূপ ভাবে জামিন দিতে হইবে। ইহাতে এই ফল হয় যে, এইরূপ সমিতিতে টাকা রাখা খুব নিরাপদ হয়। এই নিয়মে কার্য্য করিয়া এ পর্য্যন্ত ইউরোপে কিম্বা ভারতবর্ষে একটী পয়সাও ক্ষতি হয় নাই।

উপরোক্ত নিয়মে পরিচালিত কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি যে ভারতবর্ষের গ্রাম্য জীবনের সহিত সামঞ্জস্যযুক্ত নিখুঁত সমিতি, ইহা প্রমাণ করিতে আমি বোধ হয়—যথেষ্টই চেষ্টা পাইয়াছি।

এখন, কি প্রকারে ঐ সকল সমিতি পরিচালিত হইতে পারে, কেবল মাত্র তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া বাকী আছে।

সমিতিগুলির চালকের ক্ষমতা সভ্য-সকলের হাতে থাকে; তত্ত্বাবধারণের ভার সভ্যগণের হস্তে ন্যস্ত থাকে। এক বৎসর কার্য্য করিবার জন্য তাঁহাদের মধ্য হইতে তাঁহারাই একটি পঞ্চায়েৎ অর্থাৎ পাঁচ জন সভ্য সংগঠিত একটি কমিটি নির্ব্বাচিত করেন, এবং একজন সভ্য প্রয়োজনীয় হিসাব রাখেন। সমিতি বৃহৎ হইলে সেক্রেটারী নিজেকে সাহায্য করিবার জন্য আর একজনকে সহকারীরূপেও নিযুক্ত করিতে পারেন। কমিটির-সভ্যগণ বেতন পান না। তাঁহাদিগকে খুব অল্প কাজই করিতে হয়। যেহেতু কার্য্যপরিচালনে সাহায্য করাই প্রত্যেক সভ্যেরই স্বার্থ। সভ্যগণকে বেতন দেওয়া হয় না; কারণ প্রথমতঃ তাহা হইলে সুদের হার খুব বেশী করিতে হইত, দ্বিতীয়তঃ তাহা হইলে পুনঃপুনঃ নির্ব্বাচিত হওয়াই কমিটির স্বার্থ হইত, এবং সভ্যগণের উপকারের দিকে মন দেওয়া অপেক্ষা যাহাতে তাঁহারা পুনর্নির্ব্বাচিত হইতে পারেন এরূপভাবে সমিতি পরিচালন করিতে সকলেই ইচ্ছুক হইতেন। অপর পক্ষে তাঁহাদিগকে বেতন না দেওয়ায় সকলের উপকারের জন্য সমিতি পরিচালন করাই তাঁহাদিগের স্বার্থ হইবে এবং

তাঁহাদের কার্য্যের সময় শেষ হইলে তাঁহারা তাঁহাদিগের দায়িত্ব অপরকে বুঝাইয়া দিতে প্রস্তুত থাকিবেন।

সভ্যদিগের জন্য প্রত্যেকদিন কার্য্য করিতে কমিটিকে বিরক্ত করিতে পারা যায় না; সেইজন্য মাসের মধ্যে একদিন, সাধারণতঃ পূর্ণিমার দিন, পঞ্চায়েতের অধিবেশনের দিন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যখন কোনও সভ্য ঋণের জন্য আবেদন করেন, তখন কমিটি তিনটি বিষয় বিবেচনা করেন। প্রথম,—ঋণের প্রয়োজন; দ্বিতীয়,—কত কিস্তিতে টাকা পরিশোধ করিতে হইবে; তৃতীয়,—ঋণগৃহীতার মৃত্যু কিম্বা ত্রুটি হইলে তাঁহার জামিন। কমিটি প্রত্যেক সভ্যের অবস্থা বিশেষরূপে জানেন; সুতরাং তাঁহাদের ঋণ-প্রয়োজন স্থিরীকরণ বিষয়ে তাঁহাদের কোনই কষ্ট হয় না। কমিটি ঋণগ্রহীতা সভ্যের পরিশোধের ক্ষমতাও জানেন; সুতরাং যে নিয়মে টাকা ঋণ দিলে সমিতির কোনও ক্ষতি হইবে না, অথচ ঋণ গ্রহীতারও উপকার হইবে, সেই ব্যবস্থাই বিহিত করিয়া দেন। অর্থাৎ, যদি কোনও লোক অত্যন্ত অধিক সুদের টাকা শোধ দিবার জন্য টাকা ধার করে, তাহা হইলে কমিটি ঐ সভ্যের পূর্ব্ব মহাজন কর্ত্তৃক প্রার্থিত সুদের হার এবং সমিতির প্রার্থিত সুদের হার বিবেচনা করিয়া কত কিস্তিতে ঐ টাকা পরিশোধ করিতে হইবে, তাহা ঠিক করিবেন। যদি শস্য উৎপন্ন করিবার জন্য টাকা ধার করা হয়, তাহা হইলে উৎপন্ন শস্য বিক্রয় দ্বারা সমস্ত টাকা পরিশোধ করিতে হইবে। যখন একবার কমিটি কাহারও ঋণপ্রয়োজন স্থির করিবেন এবং সেই প্রয়োজনানুসারে কোনও সভ্য ঋণ লইতে সম্মত হইবেন, তখন ঐ টাকা কেবলমাত্র সেই উদ্দেশ্যেই তাহাকে নিয়োজিত করিতে হইবে। অর্থাৎ যদি কোনও লোক বিবাহের খরচের জন্য টাকা ধার করেন, তাহা হইলে ঐ টাকা দ্বারা তিনি এক জোড়া বলদ ক্রয় করিতে পারিবেন না। যদি ঋণগ্রহীতাকে কমিটী কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত উদ্দেশ্য পরিবর্ত্তন করিতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার উপর কোন শাসনই থাকিবে না। সভ্যগণের অবস্থানুসারে কিস্তির সংখ্যাও পরিবর্ত্তিত হয়। একজন তামাক চাষ করেন, তাঁহাকে তামাক বিক্রয় করিয়া টাকা শোধ দিতে হইবে। একজন পাট চাষ করেন, তাঁহাকে পাটের দাম লইয়া ঐ টাকা দিতে হইবে। আর একজন মাসিক বেতনভোগী শ্রমজীবী, তাঁহাকে প্রত্যেক মাসে নির্দ্দিষ্ট টাকা প্রদান করিতে হইবে। ফলতঃ সকলের অবস্থানুসারেই ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হইবে। ঋণগ্রহীতা এবং কমিটীর মধ্যে আলোচনা দ্বারা কিস্তিসংখ্যা স্থিরী-হয়। কোনও নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পর্য্যন্ত টাকা কমিটির ধার দিবার ক্ষমতা আছে; এবং সমিতির জন্য কোনরূপ টাকা কর্জ্জ দিবার নিয়মগুলি সভ্যগণ কর্ত্তৃক সীমাবদ্ধ করা আছে।

এই কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটীর কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সহিত একটি তত্ত্বাবধায়ক-সমিতি আছে। মধ্যে মধ্যে হিসাব-মোকাবেলা করা, সভ্যগণকৃত ঋণ-ব্যবহারে পর্য্যবেক্ষণ করা, অপব্যবহার ঘটিলে কিম্বা সভ্যের ব্যবহারে সমিতির পসার নষ্ট হইতে পারে এরূপ ঘটনা ঘটিলে, সমিতিকে তাহা জ্ঞাপন করা,—তত্ত্বাবধায়ক সমিতির কর্ত্তব্য।

আত্মসহায়তাই এই ঋণদান-সমিতির সার উদ্দেশ্য। ইহার নিয়মগুলি এবং কি রকমে সেগুলি ব্যবহৃত হয়, তাহা আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছি। যাহাতে আপনারা সেই সকল মনে রাখিতে পারেন, তজ্জন্য ঐগুলি সংক্ষেপে পুনর্ব্বর্ণন করিব। রাষ্ট্র-

ফিসেন কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটির প্রধান নিয়মগুলি সংখ্যায় সাতটি।

(১) অসীম দায়িত্ব।
(২) ক্ষুদ্র স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ কার্য্যক্ষেত্র।
(৩) কোনও অংশ নাই, সুতরাং লভ্যাংশও নাই।
(৪) অবৈতনিকভাবে কার্য্যনির্ব্বাহ।
(৫) লাভ কিম্বা সঞ্চিত অর্থ হইতে ঋণ-পরিশোধ।
(৬) অবিভাজ্য রিজার্ভ ফণ্ড বা স্থায়ী ভাণ্ডার।
(৭) সভ্যগণের নৈতিক এবং আর্থিক উপকার।

এই সাতটি নিয়ম ভিত্তিস্বরূপ রাখিয়া কার্য্য করায় গত অর্দ্ধ শতাব্দীতে ইউরোপে বিশেষ সাফল্য লাভ হইয়াছে। ঐ এক ভিত্তির উপরই কার্য্যক্ষেত্র নির্ম্মাণ জন্য আমরাও এই ভারতে সফলতা-লাভ করিতেছি। আর একটি বিষয় বাকী আছে। বর্ণিত সমিতিগুলি—ক্ষুদ্র এবং অনেক ক্ষেত্রে দুর্ব্বল; কিন্তু একতানিবন্ধন দৃঢ়ীকৃত। ইউরোপ ঐ সকল সমিতি শাসন-শৃঙ্খলা এবং অর্থসাহায্যের জন্য পরস্পর মিলিত হইয়াই প্রবল হইয়াছে। জর্ম্মণী এবং অষ্ট্রীয়ার মত ভারতবর্ষে ঐরূপ স্বতন্ত্র সমিতিগুলিকে একত্র সম্মিলিত করা বাকী আছে। এক্ষণে এই মহাকার্য্যে লোকদিগের চিত্তাকর্ষণ করিতেছি। ইউরোপে যখন উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে, তখন ভারতেও সফল হইবে—ইহা আশা করা যায়। সমিতিগুলি এইরূপে সম্মিলিত হইলে, পরস্পরের জন্য জামিন দিতে সমর্থ হয়।

এইরূপে জনসাধারণের চক্ষে স্বতন্ত্র সমিতিগুলিও জামিনের মূল্য বৃদ্ধি করিতে পারে। সুতরাং খুব অল্প হারের সুদে মূলধন সংগ্রহ করিতেও সমর্থ হয়। এই একতাই এক সমিতির মূলধনাধিক্যে ও অপর সমিতির মূলধনাভাবে সামঞ্জস্য বিধান করিবে, এবং এতদ্দ্বারা পুরাতন সমিতিগুলি নূতন সমিতিগুলিকে আবশ্যকানুযায়ী কার্য্যপদ্ধতি শিখাইতে সমর্থ হইবে।

ইহাই কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। আমি বিবেচনা করি, আপনারা আমার সহিত ইহা বিশ্বাস করিতে সম্মত হইবেন যে, তাদৃশ নিয়ম বিধানেই ভারতবর্ষীয় ঋণ সমস্যার সমাধান করিবে। আমরা আমাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট অর্থ সাহায্য চাই না। আমাদের এই নিয়ম সকল জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিবার জন্য এবং যাহাতে তাহারা সেই মত কার্য্য করে এইরূপ উপদেশ দিবার জন্য দেশের লোকের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মহোদয়গণের স্বেচ্ছা-প্রণোদিত সাহায্য প্রার্থনা করি। টাকা নিশ্চয়ই আসিবে; কিন্তু আমরা এখন কেবল এরূপ লোক চাই,—যাঁহারা এই দেশকে এবং ইহার অধিবাসিগণকে ভালবাসেন;—যাঁহারা আপন হতভাগ্য ভ্রাতৃগণকে সাহায্য করিবার জন্য সময় এবং পরিশ্রম উৎসর্গ করিতে ইচ্ছুক;—যাঁহারা আমাদের এই কার্য্য বিশ্বাস করেন, এবং জনসাধারণের প্রতি যাঁহাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। কোনও যুবকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা মহত্তর কার্য্য আর নাই। ইহাতে বিশেষ ক্ষমতার এবং পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন নাই; ইহাতে কেবল সহিষ্ণুতা এবং সহানুভূতির প্রয়োজন। দেশের জন্য কার্য্যকরণেচ্ছুক লোকের পক্ষে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ কার্য্য।



বৈশাখ—১৩১৬।

নব বর্ষ।

—

কালের অনিবার্য্য গতিতে আর একটি বৎসর অস্তমিত হইল। 'কৃষক' দশমবর্ষে পদার্পণ করিল। লেখক, গ্রাহক ও পাঠকবর্গের সহানুভূতির বলেই যে 'কৃষক' এতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। আমাদের দেশে সংবাদপত্রের আধিক্য যত, অকাল মৃত্যুর দৃষ্টান্ত ততই সুলভ। সাধারণ সংবাদপত্র সমূহই যখন উপযুক্ত উৎসাহের অভাবে কালগ্রাসে পতিত হয়, 'কৃষকে'র ন্যায় ব্যবহারিক বিষয় সম্বন্ধীয় সংবাদপত্র যে এতদিন নিজের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছে, তাহা দেশীয় লোকের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানাকাঙ্ক্ষার সামান্য পরিচয় নহে। বস্তুতঃ দেশে যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভের একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে ও ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

যতদিন আমাদের এই নূতন আকাঙ্ক্ষাটা উপযুক্ত কার্য্যে নিয়োগের অভাবে হীনবল না হইয়া পড়ে, ততদিন আমাদের উন্নতির আশা আছে। প্রথম উদ্যমের ও আত্ম শক্তির অস্তিত্বের প্রথম অনুভবের সহিত একটা মাদকতা জড়িত আছে। যখন আমরা প্রথম বুঝিতে পারি যে আমাদের কার্য্য করিবার সামর্থ্য আছে, তখন এক সঙ্গে একবারে অনেক কার্য্য করিয়া ফেলিবার বাসনা হয়। এরূপ উৎসাহের আধিক্যে কোন কোন কাজ বাদ পড়িয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে দেশে অনেকগুলি যৌথ কারবার স্থাপিত হইয়াছে এবং নূতন নূতন শ্রমশিল্পের দিকে লোকের মনযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। এ সময় আমাদিগকে বিশেষ সতর্কতার সহিত কার্য্য করিতে হইবে। এ সময়ে পদস্খলনে যে কেবল বর্ত্তমানের ক্ষতি হইবে, তাহা নহে, ভবিষ্যতেরও সমূহ অনিষ্ট সাধিত হইবে। আরও একটা কথা আমাদের মনে রাখা উচিত। আমরা শ্রমশিল্প স্থাপনের আগ্রহে অনেক সময় ভুলিয়া যাই যে, ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। এখানে কৃষিজীবীর সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অবশ্য শ্রমশিল্প যত বৃদ্ধি পায়, ততই মঙ্গল। কিন্তু শ্রমশিল্প হইলেই সব হইল না। শ্রমশিল্পের উন্নতির সহিত কৃষির উন্নতি হইলেই ধনাগমের পথ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে। নতুবা ধনাগমের মূল ভিত্তি,—কৃষি, দুর্ব্বল থাকিয়া যাইবে। ভিত্তি দুর্ব্বল হইলে উক্ত ভিত্তির উপর নির্ম্মিত অট্টালিকাও নিরাপদ হইবে না। এই প্রসঙ্গে আমরা ভারত হিতৈষী বিচক্ষণ ব্যবসায়ী স্যার ডেনিয়েল হ্যামিলটনের কতিপয় কথার উল্লেখ করিব। ভারতের দারিদ্র্য মোচনের উপায় সমূহ আলোচনা উপলক্ষে তিনি বলিয়াছেন;—"It is commonly stated that India is too much of an agricultural country, but if half the agricultural population were turned on to manufacturers tomorrow, what would be the immediate result? Would it not be the reduction by one half of the food supply of the

country and a further great rise in the prices of food grains? It is not a curtailment of agriculture but an increase which is wanted to enrich India, and to devolop her manufactures." অর্থাৎ সাধারণতঃ ভারতবর্ষকে কৃষিপ্রধান দেশ বলা হইয়া থাকে। কিন্তু কাল যদি অর্দ্ধেক সংখ্যক কৃষিজীবীগণকে শিল্পজীবী করিয়া ফেলা হয়, তাহা হইলে তাহার প্রত্যক্ষ ফল কি হইবে? তাহা হইলে কি দেশে খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের মাত্রা অর্দ্ধেক কমিয়া যাইবে না? ভারতকে ধনশালী করিতে এবং তাহার শিল্পসমূহের উন্নতি সাধন করিতে হইলে কৃষি কমান অপেক্ষা বাড়ানই আবশ্যক। সুতরাং বুঝিতে পারা যাইতেছে, কৃষির উন্নতিই আমাদের প্রথম ও প্রধান কার্য্য হওয়া উচিত। শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠার প্রবল বন্যায় যদি কৃষি, অবহেলায় ভাসিয়া যায়, তাহা হইলে দেশের কখন মঙ্গল হইবে না।

যাহা হউক, এক্ষণে বিগত বৎসর কৃষির সাধারণ অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা দেখা যাউক। সম্প্রতি প্রকাশিত ১৯০৭–০৮ সালের সরকারী কৃষি-বিবরণীতে আমরা দেখিতে পাই যে, উক্ত বৎসর মোটের উপর ৪০,৩৯৯,৯০০ একর জমি চাষ হয়। তাহার মধ্যে ৬,০১৬,৬০০ একরে একবারের অধিক ফসল জন্মিয়াছিল। সুতরাং ঐ পরিমাণ জমি বাদ দিলে প্রকৃত প্রস্তাবে ৩৪,৩৮৩,০০০ একর জমি চাষ হইয়াছিল বলিয়া বুঝিতে পারা যায়।

অনেক স্থানেই সময়ে জলাভাব ও অসময়ে প্রচুর বারিপাত প্রভৃতি কারণে ফসল তেমন সুবিধা হয় নাই। বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলায় বিগত বৎসর অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ ফসল উৎপাদিত হইয়াছে। তৎপূর্ব্ব বৎসর পাটের অধিক দর হওয়ায় বিগত বৎসর অনেকেই প্রলোভনে পড়িয়া অধিক পরিমাণ পাট উৎপাদিত করেন। দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহাদের সে আশা ফলবতী হয় নাই। ফলতঃ বিগত বৎসর বঙ্গীয় কৃষির পক্ষে সুবৎসর ছিল না। আমরা ইতিপূর্ব্বে কর্ষিত জমির পরিমাণ প্রদান করিয়াছি। উহা তৎপূর্ব্ব বৎসরের জমির পরিমাণ অপেক্ষা ১০১৫২০০ একর কম। পক্ষান্তরে উৎপাদিত ফসল সমূহের হিসাব দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ধান, গোধূম, যব, জোয়ার বজরা ও দাউল প্রভৃতির কম চাষ হইয়াছিল। তিসি, তিল, সরিষা প্রভৃতি তৈলশস্যের জমি পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৫৮,৩৩০০০ একর কম। ইক্ষু চাষ ১১,৮০০ একর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। কার্পাস, পাট, নীল প্রভৃতি চাষেরও বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। পশুখাদ্য উৎপাদনের জমি ৭০০০ একর ও উদ্যানজাত ফসলাদির জমিও ১০২,২০০ একর পরিমিত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা এতক্ষণ পশ্চিমবঙ্গের কৃষির বিষয় উল্লেখ করিলাম। পূর্ব্ববঙ্গেও বিগত বৎসর আবহাওয়ার অবস্থা তাদৃশ অনুকূল না থাকায় চাষের পরিসর আশানুরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় নাই। কিন্তু বিগত বৎসর উক্ত স্থানের কৃষিবিভাগ কৃষির উন্নতিকল্পে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। তৎসমুদয়ের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কতিপয় পরীক্ষা হইতে বুঝিতে পারা গিয়াছে যে, অন্যান্য কার্পাস অপেক্ষা বুড়ি কার্পাসের আবাদ পূর্ব্ববঙ্গে সুচারুরূপে হওয়া সম্ভবপর। তজ্জন্য কৃষিবিভাগ চট্টগ্রাম পার্ব্বত্যপ্রদেশ, লুসাই পর্ব্বত, দক্ষিণ শ্রীহট্টের নিকটবর্ত্তী স্থানে এবং পার্ব্বত্য ত্রিপুরায় ৭ মণ

বীজ বিতরণ করিয়াছেন। অনেক স্থানে গোল আলুর চাষ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইক্ষুর মাড়াই কল ক্রয় করিয়া দক্ষিণ শ্রীহট্টের একটি স্থানীয় জমিদারের সাহায্যে উহার উপকারিতা বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে, এবং রাজসাহীতে মিঃ হাদির চিনি প্রস্তুতের কলদ্বারাও চিনি প্রস্তুতপ্রণালী সাধারণকে শিখান হইতেছে। পূর্ব্ববঙ্গ কৃষিবিভাগ বিগত বৎসর একটি নূতন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। এতদ্দেশে মুরগী, হাঁস প্রভৃতির চাষে যথেষ্ট অর্থাগম হইতে পারে, তাহা অনেকেই জানেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে কেহই অনুসন্ধান করেন না। পূর্ব্ববঙ্গের কৃষিবিভাগ নোয়াখালী জেলায় মুরগী চাষের বর্ত্তমান অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া একটি বিবরণী প্রস্তুত করিয়াছেন। অতঃপর ঢাকা সহরেই এই চাষের উন্নতি বিধানার্থ প্রধান কার্য্যালয় স্থাপিত হইবে। লুসাই পর্ব্বতে মেজর কোল ইতিমধ্যেই মুরগী চাষ আরম্ভ করিয়াছেন, এবং বিলাতী মুরগীর দ্বারা দেশীয় মুরগীর সন্তান উৎপাদন করাইতেছেন। ঢাকায় তাঁহারই প্রথা অবলম্বিত হইবে। পরীক্ষায় দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে, চট্টগ্রামের কিম্বা চীন অথবা ষ্টেট প্রণালী হইতে আনীত লংসান মুরগীর জাতই উৎকৃষ্ট। সুতরাং এই গুলি দ্বারাই ভবিষ্যতে মুরগীর বংশ বৃদ্ধি করা হইবে। বস্তুতঃ পূর্ব্ববঙ্গের কৃষিবিভাগের উদ্যম ও উৎসাহ অন্যান্য অনেক কৃষিবিভাগের অনুকরণীয়।

"কৃষক" ভারতীয় কৃষি সমিতির মুখপত্র। সুতরাং উক্ত সমিতির কার্য্যকলাপ এস্থলে সংক্ষেপতঃ আলোচনা করা আবশ্যক। স্থানান্তরে প্রকাশিত সমিতির কার্য্যবিবরণী হইতে পাঠকবর্গ সমিতির কার্য্যাবলী অনেকটা অবগত হইতে পারিবেন। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় বিগত বৎসরেও সমিতি কতিপয় কৃষিবিষয়ক পরীক্ষা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। সে গুলির ফলাফল উক্ত বিবরণীতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আগামী বৎসরে যে সমুদয় পরীক্ষা হইবে, সে গুলিও উক্ত স্থানে প্রদত্ত হইয়াছে। এ সমুদয় পরীক্ষা সম্বন্ধে আমাদের পাঠকবর্গ কোন প্রশ্ন করিলে, সাদরে তাহার যথাযথ উত্তর প্রদত্ত হইবে। এস্থলে একটি বিশেষ বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক। বিগত বৎসর হইতে কৃষি-সমিতি একটি ব্যবহারিক ও কৃষি বিজ্ঞান শিক্ষার্থ পুস্তকাগার ও শিক্ষা শ্রেণী প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন এবং স্থানীয় অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উক্ত কার্য্যে পোষকতা করিতেছেন। এক্ষণে এই বিষয়ে আমাদের গ্রাহক ও পাঠকবর্গ যাঁহার যেরূপ সাধ্য সেই রূপ সাহায্য করিলে আমরা যথেষ্ট অনুগৃহীত হইব।

উপসংহারে আমরা 'কৃষকের' লেখকবর্গকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। তাঁহাদের সাহায্য ও সহানুভূতি ভিন্ন কৃষক বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইতে পারিত না। তজ্জন্য তাঁহাদিগের নিকট 'কৃষকের' পরিচালকবর্গ বিশেষ কৃতজ্ঞ এবং তাঁহারা আশা করেন যে, অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও 'কৃষক' কৃষিবিষয়ক জ্ঞান প্রচার দ্বারা তাঁহাদের অনুগ্রহ ভাজন হইবার উপযুক্ত হইবে।

ভারতীয় কৃষি-সমিতির কার্য্যবিবরণী। *

১৯০৮—০৯।

কৃষি সমিতির পরিচয়। এই কৃষি সমিতি (ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন) ১৮৯৭ সালে স্থাপিত। ইতিপূর্ব্বে ই, বি, এস রেলের সোধপুর ষ্টেসনের নিকট ইহার পরীক্ষা ক্ষেত্র ছিল। ক্রমে ক্ষেত্রটী বাড়াইবার আবশ্যক হওয়ায় এবং অন্য অসুবিধা নিবারণের জন্য দক্ষিণ বারুইপুর ষ্টেসনের নিকট গোবিন্দপুরে ইহার পরীক্ষা ক্ষেত্র স্থানান্তরিত করা হয়। ইহারচতুর্দ্দিকেইসাধারণ চাষীগণের ক্ষেত্র।

পরীক্ষিত বিষয়। এই ক্ষেত্রে প্রায়ই তিন প্রকার পরীক্ষা হইয়া থাকে। সব্জী, ফল ও সাধারণ কৃষিজাত শস্য উৎপাদন। (১) আলু, সব্জী সম্বন্ধে, (২) কলা, পেঁপে ও নারিকেল ফল সম্বন্ধে. (৩) জোয়ার এবং গিনি ঘাস পশু খাদ্য সম্বন্ধে বিগত বর্ষে পরীক্ষার বিষয় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

(১) আলু।—(ক) আলুর জাতি, (খ) আলুর পক্ষে উপযুক্ত সার, (গ) আলুর বীজ ও খাদ্যোপযুক্ত আলু সংরক্ষণের প্রকৃষ্ট উপায়, এবং (ঘ) আলুতে রোগ নিবারণের জন্য ক্ষেত্রে বোর্দ্দো মিশ্রণ পিচকারি প্রদান এই কয়টি বিষয় যথাসম্ভব অনুসন্ধানের জন্য আলু চাষ করা হইয়াছিল। একটী সুপ্রশস্ত পুষ্করণীর পাড়ে বেলে দোঁয়াস জমিতে আলুর ক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। মাটি খুব হাল্কা তার উপর দশ বার লাঙ্গল দ্বারা চষিয়া মাটি ধুলিবৎ চূর্ণ করা, জমিতে আশ্বিনের শেষ ভাগে ধার প্রদান, তদনন্তর চারি পাঁচ বার চাষ ও বিদে দিয়া মাটি ভাঙ্গিয়া দিবার পরে অগ্রহায়ণ মাসে আলু বসান হয়। ২১ ইঞ্চি অন্তর সারি করিয়া এবং আলুর মধ্যে ১০ ইঞ্চি ব্যবধান রাখিয়া আলু বসান হইয়াছিল। এক বিঘা জমিতে নৈনিতাল আলু (যাহার ২৮টীতে সের হয়) ৫।০ মণ লাগিয়াছে। কাটিয়া বসাইলে ৩।০ মণ আলুতে সেই কার্য চলিতে পারে। পাটনা আলুর বীজ খুব ছোট ছিল তাহার এক মণ দশ সের বীজেই এক বিঘার চাষ হইয়াছে। আলু বসাইবার পর ১০ দিন অন্তর ১০ বার জল দেওয়া হইয়াছে। ফাল্গুন মাসে আলু তোলা হইয়াছে। পরীক্ষার ফলে দেখা গেল যে, পাটনা আলুই ফলনে অধিক হয় এবং কাটা গোটা বসাইয়া স্থির হইয়াছে, যে গোটা আলু বসান ভাল। নৈনিতাল কাটিয়া বসান বরং চলিতে পারে কিন্তু পাটনা কাটিয়া বসাইলে কোন লাভ হয় না। পাটনা কাটিয়া বসাইলে অনেক পচিয়া নষ্ট হয়। নিম্নের তালিকায় এই কথারই প্রমাণ হইতেছে।

		গোটা	কাটা
		মণ	মণ
পাটনা	বিঘা প্রতি ফলন	৬৩।৮	৪১৸০
নৈনিতাল	,,	৫৮।২	৫৫ ০

উপযুক্ত সার নির্ণয়। কেবল পাটনা আলু লইয়া পরীক্ষা হইয়াছিল।

		মণ
হাড়ের গুঁড়া ৫।০ মণ	বিঘা প্রতি ফলন	৫২।১
রেড়ীর খৈল ১০।০ ,,	,,	৮৮ ০
ধঞ্চের সার সবুজ সার	,,	৩০।০
গোময় সার ৮৫।০ মণ	,,	৬৩।৮

ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে রেড়ীর খৈলই আলুর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সার এবং যত অধিক প্রয়োগ করা যায় ফলন ততই বাড়ে এবং অপেক্ষাকৃত লাভও অধিক হয়। তথাপি দেখা যায় যে,

* বিস্তারিত বিবরণ ইংরাজি বিবরণীতে সন্নিবেশিত হইল।

আমাদের দেশের নিঃস্ব চাষীর পক্ষে ইহাও অতিশয় দুর্ম্মূল্য। এরূপ অবস্থায় গোময়ই তাহাদের একমাত্র ভরসা। দ্বিতীয়তঃ ধঞ্চে খুব সহজ প্রযুয্য সার। ধঞ্চে বুনিতে বিঘা প্রতি ৴২॥ সের বীজের দাম ।৶০ আনা অতিরিক্ত খরচ হয়। আমাদের ক্ষেত্রে শ্রাবণ মাসে ধঞ্চে বুনিয়া গাছ একটু বড় হইলে আশ্বিন মাসে চষিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

আলু রক্ষা। বীজ আলু অন্যত্র হইতে আনাইতে অত্যন্ত খরচ পড়ে সেই হেতু বীজের জন্য ১০৴০ মণ এবং খাদ্যের জন্য ঐ পরিমাণ আলু রাখিয়া দেখা হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে নৈনিতাল আলু রাখিয়া কোন লাভ নাই, কারণ বাঙ্গালার জল হাওয়ায় উহা আদৌ টীকে না। আমরা মাটির দেওয়াল দেওয়া একটা ঘরে বাঁশের মাচান বাঁধিয়া তাহাতে বালি দিয়া আলু বিছাইয়া রাখিয়াছিলাম। বীজ আলু গুলি তুঁতের জলে ধুইয়া শুখাইয়া এবং খাদ্যের জন্য আলু জলে ধুইয়া পরিষ্কার ও শুষ্ক করিয়া তাহাতে চূণের গুঁড়া মাখাইয়া রাখা হইয়াছিল। তাহার ফলে ১০৴০ মণ বীজ আলু রাখিয়া বৎসরের শেষে ৩॥৬ সের এবং খাইবার আলু ঐ পরিমাণ রাখিয়া ৪৴৬ সের পাওয়া গিয়াছে। আশানুরূপ ফল হয় নাই। আলু সংরক্ষণের অন্য কোন ভাল উপায় আছে কি না তাহা অনুসন্ধান করা হইতেছে।

আলু ক্ষেতে ঔষধ সেক। আমাদের এই বাঙ্গালা দেশের রায়তেরা যতই কেন লোকসান হউক না তথাপি আলুতে রোগ নিবারণের জন্য কোন উপায় অবলম্বন করে না। আলু ক্ষেত্রে মধ্যে মধ্যে পিচকারি দ্বারা ঔষধ সেক করা ত দূরের কথা। আমাদের নিজ ক্ষেত্রে আলুর কোনপ্রকার রোগের প্রকোপ অধিক হয় নাই। সেই হেতু আমরা নিকটবর্ত্তী ৫টী ক্ষেত্রে ঔষধ সেকের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। অনেকেই বর্দ্দো মিশ্রণের বিষয় অবগত আছেন, আমরা সেই বোর্দ্দো মিশ্রণ ব্যবহার করিয়াছিলাম। একটী ক্ষেতে উক্ত মিশ্রণ প্রয়োগ করিবার পরই বৃষ্টি হইয়া ধুইয়া যায়। অপর চারিটী ক্ষেত্রের ফলাফল দেখিয়া বুঝা যায় যে, মিশ্রণ ব্যবহারে অলাভ নাই। যে ক্ষেতে মিশ্রণ প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহার ফলন প্রতি বিঘায় ৫৬৴০ মণ কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষেতের ফলন কেবলমাত্র ৩৮৴০ মণ। প্রতি বিঘায় ১২॥০ মণ মিশ্রণ লাগিয়াছিল। প্রথম বার সেকের জন্য ২॥০ মণ দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৫৴০ মণ হিসাবে প্রয়োগ করা হইয়াছিল। ঐ পরিমাণ মিশ্রণ তৈয়ারি করিবার খরচ মোটে ৭৲ টাকা এবং ছিটাইবার খরচ সমেত ৮॥০ টাকার অধিক পড়ে না। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে খরচ বাদেও নিশ্চয়ই লাভ থাকে।

(২) ফল বৃক্ষের সার নির্ণয়।

কলা। কলাতে (ক) গোময় সার, (খ) গোয়ালের ও খামারের আবর্জ্জনা এবং মৃত কলা গাছ ও পাতার পচানি সার এবং (গ) কেবল মাত্র পাঁক মাটি প্রয়োগ করা হইয়াছে। একটী চাঁপা কলার ক্ষেত ৴৪ কাঠা হিসাবে বিভাগ করিয়া লইয়া কার্য্য আরম্ভ করা হয়।

গোময় ২৫৴০ মণ প্রতি বিঘা,	ফলনের মূল্য	২৮৲
গোয়ালের আবর্জ্জনা ২ ভাগ		
কলা গাছ পচানি ১ ভাগ		
মোট সার ৩০৴০ মণ	,,	৩২৲
পাঁক মাটি ৪০৴০ ,,	,,	৩৮৲

কেবল গোময় প্রয়োগ করিলে যদি সার খুব গলিত ও পুরাতন না হয় তাহা হইলে মাজরা পোকা ধরিবার আশঙ্কা থাকে। যদিও বর্ত্তমান ক্ষেত্রে পাঁক মাটিতেই অধিক ফল দাঁড়াইয়াছে তথাপি আমাদের বিশ্বাস যে আবর্জ্জনা ও কলা গাছ পচানি

সারের সহিত কিছু পাঁক মাটি মিশ্রিত হইলে কলার পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সার দাঁড়াইবে।

নারিকেল। নারিকেল গাছে আমরা এতাবৎকাল লবণ, হাড়ের গুঁড়া ও পাঁক মাটির মিশ্র সার ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিতাম। কিন্তু বিগত দুই বৎসর আমরা কতিপয় নারিকেল গাছে লবণ ও হাড়ের গুঁড়া না দিয়া জলের পানা ও ঝাঝি দিতে আরম্ভ করিয়াছি। ইহাতে উক্ত গাছগুলির ফলন আশাতীত বাড়িয়াছে। পুষ্করণী এবং ঝিলের আবর্জ্জনা যদি একটা সারের কার্য্য করে তাহা হইলে জলাশয় গুলি পরিষ্কারের ব্যয়ের বিশেষ লাঘব হইবে অথচ অতি সামান্য খরচে নারিকেল গাছের সারের কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

পেঁপে। আমাদের বাগানের ধারে ধারে দুই বৎসর হইল কতকগুলি পেঁপে গাছ বসান হইয়াছিল। সেগুলিতে ফল ভাল রকম হইল না দেখিয়া এবৎসর সেগুলিতে কিছু পাঁক মাটি ও ছাই প্রয়োগ করা হয়, তাহাতে খুব ফল হইতেছে। গাছ গুলির অগ্রমুকুল (ডগা) কিঞ্চিৎ কাটিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

(৩) পশু খাদ্য। বাঙ্গালা দেশে ধান খড় ভালরূপ জন্মিলে আর কোন পশু খাদ্যের আবশ্যক হয় না কিন্তু যেখানে খড় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় না বা যে বৎসর অজন্মা হয় তাহার জন্য ত একটা উপায় হওয়া আবশ্যক। সেই জন্য আমরা বার বার জোয়ার ও গিনি ঘাসের চাষ করিয়া আসিতেছি।

আমাদের সমিতির অনারারি ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত ত্রৈলোকনাথ মুখোপাধ্যায় এফ, এল, এস, এই বিষয়ের উদ্যোক্তা।

জোয়ার। জমির পরিমাণ ⅙ বিঘা—আষাঢ় মাসের শেষে ২॥০ সের বীজ বোনা হয়। গাছগুলি প্রায় ১০ ইঞ্চি এবং সারি গুলি প্রায় ১৪ ইঞ্চি তফাৎ ছিল। গাছ বড় হইবার পর একবার নিড়ান ও একবার কোপান হইয়াছিল। গোময় সার—বিঘা প্রতি ২০ মণ হিসাবে প্রদান করা হইয়াছিল—উৎপন্ন ফসল গাছ সমেত ১৬৪ মণ পাওয়া গিয়াছে।

গিনি ঘাস। ইহারও জমির পরিমাণ ⅙ বিঘা। সার বিঘাপ্রতি ২০ মণ পাঁকমাটি। ৫ বার চাষ ও ৫ বার বিদে দেওয়া হইয়াছিল। ৩ ফিট অন্তর সারি ও ২১ ইঞ্চি অন্তর মূল বসাইয়া শ্রাবণ মাসে একবার জল সেচিয়া দেওয়া হয়। দুই বার ঘাস কাটিয়া ওজনে ৯৭ মণ দাঁড়াইয়াছে।

গাভী এবং বলদগণকে উভয় প্রকার খাদ্য খাইতে দিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহারা গিনিঘাসই অধিকতর আগ্রহের সহিত খায়। ইহার সঙ্গে খৈল ও খড় খাইতে পাইয়াছিল। একটি গাভীকে দুই মাস প্রত্যহ ১৫ সের হিসাবে জোয়ার খাওয়াইয়া দেখা হইয়াছে যে, সে ক্রমশঃ রোগা হইয়া পড়িতেছে। সুতরাং অনুমান হয় যে, যতদিন না তাহারা ঐ প্রকার খাদ্যে অভ্যস্ত হয়, ততদিন এরূপ খাদ্যে প্রধানতঃ নির্ভর করা চলে না।

আগামী বর্ষের কার্য্য।

ভারতীয় কৃষিসমিতি ১৯০৯—১০ সালে মাননীয় শ্রীযুক্ত টি, এন, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরামর্শ মত নিম্নলিখিত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন স্থির করিয়াছেন ;—

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় কার্য্যগুলি চারি ভাগে বিভাগ করা হইবে।

১। বীজ ও গাছ বিক্রয় ও বিতরণ।

২। কৃষিজ্ঞান বিস্তার।

৩। একটি বৈজ্ঞানিক পুস্তকাগার স্থাপন ও ছাত্রগণকে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও কৃষিতত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষাশ্রেণী স্থাপনের বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইবে।

৪। কৃষি সম্বন্ধে পরীক্ষা;—

(ক) সব্জী। কোঁড়কের (Mushroom) চাষ। কোঁড়ক অতিশয় পুষ্টিকর খাদ্য। আমাদের দেশে ইহা স্বভাবতঃ জন্মাইতে দেখা যায়, কিন্তু চাষ কেহ করে না। ইউরোপীয়গণ উহা সাদরে আহার করে। তাহারা অন্যত্র হইতে কোঁড়ক আনায়। এখানে ভাল জাতীয় কোঁড়কের সুপ্রথামত চাষ হইলে যে উদ্যানস্বামীদিগের একটি নূতন আয়ের পথ হইবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

(খ) ফলবৃক্ষ। বর্ত্তমান বর্ষেও নারিকেল ও কলা গাছ লইয়া পরীক্ষা হইবে।

(গ) অন্যান্য কৃষিজাত ফসল। কৃষ্ণনগরের মুগ, কাশ্মিরী ছোলা, মধ্য প্রদেশের আউস, ২৪-পরগণা ও কলিকাতার সন্নিহিত স্থান সমূহে ভাল রকম জন্মে কিনা দেখাই এই সকল শস্য চাষের একমাত্র উদ্দেশ্য।

উক্ত কৃষি-সমিতি ১০ বৎসর যাবৎ নানা বিষয় লইয়া সাধ্যমত পরীক্ষা করিয়া আসিতেছেন। এক্ষণে যাহাতে এতৎসংক্রান্ত একটি পাঠাগার ও উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব ও কৃষিতত্ত্ব শিক্ষার ব্যবস্থা হয়, তদ্বিষয়ে সাধারণে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া উক্ত সমিতির কার্য্যাধ্যক্ষগণকে উৎসাহ ও তাঁহাদের কার্য্যের অধিকতরসুযোগ প্রদান করিলে উক্ত সমিতি আপনাদিগকে ধন্য মনে করিবেন।

শ্রীশরচ্চন্দ্র বসু,—সম্পাদক।

জাতীয় বিদ্যামন্দিরে প্রদর্শনী।

জাতীয় বিদ্যামন্দির যে বিগত কয়েক বৎসরব্যাপী দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তি মণ্ডলীর স্বদেশ হিতার্থ চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের অন্যতম ফল, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। বিগত বৎসর এই বিদ্যামন্দিরের ছাত্রবর্গ ও কর্ম্মশালার শিক্ষকবৃন্দের দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যাদির প্রদর্শনী হইয়াছিল। সেই প্রদর্শনী দেখিয়া অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন। এই প্রদর্শনী দেখিয়া আমরা সাহসের সহিত বলিতে পারি যে, তাঁহাদের আশা ও কামনা নিস্ফল হয় নাই।

বর্ত্তমান বৎসরের প্রদর্শনী পাঁচটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে;—বৈজ্ঞানিক শিল্প, জীবতত্ত্ব, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, রাসায়নিক যন্ত্রাদি এবং চিত্রশিল্প—৫টি বিভাগে সর্ব্বসমেত ২৮৫টি দ্রব্য প্রদর্শিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অন্তর্ভুক্ত যে সমস্ত মফঃস্বলের জাতীয় বিদ্যালয় আছে, সেই সকল বিদ্যালয় হইতেও অনেক দ্রব্যাদি এবারে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই প্রকার প্রদর্শিত দ্রব্যের সংখ্যা ১৯২টি এবং রংপুর, মাঝপাড়া, ঢাকা, জলপাইগুড়ি, শান্তিপুর, চাঁদপুর, ময়মনসিংহ, পাবনা, কিশোরগঞ্জ, যশোহর, নোয়াখালি, মালদহ ও কুমিল্লার জাতীয় বিদ্যালয় সমূহও এই প্রদর্শনীতে যোগদান করিয়াছেন।

প্রদর্শনীতে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই বৈজ্ঞানিক শিল্প সমূহের উপর লোকের মনযোগ আকৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ ইহাই প্রদর্শনীর অন্যতম বিভাগ এবং

ইহাতেই জাতীয় বিদ্যামন্দিরের উৎকর্ষতা প্রমাণিত হয়। এই বিভাগে যে সমস্ত দ্রব্য প্রদর্শিত হইয়াছে তৎসমুদয়ের নামোল্লেখ করা এ স্থলে অসম্ভব। 'কিন্তু মোটের মাথায় দ্রব্যাদির উৎকর্ষতা দেখিলে আমাদের জাতীয় উন্নতি যে সম্ভবপর তৎসম্বন্ধে অনেকটা আশার উদ্রেক হয়। এই বিভাগের দ্রব্যাদির মধ্যে কৃষি বিষয়ক যন্ত্রাদির সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। আমরা উদ্যান সম্বন্ধীয় যন্ত্রের মধ্যে কেবল একটি বিদের স্থচারু কার্য্য দেখিয়া বিশেষ আহ্লাদিত হইয়াছিলাম। কিন্তু উহার আকার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং মূল্যও অধিক,—প্রত্যেকটি ৪৲ টাকা। যাঁহারা এতদ্দেশে কৃষিজীবীগণের জন্য যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিতে অগ্রসর হন, তাঁহাদের ইহা মনে রাখা আবশ্যক যে যন্ত্র কেবল গঠন প্রণালীতে উৎকৃষ্ট হইলে হইল না। উহার মূল্যও সুলভ হওয়া আবশ্যক। বর্ত্তমান সময়ে যে কত উৎকৃষ্ট বিদেশীয় যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু তৎসমুদয় এতদ্দেশে প্রচলিত হয় না কেন? কেবল মহার্ঘতার জন্য। যাহা হউক সাধারণভাবে আলোচনা করিতে গেল সকল নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে বলিতে হয় যে, বৈজ্ঞানিক শিল্পবিভাগে জাতীয় বিদ্যামন্দির বিশেষরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

জীবতত্ত্ব বিভাগ সম্বন্ধে কিন্তু সেই কথা বলিতে পারা যায় না। কুক্কুরী, বেঙ্গ, পায়রা প্রভৃতির শব ব্যবচ্ছেদ বিশেষ প্রশংসাযোগ্য। কিন্তু জাতীয় বিদ্যামন্দির যে কি উদ্দেশ্যে কতিপয় শুষ্ক উদ্ভিদ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। উক্ত শুষ্ক উদ্ভিদ সমূহের নমুনাগুলি (Herbarium Specimens) প্রায়ই অযত্নরক্ষিত এবং সার জর্জ্জ ওয়াট ও মিঃ ডুথি প্রমুখ উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্‌গণের সংগ্রহের অপকৃষ্ট নমুনা সমূহ হইতে সংগৃহীত। এতদ্ভিন্ন দুই চারিটি ছাড়া অপর নমুনা গুলিতে বৈজ্ঞানিক নামও দেওয়া নাই। জাতীয় বিদ্যামন্দিরের ছাত্রগণের প্রস্তুত দুইটি নমুনা পুস্তক আমরা দেখিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতে আমরা বিশেষ প্রীত হইতে পারি নাই। আশা করা যায় যে, আগামী বৎসরে জাতীয় বিদ্যামন্দির জীবতত্ত্ব বিভাগে, বিশেষতঃ উদ্ভিদতত্ত্ব বিভাগে উৎকৃষ্টতর দ্রব্যাদি প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইবেন।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিভাগে ও বৈজ্ঞানিক শিল্প বিভাগে, উভয়স্থলেই অণুবীক্ষণ ও তাহার কয়েকটি অংশ প্রদর্শিত হইয়াছে। অণুবীক্ষণের দুই একটা অংশ আগে যে এতদ্দেশে প্রস্তুত হইত না, তাহা নয়। কিন্তু Objective ও Eyepiece ব্যতীত অন্য সমস্ত অংশ এক সঙ্গে নির্ম্মাণ এই বোধ হয় প্রথম। আমরা দুইটি প্রদর্শিত অণুবীক্ষণের সমস্ত অংশ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারি নাই। কিন্তু যতদুর দেখিয়াছিলাম তাহাতে বোধ হয় যে Fine adjustment, বিখ্যাত বিদেশীয় অণুবীক্ষণের সমকক্ষ হয় নাই। একবারে সমস্ত অংশ উৎকৃষ্ট হওয়া সম্ভবপর নহে। সুতরাং যতদূর হইয়াছে তাহাতেই প্রীত হইয়া ভবিষ্যৎ উন্নতির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করাই প্রত্যেক স্বদেশ হিতৈষী ব্যক্তির কর্ত্তব্য কার্য্য।

রাসায়নিক বিভাগে কয়েকটি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র দেখিলে সকলকেই মোহিত হইতে হয়। কয়েকটি রাসায়নিক দ্রব্যাদি সম্বন্ধেও সেই মন্তব্য প্রযুয্য। বিশুদ্ধ ব্রোমিন্, ইথিলস ব্রোমাইড্ প্রভৃতি বাস্তবিকই যথেষ্ট প্রশংসাযোগ্য। এই বিভাগে কয়েকটি খনিজ পদার্থও প্রদর্শিত হইয়াছে। সে গুলিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অভ্র, ফটকিরি, লৌহ, এবং লবণ অপরিস্কৃত অবস্থা ও পরিস্কৃত

অবস্থায় প্রদর্শিত হইয়াছে। সামান্য পরিমাণে যন্ত্রাগারে এইরূপ পরিষ্কৃত দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারা প্রশংসাযোগ্য বটে, কিন্তু তখনই দেশের শুভদিন আসিবে, যখন এই সকল দ্রব্য ব্যবহারোপযোগী কল কব্জার সাহায্যে প্রভূত পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া দেশের নানাবিধ শিল্পে ব্যবহৃত হইবে।

আমরা চিত্রশিল্প বিভাগের অনেকগুলি চিত্র দেখিয়া শিল্পীর প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। সমস্ত চিত্রগুলির নাম এস্থলে উল্লেখ করা অসম্ভব। যাঁহারা তৎসম্বন্ধে বিশেষ খবর চান তাঁহারা বিদ্যামন্দির হইতে প্রকাশিত প্রদর্শিত দ্রব্যের তালিকা হইতে সমস্ত বিষয় অবগত হইতে পারেন।

উপসংহারে আমরা এবারে প্রদর্শনী দেখিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছি। যে সমস্ত দোষের বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, আমরা আশা করি সেগুলি ভবিষ্যতে সংশোধিত হইবে। জাতীয় বিদ্যামন্দিরের ইহা প্রথম উদ্যম। প্রথম উদ্যমে অনেক ত্রুটী থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা হতাশ্বাস হইতে পারি না। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ দেশের গৌরব স্বরূপ। তাঁহারা দেশের মঙ্গলের জন্য যে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন, সে সম্বন্ধে কেহ দ্বিরুক্তি করিবেন না। তাঁহাদের উত্তরোত্তর উন্নতি সকলেরই বাঞ্ছনীয়। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের মনযোগ এখনও বোধ হয় কৃষি ও উদ্ভিদ্‌তত্ত্বের দিকে সমধিক আকৃষ্ট হয় নাই। তাই আমরা প্রদর্শনীতে এই দুইটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয় সম্বন্ধে প্রদর্শিত দ্রব্যাদির সংখ্যা কম দেখিতে পাই। কিন্তু অপরাপর বিজ্ঞানের শিক্ষার সহিত এই দুই বিজ্ঞানের শিক্ষা একান্ত প্রয়োজনীয়। জাতীয় বিদ্যামন্দিরে আপাততঃ উপযুক্তরূপ কৃষি শ্রেণী নাই। উদ্ভিদ্‌বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ারও সুচারুরূপ বন্দোবস্ত নাই। ইহা মনে রাখা আবশ্যক যে, ভারতের অধিকাংশ ধন উদ্ভিদ্‌জাত। সুতরাং তদ্বিষয়ক শিক্ষাতে জাতীয় বিদ্যামন্দির যতই অগ্রসর হন, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল।

কার্ত্তিকশালি ধান্য।

আজ ২।৩ বৎসর ধরিয়া খুলনা ও যশোহর জেলায় পাটের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ যাইতেছে, কিন্তু পাটের পরিবর্ত্তে প্রজাবৃন্দ পাটের জমিতে আর একটী নূতন ফসল উৎপন্ন করিতেছে যদ্দারা তাহাদের পাটের প্রলোভনটা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া পড়িতেছে। জমিদারগণ খাজনা বাকী পড়িবে বলিয়া পাট আবাদের কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত করিতেন না। গভর্ণমেণ্টও পাট ও ধানের বৎসরান্তে একটী করিয়া Statistics লইয়া পাটে বেশী লাভ থাকে এই বিবেচনায় প্রকারান্তরে প্রজাকে পাটের আবাদ করিতে প্রশ্রয় দিতেন। বিদ্যায় ও বিজ্ঞানে চরম স্থান অধিকার করিলেও মনুষ্যের পক্ষে যেমন জীবের প্রাণদান দেওয়া অসম্ভব, সেইরূপ প্রকৃতির বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল যুদ্ধ করাও দুর্ব্বল প্রাণীর পক্ষে অসম্ভব। এই কারণে রাজা ও প্রজা উভয়ের একান্ত যত্ন সত্বেও প্রকৃতির দৌরাত্মে আজ কএক বৎসর এ অঞ্চলে পাটের আবাদ ভালরূপ হইতেছে না, আর সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়ার প্রকোপটাও অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। চাষীগণ শত বাধা বিঘ্ন প্রত্যাখান করিয়া সর্ব্ব প্রথমে পাট বুনিত, পাট ভাল না জন্মিলে সেই সমস্ত জমি প্রায়ই পতিত থাকিত। সম্প্রতি ডাঙ্গার জমিতে পাট ভাল না জন্মিলে সেই সমস্ত ডাঙ্গার জমি ভাঙ্গিয়া এদেশের প্রজারা একটী নূতন ফসল লাগাইতেছে। ঐ ফসল অন্য কিছুই নহে, আমাদের সেই পুরাতন কার্ত্তিক শালি ধান্য। কার্ত্তিক শালি ধানের চাষ এ অঞ্চলে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যাইত না; বর্ত্তমানে প্রজাকুল কার্ত্তিকশালি ধান্যে বিশেষ লাভবান হইতেছে। এই ধান্যকে

মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে স্থানে স্থানে ধাপ্ শাল ধান কহিয়া থাকে, কিন্তু সে অঞ্চলে এই ধান্যের প্রচুর পরিমাণ আবাদ হয় না। যাহা সামান্য আবাদ হইয়া থাকে তাহা অগ্রে ফুলিয়া উঠার দরুণ গাঁধি পোকা নামে এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটে ফুলা ধান্যের সমস্ত দুধ টুকু খাইয়া শীষগুলি নষ্ট করিয়া দেয়। এই কারণে সে দেশের চাষারা ইহার অধিক আবাদ করে না। কার্ত্তিকশালিকে বড়ান আউস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না ; কিন্তু আশু ধান্য বুনিতে হয়, আর কার্ত্তিকশালি ধান্য রোপণ করিতে হয়। কার্ত্তিকশালি ধান্য আউসের সঙ্গে পাকিবে না অথচ ইহা ছোটনা আমনের অনেক পূর্ব্বে পাকিয়া যাইবে। ইহার একমাত্র দোষ এই যে এ ধান আশ্বিন মাসে ফুলিয়া উঠিবার সময় যদি একটা (গাজল) ঝড় বাতাস পায় ত সমস্ত ধান মাটিতে পড়িয়া যায় এবং শীষে চিটা পড়িয়া থাকে। ইহা শ্রাবণের শেষে রোপণ করিয়া আবার কার্ত্তিকের মাঝামাঝি কাটিয়া লইতে পারা যাইবে। এক্ষণে আমাদের আলোচ্য বিষয় কার্ত্তিকশালি ধান্য বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বদেশে উপযোগী কি না? যে সমস্ত জেলায় কার্ত্তিকশালি ধান্যের আবাদ হইতেছে সেই সমস্ত স্থানে কার্ত্তিকশালি ধান্য ভালরূপ জন্মিতেছে কি না? স্থানে স্থানে বহু পূর্ব্ব হইতে কার্ত্তিকশালি ধান্যের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যাইত কিন্তু ইহা তৎকালিক প্রকৃতির উপযোগী না হওয়ায় চাষীবৃন্দ এই ধান্যের আবাদ একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছিল।

প্রকৃতি দেবী যদি শ্রাবণ, ভাদ্র মাসে অতি বর্ষণ করেন আর আশ্বিন, কার্ত্তিকের দিকে বারি বর্ষণ একেবারে বন্ধ করিয়া দেন তাহা হইলে ধান্য পাকিবার সময় দেবমাতৃক দেশে একেবারে সর্ব্বনাশ ঘটিল, আর নদীমাতৃক দেশে মারামারি কাটাকাটি করিয়া সামান্য কিছু ফসল জন্মিল। যেমন রাঢ় দেশ। রাঢ় দেশে আশু ধান্যের আবাদ নাই। পাটের পরিবর্ত্তে রেশম তুঁত তাহাদের ডাঙ্গার জমির প্রধান আবাদ। রাঢ় দেশে আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে অনাবৃষ্টি হইলে তাহাকে "কেতেরো" কহিয়া থাকে। রাঢ় নদীমাতৃক দেশ, নদীতে বন্যা না আসিলে সে দেশে আবাদ হয় না, বর্ষার জলে ধান্য রোপণ হইলেও প্রায়ই নদীর বান আসিয়া ধানের ভুঁয়ে জল দিয়া ধান রক্ষা করিয়া থাকে। কেতেরো হইলে সে দেশের লোকে নদী, নালা, খাদ খন্দ, ডোবা, পুষ্করিণী যেখানে বর্ষার জল পায় ছিঁচিয়া কোন গতিকে আবাদ রক্ষা করে, এই সমস্ত ছিঁচের গল্প শুনিয়া আমাদের চাষারা তাহাদের পাগল আখ্যা দিয়া থাকে। আর সে দেশের আবাদের কথা শুনিয়া হাসিয়া আটখানা হইয়া পড়ে। আশ্বিন, কার্ত্তিকে অনাবৃষ্টি হইলে রাঢ় অঞ্চলে আবাদ রক্ষা করিবার উপায় আছে, কিন্তু আমাদের এই দেবমাতৃক দেশে ঐ সময় বারিপাত না হইলে মাঠের ধান মাঠেই শুষ্ক হইয়া মরে এবং বর্ত্তমানে হইতেছেও তাই। রাঢ় অঞ্চলে ছোটনা ও বড়ান আমন ধান ভিন্ন অন্য ধান প্রায় জন্মায় না, কাজে কাজেই যদি চাষা খরচের লাঘব জন্য, ছিঁচের ভয়ে কার্ত্তিকশালি ধান্য রোপণ করিত তাহাও গাঁদি পোকায় নষ্ট করিয়া দিত। রাঢ়ের সমস্ত মাঠে কিছুই নাই মাঝে এক আধ খানি ভুঁই অগ্রে ফুলিয়া উঠে বলিয়া মাঠে সমস্ত গাঁদি পোকা একযোগে ধান্যের শীষগুলি আক্রমণ করিয়া নষ্ট করিয়া ফেলে। যদি রাঢ়ের সমস্ত প্রজাবৃন্দ একযোগে মাঠে কার্ত্তিক শালি ধান্যের আবাদ করিত, তাহা হইলে তাহাদেরও আর কেতেরোর সময় প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া জলের জন্য দাঙ্গা ফৌজদারি করিয়া ধান্য রক্ষা করিতে হইত না। আর গাঁদি পোকাও তাহাদের মাঠের আবাদ নষ্ট করিয়া ফেলিত না। আমাদের জীবনের ক্ষুদ্রতম ঘটনা হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিশ্বকর্ম্মার বিপুল বিধান লক্ষ্য করিয়া দেখিলে আমরা বুঝিতে পারি চিরদিন তিনি কিছুই একভাবে রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। আজ যাহা শুভ হইতেছে কাল তাহা অশুভ করিতেছেন, আজ যেখানে জঙ্গল কাল সেখানে নগর, আজ যেখানে জল কাল সেখানে দ্বীপ। পৃথিবী যখন পরমুখাপেক্ষী ছিল না নিজের আগুনে নিজেই পুড়িত, তখন ছয় ঋতু ছিল না। একা গ্রীষ্মই তাঁহার উপযুক্ত জীব, জানোয়ার গাছ গাছড়া ও তদীয় আহারাদির সৃষ্টি করিত। গ্রীষ্মের পর

ক্রমেক্রমে সকলে আসিয়া দেখা দিলেন। এক্ষণে আবার একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়া দেখিলে আমরা অনায়াসে বুঝিতে পারিব যে, বর্ত্তমানে ছয় ঋতুর কথঞ্চিত পরিবর্ত্তন ঘটিতে আরম্ভ হইয়াছে। শরৎ, বসন্তের যেন ক্রমশঃ বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইতেছে বলিয়া অনুমান হয়। যাহা হউক বর্ত্তমান সময়ে ঋতুর পরিবর্ত্তন ও বর্ষার ভাব ভঙ্গি দেখিলে স্পষ্টই অনুমান করা যায় যে, প্রকৃতি পূর্ব্বে যাহার উৎকর্ষ সাধন করিতেছিলেন এক্ষণে আবার তাহারই হতাদর করিতেছেন। যে কার্ত্তিকশালি ধান্য প্রসব করিতে তিনি একদিন নাচার ছিলেন আবার আজকাল সেই ধান্যের প্রতি তাঁহার ভালবাসা ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছে। তিনি যাহাকে ভাল বাসিবেন আমাদেরও বাধ্য হইয়া তাহাকেই আদর করিতে হইবে। আমাদের সময়োপযোগী খাদ্যের তিনিই ব্যবস্থা করিবেন, আমরা উপলক্ষ মাত্র। দেবমাতৃক দেশে আশ্বিন, কার্ত্তিক মাসে বারিপাত বন্ধ থাকিলেও কার্ত্তিকশালি ধান্য নষ্ট হইতে পারে না। যে সময় ধান্যের থোড় হইবে সেই সময় যদি বৃষ্টি না হয় ত ধানের শীষ ফুলিতে পারে না, কিন্তু যে ধান কার্ত্তিকের মাঝে পাকিয়া উঠিবে তাহাকে ভাদ্র মাসে অবশ্য ফুলিয়া উঠিতে হইবে। আজ পর্য্যন্ত কখনও ভাদ্র মাসে অনাবৃষ্টির কথা শুনিতে পাওয়া যায় নাই। যে ধান ভাদ্র মাসে থোড় বাঁধিবে সে ধান কখনও আশ্বিন, কার্ত্তিকের পুড়িতে নষ্ট হইতে পারে না। এবৎসর এদেশে যাহা অসম্ভব তাহা সম্ভব হইয়াছে। নিচু জমির আমন ধান গুলি বৃষ্টির অভাবে মরিয়া গিয়াছে আর প্রজাগণ পাট ভাল জন্মায় নাই বলিয়া পাটের ডাঙ্গা জমিগুলি ভাঙ্গিয়া শ্রাবণের শেষে যে কার্ত্তিকশালি ধান্য রোপণ করিয়াছিল সেই সমস্ত ধান শীষ ভরে মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছিল। এমন সুন্দর ধান এমন সুন্দর শীষ আমরা অনেক দিন মাঠে দেখিতে পাই নাই, মাঠের দিকে চাহিলে আপনা আপনই মনে আসিত লক্ষ্মী যেন বিলের জল হইতে ডাঙ্গায় আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিতেছেন, এবার এদেশের প্রজাগণ কেবল মাত্র কার্ত্তিক শালি ধান্যের দৌলতে জমিদার ও মহাজনের দেনা পরিশোধ করিতে সমর্থ হইয়াছে। অনাবৃষ্টিতে ধান্য রক্ষা করিতে হইলে, পাটের জমিতে কম খরচে ধান্য উৎপন্ন করিতে হইলে দেশে দেশে কার্ত্তিকশালি ধান্যের আবাদ করা বর্ত্তমানে একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা হইতেছে। আশ্বিন, কার্ত্তিকের জল বাতাসে যদি কখন ধান পড়িয়া গিয়া চিটা পড়িয়া যায়, তাহা হইলে একেবারে পুড়ি হইতে কার্ত্তিকশালি ধান্যের আবাদ সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ। বর্ত্তমানে ঋতুর পরিবর্ত্তন দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে কার্ত্তিকশালি ধান্যের আবাদ কোন দেশে অকৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

আমেরিকায় ভারতের শ্রমজীবী।

আমাদের দেশে অনেকেই হয় ত মনে করিতে পারেন যে আমেরিকায় ভারতের শ্রমজীবীদিগের উপর অবিচার অত্যাচার করা হয়। গত বৎসরের কয়েকটী ঘটনা হইতে এরূপ অনুমান করা স্বাভাবিক। আমরা এখনও আমেরিকায় ভারতের শ্রমজীবীদিগের অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার অবকাশ পাই নাই। কিন্তু এখন আর বিলম্ব করিলে চলিবে না। বর্ত্তমান সময়ে দুইটী বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম দৃষ্টি করিয়া চলিতে হইবে। এই দুইটী বিষয়ের মধ্যে একটী দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা, অপরটী পররাজ্যে সম্মান লাভ করা। পররাজ্যের উপর প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিলে যে কেবল বাণিজ্য ব্যবসার স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পায় এমন নহে, উহাতে পররাজ্যের সহিত মিত্রতারও সুযোগ মিলে। সেই জন্যই বোধ হয় ইউরোপের রাজ্যসমূহ বৈজ্ঞানিক উপায়ে শ্রমজীবীদিগকে চালনা করিয়া থাকে। যাহাতে এই অনভিজ্ঞ শ্রমজীবীগণ বিদেশে যাইয়া অনভিজ্ঞতার ফলে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা নষ্ট না করিয়া ফেলে তজ্জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত রাখা হয়। প্রত্যেক দেশের রাজপ্রতিনিধিগণ আপন আপন দেশবাসীদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া থাকেন। আমেরিকার শ্রমজীবীগণ যে ভারতের শ্রমজীবী-

দিগের উপর এত ক্ষেপা উহার কারণ সংক্ষেপে এই বলা যাইতে পারে যে ভারতের শ্রমজীবীগণ উহাদের উন্নতির অন্তরায়। কেবল কৃষ্ণকায় বলিয়া উহাদের ভারতবাসীর উপর এতটা বিদ্বেষ করিবার কারণ দেখি না। শত শত নিগ্রো মজুর শ্বেতাঙ্গ শ্রমজীবীদিগের ইউনিয়ন দল ভুক্ত। উহারা ইউনিয়নের নির্দ্ধারিত বেতন অথবা মজুরি অনুসারে কার্য্য করে। শ্রমজীবীদিগের জোটকেই ইউনিয়ন বলে। এখানে প্রত্যেক ব্যবসারই এক একটা ইউনিয়ন আছে। ইউনিয়ন দলভুক্ত মজুরগণ ইউনিয়ন সভার নিয়মাধীন হইয়া কার্য্য করিয়া থাকে। উহাতে উহাদের মজুরির হার কমিয়া যাইবার আশঙ্কা নাই বরং উত্তরোত্তর শ্রমজীবীদিগের অবস্থা উন্নত হইতেছে। প্রথমতঃ ভারতবাসী কুলিগণ ইউনিয়নের কোন ধার ধারে না। ইউনিয়ন কোন কার্য্যের য মজুরি নিদ্ধারণ করে উহার অনেক কমে কার্য্য গ্রহণ করে। অনেক সময় এমন দেখা গিয়াছে যে ইউনিয়নে ধার্য্য ২৫৲ পঁচিশ টাকা মজুরির স্থলে ভারতের কুলিগণ ৫৲ টাকা বা উহার কমে কার্য্য গ্রহণে প্রতিশ্রুত হইয়াছে। শ্রমজীবীদিগের উন্নতির পক্ষে উহা যে কিরূপ সাংঘাতিক যাঁহারা এদেশের অর্থনীতির অবস্থা পাঠ করেন নাই বা চিন্তা করেন নাই তাঁহারা বুঝিতে সক্ষম হইবেন না। তবে বলিবে উহারা ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া ভারতের কুলিদিগের ন্যায় বসবাস করেনা কেন। প্রথমতঃ উহারা জন্ম হইতেই এক বিভিন্নভাবে থাকিতে অভ্যস্থ। দ্বিতীয়তঃ উহারা ভারতের লোটা ও লেঙটীধারী কুলীদের শোচনীয় অবস্থা অনুকরণ করিতে ইচ্ছা করে না। ভারতের কুলিগণ যে ভাবে আমেরিকায় অবস্থান করে উহার একটা নমুনা দিতেছি। কোন স্থানে ৫।৬ প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট একটা বাটী ভাড়া করে। এই বাটীতে আমেরিকার মজুরেরা ৫।৬ জনের অতিরিক্ত বাস করে না। কিন্তু আমাদের দেশের কুলিগণ সময় সময় ২০।৩০ পঁচিশ ত্রিশজন বাস করিয়া থাকে। ভোজনান্তে উদ্বৃত ডাল ভাত জানালার ভিতর দিয়া রাস্তায় ফেলিয়া দেয়। উহা এদেশে স্বাস্থ্য নিয়মের বহির্ভূত। তারপর ঝগড়া বিবাদ, নিকৃষ্ট ভাষায় গালাগালি, হট্টগোল করিয়া কথাবার্ত্তার ত অন্তই নাই। শীতের সময় যখন কাজ কর্ম্মের অভাব তখন শত শত কুলি কোন সহরে জমা হয়। অনেকে পাঁচ টাকার কাজ চারি আনায় করিতে সম্মত হয়। কাজেই এখানকার লোকে বিশ্বাস করিতেছে ভারতবাসীরা চীনে কুলি হইতেও অধম। আর, হিন্দুরা অপরিষ্কার জাত বলিয়া ইহাদের ধারণা হইতেছে। লোকে বিশ্বাস করিতেছে, আফ্রিকার নিগ্রোদের সভ্য করিবার জন্য যেমন খ্রীষ্টান মিসনারীর দরকার, তেমনি হিন্দুদের সভ্য করিবার জন্য, ধর্ম্মে ও নীতিতে উচ্চ করিবার জন্য মিসনারীর দরকার। ভারতবাসী অদূরদর্শীতার ফলে আমেরিকাবাসীর বন্ধুতা হারাইয়া ফেলিতেছে। চীনবাসীর মূর্খতার ফলে চীনের কুলি হইতে চীনাগণ 'কুলি' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। এখনও অনেকে বুঝিতে পারে না চাইনীজ, কুলি ব্যতীত আর কিছু হইতে পারে কিনা। ভারতবাসীর এক গুরুতর কর্ত্তব্য সম্মুখে এই যে ভারতের কুলিদিগকে স্বদেশের ও বিদেশের অবস্থা অবগত করাইয়া তাহাদিগকে আত্মসম্মান রক্ষা করিতে শিক্ষা দেওয়া।

ভারতের কুলিদিগের মধ্যে অধিকাংশই শিখ। এই শিখ কুলিদের মত এমন নিরক্ষর নির্ব্বোধ লোক আর এ জগতে নাই। শিখদের দুর্গতি সত্যই অবর্ণনীয়। আজ আমেরিকায় শিখ কুলিগণ স্বদেশের উন্নতির এক বিষম অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কে শিক্ষা ও জ্ঞানের আলোক উহাদের সম্মুখে ধরিবে? কে উহাদের অর্থনীতিসম্মত ইউনিয়নের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিবে? অর্থনীতির বিরুদ্ধ পক্ষে চলিয়া ইহারা এদেশে ক্রমে ক্রমে স্বীয় শ্রমের মূল্য হ্রাস করিয়া ফেলিতেছে; এবং সভ্য জগতের শ্রমজীবী সমাজে ভারতীয় শ্রমজীবীকে ঘৃণ্যনীয় করিয়া তুলিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসী মাত্রের উপরে এদেশবাসীর একটা হীন ধারণা জন্মিতেছে। ধনী ও শ্রমী এই উভয়কে লইয়াই শিল্প, বাণিজ্য ও সভ্যতার উন্নতি। বিদেশে ভারতীয় শ্রমের মূল্য হীন করাতে প্রভূত অনিষ্ট সম্ভাবিত হইতেছে।

আর ভারতবাসী শ্রমজীবীর এত অল্প মজুরিতে

খাটিবার আবশ্যকতাও তো নাই। যাহা হউক, এই সম্পর্কে অনেক কথাই বলা যাইতে পারে। কিন্তু সম্প্রতি বক্তব্য এই যে, ভারতের নানাপ্রদেশে শ্রমজীবীদিগকে তাহাদের স্বার্থ ও সত্ব এবং ইউনিয়নের মর্ম্ম সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার আয়োজন করা কর্ত্তব্য।

পত্রাদি।

শ্রীযুক্ত এম, সি, হালদার।

গিনি ঘাসের চাষ—(১) উচ্চ, সরস দোঁয়াশ জমি ইহার পক্ষে উপযুক্ত, (২) বীজ এবং চাপড়া উভয় প্রকারে উক্ত ফসল উৎপাদিত হইতে পারে। বীজ বুনিবার সময় বর্ষার শেষ এবং চাপড়া বসাইবার প্রশস্ত সময় ফাল্গুন, চৈত্র। (৩) বিঘা প্রতি ⁄১ সের বীজ যথেষ্ট। উহার মূল্য ৫৲ টাকা। মূল অথবা চাপড়া বসাইতে হইলে বিঘা প্রতি ⁄৬ সের মূল লাগিতে পারে, উহার মূল্য ১০৲ টাকা। বীজ এবং মূল উভয়ই কিছু দুষ্প্রাপ্য। (৪) বর্ষাকাল ব্যতীত অপর সময় জল সেচন আবশ্যক। (৫) বিঘা প্রতি ১০০/০ হইতে ১১৫/০ মণ পরিমাণ কাঁচা ঘাস জন্মিতে পারে। প্রত্যহ অর্দ্ধ মণ হিসাবে এক একটি গোরুকে খাইতে দিলে উক্ত ঘাস দ্বারা প্রায় ৮ মাস চলিতে পারে। (৬) গিনি ঘাস কাঁচা এবং শুষ্ক উভয় অবস্থাতেই ব্যবহৃত হইতে পারে। (৭) চাষের ব্যয় বিঘা প্রতি প্রায় ২৫৲ টাকা। কৃঃ সঃ।

জনৈক স্থানীয় ভদ্রলোক লিখিতেছেন, আম গাছের ডালে কাল দাগ হইয়াছে এবং গাছ পোকা দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। আক্রান্ত গাছের নমুনা না পাইলে এ সম্বন্ধে কোন সঠিক পরামর্শ দিতে পারা যায় না। কৃঃ সঃ।

শ্রীযুক্ত হিমাংশু ভূষণ সেনগুপ্ত, মৈমনসিংহ।

(১) গোল মরিচের চাষ এতদ্দেশে হয় না। মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশেই উহার চাষ হয়।

(২) লটকান চাষের বিশেষ কোন পাইট নাই। বর্ষাকালে বীজ হইতে চারা উৎপাদিত হয়। ৩।৪ বৎসরেই গাছ ফলিতে আরম্ভ করে। বীজের সহিত জড়িত রঞ্জক অংশের উপর তপ্ত জল ঢালিয়া দেওয়া হয়। উক্ত জলে কিছুক্ষণ ভিজার পর কাঠের হাতুড়ির দ্বারা পিটিয়া বীজ হইতে রঞ্জক পদার্থ পৃথক করা হয়। পরে উহা শুষ্ক করিলেই রং বিক্রয়ের উপযুক্ত হইবে। কৃঃ সঃ।

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার তরফদার,
কাশীপুর, রাজসাহী।

(১) **বেগুনে পিপীলিকা**:—৩ ভাগ শুষ্ক কাঠের ছাই ও ১ ভাগ চূণ মিশ্রিত করিয়া একটি থলিতে রাখিয়া গাছের উপর উক্ত চূর্ণ ছড়াইয়া দিলে পিপীলিকার উপদ্রব কমিয়া যাইবে। হলুদের জল, তামাকের জল, লণ্ডন পার্পল প্রভৃতির দ্বারাও উপকার পাওয়া যায়। কৃঃ সঃ।

প্রাদেশিক কৃষি সংবাদ।

কাটোয়া।—গত আশ্বিন মাস হইতে বৃষ্টি না হওয়ায় মহকুমার অন্তর্গত অনেক স্থানে জলাভাব উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বপূর্ব্ব বৎসরে এ সময়ে কিছু কিছু বারি বর্ষণ হইয়া থাকে। কিন্তু এ বৎসর বিন্দুপাতও হয় নাই, হলকর্ষণ কার্য্য এখন পর্য্যন্ত একেবারে বন্ধ আছে। আম্র খুব অল্পই হইয়াছে, যাহা হইয়াছে তাহাও বৃষ্টির অভাবে অত্যধিক রৌদ্রোত্তাপে পড়িয়া যাইতেছে। সকল পল্লীরই ইক্ষুমাড়াই কার্য্য হইয়া গিয়াছে। কৃষকগণ অতি অল্প পরিমাণেই গুড় এবার পাইয়াছে। যে কৃষকের ২০।২৫ মণ গুড় হইত তাহার এবার দেড় মণ কিম্বা দুই মণ হইয়াছে। আগামী বৎসরের জন্য ইক্ষু বীজ সংগ্রহ করা কৃষকের পক্ষে কঠিন হইয়াছে। (প্রসূন, ২৭শে চৈত্র।)

বিগত কয়েকদিন হইতে উপর্য্যুপরি বৃষ্টি হওয়ায় বেশ ঠাণ্ডা পড়িয়াছে। কাটোয়া সন্নিহিত গ্রাম সমূহে হলকর্ষণ কার্য্য চলিতেছে, অনেক স্থানে ইক্ষু

রোপণ চলিতেছে। ভাদুই ধান্যের বীজ বপন প্রায় শেষ হইয়াছে। চাউলের মূল্য বর্ত্তমান সপ্তাহে ৪।৵০ হইতে ৪৸৵০ পর্য্যন্ত।

(১০ই বৈশাখ।)

নাটোর।—এ পর্য্যন্ত বিন্দুমাত্র বারিপাত হইল না। দুই দিন আকাশে বেশ মেঘ দেখা গিয়াছিল, কিন্তু শুক্‌নো ঝড় হইয়া মেঘ স্থায়ী হইতে পারে নাই। সহরবাসীর কেবল ধূলি ভক্ষণ লাভ হইয়াছে। গত কল্য সহরে বেশ বৃষ্টি হইয়াছে। অন্যত্র না হওয়ায় নাটোর অঞ্চলে গুরুতর ক্ষতি সাধিত হইতেছে। সে অঞ্চলে তিল একটি প্রধান শস্য, তাহা বৃষ্টি না হওয়ায় কেহই প্রায় বুনিতে পারিল না। তাহেরপুর অঞ্চলে এ সময় পেঁয়াজ একটি কৃষকদিগের প্রধান অবলম্বন, অতি ক্ষুদ্র কৃষকও এই শস্যে ২৫।৩০৲ টাকা আয় করে। কিন্তু এবার সে শস্য হইল না। পিয়াজের চাষে প্রচুর জল দরকার। কৃষকগণ গ্রামস্থ পুষ্করিণী গুলি পেঁয়াজের জমিতে জল ছেচিয়া শুকাইয়া ফেলিয়াছে। এখন এক দৈব ভরসা। বৃষ্টি হইলে কিছু আশা ছিল।

৩০শে চৈত্র।

বাঁকুড়া।—জেলার বহু স্থানেই প্রকৃত জলকষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। মানুষের তো কথাই নাই। গো মহিষাদি গৃহপালিত পশুরও পানীয় জল এবং খাদ্যের অভাব হইয়াছে। সর্ব্বত্রই 'জল জল' রব হইয়াছে। বাঁকুড়া দর্পণ, ৩০শে চৈত্র।

উপরে উল্লিখিত স্থান সমূহে সুবৃষ্টি হইয়াছে। চাষের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। অদ্যাপিও কিন্তু পানীয় জলের অভাব মোচন হয় নাই। কৃঃ সঃ।

বাঙ্গালার রবি ফসল।—১৯০৮ সালে রবি ফসল সংক্রান্ত সরকারী হিসাব পাঠে জানা যায় যে, কোন কোন জেলায় ঐ ফসল সেপ্টেম্বরের শেষভাগে কৃষকেরা বুনিতে আরম্ভ করে; কিন্তু মাটিতে রস না থাকিলে কার্য্যের অনেক ব্যাঘাত হয়। বৃষ্টির অভাবে ফসলের অনেকটা ক্ষতি হইয়াছে, বিশেষতঃ উত্তর বেহারের যে সকল অঞ্চলে সরকারী পয়ঃপ্রণালী হইতে জল লইয়া ক্ষেতে দিবার সুবিধা নাই, সে সকল অঞ্চলে ক্ষতির পরিমাণ কিছু বেশী হইয়াছে। জানুয়ারির শেষভাগে এবং ফেব্রুয়ারির প্রথমে যে বারিপতন হয়, তাহাতে ঐ ফসলের পক্ষে বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছিল। রবি ফসলের আবাদ বেহার অঞ্চলেই কিছু বেশী, কিন্তু ঐ অঞ্চলে বৃষ্টি সর্ব্বত্র সমভাবে পতিত না হওয়ায় ফসলের পক্ষে ক্ষতি হইয়াছে। বিগত পূর্ব্ব বৎসরে ৭৯২১৩০০ একর জমিতে এই ফসল বোনা হইয়াছিল। এ বৎসরে ৫৮৬৬৮০০ একর জমিতে উহা বোনা হইয়াছে; অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ১২৩৯০০ একর কম জমিতে উহা বোনা হইয়াছে। বাঙ্গালাদেশে যে কয়টি জেলায় এই ফসলের চাষ অধিক, তন্মধ্যে ১৯টি জেলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল জেলায় নিম্নলিখিতরূপ ফসল জন্মিয়াছে:—বর্দ্ধমানে শতকরা ৭৮, সাহাবাদে ৭৭, সারুণে ৭৩, গয়া এবং সিংহভূমে ৭২, সাঁওতাল পরগণায় ৭১, খুলনায় ৭০, চম্পারণে ৬৭, মুঙ্গেরে ৬০, পাটনায় ৫৯, ভাগলপুর এবং পালামৌয় ৫৫, মুর্শিদাবাদে ৫১, যশোহরে ৪৬, পূর্ণিয়ায় ৩৬ এবং দ্বারবঙ্গে ২৫।

সার-সংগ্রহ।

চীনা বাসন।

পরমিটের আমদানী তালিকায় দেখা গেল গত বৎসরে ৪২ লক্ষ ২২ হাজার টাকার চীনার বাসন এদেশে আমদানী হইয়াছে। উহার পূর্ব্ব বৎসরে প্রায় ৩৯ লক্ষ টাকার ঐরূপ বাসন আসিয়াছিল। ইহাতে দেখা যাইতেছে অন্যান্য বিদেশী সামগ্রীর আমদানীর ন্যায় ইহারও আমদানী উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। আমাদের দেশে চীনা মাটির অভাব নাই। চীনা মাটির প্রধান উপাদান কেওলিন। সাঁওতাল পরগণার মঙ্গল হাটে আজন্মকাল কেওলিন মাটি বিদ্যমান রহিয়াছে। এতকাল এতাদৃশ ধনাগমের একটা উপকরণ ব্যর্থ পড়িয়াছিল। এইবার কতকগুলি উদ্যোগী ঐ মঙ্গল হাটের চীনামাটি হইতে সানক, পেয়ালা, পিকদানী,

দোয়াত, কলম, ইত্যাদি রাখিবার ছোট ছোট বাটি, খেলানা ইত্যাদি নানা সামগ্রী প্রস্তুত করিতেছেন। শুনিলাম তাঁহারা কিছু দিন হইল জর্ম্মানী হইতে কল আনাইয়া তাহাতে ঐ সকল সামগ্রী তৈয়ার করিতেছেন, ইহাতে প্রতিদিন প্রায় দেড় হাজার পেয়ালা প্রস্তুত হইতেছে। পূর্ব্বে ৫০ জন কারিকর সমস্ত দিন খাটিয়াও ১২৫টির অধিক পেয়ালা তৈয়ার করিতে পারিত না। যাহাতে তাঁহাদের কারখানার সামগ্রী কোন অংশে বিদেশের আমদানী জিনিস অপেক্ষা নিকৃষ্ট না হয় এবং তাহার নক্সা, রং ইত্যাদি দেখিতে সুশ্রী হয় এজন্য তাঁহারা জাপান হইতে দুইজন ওস্তাদ কারিকর আনাইয়াছেন। এই ব্যবস্থায় যেমন এক দিকে জিনিস ভাল হইবে ও সেজন্য কাটতি বাড়িবে, অপর দিকে ঐ দুই জন জাপানী ওস্তাদের কাছে এদেশের কারিকরেরা শিক্ষালাভ করিতে পারিবে। এতভিন্ন মহারাজ মণীন্দ্রনাথ নন্দী রাজমহল হইতে চীনামাটি আনাইয়া কলিকাতার উপকণ্ঠে চীনা বাসনের কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। এই কারখানার প্রস্তুত বাসন বিদেশী আমদানী বাসন অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। এইরূপ যদি আর দুই দশটি কারখানা স্থাপিত হয় তাহা হইলে দেশের প্রয়োজন মিটাইয়া ক্রমে ঐ সকল জিনিস বিদেশে চালান যাইতে পারে। যদি এরূপ হয় তাহা হইলে দেশের ৪২ লক্ষ টাকা ত রক্ষা হইবেই আবার বিদেশ হইতেও দেশে টাকা আসিবে।

শিল্প বিজ্ঞান সমিতি।

এই সমিতির ষষ্ঠ সংবাৎসরিক অধিবেশন সম্প্রতি কলিকাতা টাউনহলে হইয়া গিয়াছে। রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুর সভাপতি মনোনীত হইয়া একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

উক্ত সমিতি ইউরোপ প্রভৃতি অঞ্চলে শিল্প-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বৃত্তি অথবা পাথেয় দিয়া এ বৎসরে যে একশতটি ছাত্রকে পাঠাইতেছেন, তন্মধ্যে ইংলণ্ডে যাইবেন ২৫ জন, ১৭ জন জাপানে, ৩ জন জর্ম্মানিতে, ১ জন সুইডেনে, ১ জন কানাডায় এবং ৪ জন আমেরিকায়, অবশিষ্ট ৪৯ জন ইউরোপের কোথায় কোন কোন অঞ্চলে যাইবেন, এখনও তাহা ঠিক হয় নাই। এই সকল ছাত্রদের মধ্যে ২০ জনকে বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে মাসে ৭৭৫ টাকা ব্যয় হইবে। এই ২০ জনের মধ্যে ৮ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব ভাল গ্রাজুয়েট। সর্ব্বোচ্চ বৃত্তি মাসিক একশত টাকা, নদীয়া জেলার একজন হিন্দু যুবককে দেওয়া হইয়াছে। ইনি উচ্চ অঙ্গের বিজ্ঞান শিখিবার জন্য ইংলণ্ডে যাইবেন। বাঙ্গালার ছাত্রদিগের মধ্যে ১১টি, পূর্ব্ববঙ্গের ৩, আসামের ২, বেহারের ৩, এবং উড়িষ্যার একটি বৃত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালায় এগার জন বৃত্তিপ্রাপ্তের মধ্যে একজন ভারতবাসী খৃষ্টান আছেন, এবং বেহারের ৩ জনের মধ্যে দুই জন মুসলমান। উৎকলের ছাত্রটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বি, এ। ইনি ফার্ম্মাসিউটিক্যাল কেমিষ্ট্রী শিখিবার জন্য ইংলণ্ডে যাইবেন, দুইটি ছাত্র কৃষিবিজ্ঞান শিখিবার নিমিত্ত যাইবেন, একজন যাইবেন কানাডায়, আর একজন জাপানে। ছাত্রেরা প্রধানতঃ যে সকল শিল্প শিখিবার জন্য বিদেশে যাইতেছেন, সে গুলি এইঃ—চামড়ার কাজ, মেক্যানিক্যাল এবং ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, সূতাকাটা, কাপড় বুনন, দেশলাই, সাবান, গন্ধদ্রব্য, বোতাম, এনামেল, ছাতা, রং এবং পেন্সিল। উক্ত সমিতি শিল্প-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বিদেশে ছাত্র প্রেরণ দ্বারা দেশের যে প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতেছেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কিন্তু কৃষির উন্নতি সম্বন্ধে দেওঘরে যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা সম্যক ও সমিচীন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। এতৎসংক্রান্ত যে কৃষি স্কুল স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে কাজ ভাল হইতেছে না। কতকগুলি ঘর বাড়ীও প্রস্তুত হইতেছে। এরূপ আশা হইয়াছিল যে কৃষি অনুরাগী অনেকেই তথায় নিয়ত থাকিয়া কৃষির উন্নতির জন্য যত্ন করিবেন। নানা কারণে সে উৎসাহ ও উদ্যোগ নাই। অনেকগুলি যৌথ কারবার দেশীয় লোকের টাকায় খোলা হইয়াছে? ইহা সুখের বিষয়। অনেকের এরূপ বিশ্বাস আছে যে সাধারণের টাকা সুদক্ষ হস্তেই ন্যস্ত হইয়াছে। দেশের নেতৃবর্গ যাহাতে চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া সর্ব্ব প্রকারে সুব্যবস্থা করেন ইহাই আমাদের ঐকান্তিক বাসনা।

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য।

হাজারিবাগের অভ্রের খনি সকলের অবস্থা আজকাল খুব ভাল। গ্রাণ্ড কর্ডলাইন খোলা অবধি সকল খনির বিশেষ উপকার হইয়াছে। তদ্ব্যতীত "মাইকানাইট" নামে একটা নূতন সামগ্রীর আবিষ্কার হওয়াতে নিকৃষ্ট অভ্র খুব কাটিতেছে। "মাইকানাইটে" এইরূপ অভ্রেরই বিশেষ প্রয়োজন।

কৃষিজাত সামগ্রী ও কৃষি যন্ত্রাদি কৃষকদিগকে প্রদর্শন করিবার জন্য ডুমরাও-রাজ একটি স্থায়ী প্রদর্শন-আগার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কলিকাতার যাদুঘরের অন্তর্গত ইকনমিক মিউজিয়াম (Economic Muesum) ব্যতীত এরূপ আগার বাঙ্গালায় আর কোথাও নাই। সম্প্রতি ভাগলপুরের কৃষি কলেজের সংশ্লিষ্ট এইরূপ একটি আগার প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

মরিচদ্বীপে ভাকোয়া নামে এক প্রকার উদ্ভিদের সূত্রে থলে প্রস্তুত হইতেছে। চটের থলের পরিবর্ত্তে আজ কাল দক্ষিণ আফ্রিকায় এই থলেতে কয়লা, চিনি, ময়দা ইত্যাদি বস্তাবন্দি করা হইতেছে। অনেকে ইহা চটের থলে অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করেন। চটের থলেতে রাসায়নিক পদার্থ বা জমির সার বস্তাবন্দী করিলে উহা প্রায় পচিয়া যায়, কিন্তু ভাকোয়ার থলে সেরূপে নষ্ট হয় না। এই জন্য মরিচদ্বীপ ও দক্ষিণ আফ্রিকার অনেক স্থানে আজ কাল চটের থলের পরিবর্ত্তে ভাকোয়ার থলে ব্যবহৃত হইতেছে। পাটের একাধিপত্য নষ্ট করিবার জন্য আজকাল নানাস্থানে নানা চেষ্টা হইতেছে।

এক্ষণে অনেক লোক ব্যবহারিক বিদ্যা ও শ্রমশিল্প শিক্ষার জন্য জাপানে যাইতেছে। ভারতবর্ষের প্রায় ৫০ জন যুবক তথায় এই উদ্দেশে অবস্থিতি করিতেছে এবং আমদেশেও ৬০ জনকে পাঠাইয়াছেন। তথায় যে সকল ছাত্র ব্যবহারিক বিদ্যা শিক্ষা করেন তাঁহাদের মাসিক ব্যয় সর্ব্বসমেত ৬০ হইতে ৭৫ টাকার অধিক লাগে না।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

জ্যৈষ্ঠ মাস।

কৃষিক্ষেত্র।—এই সময় আমন ধান বোনা হয়, পাট ও আউস ধানের ক্ষেত নিড়াইতে হয়, বেগুন গাছে ভাঁটি বাঁধিয়া দিতে হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্য্যন্ত অরহর বীজ বপন করা চলে। আদা, হলুদ, কচু, ওল প্রভৃতি জ্যৈষ্ঠ মাসেও বসাইতে পারা যায়। শাঁকালুর বীজ বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিয়া আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত বপন করা চলিতে পারে।

সব্জী বাগ।—এই মাসে ভুট্টা বীজ বপন করা উচিত। কেহ কেহ ইতিপূর্ব্বেই বপন করিয়াছেন। জলদি ফসল হইতে ইতি মধ্যে ভুট্টা ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। লাউ, কুমড়া, ঢেঁড়স, পালা ঝিঙ্গা, পালা শসার বীজও এই মাসে বপন করা চলে। বর্ষাতি মূলা ও নানা জাতীয় শাক বীজের বপন কার্য্য জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমেই শেষ করিতে হইবে। জলদি ফুল কপি খাইতে গেলে এই সময় হইতে পাটনাই ফুল কপি বপন করিয়া চারা তৈয়ার করিতে হইবে।

ফুল বাগিচা।—এই সময় জিনিয়া, দোপাটী, গাঁদা বীজ বপন করিতে হইবে। ডালিয়া বীজও এই সময় বপন করা চলে। কেহ কেহ ডালিয়া মূল এই সময় বসাইতে বলেন, আমরা কিন্তু বলি যে, আমাদের দেশের অত্যধিক বর্ষায় মূল গুলি পচিয়া যাইবার ভয় আছে, সেই জন্য বর্ষাতে বসাইলেই ভাল। কিন্তু শীঘ্র শীঘ্র ফুলের মুখ দেখিতে গেলে একটু কষ্ট স্বীকার না করিলে চলে না। পূর্ব্ব কথিত ফুল বীজ ব্যতীত আমারান্থাস, কক্সকোম্ব, আইপোমিয়া, রাধাপদ্ম, ধুতুরা, মার্টিনিয়া প্রভৃতি ফুলবীজ বপনেরও এই সময়।

ফলের বাগানের এখন বিশেষ কোন পাট নাই। ফল আহরণ এখন একমাত্র কার্য্য। তবে কুল, পীচ, লেবু প্রভৃতি যে সকল গাছের ধাপকলম করিতে হইবে তাহার বন্দোবস্ত এখন হইতে করিতে হয়।

পার্ব্বত্য প্রদেশে কিন্তু ঋতুর পার্থক্য হেতু বিভিন্ন প্রথা অবলম্বন করা হইয়া থাকে। সেখানে এখন ডালিয়া ফুটিতেছে। তথায় মটর ও সীম ফলিতেছে। বাঁধা কপি ও ফুলকপি বীজ এখন বপন করা যায়।

REGISTERED No. C 192.

কৃষক

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসনের মুখপত্র

জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬।







কৃষি-রসায়ন বা রসায়ন পরিচয়।

বিজ্ঞানসম্মত কৃষিপ্রণালী শিখিতে হইলে
ইহা অত্যাবশ্যকীয়।
বঙ্গীয় কৃষিবিভাগের কৃষিপরিদর্শক,
শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত
বিশেষরূপ সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত।
নূতন সংস্করণ (যন্ত্রস্থ।)
মূল্য ১৲ এক টাকা স্থলে ১০ পাঁচ সিকা।

নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইবে, সুতরাং গ্রহণেচ্ছুগণ এই সময় হইতে কৃষক আফিসে তাঁহাদের নাম রেজেষ্টী করিয়া রাখুন।

ম্যানেজার. 'কৃষক,'
১৬২, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



কুণ্ডু এণ্ড চ্যাটার্জ্জির

স্বদেশী এসেন্স।

মহারাজবকুল, দীলদরিয়া, চেরী, কাশ্মীর ফ্লাওয়ার্স, হেস্নাহানা, মতিয়া, চামেলী, খস্‌খস্, রজনীগন্ধা, হোয়াইটরোজ, জেসমিন ইত্যাদি—১ আঃ শিশি ৬৵০, অর্দ্ধ আঃ শিশি ॥৵০। ৵০ দুই আনার ডাক টিকিটসহ এই বিজ্ঞাপন খণ্ড আমার নিকট পাঠাইয়া দিলে একটী শিশি নমুনা পাইবেন।

ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার ২ আঃ।৵০ আনা, ৪ আঃ ৺৵০ রোজ পমেড।৵০, বকুল পমেড ॥০ আনা।

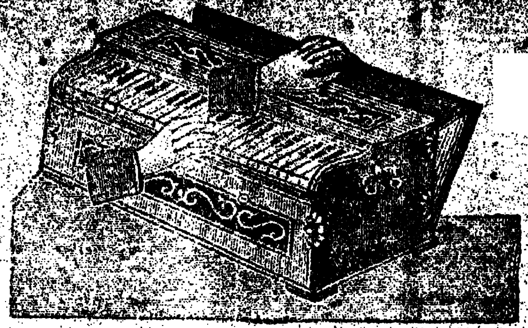
১০।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অমর বিলাস তৈল।

ইহা সর্ব্বজন বিদিত সুমধুর কেশতৈল। ইহার গন্ধ সদ্যপ্রস্ফুটিত বকুলপুষ্পের ন্যায় এবং বহুক্ষণ স্থায়ী। ইহা ব্যবহারে কেশ কোমল, বৃদ্ধি এবং কুঞ্চিত হয়। চুলে আটা বা চটচটে হয় না।

ভদ্র মহিলাদিগের এবং রাজা মহারাজাদিগের আদরের ধন। উপহার দিবার উপযোগী এবং বিলাসীর একমাত্র প্রিয়বস্তু। ইহা টাকের ও অকালবৃদ্ধের মহৌষধ। ইহা মস্তকের যন্ত্রণা নিবারক এবং মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারক। ইহার গন্ধ অতি মনোরম এবং তীব্রতার লেশ নাই। মূল্য প্রতি পাইট বোতল ৸৵ আনা মাত্র।

বিজয়বসন্ত ঘোষ,
পারফিউমার।
[illegible] নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



দুই বৎসরের গ্যারাণ্টি।

নিউ শ্যামসুন্দর ফ্লুট-হারমোনিয়ম

ইহার সুর সুমধুর ও স্থায়ী।

বিশেষ মজবুত। পত্র লিখিলে দরের লিষ্ট পাঠাইয়া থাকি। অর্ডারের সহিত ৫৲ টাকা দিলে মফঃস্বলে ভি, পি,তে পাঠাইয়া থাকি।

১ সেট রিডযুক্ত ৩ অক্‌টিভ, ৩ ষ্টপ ২[illegible]—৩২৲।
২ সেট রিডযুক্ত ৩ ,, ৩ ,, ৩[illegible]—৫৫৲।

সোল এজেণ্টস,
জে, এণ্ড এন, এন ঘোষ,
হারমোনিয়ম মেকার্স এণ্ড অর্ডার সাপ্লায়ার।
১১৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কিং এণ্ড কোং

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও পুস্তক বিক্রেতা।

৮৩, হ্যারিসন রোড,
ব্রাঞ্চ—৪৫, ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধের জন্য উপরোক্ত ঠিকানায় লিখুন।

একজন ধনীর আবশ্যক।

জামতাড়া ষ্টেসনের নিকটেই এক চৌহদ্দিতে প্রায় ২০০ শত বিঘা জমি আছে। ষ্টেসন হইতে এক মাইলের মধ্যে। জলের সুবিধা আছে। জমি গোলাপ ফুল ও ভুট্টা চাষের উপযুক্ত ও অন্যান্য চাষও ভালরূপ হয়। কোন একজন সম্ভ্রান্ত লোক আপাততঃ দুই হাজার টাকা লইয়া আমার সহিত যোগ দিলে কার্য্যারম্ভ করা যাইতে পারে।

শ্রী ক—জামতাড়া।
[illegible] ম্যানেজার, [illegible]
[illegible] নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

REGISTERED No. C. 192.

কৃষক।

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

দশম খণ্ড,—২য় সংখ্যা।



সম্পাদক—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস্।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬।

কলিকাতা : ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে
শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা ; ১৯৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, দি মিলার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
এস, এইচ, রহমান দ্বারা মুদ্রিত।



কৃষক।

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১০ম খণ্ড। | জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬ সাল। | ২য় সংখ্যা।

গো-চর্য্যা।

গোরুর খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত প্রণালী।

এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে গোরুর ৪টী পাকস্থলী আছে এবং ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য গোরুর অধিক আহারের প্রয়োজন। কাঁচা ঘাস, তৃণ, বিচালী ইত্যাদি খাইয়া গোরু উদর পূরণ করে বটে, কিন্তু ইহাতে গোরু অধিক হৃষ্টপুষ্ট ও বলবান হইতে পারে না অথচ ঘাস ও খড়কুটা না খাইলে ইহার উদর পূর্ত্তি হয় না। নানা দেশে নানাবিধ খড়কুটা, বিচালী শুষ্ক তৃণাদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় এবং যে দেশে যাহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে তাহা গোরুকে খাওয়াইলে কম খরচ লাগিবে।

কঠিন খড়, খড়কুটা, বিচালী ইত্যাদি যত ছোট করিয়া কাটিতে পারা যায় কাটিয়া লওয়া উচিত। কাঁচা ঘাস ও শুষ্ক তৃণাদি না কাটিয়াও গোরুকে খাওয়ান যায়। পরিপাক ক্রিয়ার সুবিধার জন্য কোন কোন দ্রব্য ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া লইতে হয়; কোন কোন খাদ্য জলে ভিজাইয়া দিতে হয়; কোন কোন খাদ্য সিদ্ধ করিয়া দিতে হয় এবং কোন কোন খাদ্য চূর্ণ করিয়া দিতে হয়। প্রত্যেক গোরুকে প্রত্যহ দুই বেলায় ২টী জাব তৈয়ার করিয়া খাইতে দিবে। যাহারা মাঠে চরিয়া খায় তাহাদিগকেও জাব তৈয়ার করিয়া খাইতে দিবে। প্রত্যহ ডাবাটী পরিষ্কার না করিয়া গোরুকে জাব দেওয়া উচিত নহে কেননা ডাবায় দুর্গন্ধ থাকিলে গোরু তৃপ্তির সহিত আহার করে না। খাদ্য দ্রব্যের তালিকায় কোন্ কোন্ জিনিষ কি কি পরিমাণে গোরুকে খাইতে দেওয়া যাইতে পারে তাহা বিবৃত হইল, সেই তালিকা দেখিয়া খাদ্যের পরিমাণ ঠিক করিয়া লইবে। ছোলা, দাইল, ভুষি, খইল ইত্যাদি পুষ্টিকর খাদ্য অধিক পরিমাণে খাওয়াইলে গোরু পীড়িত হইতে পারে। অল্প পরিমাণে পুষ্টিকর দ্রব্য খাওয়াইলে গোরু দুর্ব্বল হয়। অল্প পরিমাণে অধিক পুষ্টিকর দ্রব্যের সহিত অধিক পরিমাণ অল্প পুষ্টিকর দ্রব্য মিশাইয়া জাব প্রস্তুত করিতে হয়। ছানি তৈয়ার করিবার সময় মানুষের ব্যবহরোপযোগী বিশুদ্ধ পানীয় জল ব্যবহার করিবে। কখনও দুর্গন্ধময় অপরিষ্কৃত জল ব্যবহার করিবে না। গোরু প্রত্যহ ১৷৷০ মণ এমন কি ২/০ মণ জল খাইয়া থাকে, সে কারণ জাব তৈয়ার করিবার সময় অধিক জল ব্যবহার করিবে।

আমাদের দেশে গোরুকে লবণ খাওয়ান রীতি নাই বলিলেই হয়। লবণ গোরুর বিশেষ উপকারী; লবণ ব্যবহারে গোরু হৃষ্টপুষ্ট হয়; দুধাল গাভীর দুধ বাড়ে। প্রত্যেক পূর্ণ বয়স্ক গোরুকে প্রত্যহ /০ এক ছটাক লবণ খাইতে দেওয়া উচিত। কাটা খড় কুটা প্রথমে বেশ করিয়া জলের সহিত মাখিয়া লইবে; পরে তাহাতে পরিমাণমত লবণ, খইল ও ভুষি মিশাইবে এবং অনেক বার উলট পালট করিয়া দিবে। ছানি বেশ করিয়া তৈয়ার করিয়া দিতে পারিলে গোরু তৃপ্তির সহিত খাইয়া থাকে।

গাভীর দুগ্ধ বেশী হইবার উপায়।

যে সকল গাভী শৈশবকাল হইতে ভাল খাইতে না পায় ও অল্প বয়সে গর্ভিনী হয় তাহাদের প্রায় অধিক দুধ হয় না, কিন্তু রীতিমত খাওয়াইলে দ্বিতীয় বিয়ানে কোন কোন গাভীর দুধ বেশী হয়। যে গাভীকে ভাল করিয়া খাইতে দেয় সে বেশী দুধ পাইয়া থাকে। লোকে কথায় বলে "গাভীর বাঁটে দুধ নহে, গাভীর মুখে দুধ" অতএব দুধ বেশী করিবার প্রধান উপায় গাভীকে অধিক করিয়া খাইতে দেওয়া। খাইতে দিলে যে গাভীর অধিক দুধ হয় ইহা সকলেই জানেন কিন্তু অতি অল্প লোকই গাভীকে পেট ভরিয়া খাইতে দেয়। কি কি জিনিষ খাওয়াইলে দুধ বাড়ে তাহা অধিকাংশ লোকই জানে না। অধিক দুধ পাইবার আশায় অনেক লোক গাভীকে দাইল ইত্যাদি অধিক পুষ্টিকর দ্রব্য খাওয়াইয়া থাকে, কিন্তু ইহাতে যে অধিক দুধ পাওয়া যায় না বলা বাহুল্য। দুগ্ধ বৃদ্ধিকারক দ্রব্যের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল যথা:—কাঁচা ঘাস, শুষ্ক তৃণাদি, চাউল ও কলাই সিদ্ধ, সিমুল বীচি সিদ্ধ, খেসারী দাইল সিদ্ধ, তিল ও সরিষার খইল, দাইলের ভুষি, কলার পোড়, লাউ সিদ্ধ, কাঁটা নটে সিদ্ধ, মদের ছিবড়ে, মাড় ঘাস, ফেন, আমানি, চাউলের কুঁড়া, গুড়, আকের শিকড়, বাঁশ পাতা সিদ্ধ, চাউল ধোওয়া জল, লবণ ইত্যাদি।

প্রসবের পর /॥০ সের সিদ্ধ মাস কলাই, আধ সের ভাতের মাড়, এক পোয়া ইক্ষু গুড়; ১ এক তোলা পিঁপুলের গুঁড়া ও /০ এক ছটাক আদা এক সঙ্গে মিশাইয়া প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় দিন কতক খাওয়াইলে গাভীর দুধ বাড়ে। আধ সের কাঁজির সঙ্গে অল্প খড় মাখিয়া এবং তাহাতে আকের শিকড় চূর্ণ /০ এক ছটাক মাখিয়া খাওয়াইলে গোরুর দুধ বাড়ে। বাঁশের পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া তাহাতে যোয়ান ও গুড় মিশাইয়া খাওয়াইলে গাভীর বেশী দুধ হয়। রেড়ির কচি কচি দুই চারিটা ডগা জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল খাওয়াইয়া দিলে গোরুর বেশী দুধ হয়। রেঁড়ির সিদ্ধ কচি কচি পাতা ২।৪টা পালানের উপর রাখিয়া কাপড় দিয়া বাঁধিয়া রাখিলে এবং কিছুক্ষণ পরে খুলিয়া দুধ দোহাইলে অধিক দুধ পাওয়া যায়। প্রসবের ১২।১৪ দিন পর হইতে চাউলের সহিত লাউ সিদ্ধ করিয়া এবং খেসারী দাইল ভিজাইয়া খাওয়াইলে গোরুর দুধ বেশী হয়। দুধ দোহন করিবার পূর্ব্বে গাভীকে খইল, ভুষি, জল, ফেন ও লবণ খাওয়াইলে বেশী দুধ পাওয়া যায়। প্রতিদিন এক সময়ে এবং একজন লোক দিয়া দুধ দোহান উচিত। দুধ দোহাইবার সময়ে গাভীটীকে বিরক্ত না করিলে বেশী দুধ পাওয়া যাইতে পারে।

গাভীর সারা দিনের খোরাকী।

১। সরিষা কিম্বা তিলের খইল /২ সের

চাউল সিদ্ধ ...	।৵০ পোয়া	একত্রে
খেসারী কিম্বা কলাই সিদ্ধ	॥৵০ "	

খড়কুটা	...	৩।৪ ঝুড়ি
কাঁচা ঘাস	...	যত খায়
ফেন	...	এক হাড়ি
লবণ	...	/০ এক ছটাক

অন্যান্য দুগ্ধ বৃদ্ধিকারক খাদ্য পরিমান মত দিবে।

২।	খইল	... ...	/১ সের
	কলাই বা খেসারী দাইল সিদ্ধ		/১।॥০ সের
	ভূষি	... ...	৩।৪ ঝুড়ি
	বিচালী	... ...	যত খায়
	লবণ	... ...	/০ ছটাক
	ফেন	... ...	এক হাড়ি
৩।	সিমুল বিচীর গুঁড়া	...	/১।॥০ সের
	খইল	... ...	৷৵০ পোয়া
	ফেন	... ...	এক হাড়ি
	বিচালী	... ...	৩।৪ ঝুড়ি
	কাঁচা ঘাস	... ...	যত খায়
	লবণ	... ...	/০ ছটাক
৪।	খইল	... ...	/২ সের
	লাউ ও কাঁটানটে সিদ্ধ	...	২।৩ ঝুড়ি
	কাঁচা ঘাস	... ...	যত খায়
	বিচালী	... ...	৩।৪ ঝুড়ি
	লবণ	... ...	/০ ছটাক
৫।	খোড়	... ...	৩।৪ ঝুড়ি
	খইল	... ...	/১।॥০ সের
	ভূষি	... ...	/১ সের
	বিচালী	... ...	৩।৪ ঝুড়ি
	কাঁচা ঘাস	... ...	যত খায়
	লবণ	... ...	/০ ছটাক

এতদ্ভিন্ন দুগ্ধ বৃদ্ধিকারক দ্রব্য দুধাল গাভীকে পরিমাণমত খাওয়াইবে।

বলদের সারা দিনের খোরাকী।

খইল	... ...	/১।॥০ সের
গমের ভূষি	... ...	/১ সের
কলাইয়ের দাইল	...	/১।॥০ সের
বিচালী	... ...	যত খায়
কাঁচা ঘাস	... ...	/৪-/৫সের
লবণ	... ...	/০ ছটাক

ষাঁড়ের সারা দিনের খোরাকী।

খইল	... ...	/১।॥০ সের
গমের ভূষি	... ...	/১।॥০ সের
দাইল কিম্বা ছোলা	...	/১।॥০ সের
বিচালী	... ...	যত খায়
কাঁচা ঘাস	... ...	/৪-/৫সের
লবণ	... ...	/০ ছটাক

পূর্ব্বে যে ষাঁড়, বলদ ও গাভীর সারা দিনের খোরাকীর হিসাব দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে গাভী হইতে বলদ ও বলদাপেক্ষা ষাঁড়কে অধিক পরিমাণে পুষ্টিকর দ্রব্য খাওয়াইতে হইবে। সমস্ত প্রকার পুষ্টিকর খাদ্য গাভীর উত্তম খাদ্য নহে। যে যে দ্রব্য খাওয়াইলে গাভী বেশী দুধ দেয় তাহা খাওয়াইবে।

শৈশব কাল হইতে এঁড়ে ও দামড়া বাছুরদিগকে ভাল করিয়া না খাওয়াইলে তাহারা হৃষ্ট-পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইবে না। তাহাদিগের পক্ষে কি কি খাদ্য উত্তম ষাঁড় ও বলদের খাদ্যের তালিকা দেখিলে জানিতে পারা যাইবে।

বয়স নির্ণয়।

গোরুর বয়স জানা অতি দরকার। পেট ভরিয়া খাওয়াইলে ও উত্তমরূপে সেবা শুশ্রূষা করিলে গোরু ২০।২৫ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিতে পারে। শিং ও দাঁত দেখিয়া বয়স নির্ণয় করিতে হয়।

অনেক গোরুর শিং উঠে না; কোন কোন গোরুর শিং কখন কখন ভাঙ্গিয়া যায়; সে কারণ দাঁত দেখিয়া গোরুর বয়স নির্ণয় করা সহজ ও ঠিক। অনেকে গোরুর আকৃতি ও গঠন প্রণালী দেখিয়া বয়স নির্ণয় করে।

শিং দেখিয়া বয়স নির্ণয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসরে শিংএ কোন প্রকার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। তৃতীয় বৎসরের প্রারম্ভে শিংএ আংটির ন্যায় গোলাকৃতি একটী দাগ পড়ে। প্রতি বৎসর ১টী করিয়া দাগ শিংএ পড়িতে থাকে। যে গোরুর শিংএ তিনটী আংটির ন্যায় গোলাকৃতি দাগ আছে তাহার বয়স ৫ বৎসর হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কিন্তু শিং দেখিয়া বয়স নির্ণয় করা সকল সময়ে ঠিক হয় না।

গোরুর দাঁত।

প্রসবের পর বাছুরের নিম্ন মাড়ীতে ২টী দাঁত দেখিতে পাইবে; উপরের মাড়ীতে দাঁত হয় না। ২য় সপ্তাহে ৪টী, তৃতীয় সপ্তাহে ৬টী এবং কয়েক মাসের মধ্যে ৮টী দাঁত উঠে। ৬ মাসের মধ্যে দাঁতগুলি বেশ বড় হয়। গোরুর দাঁত দুই প্রকার দুগ্ধ বা অস্থায়ী ও চিরস্থায়ী। অস্থায়ী দাঁত দুধের ন্যায় সাদা; ইহার গ্রীবাদেশ চিরস্থায়ী দাঁত হইতে অপেক্ষাকৃত সরু ও আকারে ক্ষুদ্র। ৬ মাসের পরে দাঁতগুলি ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে কিন্তু সকল দাঁত এক সময়ে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। মধ্যবর্ত্তী দাঁত ২টী যেমন পূর্ব্বে উঠে, সেরূপ ইহারা সকলের পূর্ব্বেই ক্ষয় পায়; ক্রমশঃ ৮টী দাঁতই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং তাহাদের স্থানে নূতন চিরস্থায়ী দাঁত উঠিতে থাকে। সাধারণতঃ ১ বৎসর বয়সের সময় মধ্যবর্ত্তী দাঁত ২টীতে, ১৫ মাসের সময় উভয় পার্শ্ববর্ত্তী দাঁত ২টীতে, ১৮ মাসে তাহাদের সংলগ্ন ২টীতে এবং ২ বৎসর বয়সের সময় অবশিষ্ট ২টীতে ক্ষয়ের চিহ্ন লক্ষিত হয়। মধ্যবর্ত্তী দাঁত ২টী সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে এবং তাহাদের স্থানে ২টী নূতন চিরস্থায়ী দাঁত উঠিবে। এইরূপে তৃতীয় বৎসরে ২টী, চতুর্থ বৎসরে ২টী ও ৫ম বৎসরে আরও ২টী চিরস্থায়ী দাঁত উঠিবে এবং একুনে ৫ বৎসরে নিম্ন মাড়ীতে ৮টী চিরস্থায়ী দাঁত দেখিতে পাওয়া যাইবে।

দাঁতদ্বারা বয়স নির্ণয়।

৫ বৎসর বয়সে গোরু পূর্ণবয়স্ক হয় এবং দাঁতগুলিতে কোন প্রকার ক্ষয়ের চিহ্ন থাকে না। ৬ষ্ঠ বৎসর হইতে মধ্যবর্ত্তী দাঁত ২টীতে ক্ষয়ের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই সময় দাঁতের ক্ষয়ের পরিমাণ দেখিয়া বয়স নির্ণয় করা হয়। ৬ষ্ঠ বৎসরে মধ্যবর্ত্তী দাঁত ২টীর, ৭ম বৎসরে তৎপার্শ্ববর্ত্তী দাঁত ২টীর, ৮ম বৎসরে তৎসংলগ্ন দাঁত ২টীর ও ৯ম বৎসরে অবশিষ্ট দাঁত ২টীর উপরিভাগে ক্ষয়ের চিহ্ন দেখিতে পাইবে। ১০ম বৎসরে সমস্ত দাঁতেই ক্ষয়ের চিহ্ন দেখা যায়। ১১শ বৎসরে মধ্যবর্ত্তী দাঁত ২টীতে বেশী পরিমাণে ক্ষয়ের চিহ্ন লক্ষিত হয় এবং পর বৎসর তৎপার্শ্ববর্ত্তী দাঁত ২টীতে ক্ষয়ের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। কঠিন কঠিন দ্রব্য খাইয়া গোরুর দাঁত অসময়ে কখন কখন ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অতএব দাঁত, শিং, আকৃতি ও গঠন ইত্যাদি দেখিয়া গোরুর বয়স নির্ণয় করিতে হইবে।

দুগ্ধ।

ঈষৎ হলুদ বর্ণের সহিত সাদা, অল্প পরিমাণে স্বচ্ছ, গন্ধ বিহীন, মিষ্ট আস্বাদযুক্ত, ক্ষার ধর্ম্ম-বিশিষ্ট ও জল অপেক্ষা ঘন। ভাল দুধের ১টী ফোঁটা মাটীতে ফেলিলে গোলাকৃতি হয় ও কোনদিকে ছড়াইয়া পড়ে না। শীতকালে গাভী কম দুধ দেয়। অতিরিক্ত শীতে গাভীকে রাখিলে ইহার দুগ্ধ

ক্ষরণ হ্রাস পায়। এইজন্য দুধাল গাভীর গায়ে গাত্র-বস্ত্র বাঁধিয়া দিবে এবং ইহাতে অধিক দুধ পাওয়া যায়। প্রাতঃকালের দুধ বৈকালের দুধ হইতে সুমিষ্ট। প্রসবের পরে ও শাঙ্কর্য্যের সময় গাভীর দুগ্ধ ভাল নহে। শাঙ্কর্য্যের ৩ সপ্তাহ পর হইতে গাভী কম করিয়া দুধ দেয়। প্রসূতির প্রথম ১০ দিনের দুধ ভাল নহে এবং উহা কেবলমাত্র বাছুরের উৎকৃষ্ট ও একমাত্র আহার। এই সময়ে গাভীকে দুগ্ধ বৃদ্ধিকারক দ্রব্য খাওয়াইবে। সকল গাভী সমান পরিমাণে দুধ দেয় না; এক গাভী ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে ও খাদ্যের তারতম্যানুসারে কম বেশী দুধ দেয়। রাখাল অথবা চাকরের উপর নির্ভর না করিয়া গৃহস্থের নিজেরই গাভীর তত্ত্বাবধান করা উচিত। গাভীকে মাঠে প্রত্যহ চরাইতে দিবে। কাল গাভীর দুধ অধিক সুমিষ্ট।

গো-জাতির অবনতির কারণ ও উন্নতির উপায়।

উপক্রমণিকায় গো-জাতির অবনতির কয়েকটী কারণ বিবৃত হইয়াছে, সে কারণে এস্থলে বিস্তৃত-ভাবে কোন কথা বিবৃত হইল না। নিম্নে কয়েকটী প্রধান প্রধান কারণ লিখিত হইল:—

১। বলবান ষণ্ডের অভাব।
২। উপযুক্ত আহারের অভাব ও পালনের দোষ।
৩। গো-চারণ ভূমির অভাব।
৪। উপযুক্ত পশুচিকিৎসকের অভাব।
৫। রোগ ও প্রতিবাধাত্মক চিকিৎসার অনাদর।
৬। বিষপ্রয়োগে গো-হত্যা।
৭। গো-খাদকদিগের আহারের জন্য ও গো-চর্ম্মের ব্যবসায়ের নিমিত্ত গো-হত্যা।

যেরূপ ভাবে দিন দিন গো-জাতির হ্রাস হইয়া যাইতেছে, তাহার প্রতিকার করা আমাদের উচিত।

১। সুস্থাবস্থায় ও রোগকালীন সেবাশুশ্রূষা, লালনপালন ও চিকিৎসা সম্বন্ধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক কৃষকদিগের মধ্যে বিতরণ করা।
২। গো-চারণ স্থাপন।
৩। গো-শালা প্রতিষ্ঠা।
৪। গো-রক্ষিণী সভা স্থাপন।
৫। সংবাদপত্রে গো-রক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা।
৬। দাতব্য চিকিৎসালয়ের ন্যায় গো-চিকিৎসালয় স্থাপন।
৭। গো-প্রদর্শনী।
৮। প্রচুর পরিমাণে গো-খাদ্য জন্মান।

গো-চিকিৎসা সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় অতি অল্প পুস্তকই আছে, কিন্তু যাহা আছে তাহাতেও জ্ঞাতব্য বিষয় অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালা ভাষায় এরূপভাবে গো-চিকিৎসার বহি লিখিতে হইবে, যাহা পড়িয়া কৃষকগণ রোগনির্ণয় করিতে পারে ও অল্প খরচে চিকিৎসা করিতে পারে। গো-রোগ নির্ণয় অতি দুরূহ ব্যাপার, এই হেতু ইহারও বিস্তৃত বর্ণনা প্রয়োজন। প্রচুর পরিমাণে ঘাস ও তৃণাদি গোরুকে খাওয়াইতে হইলে গো-চারণ স্থাপন করিতে হইবে এবং এই বিষয়ে জমিদার, রাজা, প্রজা, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, কৃষক ও ব্যবসায়ীগণের সমবেত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া আবশ্যক। আদর্শ গো-শালা প্রতিষ্ঠা করিয়া বলবান ষাঁড় ও দুধাল গাভীর অভাব মোচন করিতে হইবে। ভাল ভাল ষাঁড়, গাভী ও বলদদিগের মালিকগণকে পুরস্কার বিতরণ করিয়া উৎসাহ প্রদান করা আবশ্যক। দেশীয় গাছ গাছড়া ও ঔষধের মাত্রাদি সমেত পুস্তক লিখিয়া কৃষকগণকে বিতরণ করা প্রয়োজন।

মোট কথা গো জাতির উন্নতিকল্পে সমস্ত লোকের সমবেত চেষ্টা আবশ্যক। ২।১ জনের দ্বারা গো-জাতির উন্নতি হইবে না।

গো নির্ব্বাচন।

উৎকৃষ্ট ষাঁড়ের অভাবে গো-জাতির ক্রমশঃই অবনতি ঘটিতেছে। বলবান ষণ্ডের অভাবে গাভীগণ হৃষ্টপুষ্ট বাছুর প্রসব করিতে পারে না। অনেক লোক বিদেশ হইতে উৎকৃষ্ট ষাঁড় আনিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে, ২।১ বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ ষাঁড় আবহাওয়া সহ্য করিতে না পারিয়া অকর্ম্মণ্য হয়। সে কারণ স্থানীয় উৎকৃষ্ট ষাঁড় সংগ্রহ করা উচিত। রীতি-মত খাওয়াইলে ও সেবা শুশ্রূষা করিতে পারিলে স্থানীয় ষণ্ডগুলি অনেক দিন পর্য্যন্ত কার্য্যক্ষম থাকে। বিদেশ হইতে গোরু আনিয়া আমাদের দেশীয় গোরুর উন্নতি হইবে কি না সন্দেহের বিষয়। আমাদের মতে গো-জাতির উন্নতির জন্য দেশীয় উৎকৃষ্ট গোরু উত্তম।

উৎকৃষ্ট ষাঁড়ের লক্ষণ।

কর্ণ দুইটী লম্বা ও দোলায়মান। কপাল—প্রশস্ত; নাসিকা—উন্নত। চক্ষু—উজ্জ্বল; শিং দুইটী বাঁকা বাঁকা, ফাঁক ফাঁক, লম্বা ও কাল রং বিশিষ্ট। মুখ কাল বা ঠোঁট কাল রং বিশিষ্ট ও ভিজে ভিজে। গ্রীবাদেশ মানানসই লম্বা ও সজোর। ঝুঁট উন্নত, স্থূলাকার ও পুরু। পৃষ্ঠ ও কোমর—প্রশস্ত ও সমতল। বক্ষঃস্থল গভীর। উদর—নিটোল। লেজটী—লম্বা। পাগুলি—পরিষ্কার। চক্ষুর ঊর্দ্ধ ও নিম্নস্থ চর্ম্ম কাল লোমে আবৃত। ক্ষুর কাল রং বিশিষ্ট। গ্রন্থিগুলি মোটা মোটা, কর্কশ ও উহাদের সম্মুখভাগ কাল লোমে আচ্ছাদিত। ক্ষুরের মধ্যবর্ত্তী স্থান অল্প অল্প ফাঁক। শরীরটী প্রায় গোলাকৃতি; উদরের ও বক্ষঃগহ্বরের পরিধি প্রায় সমান। স্ফীত উদর ও সরু বক্ষঃ গহ্বর ষণ্ডের উৎকৃষ্ট লক্ষণ নহে। উচ্চতা ক্ষুর হইতে ঝুঁট পর্য্যন্ত প্রায় ৪৮ ইঞ্চি অর্থাৎ ২৸০ হাত, কিন্তু ইহাপেক্ষা বক্ষঃগহ্বরের পরিধি ২।১ ইঞ্চি বেশী হওয়া উচিত। পার্শ্বদেশ হইতে দেখিলে দেখিতে পাইবে যে উৎকৃষ্ট ষাঁড়ের ক্ষুর হইতে ঝুঁট পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ ঋজুভাবে আছে এবং ইহার শরীরটী গোল পানা, উরুসন্ধির উপরস্থ চর্ম্ম স্থূলাকার ও পুরু, পিছনের পা বক্র ভাবে অবস্থিত ও মস্তকটী ঢালু। পিছন দিক হইতে দেখিতে পাইবে যে, উভয় পায়ের মধ্যস্থানে কিছু ব্যবধান আছে এবং এক পা অন্য পায়ের সহিত লাগে না। উৎকৃষ্ট ষাঁড়ের চর্ম্ম কোমল, মসৃণ, স্থিতিস্থাপক ও গমনশীল এবং ইহার রংটী ঈষৎ ধূসরবর্ণের হইলে বেশ ভাল হয়। দোষমুক্ত বলবান ১টী ষাঁড় দ্বারা বৎসরে ৪০।৫০টী গাভী গর্ভিণী হইতে পারে। ৫ বৎসর হইতে ১২ বৎসর কাল পর্য্যন্ত ষাঁড় উৎকৃষ্ট কাজ করিয়া থাকে। গাভী হইতে ষাঁড় কিছু উচ্চ হইবে—ছোট গাভী হইলে ষাঁড়টী ছোট ও বড় গাভী হইলে ষাঁড়টী বড় হওয়া আবশ্যক। রোগাক্রান্ত ষাঁড়কে পাল্কর্য্যের কার্য্যে নিযুক্ত করিবে না এবং পাল্কর্য্যের পূর্ব্বে দেখিয়া লওয়া উচিত পশুটী রোগমুক্ত কি না। প্রাতঃকাল পাল্কর্য্যের উৎকৃষ্ট সময়। ৭।৮টী গ্রামের জন্য ৩।৪টী নিখুঁত ষাঁড় রাখা যাইতে পারে। ষাঁড় রক্ষকগণ গাভী প্রতি কিছু কিছু আদায় করিয়া ষাঁড় পুষিবার খরচ উঠাইতে পারেন। ষাঁড়টী হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইবে, কিন্তু অত্যধিক মোটা হইবে না। ষাঁড়কে পুষ্টিকর দ্রব্য খাওয়াইবে।

উৎকৃষ্ট গাভীর লক্ষণ।

মুখখানি মেয়েলি মেয়েলি। কপালটী প্রশস্ত; কর্ণ ২টী লম্বা ও দোলায়মান। শিং ২টী বাঁকা বাঁকা ও ৬।৭ ইঞ্চি লম্বা। মুখ-জালী ও ক্ষুর কাল। গ্রন্থি কাল লোমে আবৃত। ঝুঁট পুষ্ট। গ্রীবা-দেশ অপেক্ষাকৃত লম্বা ও সোজা। শরীরটী গোল-পানা, বক্ষঃস্থল বিস্তৃত; পৃষ্ঠদেশ সমতল। পাছা ভারি। রংটী এক বর্ণের হইলে ভাল। নাকটী চ্যাপ্টা বা খাঁদা হইবে না। মস্তকটী সমস্ত শরীরের তুলনায় ক্ষুদ্র। লেজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোম বিশিষ্ট ও ভূতল স্পর্শী। অবয়বের তুলনায় পাগুলি অপেক্ষা-কৃত ক্ষুদ্র। হাড়গুলি সূক্ষ্ম ও গাঁটগুলি সজোর। লোমগুলি ঘন ঘন; উরু প্রদেশটী প্রশস্ত ও গভীর; লোম গুচ্ছটী চামরের ন্যায়; পশ্চাতের পাগুলি সোজা, অপেক্ষাকৃত লম্বা ও স্থূল। পাঁজরের হাড়গুলি ছোট ছোট ও ধনুর ন্যায় বক্র। পালানটী বড়, কোমল, নিটোল, অমাংসল ও চর্ব্বি বিহীন। পালানের তলটী সমতল। বাঁটগুলি মোটা, কোমল ও লম্বা। পালানটী কেবল দেখিতে বড় হইলে ভাল নয় কারণ যেটী দেখিতে বড় তাহাতে অল্প পরিমাণ দুধ থাকিবার সম্ভাবনা। কিন্তু যে পালানটী দোহনের পূর্ব্বে বড়, নিটোল ও মসৃন হয় কিন্তু দোহনের পরে কোঁকড়াইয়া যায় সেটী ভাল। বড় গাভীর বাঁটগুলি ২।২½ ইঞ্চি লম্বা এবং ছোট গাভীর বাঁটগুলি ১½।২ ইঞ্চি। লেজের নীচে পালানের উপরে ও উরুপ্রদেশের গোড়ায় যে সকল লোম উঁচু হইয়া থাকে উহার আয়তন যত বেশী হইবে, গাভীও সেই পরিমাণে অধিকতর দুগ্ধবতী হইবে। বাঁটগুলি নিটোল, স্তম্ভাকার ও সমভাব হইবে এবং লম্বা হইয়া ঝুলিবে। পালানে বেশী মাংস ও চর্ব্বি থাকিলে তাহাতে দুধ থাকিবার পরিসর কম থাকে।

দামড়া করিবার উপকারিতা ও অপকারিতা।

যে সকল পুং জাতীয় বাছুর শাকর্য্যের জন্ম ব্যবহৃত হইবে না তাহাদিগকে ২।৩ মাসের সময়ে দামড়া করিয়া লইবে। ২।৩ মাসের সময়ে দামড়া করিবার উৎকৃষ্ট সময়। ২।৩ বৎসর বয়সের দামড়াকে বলদ কহে। খাসি না করিলে পুং জাতীয় বাছুরকে এঁড়ে বাছুর কহে। ২।৩ বৎসর পরে এঁড়ে বাছুর ষাঁড় হয়। গো-খাদকদিগের দামড়ার মাংস অতি উপাদেয়। শৈশবে দামড়া করিলে বাছুর শিষ্টশান্ত, সুস্থ, সবলকায়, হৃষ্টপুষ্ট ও বলবান হয় এবং দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত কার্য্যক্ষম হয়। গাভীর সহিত একত্রে লালিত পালিত হইতে পারে ও ষাঁড়ের ন্যায় ইহাদিগকে অধিক পুষ্টিকর দ্রব্য খাওয়াইতে হয় না। বলদগুলি দুর্ব্বল ও রোগগ্রস্ত হইলে কৃষি কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে কিন্তু গো জাতির অবনতি হইতে পারে না।

অপকারিতা।—উচ্ছৃঙ্খল ও অশান্ত হয়; দুর্ব্বল ষণ্ডের সহিত একত্রে থাকিয়া গাভীগণ দুর্ব্বল ও কৃশ বৎস উৎপাদন করে। শাকর্য্যের জন্ম বলবান ষাঁড় নিযুক্ত না করিলে বাছুর হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইবে না। বিশেষতঃ যখন বলবান বলদ দিয়া কৃষিকার্য্য উত্তমরূপে চলিতে পারে তখন দুর্ব্বল ও রোগযুক্ত ষণ্ডের প্রয়োজন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শ্রীকুঞ্জবিহারী দে।

স্বদেশী আন্দোলনের সুফল।

বিগত চারি বৎসরকাল ব্যাপী স্বদেশী আন্দোলনে ভারতবর্ষবাসীগণ বিশেষতঃ বঙ্গদেশের অধিবাসীবর্গ কোন্ কোন্ বিষয়ে বা বিভাগে কি কি প্রকার উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, নিম্নে তাহার একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা সন্নিবিষ্ট হইতেছে। কতকগুলি ইংরাজি, হিন্দি, উর্দ্দু ও তামিলপত্র হইতে এই বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে, বাঙ্গলা সমাচার পত্র হইতে কোন সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। এই বিবরণের স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অশুদ্ধি বা ভুল থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেও ইহা যে বহুযত্নে সংগৃহীত এবং ইহার অঙ্কগুলি প্রায় বিশুদ্ধ তাহা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে। স্বদেশী আন্দোলনের কয়েকটি কুফলের সঙ্গে আমরা অবশ্য অনেক সুফলও প্রাপ্ত হইয়াছি ইহা নিশ্চয়; এই প্রবল আন্দোলনে দেশের কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, ব্যবসায় প্রভৃতির দিকে দেশবাসী ভ্রাতৃবৃন্দের যেরূপ দৃষ্টি পতিত হইয়াছে এবং গভর্ণমেণ্ট বাহাদুরও যে প্রকারে ভারতবর্ষীয়দিগের স্বাধীন বৃত্তির পোষকতা পূর্ব্বক এতদ্দেশীয় শিল্পাদির উন্নতি পক্ষে উৎসাহ দিতেছেন, যদি ইহা লুপ্ত না হইয়া কিছুকাল পর্য্যন্ত অধ্যবসায় ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এবং যথার্থ দেশানুরাগ সহ বর্ত্তমান থাকে এবং আমরা সুবুদ্ধিমান ব্যক্তিবৃন্দের ন্যায় চলিতে পারি তাহা হইলে এই আন্দোলন উপলক্ষে আমাদিগকে বহুপ্রকারের যে ঘোরতর অনিষ্ট ও অপমান এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে শারীরিক ও মানসিক কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে তাহা এক সময়ে বিস্মৃত হইয়া ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ দিতে পারিব ইহা ধ্রুব সত্য। স্বদেশী আন্দোলনে কি কি বিষয়ে আমাদের উন্নতি লাভ হইয়াছে একক্ষণে তাহাই বিবৃত হইল। এই তালিকায় গত চারি বৎসরের বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।*

পরিচ্ছদ বিভাগ।—কাপড়ের নূতন কল ১২। কেবল ধুতি ও সাড়ি এবং গামোছার নূতন দোকান ৩৬২। অন্যান্য প্রকারের বস্ত্রের কারবার ৭৭। ইউরোপীয় পোষাকের অনুকরণে আপনালয় ২৯। মোজা, গেঞ্জি প্রভৃতি ৮৯ এবং মেশিন (কল) ২১১ টা। নূতন তাঁতের সংখ্যা (বিলাত হইতে আমদানী) ৬২৮, জাপান হইতে আনীত ১২৪, আমেরিকা হইতে আনীত ৭৪ এবং দেশী তাঁত একসহস্রাধিক। আনুমাণিক চারি সহস্র ছয় শতাধিক জোলা ও তাঁতী বস্ত্রাদি বয়ন কার্য্যে নূতন প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং প্রায় নয় শত পুরাতন তাঁতী পরিবার (যাহারা তাঁতের কার্য্য ত্যাগ করিয়া অন্য উপায়ে জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছিল) পুনরায় স্ববৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। তুলার দোকান—চারি শত তের। সূতার দোকান—তিন শত বাইশ। কাপড়ের কলে একাদশ সহস্রাধিক হিন্দু এবং চারি সহস্রাধিক নিঃস্ব মুসলমানের অর্থোপার্জ্জন হইতেছে।

ব্যাঙ্ক।—ইহার সংখ্যা চতুর্দ্দশ।

জীবন বীমা।—(লাইফ্ ইন্‌সিওরেন্স্) ছয়।

অগ্নি বীমা।—(ফায়ার ইন্‌সিওরেন্স্) চারি।

স্কুল ও কলেজ। সাতাইশ।

ব্যায়ামের বন্দোবস্ত। দুইশত ভের্বাট্ট স্থানে ব্যায়ামশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

---

* দেশীয় রাজ্য ও বৃটিশ ভারত এতদুভয়ের হিসাব এই তালিকায় দেওয়া হইয়াছে।

কৃষি বিভাগ। চারি শত পঁচাত্তর স্থানে কৃষি-ক্ষেত্র, কৃষিস্কুল অথবা হল নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নানাপ্রকারের জয়েণ্টষ্টক্ কোম্পানী —(যৌথকারবার) ৫২ সংখ্যার কিছু অধিক। সম্বাদ পত্র ও সাহিত্য বিভাগ।—বাঙ্গলা দেশে নূতন সম্বাদ পত্র ৪১, মাসিক পত্র ১৩। তামিল ভাষায় (সর্ব্বশুদ্ধ) ১৫, তেলুগু ভাষায় ৭, মহারাষ্ট্রী ভাষায় ৯, উর্দ্দু ১১, হিন্দী ৫ এবং ইংরাজী (সর্ব্ব-শুদ্ধ) ২২ খানা। ভারতবর্ষীয় সর্ব্বপ্রকার ভাষায় শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, ব্যবসা, রাজনীতি, অর্থব্যবহার প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে পুস্তক পুস্তিকার সংখ্যা ৮৬৫ খানা।

মাথার হ্যাট্, পাগড়ী, টুপী ইত্যাদির নূতন দোকান।—২৯। তালা চাবির দোকান।—৩৯টা

চিত্র বিভাগ।—চিত্রের জন্য নূতন বিলাতী মুদ্রাযন্ত্র ২৮। নূতন চিত্রকরের সংখ্যা ২৪১; দোকানের সংখ্যা ১৬। নানাপ্রকার তৈলের।—৫১। গালিচা, সৎরঞ্চ ও চাদরের নূতন দোকান —১৩২টা। কেশতৈল, পুষ্পসার, ফুলেল তৈল, সোডাওয়াটার, লেমনেড্, সিরাপ প্রভৃতি দোকান —তিনশত ৪৫ খানার অধিক। চামড়ার দোকান। —নয় খানা। রংএর দোকান—৬২ খানা। পেন্সীলের কারবার।—ছয়টা। দেশালাইএর কারখানা।—তিনটা। বোতামের কারখানা। —দুইটা। কাষ্ঠের নানা প্রকারের নূতন দোকান।—৯৮টা।

বিস্কুটের কারবার।—৩৬টা। রাসায়নিক কারখানা (Chemical works)।—তিনটা। লোহার সিন্দুক।—লোহানী, কুষ্টীয়া, কলিকাতা (চিৎপুর) প্রভৃতি স্থানে নূতন দোকানের সংখ্যা ১৭টা। ট্রাঙ্ক।—বহরমপুর, কলিকাতা এবং মেদিনী-পুরের উৎকৃষ্ট। নূতন কারখানার সংখ্যা ১৭টা। ছুরী কাঁচি ইত্যাদি।—বিষ্ণুপুর, কাঞ্চননগর, শাশপুর, জগদীশপুর, খুলনা, নবদ্বীপ এবং সালিখার উৎকৃষ্ট। নূতন দোকানের সংখ্যা ৯২ খানা। দেশী জুতার দোকান।—দুইশত ত্রিশের অধিক। দেশীয় ক্ষুর।—প্রায় চারি সহস্রাধিক ভারতবর্ষীয় ক্ষৌরকার (নাপিত) বিলাতী ক্ষুর পরিত্যাগ করিয়াছে।

পিতল ও অন্যান্য ধাতুর কারখানা।—হুগলী, ধারোয়ারি, খড়ার, বালেশ্বর, কটক, পুরী, বীরভূম, মেদিনীপুর, খাগড়া, গয়া, ছাপরা, মহনাপল্লী, টানা, কোইম্বাটোর প্রভৃতি স্থানের উৎকৃষ্ট। নূতন— দোকানের সংখ্যা দুই শতাধিক। ছাতার দোকান —চারিশত ৭২ খানার অধিক। মাথার চিরুণীর দোকান।—আট খানা। দেশী ল্যাম্প ও কলম রক্ষণী (পেন্ হোল্ডার)—সাতাইশ। সাবান —সাত খানা। জাহাজের কারবার—তিনটা। কালী প্রস্তত করিবার কারখানা—ছাব্বিশ। চিনি ও মিশ্রি—ছয়টা। দেশী তাস—১৭ খানা। ছিটের কাপড়ের দোকান—দশ। কাগজের কারবার—দুইটা।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

পাট বা নালিতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

তৃতীয় অধ্যায়—পাটের বীজ বাছাই, শস্য পর্য্যায় ও ফাস।

১০। বীজ শক্তি ও অন্যোন্য সংযোগ

(Cross-pollination)

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে বীজও গাছেরই এক-প্রকার রূপান্তর মাত্র (alternation of generations)। অঙ্কুররূপে একটি আবরণের (testa) ভিতরে কিঞ্চিৎ খাদ্যবস্তু সহ অতি ক্ষুদ্রাকারে, গাছ নিদ্রিত শিশুর ন্যায় বীজের ভিতরে কিছুদিন অবস্থান করে। পরে উপযুক্ত মাটি, জল, বায়ু এবং উত্তাপের সাহায্যে পুনর্ব্বার রূপান্তরিত এবং বর্দ্ধিত হইয়া গাছের বৃহদাকার ধারণ করে। এই বীজের ভিতরে যে কি অলৌকিক শক্তি নিহিত আছে তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। বীজের মাহাত্ম্য মনুষ্য পশ্বাদি সম্বন্ধে আমরা কিঞ্চিৎ অবগত আছি। এমন কি রামায়ণে দেখা যায় তখনও লোকে মানুষ সম্বন্ধে বীজশক্তির মাহাত্ম্য বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন—"সত্যশ্চাত্র প্রবাদোয়ং লৌকিকঃ প্রতিভাতিমা। পিতৄন্ সমনুজায়ন্তে নরা মাতরমঙ্গনাঃ॥ (অযোধ্যা কাণ্ড, ২৮শ ৩৫অ)। সেকালে এরূপ প্রবাদ ছিল যে ছেলে বাপের মত হয় এবং মেয়ে মায়ের মতন হয়। 'কুলীন' এই শব্দটা অধুনা আমাদের দেশে এমন এক প্রকার বিকৃত অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছে যে গুণের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু পূর্ব্বে বোধ হয় এরূপ ছিল না। এমন কি রামায়ণে দেখা যায় হাতী ঘোড়ারও তখন কুলের বিচার ছিল—"নাগান্ হয়াংশ্চৈব কুল-প্রসূতান্" (অযো-৩২শ-৮২অ)। বিলাতে গরুর মধ্যে কুলের বিচার অত্যন্ত প্রচলিত (pedigree cattle) এবং বংশাবলী দৃষ্টে ভাল গরুর মূল্যের তারতম্য হয়। বংশপরম্পরায় বীজের ভিতরে যে অপূর্ব্ব শক্তি (Heredity) লুক্কায়িত আছে, এ সকল তাহারই দৃষ্টান্ত। এই অলৌকিক বীজশক্তি মনুষ্য-পশ্বাদি সম্বন্ধে যেরূপ, আমাদের শস্যাদি সম্বন্ধেও সেইরূপ। ইহাদের মধ্যেও 'কুলের' বিচার এবং বীজমাহাত্ম্য—দৃষ্ট হয়। আমাদের আলুর 'কুলীন' নাইনিতাল, পাটনাই ; কার্পাসের 'কুলীন' আমেরিকার 'সী আইলেণ্ড (Sea Island) ও মিসর দেশের 'আব্বাসী'। পাটের 'কুলীন' ও সেইরূপ বলা যায়; মিঠা পাটের মধ্যে পাবনার 'ভোষ' এবং তিতা পাটের মধ্যে ময়মনসিংহের দেশওয়াল এবং মেঘনার চরের 'বড়' বা তল্লা পাট। যে বংশের বীজ, সেই বংশের গুণশালী গাছ উৎপন্ন করিবার শক্তি সেই বীজের ভিতর প্রচ্ছন্ন আছে। উপযুক্ত লাভ পাইতে হইলে কৃষককে যেরূপ পাটের চাষাদি কার্য্য ভাল করিয়া করিতে হয়, সেইরূপ তাহার দেশ ও জমির উপযোগিতা দেখিয়া সর্ব্বোৎ-কৃষ্ট বংশের বীজ ব্যবহার করিতে হয়। আবার পাটের বীজ যত কেন ভাল বংশের হউক না, দূর দেশ হইতে আনাইয়া ব্যবহার করিলে ভাল ফল হওয়ার আশা কম। কারণ একদেশের মাটি, জল বায়ুতে যে বংশ ভাল ফল প্রসব করে; ভিন্ন দেশের ভিন্ন প্রকার মাটি, জল বায়ুতে সেরূপ ভাল ফল প্রসব না করিবারই অধিকতর সম্ভাবনা। এজন্য কৃষক নিজের দেশের, নিজের মাটির মত মাটিতে যে বংশের পাট ভাল হয়, সেই বংশেরই বীজ ব্যবহার করিবে। বিলাতের বৈজ্ঞানিক কৃষকেরা তাহাদের প্রধান শস্য গম এবং আলুর ভিন্ন ভিন্ন বংশীয় গাছের অন্যোন্য সংযোগ (cross fertiliza-

tion) দ্বারা ইচ্ছামত আপনাপন অবস্থার উপযোগী নূতন নূতন বংশ প্রস্তুত করিতেছেন। আমেরিকা তাহাদের প্রধান শস্য কাপাস এবং মাকৈর (maize) ভিন্ন ভিন্ন বংশের অন্যোন্য-সংযোগ দ্বারা অতি উৎকৃষ্ট নূতন নূতন বংশ প্রস্তুত করিতেছেন। অপরাপর শস্য সম্বন্ধে যাহা সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে পাট সম্বন্ধে তাহা সত্য হইবে। এই অন্যোন্য-সংযোগ (cross fertilization) যত্নের সহিত করিতে পারিলে আমাদের পাটেরও বিশেষ উন্নতি হইতে পারে ; এবং কৃষকের লাভ অধিক হইতে পারে। এই অন্যোন্য-সংযোগ করাও বড় শক্ত নয়। কৃষিবিৎ পণ্ডিত শ্রীযুত এন্ এন্ বাড়্‌জ্যা এক সময়ে হাতোয়া-শ্রীপুর কৃষিক্ষেত্রে সামান্য কুলি-দ্বারা কাপাসের অন্যোন্য-সংযোগ ফল পরীক্ষা করিয়াছিলেন। পাটের জন্যও সেরূপ করা যাইতে পারে। তোমার মাটির পক্ষে বিশেষ উপযোগী হয় এমন বংশের একটি ভাল পাট গাছ বাছিয়া লও। তাহার ফুল ফুটিবামাত্র অর্থাৎ গর্ভকেশরে পরাগযোগ হইবার পুর্ব্বে একটি সদ্যফুটন্ত ফুলের পরাগকেশরগুলি সরু কাঁচি দ্বারা ছাঁটিয়া ফেলিয়া দাও এবং অবিলম্বে তুমি যেরূপ গুণ চাও সেইরূপ গুণযুক্ত বংশের একটি ভাল গাছের ফুলের পরাগ কেশর একটি সন্না (forceps) দ্বারা ধরিয়া লও। প্রথম গাছের গর্ভকেশরের মাথায় ঝাড়িয়া দ্বিতীয় গাছের কয়েকটি পরাগ তাহার মস্তকে ফেলিয়া দেও। ভাল করিয়া দেখ ঠিক গর্ভকেরের মাথায় পড়িয়াছে কি না। হয় ত দেখিবার জন্য আতস্-পাথর (magnifying glass) ব্যবহার করিলে সুবিধা হইবে। যখন দেখিবে ঠিক পড়িয়াছে, তখন একখণ্ড পাতলা ন্যাকড়া দিয়া সে পরাগ-সংযুক্ত (cross-pollinated) ফুলটি জড়াইয়া রাখ যেন কীট কি বায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া অন্য কোন পাট ফুলের পরাগ আসিয়া এই ফুলের গর্ভ-কেশরে না পড়ে। কয়েক বার করিলেই অভ্যাস হইবে। মোটামুটি এই প্রণালীতেই অন্যোন্য-সংযোগ (cross-fertilization) করিতে হয়। মনে কর যেন মেঘনার চরের বড় পাটই তোমার উপযোগী। তুমি ইহাকে আরও অল্প সময়ে পূর্ণ-বিকাশ লাভ করাইতে ইচ্ছা কর। ময়মনসিংহের দেশওয়াল পাট খুব অল্প সময়ে পুর্ণ বিকাশ লাভ করে। তুমি তোমার বড় পাটের ফুলের গর্ভ-কেশরে এই দেশওয়াল পাটের ফুলের পরাগ যোগ যোগ কর। তবেই তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। এই উপায় অবলম্বন করিতে পারিলে কৃষকেরা নিজ নিজ মাটি, জল বায়ুর উপযোগী উৎকৃষ্ট গুণ-বিশিষ্ট পাটের বংশ প্রস্তুত করিয়া অধিকতর লাভবান হইতে পারে। তবে কিঞ্চিৎ শিক্ষার প্রয়োজন। যাহা হউক কৃষক যতদূর সম্ভব তাহার মাটির উপযোগী দেখিয়া উৎকৃষ্ট বীজই ব্যবহার করিবে।

১১। বীজ-বাছাই প্রণালী

(Seed-selection.)।

বংশের কথা ছাড়িয়া দিলেও বীজ সম্বন্ধে আরও একটি অতি গুরুতর কথা আছে। যে কোন

পাটক্ষেত্রে যাও, তুমি দেখিতে পাইবে যে এক বংশের গাছও সকলগুলি সমান গুণশালী হয় না। মানুষ যেমন এক বংশের কি এক পিতামাতার সন্তান হইলেও, তাহাদের মধ্যে ব্যক্তিগত পার্থক্য এবং গুণভেদ দৃষ্ট হয়, পাটগাছেরও সেইরূপ। একই ক্ষেত্রের একই বংশের পাটগাছের মধ্যেও নানাত্ব এবং গুণের তারতম্য রহিয়াছে। কোনটা সতেজ, কোনটা নিস্তেজ, কোনটা মোটা, কোনটা সরু, লম্বায় কোনটা বেশী, কোনটা কম। শাখা প্রশাখা কোনটাতে কম, কোনটাতে বেশি, আঁস কোনটার মোটা, কোনটার সরু, অথবা কোনটার লম্বা, কোনটার খাট, কোনটা সত্বর বিকাশ প্রাপ্ত হয়, কোনটার বিকাশে বেশি সময় লাগে ইত্যাদি। মোট কথা এই মানুষের মত গাছেরও পৃথক ব্যক্তিত্ব আছে। আবার মনুষ্য, পশ্বাদির মধ্যে যেমন পিতামাতার ব্যক্তিগত গুণও সন্তানাদিতে সংক্রামিত হয় (prepotency) গাছেরও সেইরূপ "আত্মাবৈজায়তে পুত্রঃ।" সন্তানাদিতে আপনাপন গুণ সংক্রামিত করিবার এই শক্তি সকল পিতামাতার যেমন সমান থাকে না, সেইরূপ গাছের মধ্যেও এই সংক্রামণ শক্তির (prepotency) তারতম্য দৃষ্ট হয়। এই ব্যক্তিগত গুণভেদ এবং সংক্রামণ শক্তির মধ্যে ইউরোপ, আমেরিকার কৃষকেরা সর্ব্বপ্রকার শস্যেরই উন্নতি করিবার একটী অপূর্ব্ব ভিত্তি লাভ করিয়াছেন। বিলাতের আলু, গম, জর্ম্মনির বীট এবং আমেরিকার মাকৈ এবং কাপাস পূর্ব্বে অতি সামান্য শস্য ছিল; আর এই ভিত্তির উপরে তাহাদের বীজ বাছাই প্রণালী স্থাপন করিয়া, এ সকল শস্যকে উন্নত করিয়া আজ কোথায় আনিয়াছে। বীজ বাছাই প্রথার প্রভাবে ইহারা উন্নিত হইয়া স্ব স্ব জাতীয় শস্য মধ্যে জগতে অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। কৃষকেরা পাট সম্বন্ধেও ঐরূপ বীজ বাছাই প্রথা অবলম্বন করিলে যে বংশেরই কেন হউক না, তাহার সম্বন্ধে আশাতীত ফল লাভ করিবে এরূপ আশা করা যায়। তবে কেহ কি আয়াস স্বীকার করিয়া পরীক্ষা করিতে প্রস্তুত? বীজ বাছাই করিবার প্রণালী নিম্নে বর্ণনা করা যাইতেছে।

পাটের বীজ বাছাই।

(Seed-selection)

ভাল পাটের গাছের প্রধান গুণ এই যে পাট বেশি হয়। দ্বিতীয় গুণ এই যে পাট গাছ শীঘ্র শীঘ্র বিকাশ লাভ করিয়া পাটের বাজার যখন খুব আক্রা থাকে তখন (ভাদ্র মাসের মধ্যে) পণ্য পাট বাজারে উপস্থিত করা যায়। তৃতীয় গুণ এই যে গাছ খুব মোটা, সবল ও লম্বা হয়; কাণ্ডের নিম্নভাগে সূক্ষ্ম শিকড়গুচ্ছ থাকে না এবং গাছের শাখা প্রশাখা খুব কম থাকে। কারণ তাহা হইলে আঁস অধিক হইবে এবং আঁসের গোছাগুলি ঠিক সমান এবং খুব লম্বা হইবে। (আঁসের গুণাগুণ পরে দেখিলেই চলিবে) কৃষক নিজের

কিম্বা প্রতিবেশীর পাট ক্ষেত্রে যাইয়া উল্লিখিত গুণ গুলি সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট দেখিয়া ৫।৭টি গাছ বীজের জন্য বাছিয়া রাখিবে, এবং বীজগুলি যখন খুব ভালরূপ পাকিবে, তখন এই সকল গাছের প্রত্যেকটি হইতে খুব ভাল বিকাশপ্রাপ্ত সর্ব্বোৎকৃষ্ট ১০।১২টি খুব পরিপক্ব গোটা হইতে খুব পুষ্ট দেখিয়া কতকগুলি বীজ সংগ্রহ করিয়া, প্রত্যেক গাছের বীজ পৃথক ভাবে যত্নের সহিত রাখিবে। আবার যখন পাট বুনিবার সময় আসিবে, অন্য পাট ক্ষেত্র হইতে যত সম্ভব দূরে, উপযুক্ত জমিখণ্ডে এক একটি গাছের বীজ গণিয়া সমান সংখ্যক করিয়া পৃথক ভাবে ৫।৬টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরা জমিতে লাগাইবে। এই টুকরাগুলিও যেন কোনটার সঙ্গে কোনটা সংলগ্ন না থাকে। কীটাদি কি বাতাস দ্বারা যেন এক টুকরার গাছের ফুলের পরাগ আসিয়া অন্যটার ফুলের গর্ভকেশরে না পড়ে এই জন্যই উপযুক্ত ব্যবধান রক্ষা আবশ্যক। চাষাদি এবং চারা গাছের সেবা যত্ন যথোপযুক্ত রূপে করিবে। তাহাতে যেন কোনরূপ ত্রুটি না হয়। মনে কর তুমি এইরূপে ৫টি গাছের বীজ হইতে পাঁচ টুকরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমি করিয়াছ। গাছগুলির ফুল ধরিবার সময় হইলে পর তুলনা করিয়া দেখ এই পাঁচ টুকরার মধ্যে কোনটার গাছ কি পরিমাণ সময়ে পূর্ণবিকাশ লাভ করিয়াছে এবং কোনটা কি পরিমাণে তাহাদের উৎপাদক পূর্ব্ব গাছের গুণ সকল লাভ করিয়াছে। হয়ত দুই টুকরার গাছ পূর্ব্ববর্ত্তী গুণ ভাল পায় নাই, অর্থাৎ ইহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী গাছের গুণ সংক্রামণ শক্তি (prepotency) অত্যন্ত কম। অতএব এই দুই টুকরা তোমার পরীক্ষা হইতে ফেলিয়া দিতে হইবে। আবার হয়ত এক টুকরার গাছ পূর্ণ বিকাশ পাইতে অনেক বিলম্ব হইয়াছে। যদি তাহাতে তোমার লাভের ব্যাঘাত হয় মনে কর তবে এই টুকরাও পরীক্ষা হইতে ফেলিয়া দাও। হয়ত বাকি দুই টুকরার গাছ উপযুক্ত সময়ে পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়া তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীর গুণ সকল পাইয়াছে। এখন ইহাদের প্রত্যেকটি হইতে উৎকৃষ্ট গোটা ১৪ গাছ লইয়া পৃথক ভাবে আঁস প্রস্তুত করিয়া দেখ কোন্ টুকরার আঁসে কেমন শুভ্রবর্ণ, লম্বা, মসৃণ, সূক্ষ্ম, অথচ শক্ত এবং কোনটার পাটের ওজন কত। এই সকল তুলনা করিলে দেখিতে পাইবে যে একটি টুকরার গাছ সমস্ত গুণের মোট ধরিলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া স্থির করা যায় এবং তাহার চাষে তোমার লাভ অধিক হইবে। এখন অপর সব টুকরাগুলি ছাড়িয়া দিয়া কেবলমাত্র ঐ উৎকৃষ্ট টুকরার গাছগুলি হইতে আগামী ফসলের জন্য বীজ সংগ্রহ করিবে এবং তাহার বীজগুলি ছাই মিশাইয়া রৌদ্রে ভালরূপ শুকাইয়া, একটি মাটির ভাঁড় আগুনের উপরে কিছুকাল রাখিয়া ঠাণ্ডা হইলে পর তাহাতে বীজগুলি ভরিয়া সরা দিয়া মুখ ঢাকিয়া এবং ময়দা সিদ্ধ দিয়া বায়ু প্রবেশের পথ বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিবে। আবার বুনিবার সময় আসিলে সেই বীজ খুলিয়া অবিলম্বে ব্যবহার করিবে। এবারের ক্ষেত্র হইতেও আবার পূর্ব্বের ন্যায় বাছাই করিয়া ৫।৭টি সর্ব্বোৎকৃষ্ট গাছ বীজের জন্য রাখিবে এবং বীজ পৃথক পৃথক সংগ্রহ করিয়া পৃথক পৃথক টুকরা জমিতে পূর্ব্ববৎ চাষ করিবে এবং পূর্ব্ববৎ বাছাই করিয়া আগামী সনের বীজের জন্য ব্যবহার করিবে। এইরূপে প্রতি বৎসর বাছাই করিয়া বীজ ব্যবহার করিলে দেখিবে যদি উপযুক্ত চাষ কি জলের অভাব না হয়, তবে প্রতি বৎসরই কিছু কিছু করিয়া তোমার লাভও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে। আমাদের সাধারণ ধান লইয়া গিয়া এইরূপ বীজ বাছাই প্রথা অবলম্বন করিয়া তাহা হইতেই আমেরিকা-

বাসীরা বিখ্যাত কেরোলিনা ধান্য (Carolina rice) উৎপন্ন করিয়াছে।

১২। পাটের উপযোগী শস্যপর্য্যায়

(Rotation of crops)

শস্য পর্য্যায় (Rotation of crops) কথাটি বিদেশী। যে সকল স্থানে একই প্রকার জমিতে নানা জাতীয় শস্যের চাষ হইতে পারে, ইহা সেই সকল স্থানেরই উপযোগী। আমাদের পাটের কৃষকদিগের ক্ষেত্রগুলি ছোট ছোট খণ্ড, নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত, কোন প্রকার বেড়া দ্বারা সুরক্ষিত থাকে না। আবার অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিতেই পাট এবং ধানের চাষ হয়। গরু, ছাগলের উৎপাত অনিবার্য্য। পাট গাছ গরুতে বড় খায় না। ধান গাছ একটু বড় হইলে পর গরুতে খাইলেও একেবারে নষ্ট হয় না। এ দুটি ভিন্ন অন্য কোন বেশী লাভজনক শস্য এরূপ অরক্ষিত জমিতে কাহারও চাষ করিতে সাহস হইবে না। কেবল যে গরুর উৎপাত তাহা নয়। চুরিচামারীও দেশে অত্যন্ত প্রচলিত। আলু, কপি, তামাক, ইক্ষু, প্রভৃতির চাষে লাভ অনেক বেশী। কিন্তু বাড়ীর নিতান্ত সংলগ্ন ভূমি ভিন্ন নিরাপদে এ সকলের চাষ করা সম্ভবপর নয়। এ জন্য পাটের শস্য পর্য্যায়ের প্রশ্নটী অতি সঙ্কীর্ণ। শেষটা এই মাত্র দাঁড়ায় যে একই জমিতে প্রতি বৎসর পাট করাই ভাল, অথবা একবৎসরে পাট করিয়া পরবৎসর ধান, এইরূপ পর্য্যায় অবলম্বন করাই ভাল। পাটেই কৃষকের বেশী লাভ কি ধানেই বেশী লাভ? এ প্রশ্নের উত্তরে এইমাত্র বলা যায় যে গত ৭।৮ বৎসর পাটেই বেশী লাভ ছিল, কিন্তু এবৎসরে দেখা গিয়াছে ধানেই বেশী লাভ। মোট কথা, পাটের লাভ ক্ষতি অতিশয় অনিশ্চিত এবং শুধু পাটের উপরে নির্ভর করিয়া কৃষকের ধান পরিত্যাগ করা অত্যন্ত অসঙ্গত। ইহাতে শস্য-পর্য্যায়ের কোন প্রশ্নই আসে না। লাভের জন্য পাট করুক আর না করুক খাদ্যের জন্য কৃষককে বাধ্য হইয়াই ধান চাষ করিতে হইবে। পাটের মূল্যের যখন কোন নিশ্চয়তা নাই—আজ হয়ত ৭৲।৮৲ টাকা মণ, আবার কাল ৩৲।৪৲ টাকা মণ—পাটের প্রাপ্য টাকা দিয়া ধান কিনিয়া খাওয়া অনেক সময় সম্ভব হয় না। কৃষককে বাধ্য হইয়াই কতক পাট কতক ধান করিতে হয়। শুধু তাহা নয়, কুমিল্লা, রংপুর প্রভৃতি স্থানে এবং অন্যান্য স্থানেও অপেক্ষাকৃত কম নীচু জমিতে দেখা যায়, ক্ষুধাতুর কৃষক শ্রাবণ, ভাদ্র মাসে পাট কাটিয়া সেই জমিতে শ্রাবণ ভাদ্র মাসেই রোয়া ধান লাগাইয়া দেয়, যদিও অভিজ্ঞ কৃষক মাত্রেই জানে যে এরূপ করিলে ভূমির উৎপাদিকা শক্তির অত্যন্ত হানি হয়। ইহার বিষময় ফলে দেখা যায় যে এই সকল স্থানে যে জমিতে শুধু পাট করিলে হয়ত বিঘা প্রতি ৫।৭ মণ পাট হইত, পাট কাটিয়া ভাদ্র মাসে রোয়া ধান করিলে পর, পরের বৎসর সেস্থলে ২।৩ মণ পাটও হয় না। কতক ধান, কতক পাট কৃষককে করিতেই হইবে। এখন প্রশ্ন এই যে পাটের জমিতে কি প্রতি বৎসর পাট এবং ধানের জমিতে প্রতি বৎসর ধান করাই ভাল, না বৎসরের পর বৎসর ধানের জমিতে পাট, পাটের জমিতে ধান করা ভাল? ধানের পর পাট, পাটের পর ধান এইরূপ শস্যের পরিবর্ত্তন করারই নাম 'শস্য পর্য্যায়' (Rotation of crops)।—"প্রবাসী।"

(ক্রমশঃ)।

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।



জ্যৈষ্ঠ—১৩১৬।

পূর্ব্ববঙ্গের কৃষি-বিভাগ।

আমরা গত সংখ্যায় পূর্ব্ববঙ্গের কৃষি-বিভাগের উল্লেখ করিয়াছি। উক্ত বিভাগের বাৎসরিক বিবরণী প্রকাশিত হইতে অত্যন্ত বিলম্ব ঘটিয়াছে। এরূপ বিলম্ব ঘটা আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু এই ক্রটী ছাড়িয়া দিলে পূর্ব্ববঙ্গের কৃষি-বিভাগের বিবরণী বাস্তবিকই একটি পাঠযোগ্য পুস্তিকা। অপরাপর কৃষি-বিভাগের বিবরণীর ন্যায় ইহা কতকগুলি অসম্বদ্ধ উদ্দেশ্য-বিহীন পরীক্ষাবলীর বিবরণের সমষ্টি নহে। পূর্ব্বে বঙ্গে যে সমুদয় কৃষি পরীক্ষা হইতেছে, তাহাদের একটা নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে এবং সেগুলি সমাপ্ত হইলে আমাদের কৃষি-জ্ঞান বাস্তবিকই কতক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে।

আমরা ইতিপূর্ব্বে অনেকবার বলিয়াছি যে সরকারী কৃষি-বিভাগ সমূহের বিফলতার অন্যতম কারণ উহাদের প্রতি জন সাধারণের সহানুভূতির অভাব। পূর্ব্ববঙ্গের কৃষিবিভাগ এই অন্তরায় দূরীভূত করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। উক্ত বিভাগের কর্ত্তা, মিঃ হার্ট, বিবরণীর প্রথমেই বলিয়াছেন, যে তিনি যে সকল স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন, সে সকল স্থানের স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের সহিত পরিচিত হইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই চেষ্টার ফলে আমরা পূর্ব্ববঙ্গের কৃষিবিভাগে একটি নূতন জিনিষ দেখিতে পাই—উহা কৃষিবিভাগের অবৈতনিক সংবাদবার্তা। পূর্ব্ববঙ্গের সমস্ত জেলাতেই এইরূপ দুই একজন সংবাদদাতা নিযুক্ত হইয়াছেন এবং তাঁহাদিগের নিকট হইতে কৃষিবিভাগ অনেক সাহায্য পাইতেছেন। দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গকে কৃষিকার্য্যে উৎসাহিত করিতে পারিলে এবং তাঁহাদিগের সাহায্যে নিম্নস্তরের লোকসমূহ মধ্যে কৃষিজ্ঞান প্রচার করিতে পারিলে দেশের যে অশেষ মঙ্গল সাধন করা হইবে তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজারের বেসরকারী কৃষি-সমিতি একটা পোষাকী দ্রব্য। ইহার দ্বারা বাস্তবিক কোন উপকার সাধিত হইয়াছে কি না তাহা আমরা অবগত নহি। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের উৎসাহী অবৈতনিক সংবাদদাতাগণের দ্বারা কৃষি-বিভাগ যে অনেক রকমে উপকৃত হইতেছেন, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। কৃষি-বিভাগের সহিত অপর বিভাগের যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে তাহা আমাদের কর্ত্তারা অনেক সময় ভুলিয়া যান। আফিসের হিসাবপত্র ঠিক রাখিয়া, বৎসরের শেষে এক রিপোর্ট লিখিয়া শাসন-সংক্রান্ত অপরাপর বিভাগ যেমন খালাস, ভারতের কৃষিবিভাগ গুলিকে সেইরূপ করিবার ইচ্ছা অনেকের দেখিতে পাওয়া যায় এবং তজ্জন্যই এতদ্দেশীয় কৃষিবিভাগগুলির অবস্থা এইরূপ। এই প্রকার অসারতার মধ্যে আমরা পূর্ব্ববঙ্গের কৃষি-বিভাগের সজীবতা দেখিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছি। বলা বাহুল্য যে এই সজীবতার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল মিঃ হার্ট, মিঃ বসু প্রমুখ সুদক্ষ কর্ম্মচারীগণের অসীম উদ্যম এবং অধ্যবসায়।

পূর্ব্ববঙ্গের কৃষিক্ষেত্র সমূহের সংখ্যা আটটি।

এইগুলি যথাক্রমে ঢাকা, রাজসাহী, জোড়হাট, রঙ্গপুর, বুড়িরহাট, ওয়াঞ্জেন, উত্তর সিলঙ্গ এবং সিলঙ্গে অবস্থিত। আমরা সংক্ষেপে বিগত বৎসর এই ক্ষেত্র গুলিতে কি কি কার্য্য হইয়াছিল তাহা বিবৃত করিব। ঢাকা কৃষিক্ষেত্রে বিগত বৎসর বিশেষ কিছু পরীক্ষা হয় নাই। জমি তৈয়ারী ও গৃহ নির্ম্মাণাদি কার্য্যেই সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। রাজসাহী ক্ষেত্রই পূর্ব্ববঙ্গের যাবতীয় কৃষিক্ষেত্র অপেক্ষা পরীক্ষা বিষয়ে অগ্রসর হইয়াছে। বৃষ্টির অভাবে গত বৎসর কতকগুলি পরীক্ষা নির্ব্বাহিত হয় নাই। এই ক্ষেত্রের ইক্ষু ও আলুর পরীক্ষা গুলি বিশেষরূপ উল্লেখযোগ্য। ঢাকার গাণ্ডারী নামক ইক্ষুই রাজসাহী ক্ষেত্রে উত্তমরূপ জন্মিয়াছে এবং স্থানীয় ইক্ষু অপেক্ষা ফলনেও অধিক হইয়াছে। আলুর পরীক্ষায় বিঘাপ্রতি প্রায় ২ মণ ১৬ সের বীজ আলু (কাটা) বসান হয়। উহাতে বিঘাপ্রতি ৭১ মণ আলু উৎপন্ন হয় এবং ৭৮৲ টাকা লাভ হয়। এই পরীক্ষায় কৃষকেরা সাধারণতঃ যেরূপ সার ব্যবহার করে (১০০ মণ গোবর সার) সেইরূপই ব্যবহৃত হইয়াছিল। বিশেষ পাইটের মধ্যে পূর্ব্ব বৎসর আলুর ক্ষেত্র পতিত রাখা হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে রঙ্গপুর কৃষি-ক্ষেত্রে তামাক সম্বন্ধীয় পরিক্ষা চলিতেছিল। কিন্তু রঙ্গপুর ক্ষেত্র তামাকের জন্য তাদৃশ উপযুক্ত নয় প্রতীয়মান হওয়ায়, রঙ্গপুর হইতে ৬ মাইল দূরে বুড়ীরহাট নামক স্থানে তামাক উৎপাদনের জন্য একটি ক্ষেত্র স্থাপিত হইয়াছে এবং রঙ্গপুর ক্ষেত্র স্থানীয় কৃষি সমিতির হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে। কিন্তু বিগত বৎসরও উক্ত স্থানে বিদেশীয় তামাক উৎপাদিত হইয়াছিল। তৎপূর্ব্ব বৎসরের উৎ-পাদিত তামাক বিলাতে পাঠাইয়া যে দর পাওয়া গিয়াছে তাহা আশাজনক নহে। উক্ত তামাক পাঠাইবার পূর্ব্বেই খারাপ হইয়া গিয়াছিল। এবার নূতন তামাকের নমুনা পাঠান হইয়াছে। উহার কিরূপ দর পাওয়া যায় তাহা দ্রষ্টব্য। যাহা হউক নূতন ক্ষেত্রে বিদেশীয় তামক না ভাল হইলেও দেশীয় তামাক সম্বন্ধে যে যথেষ্ট উন্নতি হইতে পারে তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। পূর্ব্ব-বঙ্গের ষষ্ঠ পরীক্ষা ক্ষেত্র ওয়াঞ্জেন নামক স্থানে স্থাপিত। এস্থানে কোকা, কর্পূর, দারুচিনি, আনারস, নেটালের কমলা লেবু, সফেটা লেবু প্রভৃতির চাষ হইয়া থাকে। এই পরীক্ষা ক্ষেত্রের অন্যান্য ফলাফলের মধ্যে লেবুঘাস সম্বন্ধীয় পরীক্ষা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চোলাই করিতে ১৩৩৲ টাকা ব্যয় করিয়া ২৮১৷৶০ আনার তৈল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ফল আশাপ্রদ বলিতে হইবে এবং অনেক স্থানীয় কৃষকও ইহাতে আশান্বিত হইয়া লেবুঘাস চাষ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহার একমাত্র অন্তরায় তৈলের সঠিক বাজার পাওয়া। সিলঙ্গে যে দুইটি পরীক্ষা ক্ষেত্র আছে তন্মধ্যে উত্তর সিলঙ্গে প্রধানতঃ আলু চাষ ও গবাদির বংশ বৃদ্ধি করা হইয়া থাকে। আলু চাষের পরীক্ষাতে আলুর ছএক রোগ বোর্দো মিশ্রণের উপকারিতা এবং কিং অব্ পোটাটোস্ নামক আলুর সর্ব্বাধিক ফলন প্রমাণিত হইয়াছে। পশুর বংশ বৃদ্ধি সম্বন্ধে পাটনা ও স্থানীয় গরুর সংযোগে উৎকৃষ্ট গরু উৎপাদিত। ভবিষ্যতে কৃষি বিভাগ কেবল পাটনা জাতীয় বৃষই বিতরণ করিবেন। সর্ব্বশেষে আমরা সিলঙ্গ পরীক্ষা ক্ষেত্রের বিষয় বলিব। ইহা ফল পরীক্ষা ক্ষেত্র। দেশীয় ও বিদেশীয় নানা জাতীয় ফল বৃক্ষ লইয়া এখানে পরীক্ষা চলিতেছে। ডাল ও মূল ছাঁটা প্রভৃতি বিষয়ে অনুসন্ধান চলিতেছে। এরূপ বিষয়ে এত সত্বরে ফল পাওয়ার আশা করা যুক্তিযুক্ত নহে।

আমরা এতক্ষণ পূর্ব্ববঙ্গের কৃষি ক্ষেত্র সমূহের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিলাম। এক্ষণে উক্ত কৃষি পরীক্ষা সমূহে বিশেষ বিশেষ ফসল সম্বন্ধে কিরূপ নূতন প্রথা অবলম্বিত হইয়াছে অথবা নূতন ফল পাওয়া গিয়াছে তাহা এক্ষণে বিবৃত হইবে।

১। তুলা :—তুলা সম্বন্ধে সমতল ক্ষেত্রে যে সমস্ত পরীক্ষা হইয়াছে সেগুলি প্রায় বিফল হইয়াছে। কিন্তু অপ্লোচ্চ পাহাড়ে তুলা চাষ করিলে তাহাতে সুফল পাওয়া যাইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে বৈকুণ্ঠপুর ক্ষেত্রে কৃষি বিভাগ কিয়ৎ পরিমাণ জমি খাজনা করিয়া কিংস্, ইম্প্রুভড্, ক্যারাভোনিকা, স্পেন্স, ধারওয়ায় ও বুড়ী কার্পাসের চাষ করেন। প্রথমোক্ত তিনটিতে কোন ফলই হয় নাই। শেষোক্ত দুইটিতে মন্দ ফসল পাওয়া যায় নাই। ফলতঃ যাবতীয় পরীক্ষা হইয়াছে তদ্দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে 'বুড়ী' কার্পাসই সফল হইতে পারে। তজ্জন্য কৃষি বিভাগ বুড়ী কার্পাসের বীজ বিতরণ করিতেছেন ও স্থানে স্থানে চাষের বন্দোবস্ত করিতেছেন।

২। পাট :—আসাম উপত্যকায় আজকাল প্রায় সর্ব্ব স্থানেই পাটের আবাদ হইতেছে। তজ্জন্য কৃষি বিভাগের বিশেষ চেষ্টা অনাবশ্যক। উপরোক্ত স্থানে বোধ হয় পাটের চাষ আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত কিন্তু বিগত বৎসর পাটের মূল্য হ্রাস হওয়ার জন্য তাহা হয় নাই। উত্তর কামরূপে ইউরোপীয় তত্ত্বাবধানে দুইটী নূতন পাটের কারবার খোলা হইয়াছে। আসাম বেঙ্গল রেলের পার্শ্বে রেলের কর্ত্তারা পাট সম্বন্ধে যে সমুদয় পরীক্ষা করিতেছিলেন তৎসমুদয় প্রায়ই সফল হইয়াছে। চট্টগ্রাম জেলায় পাট চাষ হইতে পারে কিনা তাহা অনুসন্ধান করিবার জন্য বিশেষজ্ঞ মিঃ ফিন্‌লো এস্থানে গমন করেন এবং তিনটি পরীক্ষা ক্ষেত্র স্থাপন করেন। তন্মধ্যে দুইটিতে ভাল পাট জন্মিতেছে। বিগত বৎসর পাটে পোকার উপদ্রব কিছু কম হয় নাই। সাধারণতঃ তিন প্রকার পোকার প্রাদুর্ভাবই অধিক হইয়াছিল এবং সরকারী কীট-সংগ্রহকারক স্থানে স্থানে গিয়া কৃষকদিগকে কীট নিবারণ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষকগণের অনবধানতায় তাদৃশ সুফল হয় নাই।

৩। আলু :—সাধারণতঃ পূর্ব্ববঙ্গে যে রকম আলু উৎপাদিত হয় তাহা অতি নিকৃষ্ট জাতীয়। প্রায় ৩০০ শত আলুতে এক সের হয়। এই নিমিত্ত কৃষি বিভাগ পাটনা ও নইনিতাল আলু প্রবর্ত্তনের জন্য বিশেষ সচেষ্ট হইয়াছেন। উভয় প্রকারের আলুরই যথেষ্ট পরিমাণ বীজ বিতরিত হইয়াছে এবং অনেক স্থলে আশাপ্রদ ফলও পাওয়া গিয়াছে। আলুর ধসা রোগের জন্য বোর্দ্দো মিশ্রণের উপকারিতাও অনেক স্থলে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ফলতঃ আলুর চাষ বিস্তারের জন্য কৃষি বিভাগ যেরূপ চেষ্টা করিতেছেন তাহাতে বোধ হয় অনতিকাল পরে পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থানেই আলু অত্যন্ত সুলভ হইয়া দাঁড়াইবে।

৪। ধান্য :—ধান্য সম্বন্ধে এখনও অধিক সংখ্যক পরীক্ষা হয় নাই। পশ্চিম বঙ্গের দাদখানি, গোবিন্দভোগ প্রভৃতি ধান্য পরীক্ষিত হইতেছে। ধান্যের মধ্যে যব দ্বীপের এক নূতন জাতীয় ধান্য প্রবর্ত্তিত হইতেছে। আমাদের সুপরিচিত শিবসাগরের শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঘোষ এই ধান্য চাষ করিয়া বিঘা প্রতি ৮/ ফসল পাইয়াছেন। শুনিতে পাওয়া যায় যে যব দ্বীপের ধান্যে সাহেবদিগের খাদ্যোপযোগী উত্তম চাউল (Table Rice) হয়। ইহার পরীক্ষা এতদঞ্চলেও

বাঞ্ছনীয়। ধান্যের সার সম্বন্ধে পূর্ব্ববঙ্গে নূতন কিছু আবিষ্কৃত হয় নাই। বর্দ্ধমান কৃষি ক্ষেত্রে প্রতিপন্ন বিঘা প্রতি ১/৫ মণ হাড়ের গুঁড়া ও ১০ সের সোরা সারই পূর্ব্ববঙ্গে ব্যবহৃত হইতেছে। অসভ্য পার্ব্বতীয় জাতিদিগকে ধান্য চাষ শিক্ষা দেওয়ার জন্য গভর্ণমেণ্ট ৫০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

৫। কমলা লেবু ঃ—খাসিয়া পর্ব্বতের কমলা লেবু অতি প্রসিদ্ধ ফসল। কয়েক বৎসর হইতে এক প্রকার ছত্রক রোগ হইয়া লেবু গাছ নষ্ট হইয়া যাইতেছে। এ পর্য্যন্ত ইহার কোন সঠিক প্রতিকার আবিষ্কৃত হয় নাই। ভারতীয় গভর্ণমেণ্টের ছত্রকতত্ত্ববিৎ এই রোগের ইতিহাস ও প্রতীকার বিষয়ে অনুসন্ধান করিতেছেন।

নিরপেক্ষ ভাবে বিবেচনা করিতে গেলে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের কৃষি বিভাগকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারা যায় না। এই বিভাগটি অত্যন্ত নূতন; এত অল্প সময়ের মধ্যে যে ইহা এত কার্য্যক্ষম হইয়া উঠিয়াছে তাহা বিস্ময়ের বিষয় বটে। কিন্তু এই বিভাগের কর্ম্মচারীবর্গ বাস্তবিকই কৃষিকার্য্যে উৎসাহী। যে স্থানে ডিরেক্টার ও সহকারী ডিরেক্টার জনসাধারণের সহিত পরিচিত হইতে একান্ত প্রয়াসী এবং শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গকে কৃষি বিভাগের কার্য্যে লিপ্ত করিতে একান্ত ইচ্ছুক সে স্থানে ফল শুভ হইবারই কথা।

পত্রাদি।

শ্রীযুক্ত কৃষক সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

উদ্ভিদতত্ত্ব আলোচনা করিবার ও শিখিবার আমার ইচ্ছা আছে, কিন্তু স্কুল কলেজে পড়িয়া শিখিবার মত অবসর নাই। অন্য কোন স্থানে ঐ বিষয়ের আলোচনা হয় কি? শিবপুরে বোটানিক্যাল গার্ডেন (উদ্ভিদ উদ্যান) আছে। উক্ত বাগানে বৃক্ষলতাদি চিনিবার বা তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিবার কোন সুযোগ আছে কিনা। উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে কোন নূতন তত্ত্বের তথায় আলোচনা হয় কিনা এবং সাধারণে তথায় যাইয়া এই বিষয়ে কোন জ্ঞানার্জ্জন করিতে পারে কিনা? আশা করি ইহার সদুত্তর দানে সুখী করিবেন।

শ্রীরত্নেশ্বর চট্টোপাধ্যায়,
উকীল, বারুইপুর মুন্সেফী আদালত,
২৪-পরগণা।

[পুষাতে একটী কৃষিতত্ত্বানুসন্ধানাগার স্থাপিত হইয়াছে। তথায় প্রাদেশিক কৃষি-কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ প্রবেশাধিকার পাইবেন। সবরে ও অন্যান্য স্থানে কৃষি-বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে। এই সকল স্থানে অন্যান্য বিষয়ের সহিত উদ্ভিদতত্ত্বও শিক্ষা দেওয়া হইবে। কলিকাতা বিজ্ঞান আলয়ে (Science Association) উদ্ভিদতত্ত্ব শিখান হয় বটে, কিন্তু তথায়ও ব্যবহারিক উদ্ভিদতত্ত্ব শিখিবার কোন বন্দোবস্ত নাই। কেবলমাত্র সাধারণ স্কুল কলেজের পাঠ্যোপযোগী উদ্ভিদতত্ত্বের আলোচনা হয়। ব্যবহারিক উদ্ভিদতত্ত্ব শিক্ষার

জন্য ভারতীয় কৃষি-সমিতি (Indian Gardening Association) একটী শ্রেণী খুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। শিবপুর উদ্ভিদ উদ্যানে সাধারণের জন্য উদ্ভিদতত্ত্ব আলোচনার কোন বন্দোবস্ত নাই।

কৃঃ সঃ।]

মাননীয় কৃষক সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—
মহাশয়,

আমার সুপরিচিত জনৈক ভদ্রলোক হাজারিবাগ অঞ্চলে পূর্ত্তবিভাগে কার্য্য করিতেন। তিনি তথায় অবস্থানকালে এক প্রকার গুল্মপত্র দলন করিয়া সর্পাহত রোগীর ক্ষতমুখে ব্যবহার করিতে দেখিয়াছেন। ইহাতে সাপের বিষক্রিয়া নষ্ট হয়। এরূপে তিনি অনেক সর্পদষ্ট রোগীকে আরোগ্য লাভ করিতে দেখিয়াছেন। রাঁচি ও হাজারিবাগ অঞ্চলে এই প্রকার গুল্ম যথেষ্ট পরিমাণে বনে জঙ্গলে জন্মায়। তত্রস্থ লোকেরা ঐ পাতার রসে সরবৎ প্রস্তুত করিয়া গ্রীষ্মকালে পান করিয়া থাকে। ঐ গুল্মের স্থানীয় নাম "নটর বটিয়া"। যদি কেহ ঐ গুল্মের গুণাগুণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ বিচার করিয়া সাধারণকে জানান তাহা হইলে দেশের একটা বিশেষ উপকার হয়।

রোগ নিবারণের অধিকাংশ ঔষধাদি গাছ গাছড়া হইতে প্রস্তুত হয়। সুতরাং গাছ গাছড়ার গুণাগুণ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

জনৈক পল্লিবাসী।

[যদি কোন ব্যক্তি হাজারিবাগ বা রাঁচি হইতে উক্ত গুল্ম সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতে পারেন, তাহা হইলে আমরা উক্ত গুল্ম সম্বন্ধে পরীক্ষা করিতে পারি। কৃঃ সঃ।]

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র মজুমদার, কলিকাতাঃ—বাগানে ও ইষ্টকালয়ের গাত্রে আগাছা নষ্ট করিবার উপায় জানিতে চাহিতেছেন ;—

[নাইট্রেট অফ্ সোডা, হিরাকস, লবণ, আর্সেনেট অব্ সোডা প্রভৃতি আগাছা মারিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। জঙ্গলা সরিষা, পাণিমরিচ, কাঁটানটে প্রভৃতি আগাছা ⁄১ সের হিরাকস ⁄৫৷৹ সের আন্দাজজলে দ্রব করিয়া প্রয়োগ করিলে বিনষ্ট হয়। অম্লরসযুক্ত জমিতে যে আমরুল, ফর্ণ, শৈবাল প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, সে সমুদয় চুণ এবং ছাই প্রয়োগে মরিয়া যায়। ১ ভাগ শাদা সেঁকো ও ৪ ভাগ বস্ত্রধৌত করার সোডা জলে দিয়া ফুটাইলে যে দ্রাবণ প্রস্তুত হয়, তাহা ৩০ গুণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া গৃহের ভিত্তি অথবা দেওয়ালের উপর ছিটাইয়া দিলে আগাছা নিরাকৃত হইবে। বড় গাছের গুঁড়ি মারিতে হইলে গুঁড়ির গাত্রে আগর দ্বারা ছিদ্র করিয়া পূর্ব্বোক্ত দ্রাবণ উক্ত গর্ত্তে ঢালিয়া কর্ক দ্বারা বেশ করিয়া বন্ধ করিয়া দিলে গুঁড়ি মরিয়া যাইবে। বসন্তাগমের পূর্ব্বে এই দ্রাবণ প্রয়োগ করিলে ভাল হয়। কারণ তাহা হইলে নূতন পত্রোদ্গমের আর উপায় থাকে না। কৃঃ সঃ।]

শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র সেট, কুমিল্লা;—পেঁপে চাষে পেঁপে বিক্রয় ভিন্ন ফসল হইতে অন্য কোন প্রকারে লাভ হইতে পারে কিনা জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন ;—

[পেঁপে হইতে পেপিন নামক এক প্রকার পদার্থ পাওয়া যায়। উহা পরিপাক ক্রিয়ার যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করে এবং এতদুদ্দেশ্যে ঔষধে ব্যবহৃত হয়। তসরের গুটি প্রভৃতির আঠাবৎ পদার্থ দ্রব করিবার জন্যও ইহা ব্যবহৃত

হইতে পারে। পেপিন নিম্ন প্রকারে প্রস্তুত করা যায়। সুপুষ্ট অথচ অপক্ক ফলের গাত্রে ছুরী দ্বারা দাগ দিলে আঠা বাহির হয়। আঠা অনতিবিলম্বে চাঁচিয়া তুলিয়া লইয়া তিনগুণ পরিমাণ সুরাসারে কয়েক ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিতে হয়। তৎপরে পেপিন ছাঁকিয়া বাহির করিয়া লইয়া অল্প উত্তাপে শুষ্ক করা আবশ্যক। শুষ্ক ও চূর্ণীকৃত পেপিন ফিকে হরিদ্রাবর্ণ এবং উষ্ণ জলে প্রায় সম্পূর্ণরূপে দ্রবণীয়। কৃঃ সঃ।]

প্রাদেশিক কৃষি সংবাদ।

জয়পুর—বগুড়া।—বগুড়া জেলায় ভীষণ অন্নকষ্ট। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম সপ্তাহ গত হইল, এ পর্য্যন্ত বারিপাত হয় নাই। যাহা কিছু হইয়াছিল তাহাও প্রখর সূর্য্য কিরণে শুষ্কপ্রায়। দেশের এই দুর্দ্দিনে ঈশ্বর অনুকম্পায় কলিকাতা ১০৬নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীটস্থিত খ্যাতনামা দয়ার্দ্রহৃদয় দানশীল মহাত্মা হাজারিমল যোগীনপ্রসাদ আগরওয়ালা ও অত্র জয়পুরের প্রসিদ্ধ মহাজন শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র আগরওয়ালা দয়াপরবশ হইয়া, ৫ই বৈশাখ তারিখে অত্র বগুড়া জেলার অন্তর্গত পাঁচবিবি পুলিস ষ্টেসনের অধীন জয়পুর বন্দরে একটী অন্নছত্র স্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে সমাগত আবাল বৃদ্ধ দৈনিক ৵৷০ পোয়া চাউল পাইতেছে। প্রথম দিন ২০০ শত লোক হইয়াছিল, অদ্য ৩১শে বৈশাখ ৪৯০০ শত লোক হইয়াছে, যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে অনুমান হয় অতি সত্বরে ৫০০০।৬০০০ হাজার লোক হইবে। ৫ই বৈশাখ হইতে ৩১এ বৈশাখ পর্য্যন্ত ৩৪৩৷৪ সের চাউল বিতরণ হইয়াছে। এই মহৎ ব্যাপার শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত চলিবে।—শ্রীরাধাকান্ত সরকার।—সঞ্জীবনী।

জলকষ্ট।—সম্প্রতি মেদিনীপুরে অত্যধিক গরম পড়িয়াছে। তারপর দারুণ জলকষ্টে লোকে অস্থির হইয়া বেড়াইতেছে। জলাভাবে চারিদিকেই হাহাকার উঠিয়াছে। খাল, পুকুর প্রভৃতি জলাশয় সমূহের জল একেবারে শুকাইয়া যাওয়ায় মনুষ্য ও গৃহপালিত পশু আদির বিষম কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। অনেক পল্লীবাসীকে এক, দেড় মাইল দূর হইতে জল বহিয়া লইয়া অভাব নিবারণ করিতে হইতেছে।

এই প্রকার আরও কত শত স্থান হইতে জলাভাবে চাষ নষ্ট ও পানীয় জলাভাবে প্রাণহানিকর ঘটনার সংবাদ আসিতেছে। চৈত্র মাস হইতে আরম্ভ করিয়া বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ কখন কখন আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত প্রায় প্রতি বৎসর এই আর্ত্তনাদ আমাদিগকে শুনিতে হয়। নিঃস্ব প্রজা বড় আশা করিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করে কিন্তু তাহাতে ফল হয় কৈ? গভর্ণমেণ্ট এই অর্থ কৃচ্ছ্রতার বৎসরেও ৮৪ লক্ষ টাকা পুলিশবলবৃদ্ধির জন্য ধার্য্য করিলেন কিন্তু জলকষ্ট নিবারণের তাঁহাদের তাদৃশ সহানুভূতি কৈ?

পঞ্জাবে গমের আবাদ ১৯০৮।১৯০৯।—মাটি অত্যন্ত রসা থাকায় এবং ম্যালেরিয়া জ্বরের অত্যধিক প্রকোপ বশতঃ বর্ত্তমান বর্ষে এতদঞ্চলে প্রায় ১০ লক্ষ একর পরিমাণ জমিতে গম বোনা হয় নাই। অন্যদিকে আবার শীতকালে বৃষ্টির অল্পতা হেতু মধ্য ও দক্ষিণদিকবর্ত্তী জেলা সমূহে গমের আবাদের হ্রাস হইয়াছে, কিন্তু যে সকল জেলায় গম অত্যধিক পরিমাণে জন্মায় তথায় চাষের বিশেষ কোন অসুবিধা হয় নাই। সেই জন্য দেখা যায় যে, স্থানে স্থানে এত বিঘ্ন বিপদ সত্ত্বেও মোটের

উপর শতকরা ৫ ভাগ মাত্র কম জমিতে গম চাষ হইয়াছে।

বিগত বৎসর পূর্ব্ব বৎসরের সহিত তুলনায় গমের আবাদের পরিমাণ নিম্নলিখিত রূপ দাঁড়াইয়াছে :—

বৎসর।	সেচন জলের সাহায্যে।	সেচন জল বিনা।	মোট।
	একর	একর	একর
১৯০৭-০৮	৪,৩৫৩,০০০	২,৮৩৪,৩০০	৭,১৮৭,৩০০
১৯০৮-০৯	৪,০০৭,৯০০	৩,৭৯৭,১০০	৭,৮০৫,০০০

উপরের তালিকা দৃষ্টে বুঝা যায় যে বিগত পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা গমের আবাদী জমির পরিমাণ শতকরা ৮ ভাগ অধিক কিন্তু বিগত পাঁচ বৎসরের গড় হিসাবে শতকরা ১ ভাগ কম। এপ্রিল মাসের শেষে বৃষ্টি হইয়া গমের কিছু ক্ষতি হইলেও গত বৎসর অপেক্ষা ফলন শতকরা ২২·৫ ভাগ অধিক হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরের ফসলের পরিমাণ ২,৭২৩,০৯৯ টন। বিগত বর্ষের ২,২২২,৭৮৯ টন। কিন্তু পাঁচ বৎসরের গড় হিসাব ধরিলে শতকরা ৯·৪ ভাগ কম হইয়াছে।

১৯০৮ সেপ্টেম্বর মাসে অমৃতসহরে গমের দর টাকায় ১০॥ সের ছিল, নভেম্বর মাসে ৮॥ সের হয়। ফেরোজপুরে মে মাসে ৮॥ সের টাকায় দর ছিল, তারপর মধ্যে ১০ সের হইয়া আবার টাকায় ৮ সের বিকাইয়াছিল।

গমের রপ্তানি।—১৯০৮ সালে সর্ব্বসমেত ৩০৫,৩৪১ টন গম অন্যত্র রপ্তানি হইয়াছে; কিন্তু ১৯০৭ সালে রপ্তানির পরিমাণ ১,২৯৬,০০৭ টন। ১৯০৭-০৮ সালে গম ভালরূপ জন্মায় নাই বলিয়া এবং সঞ্চিত শস্য কম ছিল বলিয়া ১৯০৮ সালে রপ্তানির পরিমাণ এত কম হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত দেশীয় পাতিয়ালা, ঝিন্দ, নভা, কপূর্‌রথালা, কর্‌য়াকেল, মন্ডি, সুখেত ও মল্লার রাজ্যে ১,০৭৯,০০০ একর পরিমাণ জমিতে গমের আবাদ হইয়াছে এবং উৎপন্ন গমের পরিমাণ ৩৩৪,১৭৮ টন।

বঙ্গে তৈল শস্যের আবাদ ১৯০৮-০৯।— উক্ত বর্ষে ২,১৭০,৩০০ একর জমিতে তৈল শস্যের আবাদ হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল কিন্তু কেবল মাত্র ১,৫৫৭,৫০০ একর মাত্র জমিতে আবাদ হইয়াছিল। বিগত পূর্ব্ব বৎসর তৈল শস্যের আবাদী জমির পরিমাণ ১,৪০৩,১০০ একর মাত্র। এই বিবরণীতে তিল বাদে অন্য তৈল শস্যের হিসাব ধরা হইয়াছে। তৈল শস্য বপনের সময় জল হাওয়ার অবস্থা ভাল ছিল, কিন্তু কার্ত্তিক মাসে সুবৃষ্টি না হওয়ায় অনেক জমি পতিত রহিয়া গেল এবং ক্ষেত্রস্থ অনেক ফসলের ক্ষতি হইয়াছিল। তৈল শস্যের পরিমাণ যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে দেখা যায় সম্বলপুরে তের আনা, ৬টী জেলায় বার আনা, অপর দশটী জেলায় নয় কিম্বা দশ আনা এবং বাকী ৮টী জেলায় আট আনা কিম্বা নয় আনা মাত্র ফসল জন্মিয়াছে। একর প্রতি সরিষা, রাই ও তিসির ফলন ৬/০ মণ ধরিলে এবং অন্য তৈল শস্যের ৪৷৷০ মণ ধরিলে মোটের উপর ১৮৯,৭০০ টন তৈল শস্য জন্মিয়াছে। গতপূর্ব্ব বৎসরে ১৮৮,০০০ টন শস্য জন্মিয়াছিল।

গত সনে বঙ্গদেশে গমের আবাদ। ১৯০৮-০৯।—গত বৎসর উপযুক্ত সময়ে বৃষ্টি না হওয়ায় প্রথমতঃ সমস্ত জমিতে চাষ ঘটিয়া উঠে নাই। দ্বিতীয়তঃ আশানুরূপ গম উৎপন্ন হয়

নাই। ১৩৫১৫০০ একর জমির মধ্যে ১২৫৫২০০ একর জমিতে বীজ বপন করা হইয়াছিল অর্থাৎ শতকরা ৭ ভাগ জমি পতিত ছিল। গম চাষের উপযুক্ত জমি বেহার অঞ্চলেই বেশীর ভাগ। সমস্ত বঙ্গদেশে যত জমিতে গম চাষ হয়, তাহার ৮৭ ভাগ জমিই বেহারে। গত সনে সেখানে উপযুক্ত পরিমাণে শস্য জন্মায় নাই। সাধারণতঃ যাহা আশা করা যায়, তাহার কিঞ্চিদধিক অৰ্দ্ধেক মাত্র জন্মিয়াছে। মুর্শিদাবাদ, নদীয়া এবং হাজারিবাগ এই তিন স্থানেও গমের চাষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার প্রথম দুই স্থানে অৰ্দ্ধেকেরও কম জন্মিয়াছে এবং তৃতীয় স্থানে অৰ্দ্ধেকের কিছু বেশী জন্মিয়াছে।

বিদেশে রপ্তানির হিসাব।

১৯০৮ সালের এপ্রিল হইতে ১৯০৯ সালের ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত ...	৬৭০৮৩ মণ
ইহার পূর্ব্ব বৎসর ঐ এগার মাসে	১৯৯৯৩৫ মণ
তৎপূর্ব্ব বৎসর ...	১৭৫৬৭৮ মণ

বিদেশ হইতে আমদানির হিসাব।

৩১৮৪৭৫৭ মণ
৪৩৯৮০০৫ মণ
৪৩১২১৮৫ মণ

কিন্তু ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর অপেক্ষা গত বৎসর গম অধিক জন্মিয়াছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ ২৯৯২০০ টন এবং গত বৎসর ৩১৯৮০০ টন। বৎসরে তিনবার গম উৎপন্ন হয়, অগ্রাণী, ভাদুই এবং রবি। সমগ্র বঙ্গদেশে মোট হিসাবে ৬০ ভাগ মাত্র গম উৎপন্ন হইয়াছে। গমের দামের তালিকা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

বিগত তিন বৎসর গমের দর নিম্নরূপ ছিল।

প্রতি টাকায়।

	১৯০৭।	১৯০৮।	১৯০৯।
	সের ছঃ।	সের ছঃ।	সের ছঃ।
কলিকাতা ...	।০।/০	/৭	/৭।০
মফঃস্বল ...	।১।০	/৭/০	/৪৷৴০

সার-সংগ্রহ।

স্বদেশীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ফরিদপুরের অন্তর্গত বাজিতপুরের বালকদিগের কার্য্য দর্শন করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। উক্ত গ্রামের উত্তরপাড়ার কতকাংশে জলের কষ্ট ছিল। উত্তরপাড়ার বালকগণ এক দিন একত্র হইয়া স্থির করে যে, তাহারা দত্তদিগের পুরাতন অব্যবহার্য্য পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিয়া তথাকার জলকষ্ট দূর করিবে। অতঃপর দত্তদিগের অনুমতি লইয়া তাহারা পুষ্করিণী খনন আরম্ভ করে। তাহারা সকলেই কায়স্থ ভদ্রলোকের সন্তান। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের উত্তাপে গৃহে তিষ্ঠান কষ্টকর, এমন সময়ে পুকুর খনন কি ভয়ঙ্কর কষ্টসাধ্য ব্যাপার, তাহা বর্ণনা করাই বাহুল্য। নিম্ন শ্রেণীর অধিবাসিগণ ভদ্র সন্তানদিগের এই আশ্চর্য্য ক্ষমতা ও উৎসাহ দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়াছে। পুষ্করিণীটি দীর্ঘে ৬০ হাত এবং প্রস্থে ৫০ হাত; ইহাতে প্রায় ৬ হাত গভীর মৃত্তিকা খনন করা হইয়াছে। এই পুষ্করিণী খনন করিতে অন্যূন ৩০০৲ টাকা ব্যয় হইত। জলকষ্ট নিবারণের জন্য ভদ্রলোকের শিশু সন্তানগণ কখনও পুষ্করিণী খনন করিতে পারিবে ইহা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। সত্য সত্যই স্বদেশী আন্দোলন বঙ্গদেশের মৃতদেহে নূতন জীবন সঞ্চার করিয়াছে। এই বালকগণের পন্থাবলম্বন করিয়া রাজা, মহারাজা, ধনী, দরিদ্র সকলে স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে কাহাকেও কাহারও মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয় না। তখন কি অন্নকষ্ট, কি জলকষ্ট দূর করা সাধ্যায়ত্ত হইয়া পড়ে।

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য।

কৃষি রসায়ন।—অনেকেই এক্ষণে বিজ্ঞান সম্মত কৃষি প্রণালী অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু কৃষি-রসায়ন শিক্ষা না করিলে যে কোন কৃষি প্রণালী অবলম্বন করুণ না তাহা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। বঙ্গ ভাষায় কৃষি-রসায়ন পুস্তক অত্যন্ত বিরল। শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র চৌধুরি প্রণীত রসায়ন পরিচয় এতৎসম্বন্ধে একমাত্র পুস্তক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাই আমরা সেই রসায়ন পরিচয়ের নূতন সংস্করণ হইতেছে শুনিয়া সুখী। আরও সুখের বিষয় এই যে, এই নূতন সংস্করণ সম্পূর্ণ সংশোধিত হইবে এবং ইহাতে নূতন বিষয় সংযোজিত হইবে।

চিত্র শিল্প।—খুলনা-মহেশ্বরপাড়ার শ্রীযুক্ত শশী ভূষণ পাল উত্তম চিত্র-শিল্পী ; আমরা ইহাঁর চিত্রের সবিশেষ সুখ্যাতি শুনিয়াছি। ইনি ফ্রাঙ্কো-ব্রিটিশ প্রদর্শনী হইতে প্রশংসাপত্র পাইয়াছেন। বড়লাট লর্ড মিণ্টো, বরোদার গায়কোবাড় এবং কুচবিহারের মহারাজ ইহাঁর চিত্র দর্শনে পরম প্রীত হইয়া, এক এক শত টাকা পুরস্কার দিয়াছেন ; ময়ুরভঞ্জের মহারাজের নিকটও ইনি পঞ্চাশ টাকা বকসিস পাইয়াছেন। ইহাঁর স্ত্রী শ্রীমতী কামিনী সুন্দরীও চিত্র শিল্পে, বিশেষতঃ বয়ন-শিল্পে সবিশেষ সুনিপুণা। কামিনীসুন্দরী বস্ত্রোপরি সূত্রসংযোগে গ্লাডষ্টোন এবং পলাশী-যুদ্ধের যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা বস্তুতই অতীব প্রশংসার যোগ্য। এ চিত্র আমরা দেখিয়াছি। স্বয়ংসিদ্ধ শশীভূষণ উদ্যোগী ছাত্রকে বিনা পারিশ্রমিকে চিত্র-শিল্প শিখাইতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। শিল্পোন্নতির প্রয়াস এদেশে এখন যত বাড়িবে, ততই ভাল।

অন্নরক্ষিণী সভা।—দেখিতেছি, আন্দোলন বৃথা হয় নাই। "অন্নরক্ষিণী সভা"র আন্দোলনের ফলে, দেশের অন্নকষ্টের কারণ অনুসন্ধান জন্য গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি বিশেষরূপেই পতিত হইয়াছে। "অন্নরক্ষিণী সভা"র সভাপতি দ্বারবঙ্গেশ্বর শ্রীযুক্ত রামেশ্বর সিংহ বাহাদুর যে সকল প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, গভর্ণমেণ্ট তাহারই একটী প্রস্তাব পরিগ্রহণ করিয়াছেন ; অর্থাৎ, স্থির হইতেছে,—প্রথমে অন্নকষ্টের কারণ অনুসন্ধান হইবে ; তারপর তদনুসারে কার্য্য-ব্যবস্থা হইবে। ভারত গভর্ণমেণ্ট ও প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া পাঠাইয়াছেন। বিলাতের ষ্টেট-সেক্রেটারী এক্ষণে উহার বিষয় বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। কিরূপভাবে অনুসন্ধান কার্য্য আরম্ভ হইবে, শীঘ্রই তাহা জানা যাইবে।—বঙ্গবাসী।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত সাতগেছিয়ার প্রজাবৎসল জমিদার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল শীল মহাশয় দুই সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে—উক্ত গ্রামে একটী বৃহৎ ইঁদারা প্রস্তুত করিয়া দিয়া প্রজাগণের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন। দেশে যেরূপ জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, গভর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে যেরূপ উপেক্ষাভাব পরিলক্ষিত হয়, তাহাতে আমাদের দেশের প্রত্যেক প্রজাহিতৈষী জমিদারের স্ব স্ব জমিদারীতে পুকুর, ইঁদারা কাটাইয়া দেওয়া সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্য। বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী।

রঙ্গপুর—যাত্রাপুর—পাইকের ভিটা। বসন্ত রোগের প্রকোপ কমে নাই। এবার এ অঞ্চলে অতি অল্পই আম জন্মিয়াছে। কয়েক দিবস উপর্য্যুপরি বৃষ্টি হইয়াছিল ; ফলে, মাঠে নূতন তৃণাদি কিছু হইয়াছে এবং গরু বাছুরের কষ্ট কিঞ্চিৎ লাঘব হইয়াছে। ধান চাউলের দর ক্রমশঃ চড়িতেছে। শ্রীসেবারাম দাস।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

আষাঢ় মাস।

সব্জীবাগ।—শীতের চাষের জন্য এই সময় প্রস্তুত হইতে হইবে। আমন বেগুনের তলা ফেলিতে হইবে। এই সময় শাকাদি, সীম, লঙ্কা, শীতের শসা, লাউ, বিলাতি বেগুন, পাটনাই ফুলকপি, পাটনাই শালগম ইত্যাদি দেশী সব্জী বীজ বপন করিতে হইবে।

পালম্ শাক, টমাটোর জলদি ফসল করিতে গেলে এই সময় বীজ বপন করিতে হইবে বিলাতি সব্জী বীজ বপনের এখনও সময় হয় নাই।

মকাই (ছোট মকাই) এবং দে-ধান চাষের এই সময়।

হলুদ, আদা, জেরুজালেম আর্টিচোক, এরোরুট প্রভৃতির গোড়ায় মাটি দিয়া দাঁড়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। দাঁড়া বাঁধিয়া দিলে গাছগুলির বৃদ্ধি হয় এবং গাছগুলি জলে গোড়া আল্‌গা হইয়া পড়িয়া যায় না।

ফুলবাগিচা।—দোপাটি, ক্লিটোরিয়া (অপরাজিতা) এমারন্থস, কক্সকোম্ব, আইপোমিয়া, ধুতুরা, রাধাপদ্ম (Sunflowor) মার্টিনিয়া, ক্যানা ইত্যাদি ফুলবীজ লাগাইবার সময় এখন গত হয় নাই। ক্যানার ঝাড় এই সময় পাতলা করিয়া অন্যত্র রোপণ করা উচিত।

গোলাপ, জবা, বেল, যুঁই প্রভৃতি পুষ্প বৃক্ষের কাটিং করিয়া চারা তৈয়ার করিবার এই উপযুক্ত সময়।

জবা, চাঁপা, চামেলি, যুঁই, বেল প্রভৃতি ফুলগাছ এই সময় বসাইতে হয়।

ফলের বাগান।—বর্ষা নামিলে আম, লিচু, পিয়ারা প্রভৃতি ফলের গাছ বসাইতে হয়। বর্ষান্তে বসাইলে চলে কিন্তু সে সময় জল দিবার ভালরূপ বন্দোবস্ত করিতে হয়। এখন—ঘন ঘন বৃষ্টিপাত হওয়ায় কিছু খরচ বাঁচিয়া যায়, কিন্তু সতর্ক হওয়া উচিত, যেন গোড়ায় জল বসিয়া শিকড় পচিয়া না যায়। আম, লিচু, কুল, পিচ, নানাপ্রকার লেবু গাছের গুল কলম করিতে আর কাল বিলম্ব করা উচিত নহে। লেবু প্রভৃতি গাছের ডাল মাটি চাপা দিয়া এই সময় কলম করা যাইতে পারে। এইরূপ প্রথায় কলম করাকে লেয়ারিং (layering) করা বলে।

আনারসের মোকা বসাইয়া আনারসের আবাদ বাড়াইবার এই উপযুক্ত সময়।

আম, লিচু, পিচ, লেবু, গোলাপজাম প্রভৃতি ফল গাছের বীজ হইতে এই সময় চারা তৈয়ারি করিতে হয়। পেঁপে বীজ এই সময় বপন করিতে হয়।

আম, নারিকেল, লিচু প্রভৃতি গাছের গোড়া খুঁড়িয়া তাহাতে বৃষ্টির জল খাওয়াইবার এই সময়। কাঁঠালের গোড়া খুঁড়িয়া দিবার এখন একটু বিলম্ব আছে। ফল শেষ হইয়া গেলে তবে গাছের গোড়ার মাটি বিচলিত করা কর্ত্তব্য। সুপারি গাছের গোড়ায় এই সময় গোবর মাটি দিতে হয়। এই সময় ঐ সকল গাছের গোড়ায় সামান্য পরিমাণ গোবর দিলে বিশেষ উপকার পাইবার সম্ভাবনা। হাড়ের গুঁড়াও এই সময় দেওয়া যাইতে পারে।

আয়কর বৃক্ষ যথা, শিশু, সেগুন, মেহগ্নি, খদির, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, কাঞ্চন প্রভৃতি বৃক্ষের বীজ এই সময় বপন করা উচিত।

কলার মৃত মূল এই সময় ঝাড় হইতে স্থানান্তরিত করা কর্ত্তব্য এবং কলার তেউড় এখনও নাড়িয়া রোপণ করা চলে।

যাঁহারা বেড়ার বীজ দ্বারা বেড়া প্রস্তুত করিবেন, তাঁহারা এই বেলা সচেষ্ট হউন। এই বেলা বাগানের ধারে বেড়ার বীজ বপন করিলে বর্ষার মধ্যেই গাছ গুলি দস্তুরমত গজাইয়া উঠিবে।

শস্যক্ষেত্র।—কৃষকের এখন বড় মরশুম, বিশেষতঃ বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা ও আসামের কতকস্থানের কৃষকেরা এখন আমন ধান্যের আবাদ লইয়া বড় ব্যস্ত। পাট চাষ প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে কোন কোন স্থানে পাট তৈয়ারি হইয়া গিয়াছে। দক্ষিণবঙ্গে পাট কিছু নাবি হয়, কিন্তু পাট বুনিতে আর বাকি নাই। ধান্য রোপণ শ্রাবণের শেষে শেষ হইয়া যায়।

বর্ষাকালে ঘাস এবং আগাছা ও কুগাছার বৃদ্ধি হয় সুতরাং সব্জী ক্ষেতে মধ্যে মধ্যে নিড়ানি দেওয়া উচিত। ক্ষেতে জল না জমে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখাও আবশ্যক।

পার্ব্বত্যপ্রদেশে কপি চারা ক্ষেত্রে বসান হইতেছে। পূজার পূর্ব্বেই পার্ব্বত্যপ্রদেশ হইতে কলিকাতায় কপি, কড়াই শুঁটী প্রভৃতি আমদানি হয়।

এই সময় পার্ব্বত্যপ্রদেশে সূর্য্যমুখী, জিনিয়া, কক্সকোম্ব, কেপ গাঁদা, দোপাটী প্রভৃতি ফুল বীজ বপন করা হইতেছে।

REGISTERED No. C 192.

কৃষক

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসনের মুখপত্র

আষাঢ়, ১৩১৬।

REGISTERED No C. 192.

কৃষক।



কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

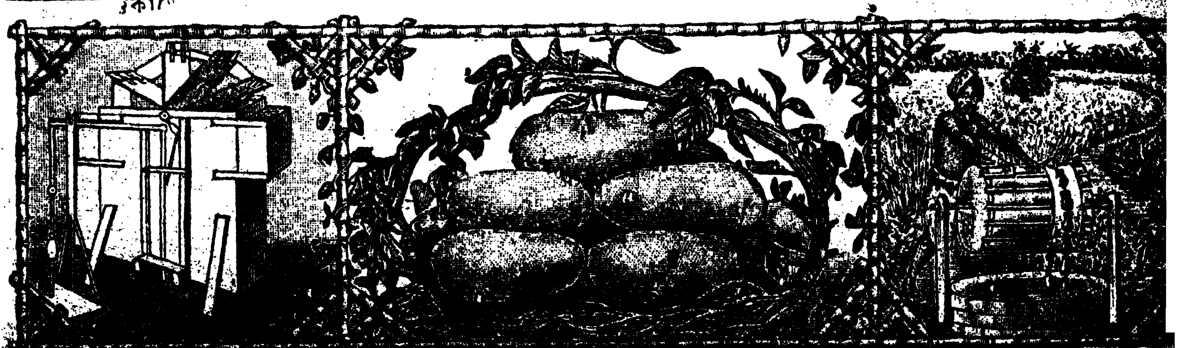
দশম খণ্ড,—৩য় সংখ্যা।

সম্পাদক—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস্।

আষাঢ়, ১৩১৬।

কলিকাতা ; ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে
শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা ; ১৯৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, দি মিলার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
এস, এইচ, রহমান দ্বারা মুদ্রিত।



কৃষক

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১০ম খণ্ড। | আষাঢ়, ১৩১৬ সাল। | ৩য় সংখ্যা।

পাট বা নালিতা।

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত, এম,আর,এ,সি, লিখিত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

১৩। শস্যের খাদ্য।

এস্থলে শস্যপর্য্যায়ের মূল তত্ত্বটী কিঞ্চিৎ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। জীবিত উদ্ভিদ-দেহের রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা পাওয়া যায় যে ১২ কি ১৪টি মৌলিক পদার্থ * (chemical elements) দ্বারাই উদ্ভিদ দেহ গঠিত হয়। তাহারই মধ্যে অঙ্গারজান সম্পূর্ণ এবং অম্লজান, জলজান ও সোরাজান কিঞ্চিৎ পরিমাণে উদ্ভিদেরা বায়ু হইতে গ্রহণ করে। আবার মৃত্তিকার রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা পাওয়া যায়—উদ্ভিদ-দেহের পোষণের জন্য প্রয়োজনীয় ঐ ১২।১৪টি মৌলিক পদার্থ সকলই মৃত্তিকাতে নিয়ত বর্ত্তমান। উদ্ভিদ সকল স্ব স্ব প্রয়োজনানুসারে যে পদার্থ যাহার যে, পরিমাণ প্রয়োজন তাহা দ্রব অবস্থায় মাটী হইতে রসের সঙ্গে আকর্ষণ করিয়া গ্রহণ করে। এজন্য যদিও সামান্যতঃ বলা যায় যে উদ্ভিদ সকলের খাদ্য বস্তু এক, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদের ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে সেই খাদ্যের প্রয়োজন। এই কারণে একই মাটীতে প্রতি বৎসর একই প্রকার শস্য চাষ করিলে, কোন কোন খাদ্য বিশেষের অভাব হইয়া সেই জমি কিছু দিন পরেই অনুর্ব্বরা হইয়া পড়ে। দৃষ্টান্তস্থলে বলা যায় পাট কি ধান একই জমিতে প্রতি বৎসর বিনা ফাসে চাষ করিলে, সত্বরই তাহাতে সোরাজান খাদ্যের অভাব হইয়া আর ভাল ফসল হয় না। আবার তাহার স্থলে অড়হর কি শন পাট চাষ করিতে পারিলে সেই জমিতে সোরাজান সঞ্চিত হইয়া জমির অনুর্ব্বরতা দোষ দূর হয়। এইরূপ একই জমিতে বার বার বিনা ফাসে আলু কি তামাক চাষ করিলে সত্বরই সে জমিতে ফসফরিক এসিড্ (অস্থিসার) ও পটাসের (পাংশুসার) অভাব হইয়া জমি অনুর্ব্বরা হইয়া পড়ে। এবং একই জমিতে বার বার শন পাট কি অড়হর চাষ করিলে সেই জমিতে চূণ এবং পটাসের (পাংশুসার)

* The more or less essential elements of the plant body are 6 metals : K, Na, Ca, Mg, Fe and Mn and 8 non-metals : H, O, N, C, S, P, Si and Ch.

অভাব হইয়া জমি অনুর্ব্বরা হয়। পরীক্ষা দ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে যে সাধারণতঃ উদ্ভিদের ভূমিগ্রাহ্য খাদ্য সকলের মধ্যে সোরাজান. ফস-ফরিক (অস্থিসার) এবং পটাস (প্যাংশুসার) ভিন্ন আর প্রায় সকলই মাটীতে প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান। এজন্য প্রধানতঃ ভূমিতে এই সকলেরই অভাব ঘটিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন চূণ, লৌহকি মেগ্নিসিয়ারও অভাব ঘটিয়া কদাচিৎ জমি অনুর্ব্বরা হইতে দেখা যায়। আবার শস্যের আহারীয় দ্রব্য অনেক সময় ভূমিতে এইরূপ রাসায়নিকযোগে বর্ত্তমান থাকে যে তাহারা রূপান্তরিত হইয়া সহজপাচ্য অবস্থা প্রাপ্ত না হইলে, শস্য তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। এই সকল নানা কারণে কেবল একশ্রেণীর খাদ্যগ্রাহী একই জাতীয় শস্য প্রতি বৎসর এক জমিতে চাষ করিলে সেই শস্যের উপযোগী খাদ্য, যথা—পাটের বা ধানের পক্ষে সোরাজান—অত্যন্ত কমিয়া গিয়া সেই জমিতে আর সেই শস্যের চাষ চলে না, অথচ সেই জমিতেই তখন অন্য শস্য দিলে,—যথা পাটের জমিতে পাটের পরিবর্ত্তে অড়হর কি শন পাট—এই শেষোক্ত শস্যের প্রয়োজনীয় খাদ্য জমিতে প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান থাকাতে তাহার খুব ভাল ফসল হয়।

১৪। সোরাজান সংগ্রাহক ও সোরাজান অপচায়ক শস্য।

আবার অড়হর, শন, মটর, কলাই, খেসারী প্রভৃতি (papillionacæ) গাছের বায়ু হইতে সোরাজান সংগ্রহ করিবার বিশেষ শক্তি আছে যাহা অপর কোন জাতীয় উদ্ভিদেরই নাই। অড়হর প্রভৃতির শিকড়ে ছোট ছোট ডিম্বাকৃতি গুটলির মত দৃষ্ট হয়। তাহা পিসিয়া রস লইয়া অনুবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে তাহার মধ্যে লম্বাকৃতি অতি ক্ষুদ্র একপ্রকার উদ্ভিদাণু বা বীজাণু (Bacteria) বর্ত্তমান। এই সকল উদ্ভিদাণু বা বীজাণু বায়ুস্থিত সোরাজান গ্রহণ করিয়া তাহা মাটিতে সঞ্চয় করে। এই সোরাজানই উদ্ভিদ এবং প্রাণিগণের খাদ্যের অতি মূল্যবান অংশ, এবং ইহা বায়ুতে প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান থাকিলেও এই বীজাণু ভিন্ন প্রাণী বা উদ্ভিদজগতে কাহারও তাহা সাক্ষাৎভাবে বায়ু হইতে গ্রহণ করিবার শক্তি নাই। এই কারণে শস্য সকলকে দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা হয়, (১) সোরাজান সংগ্রাহক যথা—অড়হর, শন, মটর প্রভৃতি (papillionacæ) এবং (২) সোরাজান অপচায়ক যথা—নালিতা, ধান, ইক্ষু, আলু প্রভৃতি অপরাপর জাতীয় শস্য—যাহারা বায়ুস্থিত সোরাজান গ্রহণ বা সঞ্চয় করিতে অক্ষম, এবং কেবল মাত্র ভূমিস্থিত সোরাজান গ্রহণ করিয়া তাহার অপচয় করে। একথা বলা আবশ্যক যে শস্যের যে অংশ বিক্রী হইয়া স্থানান্তরিত হয়, তাহা বাদে বাকি অংশ যদি সমস্ত ফাসরূপে ঐ জমিতে ব্যবহৃত হয় তবে শস্যখাদ্যের অপচয় খুব কমিয়া যায়। পাটের পণ্য আঁস মাত্র রাখিয়া যদি পত্র, যোলা ইত্যাদি সমস্ত মাটির নীচে কিছুদিন রাখিয়া পচাইয়া তাহা ফাসরূপে এই পাটের জমিতে ব্যবহার করা হয়, তবে তাহার মাটির উৎপাদিকা শক্তি হ্রাসের কারণ অনেক পরিমাণে দূর হয়।

১৫। শস্যমিশ্রণ ও জমি 'খিল' রাখিবার প্রথা।

মাটিস্থিত শস্যখাদ্যের অপচয় কমাইবার জন্য দেশ বিদেশে কৃষকেরা নানা প্রকার উপায়াবলম্বন করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে আমাদের দেশীয় কৃষকেরা যে অনভিজ্ঞ নন তাহা ডাক্তার বলকার (Dr. Voelcker) তাঁহার লিখিত রিপোর্টে ভারতের নানা দেশ হইতে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া

বেশ দেখাইয়াছেন। মাটি এবং জলবায়ুর উপযোগিতা অনুসারে আমাদের দেশে নানা প্রকার শস্যমিশ্রণ প্রথা প্রচলিত। বুদ্ধিমানের মত শস্যমিশ্রণ করিয়া বপন করিলেও শস্যপর্য্যায়েরই কার্য্য করে। পঞ্জাবে অনেক সময় গমের সহিত বুট মিশ্রিত করিয়া বপন করা হয়, উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে যবের সহিত মটর, বোম্বাই প্রদেশে সুরাটে ধান্যের সহিত অড়হর মিশ্রিত করিয়া বপন করা হয়। বাঙ্গালী কৃষকও বোধ হয় তাহাদের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চ জমিতে আউসি পাটের সঙ্গে অড়হর মিশ্রিত করিয়া বপন করিলে, ভাল ফল পাইতে পারে। এ সকলই উৎকৃষ্ট শস্য পর্য্যায়ের কার্য্য করে। আমরা বরিশাল প্রভৃতি স্থানে দেখিয়াছি আমন ধান পাকিবার কিঞ্চিৎপূর্ব্বে জমি কাদা অবস্থায় থাকিতেই কৃষকেরা ধান গাছের মধ্যেই খেসারি কি কলাই বুনিয়া দেয়। এতদ্ভিন্ন সাধারণতঃই আমাদের দেশে পাট বা ধানের পর নানাবিধ ডাইলের চাষ হয়। এ সকলই উৎকৃষ্ট শস্য পর্য্যায়ের কার্য্য করে। এই প্রথা অবলম্বন করিলে একই জমিতে প্রতি বৎসর পাট বা ধান করিলেও শস্যখাদ্যের অপচয় হইয়া জমি অনুর্ব্বরা হইবার আশঙ্কা কতক কমিয়া যায়। বৎসর বৎসর একই জমিতে পাট কি ধান করিলে জমি অনুর্ব্বরা হইবার আশঙ্কা দূর করিবার আমাদের দেশে আর একটি অতি প্রাচীন প্রথা ছিলঃ—৮।১০ বৎসর একই জমিতে ধান বা পাট চাষ করিয়া যখন কৃষক দেখে যে জমিতে ভাল ফসল হইতেছেনা তখনই সে ঐ জমি ২।৩ বৎসর বিনা চাষে 'খিল' (fallow) ফেলিয়া রাখে। ৪০ বৎসর পূর্ব্বের কথা আমরা বলিতে পারি দেশে গরু চরাইবার বা ছেলেদের খেলিবার স্থানের কোন অভাব ছিল না—কারণ প্রত্যেক কৃষকেরই কিছু কিছু জমি প্রতি বৎসর খিল পড়িয়া থাকিত। তখন সকলের ঘরেই অনেক গাই গরুও থাকিত। জমি 'খিল' ফেলিয়া রাখাতে যদিও শস্যের হিসাবে সামান্য ক্ষতি হইত, তাহার পরিবর্ত্তে তাহারা প্রচুর দুধ খাইতে পাইত। এখন আর সে দিন নাই। জনসাধারণের গরু চরাইবার জন্য অতি প্রাচীন কাল হইতে যে সকল জমি নিয়ত পতিত থাকিত—(গয়ের মজুরুয়া) খাজনার লোভে মালিকেরা তাহা আত্মসাৎ করিয়াছে। এমন কি পূর্ব্বে পাড়াগাঁয়ে সর্ব্বত্র প্রশস্ত গোবাট ছিল তাহাতেও গরু চরিতে পাইত। সেই সকল সাধারণের গোবাটেরও অধিকাংশই মালিকের কবলিত হইয়া গোবাট সকল সংকীর্ণ হইয়া গিয়া, গরুর খাদ্যাভাব ঘটিয়াছে। এখন দেশে আছে কেবল গোরক্ষিণী সভা আর গরুর দুঃখের মায়া কান্না রিপোর্ট। পাড়াগাঁয়েও গোপালনের পথ বন্ধ হইয়াছে। যাহা হউক যদি এখনও কৃষকেরা শস্যের খাদ্য সঞ্চয়ের জন্য পূর্ব্বকালের মত প্রতি বৎসর কিছু কিছু জমি 'খিল' রাখিয়া তাহাতে গাই গরু চরাইয়া দুধ বিক্রি করে, তবেও তাহারা মোটের উপরে এখন অপেক্ষা অনেক কম পরিশ্রমে অনেক বেশী লাভবান্ হইতে পারে। জমি মাঝে মাঝে 'খিল' রাখাই জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিবার নৈসর্গিক উপায়। ইহাকেও এক প্রকার নৈসর্গিক শস্য পর্য্যায় বলা যাইতে পারে।

১৬। শস্য পর্য্যায়ের আলোচ্য অপরাপর বিষয়।

শস্য পর্য্যায় স্থির করিবার সময় আরও কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করা কর্ত্তব্য—যথা (১) কতকগুলি শস্যের, যথা, পাট, অড়হর ইত্যাদির—এক একটি দীর্ঘ মূল শিকড় (tap root) থাকে। তাহা

মাটির নিম্নস্তরে গিয়া শাখা শিকড় বিস্তার করিয়া নিম্নস্তর হইতেই খাদ্য সংগ্রহ করে এবং মাটির উপরের স্তরের সঞ্চিত খাদ্যের বিশেষ কোন অপচয় করে না। (২) আবার কতকগুলি শস্যের মূল শিকড় থাকে না, যথা—ধান, যব, ইত্যাদি। ইহারা মাটির উপরের স্তর হইতেই খাদ্য সংগ্রহ করে নিম্নস্তরের সঞ্চিত খাদ্যের বিশেষ অপচয় করে না। এজন্য এই দুইশ্রেণী পরস্পরের সহিত শস্য পর্য্যায়ে কিম্বা শস্য মিশ্রণে ব্যবহৃত হইবার বিশেষ উপযোগী। আবার কতকগুলি শস্য অতি অল্প সময়েই পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয় যথা মাকৈ, আউসি পাট, সরিষা, মুগ ইত্যাদি। অন্য গুলি পূর্ণ বিকাশ লাভ করিতে অনেক সময় লাগে যথা অরহর, আমনি পাট ও ধান, কাপাস ইত্যাদি। এরূপ দুই শ্রেণীর একটি সোরাজান সংগ্রাহক যথা অড়হর এবং আর একটি সোরাজান অপচায়ক যথা মাকৈ বাছিয়া মিশ্রিত করিয়া বপন করিলে শস্য পর্য্যায়ের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় অথচ দুইটী ফসল একত্রে পাওয়া যায়। মাকৈ মাটির উপরের স্তরে খাদ্য গ্রহণ করিয়া তাড়াতাড়ি বিকাশ প্রাপ্ত হয় এবং অড়হর চারা থাকিতেই মাকৈ কাটিবার যোগ্য হয়। অড়হর আস্তে আস্তে বর্দ্ধিত হইয়া নিম্নস্তর হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে এবং যখন গাছ বড় হয় তখন মাকৈ উঠিয়া যাওয়াতে তাহার বিকাশেরও কোন বাধা হয় না। আরও একটি কথা এই কতকগুলি শস্য জমিতে তাহাদের নাড়া, গোড়া এবং শিকড় প্রভৃতি (stubble) রাখিয়া যায়। এই সকল পচিয়া জমির জল (humus) ধারণ করিবার শক্তি বৃদ্ধি ও অন্য নানাপ্রকার উপকার সাধন করে। কতকগুলি শস্য জমি আগাছাশূন্য করিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী যথা আলু, কপি, পেঁয়াজ ইত্যাদি। শেষ কথা এই, ভিন্ন জাতীয় শস্যের শত্রু পোকা, মাকড় এবং ছাতাধরা রোগ প্রভৃতিও নানাপ্রকার। শস্য পর্য্যায় অবলম্বন করিলে ইহাদের আক্রমণও অনেক কমিয়া যায়।

১৭।. পাটের শস্য পর্য্যায়ের দৃষ্টান্ত।

উল্লিখিত সমস্ত কথা স্মরণ রাখিয়া, পাটের চাষা আপনার এবং জমির অবস্থার উপযোগিতা বুঝিয়া পাটের সহিত পর্য্যায়ে অন্য চাষ করিবে। যদি আশু অন্নের অভাব দ্বারা বাধ্য না হয় তবে একই জমিতে পাটের সহিত পর্য্যায়ে ধান চাষ না করাই ভাল। কারণ পাট এবং ধান উভয়ই সোরাজানের অপচায়ক, এবং ধান পাট অপেক্ষাও অধিক অপচায়ক। অনেক কৃষক পাটের পর্য্যায়ে ধান চাষ করিয়া দেখিয়াছেন যে ইহার ফলে ৩।৪ বৎসর পরই পাটও ভাল হয় না, ধানও ভাল হয় না। এমন কি তাঁহারা ধানের পর পাট করা অপেক্ষা একই জমিতে প্রতি বৎসর পাট করিয়া, কি পাটের পর আলু চাষ করিয়া ভাল ফল পাইয়াছেন। ধান অপেক্ষা শনই নালিতার সহিত পর্য্যায়ে চাষ করিবার পক্ষে অনেক বেশী উপযোগী। আমাদের অনেক দেশীয় কৃষক শন পাটের জমি উর্ব্বরা রাখিবার শক্তির কথা অবগত আছেন। জমির উপযোগিতা অনুসারে নালিতার পর্য্যায়ে শন কিম্বা অড়হর চাষ করাই উৎকৃষ্ট। যাহারা পাটের পর ধান কিম্বা পাটের পর পাট লইতে বাধ্য হন এবং বসুমাতাকে ২।৪ মাসও বিশ্রাম দিতে অক্ষম, তাঁহারা ধান কি পাট উঠিয়া গেলে মাঝখানে এক ফসল খেসারি, মুশুরি, বুট কি অন্য কোন সোরাজান সংগ্রাহক ডাইল শস্য গ্রহণ করিলে, জমির উর্ব্বরতা কিঞ্চিৎ পরিমাণে রক্ষা হইবে, এবং কৃষকের লাভও অপেক্ষাকৃত বেশী হইবে। উপযুক্ত পরিমাণ ফাস ব্যবহার করিতে পারিলে উচ্চ জমিতে পাটের পর

আলু কি তামাকও লওয়া যায়। আমরা কৃষকের সাহায্যের জন্য পাটের শস্য পর্য্যায়ের কয়েকটি নমুনা দিতেছি।

বৎসর	(ক) অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমি।		(খ) বাস্তু ভূমি।		(গ) অপেক্ষাকৃত নিম্ন ভূমি	
	*খরিফ বা বর্ষা শস্য	*রবি বা বসন্ত শস্য	খরিফ	রবি	খরিফ	রবি
প্রথম	—অড়হর— (বর্ষব্যাপী)		নালিতা	মুগ	নালিতাপাট	সরিষা
দ্বিতীয়	নালিতা	মুগ	—ইক্ষু— (বর্ষব্যাপী)		শনপাট	তিল
তৃতীয়	ধান	আলু	—অড়হর— (বর্ষব্যাপী)		নালিতা	কলাই
চতুর্থ	শন	তামাক	নালিতা	আলু	ধান	খেসারি

১৮। পাটের ফাস।

পাটের ফাস সম্বন্ধে অনেকে অনেক ব্যবস্থা করেন। কেহ বলেন বিঘা প্রতি ৫০/ মণ করিয়া গোবর ফাস দেও, কেহ বলেন ২/ মণ করিয়া বিঘা প্রতি খৈল দেও, কেহ বলেন বিঘা প্রতি ৩/ মণ করিয়া অস্থিচূর্ণ দেও, অথবা বিঘা প্রতি ১/ মণ করিয়া সোরা দেও। "লাগে কড়ি দিবে গৌরী সেন"—যিনি ব্যবস্থা করেন তাঁর ত আর ঘরের পয়সা যাবে না—তবে ব্যবস্থা দিতে ভয় কি? পরীক্ষা করিয়াও ত দেখা হইবে। আর পরের খরচে ব্যবস্থা দাতারও ত একটু কৃতিত্ব দেখান হবে। হায়, হায়, গৌরীসেনের ঘরে টাকা নাই। শতকরা ৬০৲।৭০৲ টাকা বার্ষিক হারে কর্জ্জ করিয়া আমাদের এই গৌরীসেন গরিব কৃষককে পাটের চাষ চালাইতে হয়, তাতে আবার দেখা যায় সরকারী কৃষিক্ষেত্রে পরীক্ষার ফলও তত নিশ্চিত বা আশাপ্রদ নয়।—কখনও বা দেখা যায় বিঘা প্রতি ২০৲।২৫৲ টাকার ফাস খরচা করিয়া সরকারী কৃষিক্ষেত্রে যে ফসল পাওয়া গিয়াছে, ঐ জমির পার্শ্বেই বিনা ফাসে সেই বৎসরই তদপেক্ষা অধিক পাওয়া গিয়াছে। আমাদের বাঙ্গাল দেশী কথায় বলে "নৈরা চৈরা বার, ঘরে বৈসা তের।" কৃষককে এ অবস্থায় একটী পরামর্শ দিতে আমরা সাহসী হইতেছি। টাকা কর্জ্জ করিয়া কখনও ফাস প্রয়োগ করিও না; ফাস পয়সা দিয়া ক্রয় করিয়া প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে পাঁচ বার ভাবিয়া করিবে। সরকারী কৃষিক্ষেত্রের পরীক্ষার উপরে নির্ভর করা যায় না, কারণ অধিকাংশ ফাস এক বৎসর প্রয়োগ করিলে ৫।৭ বৎসর ব্যাপিয়া তাহার কার্য্য হয়। গোবর সার এক বৎসর প্রয়োগ করিলে ৫ বৎসর পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া তাহার কার্য্য হয়। অস্থিচূর্ণ ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কার্য্য করে। সরকারী কৃষিক্ষেত্রে আমরা যতদূর জানি বৎসর বৎসর একই জমিতে ভিন্ন ভিন্ন সার প্রয়োগ করিয়া পরীক্ষা করা হয়। এবং তাহা হইতেই প্রতি বৎসরের প্রয়োগ ফল পৃথকভাবে গণনা করা হয়। বিশেষতঃ কৃষির ফলে যাহাদের নিজের কোন লাভ লোকসান নাই তাহাদের কথার উপরে বিনা পরীক্ষায় কৃষকের পক্ষে নির্ভর করা সঙ্গত হইবে না। যতদিন না কৃষিক্ষেত্রের উপরে আমাদের কৃষকসমাজ কতকটা তত্ত্বাবধানের এবং সঞ্চালনের অধিকার লাভ করিতেছেন এবং সরকারী কৃষিক্ষেত্রের ফল কৃষকেরা নিজে পরীক্ষা করিয়া আপনাপন মত প্রকাশ করিতেছেন ততদিন বৈজ্ঞানিক কৃষকের "আলেয়ার আলোর" পশ্চাতে ধাবিত হইলে কৃষককে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। বাস্তব কোন্ জমিতে কোন্ সার

* শস্য পর্য্যায় স্থির করিবার সময় মনে রাখা আবশ্যক যে শস্য চারি প্রকার—রবি বা বসন্ত কালের যথা—আলু, মুগ, মূলা ইত্যাদি (২) খরিফ বা বর্ষাশস্য যথা—পাট, ধান ইত্যাদি (৩) রবি খরিফ উভয় যথা—ধান, কলাই, তিল ইত্যাদি (৪) বর্ষব্যাপী যথা—আক, অড়হর, কাপাস ইত্যাদি।

কি পরিমাণে দিতে হইবে—তাহা ঐ জমিতে কোন্ সার কি পরিমাণে আছে না জানিলে ঠিক হয় না। তাহা মাটীর রাসায়নিক বিশ্লেষণ (chemical analysis) দ্বারাও ভালরূপ ঠিক হইতে পারে কিনা সংশয়। কারণ রাসায়নিক বিশ্লেষণে মাটিতে কি কি বস্তু আছে তাহাই মাত্র বলিতে পারে কিন্তু কোন্ শস্যের গ্রহণ যোগ্য অবস্থায় কি পরিমাণ আছে, ইহা বলা অসম্ভব। শস্য সকলের খাদ্য-গ্রহণ শক্তি মানুষ ও পশ্বাদির হজম শক্তির ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন। এক ফসল যে রাসায়নিক অবস্থা থাকিলে যে খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে, অন্য শস্য সেই খাদ্য সেই রাসায়নিক অবস্থায় থাকিলে গ্রহণ করিতে পারে কিনা সংশয়। মোটামুটী বলা যায় যে কৃষক নিজ জমিতে প্রয়োগ দ্বারা পরীক্ষা না করিয়া কোন্ শস্যের জন্য কোন্ সার কি পরিমাণ প্রয়োগ করিতে হইবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিতে পারে না। অন্ধকারে ফাসের নামে পয়সার শ্রাদ্ধ করা গরিব কৃষকের পোষাইবে না। বিনা পয়সা খরচে শুধু বুদ্ধি খাটাইয়া এবং গায়ের খাটুনি দ্বারা কৃষক যতদূর করিতে পারে ততদূরই করিবে। নিজের কি আত্মীয়ের গোয়ালের গোবর ও গোমূত্র যত্নের সহিত সঞ্চিত করিয়া ৪।৫ মাস পচাইয়া পাটের জমিতে যে পরিমাণে পারে সার দিবে, বিঘাতে ৪০।৫০ মণের অধিক দিবার প্রয়োজন নাই। আবার পাট উঠিয়া গেলে রবি শস্যের অর্থাৎ আলু, কলাই, সরিষা প্রভৃতির চাষের সময় আপনার এবং আত্মীয়ের চুলার ছাইটা যত্নের সহিত সঞ্চিত করিয়া প্রয়োগ করিবে। বিঘাপ্রতি ২ মণ পরিমাণে ছাই হইলেই যথেষ্ট। তদ্ভিন্ন নিজের বাড়ীতে গর্ত্ত করিয়া বাড়ীর যতপ্রকার আবর্জ্জনা হয় পত্র, তৃণ, লতা, খাল, পুকুরের পানা, দল ঘাস, মাছের আঁইস, গরু, ঘোড়া বা বিড়াল, কুকুরের মৃতদেহ ইত্যাদি যাহা কিছু হয়, ছয় মাস পর্য্যন্ত মাটির নীচে রাখিয়া পচাইয়া পাট চাষের সময় সাররূপে বিঘাপ্রতি ২০।২৫ মণ ব্যবহার করিবে। ইহা ধান ও পাটের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট ফাসের কার্য্য করিবে। এক বৎসর ফাস ব্যবহার করিলে ৪।৫ বৎসর কার্য্য করে। এজন্য কম কম করিয়া প্রতি বৎসর কিছু কিছু দিলে কোন ক্ষতি হইবে না। কৃষক যদি আপনার ভ্রান্ত সংস্কারকে জয় করিতে পারে, তবে বিনা খরচে অতি উৎকৃষ্ট ফাস সর্ব্বদাই পাইতে পারে এবং দেশের অস্বাস্থ্যের কারণ নিবারণ করিয়া লোকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইতে পারে। তবে সেদিন এখনও দূরে। মোটামুটী বলা যায়, মনুষ্য, পশু পক্ষীরা যে যাহা খায় তাহার মূল্যবান পদার্থের ষোল আনার প্রায় বার আনাই তাহাদের মূত্র পুরীষের সঙ্গে বাহির হইয়া যায়। এগুলি বিধিমত রক্ষা করিয়া প্রয়োগ করিলে বিনা খরচে উৎকৃষ্ট ফাসের কার্য্য করে, এবং দেশেরও অস্বাস্থ্য নিবারণ হয়। বিনা ব্যয়ে পাটের ফাস দেওয়ার আর একটি উপায় আছে তাহা অবলম্বন করা কৃষকের পক্ষে অতি সহজ। চারা গাছে উৎকৃষ্ট ফাস হয় (Green manure)। সরিষা, কলাই, খেসারি, শণ, ধৈঞ্চা (ধুনকী) প্রভৃতি অতি তাড়াতাড়ি বর্দ্ধিত হয়। পাটের প্রথম কি দ্বিতীয় চাষ দিবার সময় এই সকলের কোনটার বীজ ছড়াইয়া দিয়া ফুল ধরিবার পূর্ব্বে গাছ নরম থাকিতে থাকিতে যদি আবার চাষ দিয়া এগুলি মাটির নীচে ফেলিয়া দেওয়া হয়, তবে এক মাস মধ্যেই এগুলি পচিয়া অতি উৎকৃষ্ট ফাসের কার্য্য করে। বিঘা প্রতি এই সঙ্গে ২।১ মণ চূণ বর্ষারম্ভের ২।৩ মাস পূর্ব্বে ছড়াইয়া দিতে পারিলে এগুলি আরও শীঘ্র শীঘ্র পচিয়া মাটির সঙ্গে মিশিয়া উৎকৃষ্ট ফাসের কার্য্য করে। সকল ফাসের উপরে জেথ্রো টালের (Gethro Tull) চাষই

ফাস' (Tillage is manure), পাট সম্বন্ধে কৃষক একথা কখনও ভুলিবেন না। যাঁহারা খৈল ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ক্ষেত্রে খৈল ব্যবহার না করিয়া দুগ্ধবতী গাভী কিম্বা হালের বলদকে সরিষা প্রভৃতির খৈল খাওয়াইয়া তাহার গোবরই ফাসরূপে ব্যবহার করিবেন। কারণ খৈলের ফাস অংশের যোল আনার প্রায় বার আনাই সেই গোবরে পাওয়া যাইবে, এবং একই খরচে কৃষক দুই দিক দিয়াই লাভবান হইবে। জমি বিশেষে অস্থিচূর্ণও পাটের ফাসরূপে ব্যবহার হইতে পারে। কিন্তু ক্রয় করিয়া এই ফাস ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে কৃষক ২।৪ গণ্ডা জমির মধ্যে পরীক্ষা করিয়া যদি লাভবান্ হয় তবেই ব্যবহার করিবে—কারণ কোন্ জমিতে ইহা প্রয়োজন, সেই জমিতে পরীক্ষা ভিন্ন স্থির হইতে পারে না। গোবর ও চারা গাছের সারকে সাধারণ সার (General manure) বলা যায়—যেহেতু ইহাদের মধ্যে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় প্রায় সকল প্রকার বস্তুই আছে। সকল প্রকার জমিতেই ইহারা উপকারী। কিন্তু অস্থিচূর্ণ, চূণ, সোরা ইত্যাদি বিশেষ সার (Special manure) দ্বারা এক জমিতে উপকার হইলেই যে অন্য জমিতেও উপকার হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। এমন কি উপকার না হইয়া ক্ষতিও হইতে পারে। যেমন আমাদের পক্ষে মাংস এক সময়ে অতি উপকারী খাদ্য হইলেও অবস্থা ভেদে ইহা দ্বারা কোন উপকার না হইয়া অপকারও হইতে পারে। এ সকল বিশেষ সারে পয়সা খরচ করিবার পূর্ব্বে কৃষক নিজের জমির ক্ষুদ্র অংশে অল্প পরিমাণে নিজে ব্যবহার করিয়া সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া কার্য্য না করিলে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইবার আশঙ্কা আছে।

বঙ্গদেশের নিম্নভূমি সকলে পাটের (এবং ধানের) বিশেষতঃ তিতা পাটের জমিতে ফাস' ব্যবহার করিবার সময় আরও একটি গুরুতর কথা স্মরণ রাখিবে। ফাসের যে অংশ গাছের পক্ষে সহজপাচ্য এবং উপকারী—তাহা সহজেই জলে গলিয়া যায় এবং বস্তুতঃ জলের সঙ্গে মিশিয়াই শিকড়দেশ দ্বারা গাছের শরীরে প্রবেশ করিয়া তাহার পুষ্টি সাধন করে। পাট গাছের বিশেষতঃ তিতা পাট গাছের নীচে প্রায় সর্ব্বদাই জল জমা থাকে ও চলাচল করে। ফাসের অতি মূল্যবান অংশ সে জলে মিশিয়া জলের সঙ্গেই জমির বাহিরে চলিয়া যায়। এজন্য অনেক সময় দেখা যায় যে তোমার জমিতে তুমি ফাস দিলে, আমার জমিতে আমি ফাস দিলাম না, কিন্তু আমার জমি হয়ত তোমার নীচে এবং তোমার জমির জল আমার জমির উপর দিয়া চলিয়া যায়। এজন্য ফলের বেলা অনেক সময় দেখা যায় শস্য তোমার জমিতে যত ভাল হউক বা না হউক, তোমার প্রদত্ত ফাসের ফলে আমার জমিতে ফসল তাহা অপেক্ষা অনেক ভাল হইয়াছে। আর যখন জলে সমস্ত মাঠ প্লাবিত হয়, তখন এক জমিতে দেওয়া ফাসের ফল কতক পরিমাণে ঐ মাঠের সমস্ত জমিতে বিস্তৃত হইয়া

যায়। যদিও মাটীর, বিশেষতঃ আটাল মাটির (clay), ফাসের সারাংশ আকর্ষণ করিয়া রাখিবার শক্তি আছে বটে, কিন্তু মাঠময় জল দাঁড়াইলে সে শক্তিকে অভিভূত করিয়া আস্তে আস্তে সে সারাংশ জলে ধুইয়া জলের সঙ্গে অনেকটা চলিয়া যাইবারই সম্ভব। ফাসের অতি মূল্যবান্ ভাগের অধিকাংশই ২।৩ মাস ব্যাপী জলপ্লাবনে এইরূপ ধুইয়া যাইবার সম্ভব। ইহা স্মরণ রাখিয়া কৃষক সর্ব্বদা এরূপ জমিতে অর্থব্যয় করিয়া ফাস প্রয়োগ করিতে সতর্ক হইবে। তবে যত দিন গাছ চারা থাকে এবং জল না দাঁড়ায় ততদিন সেই ফাস সেই জমিতেই থাকিয়া উপকার সাধন করে। আরও একটি কথা আছে। মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা ও অপরাপর নদীর চর ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থান যাহাতে নদীর জল উঠে, সেই জলের সঙ্গে পলিমাটিরূপে অতি মূল্যবান ফাস ঐ সকল জমিতে পড়ে। মেঘনা, ব্রহ্মপুত্রের বর্ষার জলপ্লাবনে পলিরূপে কি পরিমাণ শস্যখাদ্য পাওয়া যায় তাহার পরীক্ষা করা হয় নাই। কিন্তু যমুনা খালের জলে (Upper Eastern Jumna Canal) পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার লেদার তাহার পলিমাটিতে বার্ষিক প্রতি একর পটাস ৫৪·৬ পাউণ্ড, ফস্‌ফরিক ৪২ পাউণ্ড, সোরাজান ৩২·৫ পাউণ্ড পাইয়াছেন। অর্থাৎ বিঘা প্রতি ১৮·২ পাউণ্ড পটাস, ১৪ পাউণ্ড ফস্‌ফরিক, ও ১১ পাউণ্ড সোরাজান পাইয়াছেন। আমাদের গঙ্গা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্রের জলের পলিতেও সেইরূপ আশা করা যায়। ঐ সকল জমিতে নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরিক, কি পটাস ক্রয় করিয়া প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা কোন কৃষকের হিতৈষী দিবে কি না বলিতে পারি না।

খুলনা জেলায় পান চাষ।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখিত।

পর্ণ শব্দের অপর নাম তাম্বুল বা পান। পান হিন্দুর পরমাদরের এবং পবিত্র দ্রব্য মধ্যে গণ্য। হিন্দুর দেব কার্য্যে এবং পিতৃ কার্য্যে ইহা অনাদিকাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। হিন্দুস্থানে ও মুশলমান ভদ্র সমাজে রাজারাজড়ার রাজনৈতীক সভা সমিতিতেও, অধিক কি সর্ব্বোচ্চ রাজ পুরুষ ইংরাজদিগকেও পান ও আতর দিয়া সম্মান করা হয়।

বিগত দুই তিন বৎসর পানের যেরূপ অজন্মা ও মুল্যাধিক্য হইয়াছে তাহাতে নিয়মিত ও অনিয়মিত, অপর্য্যাপ্ত, নিত্য অহোর্নিশ, পানসেবির পক্ষে যে দুর্ব্বিসহ ব্যয় ভার অতিরিক্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। গত বৎসর চৈত্র, বৈশাখ মাসে এ অঞ্চলে তুলসী পত্রের ন্যায় আয়তনের চারিটি মাত্র পান এক পয়সায় বিক্রীত হইয়াছে।

বর্ত্তমান বর্ষের আশ্বিন মাস হইতে বৃষ্টি পতন বিরহিত হওয়ায় পানের বিরল উৎপাদন জন্য এবার এখনই আটটি মাত্র পান পয়সায় বিক্রয় হইতেছে, এজন্য আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস যে এ সময়ে যদি কোন ধনবান ব্যক্তি বিস্তৃত ভাবে পানের চাষ করেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি লাভবান হইবেন। আমাদিগের এই খুলনা জেলার খুলনা সবডিভিজনের এলাকাস্থিত ও যশোহর জেলার অধিকাংশ স্থানের বিস্তর তাম্বুলী ও বারজিবী (বারুই) গণ এই ব্যবসায়ে ও কৃষিতে লক্ষপতী পর্য্যন্ত হইয়া পুত্র, পৌত্রদিগকে রীতিমত শিক্ষা প্রদান পূর্ব্বক B. A., M. A. পাস করিয়াই উকিল, মোক্তার ও হাকিম করিয়া দিয়াছেন এবং এইক্ষণে

উহাঁদিগের অসংখ্য বালকবালিকা উচ্চ ও নিম্ন শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, এই জাতীয় অধিকাংশ লোকই, বিশেষতঃ প্রৌঢ় ও বৃদ্ধগণ, অদ্যাপি স্ব স্ব লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পানের বরজ ও ব্যবসায় ত্যাগ করেন নাই এবং ত্যাগ করিতেও সম্মত নহেন। এস্থলে একথা না বলিলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে এজন্য বলা আবশ্যক যে, যাঁহারা এই ব্যবসায়ে অগাধ ধন সঞ্চয় করিয়া জমিদারি ও তালুক খরিদ করিয়াছেন তাঁহারা ইত্যগ্রে কখনই চারিটি আটটি পান পয়সায় বিক্রয়ের সুযোগ, সুবিধা ও অবসর প্রাপ্ত হয়েন নাই: তাঁহাদিগকে তৎকালে এক পয়সায় এক পোণ, দুই পোণ পান বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। এই পান কলিকাতার বেলিয়াঘাটা, শিয়ালদহ, মুনসীর বাজার ও জানবাজারে ৺ রাসমণী দাসীর বাটীর পার্শ্বে এবং জানবাজারে যশুরে পান নামে অভিহিত হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিতে হইত এবং যখন পূর্ব্বকালে পানের বাজার নিরতিশয় মহার্ঘ হইত তখনও দশ গণ্ডার কমে কখনই আমাদিগকে ক্রয় করিতে হয় নাই। অপিচ যে সময়ে মেদিনীপুর মণ্ডলঘাট ও রংপুরের পান এবং দেশী পান পয়সায় পাঁচ গণ্ডা চারি গণ্ডা বিক্রীত হইত সে সময়েও যশুরে নামে খ্যাত এই দেশী পান অন্যুন দশ গণ্ডা পয়সায় ক্রয় করিতে পাওয়া যাইত এবং এই রূপ সুলভমূল্যে বিক্রয় করিয়াও ক্ষেত্রাধিপতি ও ব্যবসায়ীগণ বহুধনের অধিপতি হইয়াছেন। সুতরাং এইক্ষণে এই চারিটির বাজারে পানের কৃষিতে কোন প্রকারে ক্ষতির আশঙ্কা নাই, একথা দৈববাণীর ন্যায় আমরা ভবিষ্যতের জন্য আশা দিতে পারি।

এক্ষণে আমরা শব্দকল্পদ্রুমে পান সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিব। 'বসুমতী' প্রেস হইতে মুদ্রিত সংস্করণের চতুর্থ কাণ্ড ৬৫১ পৃষ্ঠায় তাম্বুলম্ শব্দ দেখুন, যথা—

তাম্বুলম্ (ক্লী) পর্ণম, পান ইতি ভাষা। অস্য গুণাঃ—কটুত্বম্, তিক্তত্বম্, উষ্ণত্বম্, মধুরত্বম্, ক্ষারত্বম্, কষায়ত্বম্। বাত কৃমি কফ দুঃখ-দোষনাশিত্বম্। কামাগ্নি সন্দীপণত্বম। স্ত্রীসম্ভাষণভূষণত্বম্। ধৃতিবক্ত্রমলাট বোৎসাহকান্তিকারিত্বম্। সুপ্তোত্থিতে ভুক্তে চ শস্তত্বম্। দণ্ডাস্মদৃগ্ গদে ত্যাজ্যত্বম্।

স্বর্গেঽপি দুর্লভত্বঞ্চ ইতি রাজবল্লভ॥ অপিচ, তীক্ষ্ণত্বম্। পীনসকাসনাশিত্বম্। রুচিত্বম্। দাহকারিত্বঞ্চ॥ ইত্যাদি ইত্যাদি—

আমাদিগের আয়ুর্ব্বেদ বৈদ্যক শাস্ত্রেও পানের অপরিসীম মহিমা দৃষ্ট হয়। অনেক রোগে কবিরাজ মহাশয়গণ ঔষধের অনুপানে, মুশড়ায় ও মুষ্টিযোগে পানের রস ও মধু ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ স্বল্প ও মহালক্ষ্মী বিলাস ও মকরধ্বজ ঔষধি সহ এবং জ্বর বিকার ও শ্লেষ্মারোগে পানের রস সর্ব্বদাই ব্যবহার করেন। তদ্ভিন্ন পর্ণলতা ও পর্ণমূলও সর্ব্বথা আদর প্রাপ্ত ও ঔষধার্থ ব্যবহার হইয়া থাকে।

পান নানাজাতীয় ও বিভিন্ন প্রকৃতির এবং ইহার আস্বাদও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। তন্মধ্যে আমাদিগের ভাগ্যে যে কয় প্রকারের আস্বাদন গ্রহণ ঘটিয়াছে তাহা নিম্নে বলা যাইতেছে, যথা:—

মিঠাপান, ছাঁচিপান, দেশীপান, রংপুরে পান, যশুরে পান ও গাছপান।

মিঠাপান একটু শাদা রঙ্গের, অতি সুমিষ্ট, লালাবর্দ্ধক ও চর্ব্বণে মুখ সরস হয়; একটু সুগন্ধ আছে, মধ্যমাকারের গঠন এবং একটু অধিক পুরু, ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পান, মূল্যও অধিক। ইহার জন্মস্থান মেদিনীপুর অঞ্চলে এবং বেহার ও যুক্ত প্রদেশ বা যে দেশকে ইউনাইটেড্ প্রভিন্স কহে।

ছাঁচি পান—ইহাও চর্ব্বণে উত্তম, সুগন্ধযুক্ত অনুভব হয়, কিন্তু আকারে ও বর্ণে সাধারণ পানের ন্যায়। পার্থক্যের মধ্যে পত্রের নিম্ন পৃষ্ঠে সূক্ষ্ম, কাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা বা শিরা পরিদৃষ্ট হয়। ইহাতে মুখের সরসতা বর্দ্ধিত করে, কিন্তু চর্ব্বণে ওষ্ঠের রক্তরাগ বর্দ্ধিত হয় না।

দেশী পানঃ—কলিকাতার বাজারে সর্ব্বদা যে পান বিক্রয় হয়, উহাকেই দেশী পান কহে। উহার জন্মস্থান বৈদ্যবাটী, হুগলী প্রভৃতি অঞ্চলে; পানও ভাল এবং খদির সহ চর্ব্বণে ওষ্ঠের রক্তরাগ বিবর্দ্ধিত ও মুখ সরস করে।

রংপুরে পান, ক্ষুদ্রায়তন ও অধিক পুরু এবং ভগ্নপ্রবণ, মচমচে—চাপিয়া ধরিলেই ভাঙ্গিয়া যায় ও পাতা প্রায় পুঁই পাতার মত। ঐ পানের আদৌ খিলি হয় না; কিন্তু অন্যান্য অংশ মিঠা পানের ন্যায়। কেবল বর্ণটা সাধারণ পানের মত, ইহার জন্মস্থান রংপুর ও দিনাজপুর প্রভৃতি জেলায়।

যশুরে পান—ইহার জন্মস্থান কপোতাক্ষী নদী, বেত্রবতী (বেতনা) নদী, ভৈরব নদ, মধুমতী নদী, যমুনা নদী ও ইচ্ছামতী নদী প্রভৃতি নদ নদীর তীরভূমি। যশোহর খুলনা এবং চব্বিশ পরগণা জেলার নানা অংশে এবং বিবিধ স্থানে জন্মে। এই পান আকৃতিতে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হয়, কিন্তু অত্যন্ত পাতলা এবং বেশী কাল। সুতরাং ইহাই পানের মধ্যে অপকৃষ্ট। এজন্য বাজারে তত আদরও নাই এবং মূল্য ও কম।

উপরে যে কয় প্রকার পানের কথা বলা হইল, উহারা সকলেই ক্ষেত্রে জন্মে; পানের ক্ষেত্রকে পানের বরজ কহে, কিন্তু বারুইগণ উহাকে বরুই কহে। সম্ভবতঃ বরুই রক্ষক বলিয়াই উহাদিগের জাতীর নাম বারুই হইয়াছে। এই জাতী জল-আচরণীয় এবং সৎশূদ্র মধ্যে গণ্য।

উপরের লিখিত ক্ষেত্রজ পান ব্যতীত আরও এক জাতীয় পান আছে, তাহাকে গাছ পান কহে। এই পানও ছাঁচি পান ও মিঠা পানের ন্যায় উপাদেয়, কিন্তু ভগ্নপ্রবণতা জন্য খিলি ভাল হয় না; হইলেও সবলে অসাবধানে খিলি মানবাঙ্গুলী স্পর্শমাত্র বিচূর্ণিত হইয়া যায়। মিঠা পান হইতে এই পানের আর একটা স্বাতন্ত্রতা এই যে, ইহার বর্ণ কিশলয়ের সদৃশ গাঢ় সবুজবর্ণ। ইহা ক্ষেত্র সমুদ্ভূত নহে; গাছ পানের বল্লরী আম্র, কাঁঠাল প্রভৃতি তরু ও বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি বনস্পতী মূলে অথবা চূণ বালী সংস্পর্শ শূন্য খড়া বাহির করা কঙ্কালসার ইষ্টক প্রাচীর বা অট্টালিকা পার্শ্বে রোপণ করিতে হয়। রোপণের নিয়ম এই যে, প্রকাণ্ডকাণ্ড বৃক্ষের বা প্রাচীরাদির মূলদেশ হইতে দুই আড়াই হস্ত দূরে দীর্ঘ প্রস্থে দুই হাত ও এক হস্ত বা অর্দ্ধ হস্ত গভীর এক একটি খাত করিয়া পৌষ মাঘ মাস মধ্যে ঐ খাত গোবর সারের মাটী ও ছাই দিয়া পূর্ণ করিয়া রাখিবে;

পরে বর্ষার ঘন বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইলে, আষাঢ়ের শেষে বা শ্রাবণ মাস মধ্যে চারা সংগ্রহপূর্ব্বক পূর্ব্ব প্রস্তুত সারপূর্ণ খাতের মধ্যস্থলে উহা রোপণ করিবে এবং যদি দশ পাঁচ দিবস বর্ষণ বন্ধ থাকে তাহা হইলে চারার মূলে জল সিঞ্চন করিবে। বর্ষণকালে নিয়মিত বর্ষণ হইলে জল সেচন নিস্প্রয়োজন। স্বয়মুদ্ভূত পুরাতন লতামূল হইতে যে স্বভাবজ চারা জন্মে, উহা প্রাপ্তি অসম্ভব হইলে লতার অগ্রভাগ অথবা শিকড় সহ লতার মধ্যভাগ ছেদন করিয়া রোপণ করিলেও চলিতে পারে; এই লতার তিন চারি ইঞ্চ অন্তর গ্রন্থি ঐ আছে। প্রতি গ্রন্থির চতুষ্পার্শ্বে শিকড় থাকে; শিকড় সহ লতা মৃত্তিকাভ্যন্তরে রাখিয়া দিলে বেশ সতেজ নূতন চারা বাহির হয়; অথবা পত্র সহ লতার অগ্রভাগ ভূমধ্যে রোপণ করিলেও উহার শিকড় বাহির হইয়া ক্রমে চারা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ডগা বা চারা বসাইয়া দিয়া তাহার মূলে জল সিঞ্চন করিয়া মৃত্তিকার রন্ধ্র অচিরাত বন্ধ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য এবং পরে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে চারার মূলের মৃত্তিকা শুষ্ক হইয়া না যায়। এইরূপে দুই তিন সপ্তাহ অতীত হইলেই নূতন শিকড় উপ্ত ও বর্দ্ধিত হইয়া যখন গাছের পত্রোদ্গম হইয়া গাছ লতাইয়া যাইবে, সেই সময় চারি পাঁচটি কঞ্চি (বংশ শাখা) একত্রে তাড়ি বাঁধিয়া ঐ আঁটিটী চারার মূল দেশ হইতে অবলম্বন-বৃক্ষের বা প্রাচীর গাত্রে হেলাইয়া রাখিয়া, অতি কোমল ধীর হস্তে লতাটি কঞ্চির আটির গাত্রে রাখিয়া তৃণ বা পাট দ্বারা খুব আলগা করিয়া আটি সহ বাঁধিয়া দিবে। এইরূপ বাঁধিয়া দিবার হেতু এই যে বায়ু ভরে আন্দোলিত হইয়া লতাটি মৃত্তিকার উপর ধরণী পৃষ্ঠে পতিত ও নষ্ট হইয়া না যায়: পরে ঐ কঞ্চির সাহায্যে লতা, ক্রমে স্বীয় আশ্রয় তরু অবলম্বন করিয়া, ইন্দুরের নখরবৎ অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিকড় বাহির করিয়া, তরুবরের শুষ্ক ও অর্দ্ধ শুষ্ক বিদীর্ণ ত্বক গাত্রে শিকড় প্রবেশিত করিয়া দিয়া ক্রমে উর্দ্ধে উঠিতে থাকিবে; এবং শেষে তরু শিরে আরোহণ ও তথায় শাখা প্রশাখা বিস্তৃত করিয়া বহু পত্র প্রসব করিবে এবং ঐ পত্রই পর্ণ নামে অভিহিত হইয়া মানবের ব্যবহারে আসিবে। তরু শিরে বহু পত্র উদ্গত হইবে বলিয়া তরু গাত্রাবলম্বী লতা যে একেবারে নিস্পত্র রহিবে এরূপ মনে করার কোন কারণ নাই কিন্তু তরুগাত্রে কিছু বিরল পত্রই লক্ষিত হয়। পত্র উত্তোলনকালে একেবারে এক একটি শাখা নিস্পত্র করিলে চলিবে না, শাখার অগ্রভাগের নূতন পত্রে আদৌ হস্তক্ষেপ করিতে নাই; উহার মূল ও মধ্যদেশে যে সকল সুপক্ক পত্র পাওয়া যাইবে তাহাই উত্তোলন করিতে হইবে। অর্থাৎ পত্র সঞ্চয় কালে দেখিতে হইবে যে উহাতে যেন যথেষ্ট পরিমাণে পান রহিয়া যায়, নচেৎ পত্রাভাবে সমূলে ধ্বংশ হওয়া বিচিত্র নহে। গাছ একবার লাগিয়া গেলে উহার পালন ও পোষণ জন্য যে আর কোন তদ্বির নাই এরূপ বুঝিতে হইবে না। ফলে যত কাল জীবিত থাকিবে তত কালই বৎসরে

দুই একবার লতাটির মূল দেশের তৃণাদি উপাড়িয়া, উহার মূলে সার মাটি ও ছাই পচিয়া যে মাটি হইয়াছে তাহা দিতে হইবে এবং শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে মধ্যে মধ্যে জল সিঞ্চনও করিতে হইবে। বৃহৎ বৃক্ষের তল দেশের মৃত্তিকা প্রায় সর্ব্ব ঋতুতেই শুষ্ক থাকে; বিশেষতঃ শীত ও গ্রীষ্মকালে শুকাইয়া একবারে প্রস্তরকাঠিন্য প্রাপ্ত হয়। অতএব জলাভাবে বল্লরী মৃত্যুমুখে পতিত না হয় সে পক্ষে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রাচীর গাত্রে যে গাছ উঠাইয়া দেওয়া হয় সে গাছ শুষ্কতার হস্তে বহু পরিমাণে নিরাপদ হইলেও তৃণ উৎপাটন ও জল সিঞ্চন অবশ্য কর্ত্তব্য জানিয়া রাখিতে হইবে। গাছপানের লতা একবার লাগিয়া গেলে ও নিয়মিত জল সিঞ্চন ও সার দেওয়া হইলে বহুবর্ষ জীবিত থাকে, এবং ক্রমে গাছ যতই বৃদ্ধ ও বর্দ্ধিত হইয়া শাখা উপশাখায় পরিপূর্ণ হইতে থাকে পান ও সেই রূপ অধিক প্রাপ্ত হওয়া যায়; সুতরাং গৃহস্থের পক্ষে এরূপ বহু স্থায়ী অনায়াস বা স্বল্পায়াস-লব্ধ একটা অতি প্রয়োজনীয় ও নিত্য ব্যবহার্য্য ফসলের পত্তন করা আমরা অতিশয় কর্ত্তব্য বলিয়াই মনে করি। ইহার একটা অসাধারণ গুণ এই যে ইহারা আশ্রয় তরুর কোন অপকার সাধন করে না; কেবল আশ্রয় মাত্র গ্রহণ করে ও শাখা পল্লবের উপর নির্লিপ্তভাবে যেন ভাসিয়া বেড়ায়। সুতরাং বৃক্ষের শাখা পল্লবের বা ফল ফুল প্রসবের কোন ক্ষতিই হয় না; কেবল মাত্র লতার গ্রন্থি সম্ভূত শিকড় নিচয় বৃক্ষ কাণ্ডের পরিত্যক্ত, প্রায় জীর্ণ বিদীর্ণ ত্বকসন্ধি এরূপ দৃঢ় ভাবে ধারণ করে যে, বায়ুভরে আন্দোলিত বা অন্য প্রকারে আঘাত প্রাপ্ত হইলেও সহসা স্থানচ্যুত কি বিপন্ন ও ধরাশায়ী হয় না।



আষাঢ়—১৩১৬।

বাংলার মাটী।

বঙ্গের অমর-কবি রবীন্দ্রনাথের মর্ম্মস্পর্শী গানের সঞ্জীবনী শক্তিতে অনেকেরই হৃদয়ে বাংলার মাটি ও বাংলার জলের প্রতি সুষুপ্ত শ্রদ্ধা ও প্রীতি জাগরিত হইয়াছে। কবির বাঁশরী ঝঙ্কারে বঙ্গদেশ চিরকালই মুখরিত এবং সমাজের ক্রমোন্নতির জন্য যেটুকু কবিতা আবশ্যক বাংলায় সেটুকুর কখনই অভাব হয় নাই। সমাজের বিবর্ত্তনের জন্য বিজ্ঞানের ন্যায় কবিতাও আবশ্যক। এতদুভয়ের সংমিশ্রণেই মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশ। কিন্তু এত দিন পর্য্যন্ত আমাদের দেশে কেবল কবিতারই রাজত্ব চলিয়া আসিতেছে। তাহার ফলে আমাদের চরিত্রের এক দিকই বিকশিত হইয়াছে, অন্য দিক বিকশিত হইতে পায় নাই। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিয়া আমরা যেরূপ মুগ্ধ হইতে পারি, তাহার রহস্যভেদ করিয়া সেরূপে জ্ঞানার্জ্জন করিতে পারি না। আমরা সেই জন্যই বলিতে ছিলাম যে, বাংলার মাটীর এক দিক যেমন কবির মনোমোহন সঙ্গীতে উদ্ভাসিত হইয়াছে, অপর দিক সেই রূপ বৈজ্ঞানিকের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বিশ্লেষিত

হয় নাই। বাঙ্গালায় কবি অনেক আসিয়াছেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিক দুই একজন মাত্র দেখা দিয়াছেন।

কবির কল্পনায় বাংলার মাটি শস্যশ্যামলা। কিন্তু বস্তুতঃ কি তাহাই? বাস্তবিকই কি বাংলার সর্ব্বস্থানে মৃত্তিকার উর্ব্বরতা এত অধিক যে, পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফসল জন্মিয়া থাকে? ফলতঃ তাহা নহে এবং হইতেও পারে না। কারণ বাংলার সকল স্থানের মৃত্তিকা সম শ্রেণীর ভূস্তর হইতে উৎপাদিত হয় নাই। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য কারণও বর্ত্তমান রহিয়াছে। ঐ সমুদয় কারণের অনুসন্ধানের উপর বঙ্গীয় মৃত্তিকাতত্ত্বের ভিত্তি সংস্থাপিত হইতে পারে। কিন্তু এপর্য্যন্ত কাহাকেও এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে দেখা যায় নাই। আমরা সেই জন্যই বঙ্গীয় কৃষিবিভাগের অন্যতম কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নব প্রকাশিত Soils of Bengal (বাংলার মাটি) নামক পুস্তিকাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। ইহাতে যে বাংলার মাটি সম্বন্ধে বিশদভাবে সমালোচনা হইয়াছে তাহা নহে। সেরূপ পুস্তকের এখনও বিশেষ অভাব রহিয়াছে; তবে মৃত্তিকাতত্ত্ব আলোচনা বিভাগে ইহা প্রথম প্রয়াস বলিয়াই ইহা আদরের বস্তু। মৃত্তিকাতত্ত্ব ভূতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু দেবেন্দ্র বাবুর পুস্তকে ভূতত্ত্বের সাধারণ তথ্যগুলি বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করা হয় নাই। আমরা এস্থলে সেগুলির উল্লেখ করিয়া দেবেন্দ্র বাবুর পুস্তকের সার মর্ম্ম প্রদান করিতেছি। আশা করি ইহাতে অনেক পাঠকেরই পশ্চিমবঙ্গের মৃত্তিকা সম্বন্ধে কতকটা সাধারণ জ্ঞান জন্মিবে।

অনেকেই অবগত আছেন যে পৃথিবী সূর্য্যমণ্ডল হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। আকাশপথে ক্রমশঃ আবর্ত্তন করিতে করিতে ইহা অনেক পরিমাণ আদিম তাপ বিকীরণ করিয়া শীতল হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু পৃথিবীর উপরিভাগ অনেক পরিমাণে শীতল হইয়া গেলেও ইহার ভিতরে এত উত্তাপ সঞ্চিত আছে যে, তাহাতে লৌহ প্রভৃতি কঠিন ধাতুও দ্রব অবস্থায় রহিয়াছে। উপরের যে অংশ শীতল হইয়া কঠিনীভূত হইয়াছে তাহা প্রায় ২০ মাইল গভীর হইবে। এই ২০ মাইল গভীর ভূপঞ্জর যে এক রকম উপাদানে প্রস্তুত অথবা উপাদানগুলি সকল স্থানে এক ভাবে সজ্জিত তাহা নহে। পক্ষান্তরে ইহা বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। পৃথিবীর বয়সের বৃদ্ধির সহিত এই সমুদয় স্তর ক্রমশঃ ক্রমশঃ উৎপাদিত হইয়াছে। সুতরাং সর্ব্বনিম্ন স্তর সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন এবং সর্ব্বপ্রথম-উৎপাদিত এবং সর্ব্বোচ্চ স্তর সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক। যদি পৃথিবীর প্রথম বয়স হইতে কোনরূপ নৈসর্গিক দুর্ঘটনা না হইত তাহা হইলে স্তরগুলি উৎপত্তির সময় অনুসারে পর পর সজ্জিত থাকিত; কিন্তু অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প ও নদী, সমুদ্র, বারিপাত প্রভৃতির ক্ষয়কারী শক্তি দ্বারা অনেক স্থানেই স্তরসমূহের আদিম সংস্থান প্রণালীর বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। পুরাতন স্তর নূতনের উপর আসিয়াছে, নূতন পুরাতনের নীচে গিয়া পড়িয়াছে; সমুদ্রগর্ভ পর্ব্বতে উন্নীত হইয়াছে, পর্ব্বত সমুদ্রগর্ভে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এত বিপর্য্যয় ও বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিকের তীক্ষ্ণদৃষ্টি ভূপঞ্জরের স্তর সমূহের আদিম সংস্থান প্রণালী আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছে। নিম্ন হইতে উপরদিকে অগ্রসর হইলে ভূপঞ্জরে যে সমুদয় স্তর দৃষ্ট হয়, সেগুলিকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—১ এজোইক (Azoic) ২ পেলিওজোইক (Paleozoic) ৩ মেসোজোইক (Mesozoic) এবং ৪ নিয়োজোইক (Neo-zoic)। সর্ব্বনিম্ন স্তরে জীব অথবা উদ্ভিদের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া

যায় না। তদূর্দ্ধ পেলিওজোইক যুগের স্তর সমূহে জীবনের প্রথম বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলির অধিকাংশই সামুদ্রিক এবং বহু দিবস পূর্ব্বে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মেসোজোইক যুগের স্তরের সময় জলচর ব্যতীত স্থলচর জীবও উদ্ভূত হইয়াছিল, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে তাহাদের কোন প্রতিনিধি দেখিতে পাওয়া যায় না। নিয়োজোইক স্তরেই আমরা বর্ত্তমান সময়ের উদ্ভিদ্ ও জীব এবং তাহাদিগের জাতিদিগকে দেখিতে পাই। নিয়োজোইক শ্রেণীর প্লিওসিন্ নামক তৃতীয় স্তরেই প্রথম মানব দেখিতে পাওয়া যায়।

বঙ্গদেশে পূর্ব্বোক্ত চারি শ্রেণীর স্তরই অল্প বিস্তর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গ এজোইক এবং নিয়োজোইক শ্রেণীর স্তরের দ্বারা প্রায় সমভাগে বিভক্ত। এজোইক শ্রেণীর দুইটি সর্ব্বনিম্ন স্তরের নাম নিস্ (Gneiss)—একটি পুরাতন অপরটি অপেক্ষাকৃত নূতন। অপেক্ষাকৃত নূতনটিকে Peninsular Gneiss অথবা উপদ্বীপস্থ নিস্ বলে। ভারতবর্ষের সর্ব্ব দক্ষিণ প্রান্ত হইতে গঙ্গার তীরবর্ত্তী কালগাঙ্গ পর্য্যন্ত প্রায় ১৪০ মাইল দীর্ঘ এবং গড়ে ৩৫০ মাইল প্রস্থ বিস্তীর্ণ ভূভাগ এই নিস্ অথবা প্রধানতঃ এই নিসজাত মৃত্তিকা দ্বারা আবৃত। এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে, যে সমস্ত প্রস্তর কিম্বা মৃত্তিকা সলিল-বাহিত কণা (পলি) দ্বারা প্রস্তুত হয় সেগুলিতে স্পষ্ট স্তরের পর স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। এই রূপ মৃত্তিকা অথবা প্রস্তরকে ভূবিদ্যায় Sedimentary (পলিজাত) প্রস্তর বলে। নিস্ শ্রেণীর প্রস্তর পলিজাত। কিন্তু পলিজাত হইলেও ইহা অত্যধিক উত্তাপ, চাপ প্রভৃতি দ্বারা এরূপভাবে পরিবর্ত্তিত, বিপর্য্যস্ত ও স্থানচ্যুত হইয়া গিয়াছে যে উহার আদিম স্তর সমূহ অনেক সময়ে লক্ষিত হয় না। এতদ্ভিন্ন পৃথিবীর আভ্যন্তরিক উত্তাপের প্রসারণী শক্তির প্রভাবে নিম্ন হইতে এক প্রকার দ্রবীভূত পদার্থ ইহার অভ্যন্তরে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। তাহাকে গ্রানিট্ (Granite) বলে। গ্রানিট্ আগ্নেয় গিরিনিঃসৃত লাভার ন্যায় উপরে উঠিয়া পড়ে না। জমির উপরিভাগের অনেক নিম্নে থাকিয়া যায়। গ্রানিট অগ্ন্যুৎপন্ন প্রস্তর (igneous rock)। গ্রানিটে খনিজ পদার্থ সমূহ অনিয়মিক-ভাবে মিশ্রিত; কিন্তু নিসে সেগুলি প্রায় সমরেখায় অবস্থিত, তরঙ্গায়িত পর্দ্দা হিসাবে সজ্জিত। নিস্‌কে পরিবর্ত্তন সম্ভূত (metamorphic) প্রস্তর বলে। তাহার কারণ এই যে ইহা আদত পলিজাত হইলেও উহা চাপ, উত্তাপ ও ভূপঞ্জরের ইতস্ততঃ গতি-বিধিতে অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। ইহা একপ্রকার পলিজাত ও অগ্ন্যুৎপন্ন প্রস্তরের মধ্যবর্ত্তী স্থান অধিকার করে। অগ্ন্যুৎপন্ন প্রস্তর হইতে কুঞ্চিত (foliated) গঠন প্রণালী ও সম্ভেদ (cleavage) দ্বারা ইহাদের পার্থক্য বুঝিতে পারা যায়। অপর পক্ষে ইহাদের নিয়তাকার এবং সময়ে সময়ে শর্করাবৎ গঠন প্রণালী, ও পর্দ্দার অস্থায়ী অবস্থা ইহাদিগকে পলিজাত প্রস্তর হইতে পৃথক করিয়া দেয়। যে সমুদয় পরিবর্ত্তন সম্ভূত প্রস্তরে একবারে তাহাদের আদিম অবস্থা বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই তাহাদিগকে উপপরিবর্ত্তনসম্ভূত (Sub-metamorphic) প্রস্তর বলে। বঙ্গদেশে আঙ্গুল, বাঁকুড়ার পশ্চিমাংশ, ভাগলপুরের দক্ষিণাংশ, কটকের উত্তর ও উত্তর পূর্ব্ব, দার্জ্জিলিং, গয়ার উত্তর ও দক্ষিণ, হাজারিবাগ, মানভূম, মুঙ্গেরের দক্ষিণাংশ, পালামৌ, রাঁচি, সম্বলপুর, সিংভূমের মধ্যাংশ ও সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি জেলায় নিস্ অথবা পরিবর্ত্তন সম্ভূত প্রস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। উপপরিবর্ত্তন সম্ভূত প্রস্তর নিম্নলিখিত জেলা

গুলিতে দৃষ্ট হয় ঃ—বাঁকুড়ার দক্ষিণ পশ্চিম, কটকে সামান্য, দার্জ্জিলিংএর দক্ষিণাংশ, গয়ার পূর্ব্বদিকে সামান্য, হাজারিবাগের উত্তর পূর্ব্ব, মানভূমের দক্ষিণাংশ, মুঙ্গেরের দক্ষিণাংশ, পাটনার রাজগৃহ পর্ব্বত শ্রেণী, সম্বলপুরে সামান্য ও সিংভূমের প্রায় সমস্ত। নিম্নস্তৃত স্থানের জমি অত্যন্ত ভগ্ন বলিয়া উহাতে জল আটকাইতে পারে না। তজ্জন্য যে সকল স্থান অপেক্ষাকৃত নিম্ন ও সরস সেই রূপ স্থানেই শীতকালে ফসল জন্মিয়া থাকে। উচ্চ জমিতে কেবল ভাদুই ও রবি শস্য হয়। নিম্নজাত জমি অবশ্য গ্রানিট জাত জমি অপেক্ষা ভাল। কিন্তু ইহাতে যে কোয়ারজ্ (Quartz) ও অভ্র আছে সেগুলিতে বিশেষ পরিমাণে উদ্ভিদ খাদ্য নাই।

পরিবর্ত্তনসম্ভূত ও উপপরিবর্ত্তন সম্ভূত প্রস্তর শ্রেণীর উর্দ্ধে বিন্ধ্য শ্রেণী (Vindhyan system) অবস্থিত। ইহাতেও জীব অথবা উদ্ভিদ্ কঙ্কাল পরিদৃষ্ট হয় না। সাহাবাদ জেলার দক্ষিণাংশ এবং পালামৌ জেলার উত্তরপশ্চিমাংশের কিয়দংশ ব্যতীত বঙ্গের আর কুত্রাপি বিন্ধ্য শ্রেণীর পর্ব্বত নাই। কিন্তু মধ্য ভারতে প্রায় ৪০,০০০ মাইল ব্যাপিয়া এই শ্রেণীর প্রস্তর বিদ্যমান রহিয়াছে। বিন্ধ্য শ্রেণীর পর ভারতবর্ষে গন্ধবান শ্রেণী (Gondwana system)। এতদুভয়ের মধ্যে ব্যবধান অনেক। কিন্তু ভারতে ইহাদের মধ্যবর্ত্তী স্তরসমূহের প্রায় কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। জলের ক্ষয়-কারী শক্তি উহাদিগকে একেবারে বিলোপ করিয়া দিয়াছে। গন্ধবান শ্রেণী চারিটি উপশ্রেণীতে বিভক্ত এবং পেলিওজোইক যুগের কার্ব্বনিফেরাস্ (carboniferous) স্তর হইতে মেসোজোইক যুগের জুরাসিক্ (Jurassic) স্তর পর্য্যন্ত সমস্ত স্তর ইহার অন্তর্ভুক্ত। নিম্ন হইতে উর্দ্ধদিকে গন্ধবান শ্রেণীর উপশ্রেণী গুলির নাম ঃ—(১) তালচর (Talchers), (২) দামোদর (Damudas) (৩) পঞ্চকোট (Panchets) ও (৪) মহাদেব (Mahadevas)। দ্বিতীয় শ্রেণীর তিনটি বিভাগ আছে, যথা ঃ—(১) বরাকর, (২) লৌহ প্রস্তর, (৩) রাণীগঞ্জ। এই বরাকর বিভাগের স্তর হইতেই প্রধানতঃ এতদ্দেশে পাথুরে কয়লা পাওয়া যায়। পঞ্চকোট ও মহাদেব উপশ্রেণীর প্রস্তর হইতে বালুকাময় জমি উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ গন্ধবান শ্রেণী সম্বন্ধেও এই মন্তব্য প্রযুজ্য। গন্ধবান শ্রেণী জাত মৃত্তিকা সারবিহীন ও চাষ আবাদের অনুপ-যুক্ত। আঙ্গুল জেলার উত্তরাংশে, বর্দ্ধমানের উত্তর পশ্চিম কোণে, কটকের পশ্চিম ও দক্ষিণ পশ্চিমে, হাজারিবাগ, মানভূম,পালামৌ ও সাঁওতাল পরগণার স্থানে স্থানে, পুরীর পশ্চিমে ও রাঁচির উত্তর পশ্চিমে গন্ধবান শ্রেণীর প্রস্তর রহিয়াছে। পুরাকালে ভারতে এই শ্রেণীর প্রস্তর বহুল পরিমাণে বিরাজিত ছিল। কিন্তু তাহার অধিকাংশ ভাগই ধ্বংশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

মেসোজোইক যুগের শেষ ও নিয়োজোইক যুগের প্রারম্ভের মধ্যবর্ত্তী কোন সময়ে পৃথিবীর অন্তর্নিহিত তেজের ভয়াবহ বিকাশ হয়। এই ভীষণ ভূকম্পনে হিমালয় পর্ব্বত উৎক্ষিপ্ত হয় এবং গঙ্গা সিন্ধু ক্ষেত্র বসিয়া যায়। উপদ্বীপস্থ নিসের বিদীর্ণ অংশ সমূহ (fissures) দিয়া এই সময় লাভা প্রবাহ বহির্গত হইয়া দক্ষিণ ভারতের নিসের অনেকাংশ আবৃত করিয়া ফেলে। এইরূপ লাভা-আবৃত অংশের পরিমাণ দুই লক্ষ বর্গ মাইলের কম নহে এবং ইহা দাক্ষিণাত্য-ট্রাপ (Deccan trap) নামে পরিচিত। এই ট্রাপ হইতেই প্রসিদ্ধ রিগর অথবা দাক্ষিণাত্যের কালামাটি উদ্ভূত হই-য়াছে। বঙ্গদেশে রাজমহল পর্ব্বতের কিয়ৎ স্থান

ব্যতীত আর কোন স্থানেই রিগর মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায় না।

বঙ্গদেশের অনেক স্থানে ধূসর অথবা কৃষাভ ধূসর বর্ণ এক প্রকার জমি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে লেটারাইট (Laterite) জমি বলে। বালেশ্বর, বাঁকুড়া, ভাগলপুর, বীরভূম, বর্দ্ধমান, কটক, মেদিনীপুর, পালামৌ, পুরী, রাঁচি প্রভৃতি জেলায় অল্প বিস্তর পরিমাণে লেটারাইট পাওয়া যায়। লেটারাইট উহার অব্যবহিত নিম্নস্থিত প্রস্তরের ধ্বংশাবশেষ। সময়ে সময়ে এই ধ্বংশাবশেষ জল প্রবাহ দ্বারা নিম্ন ভূমে নীত হইয়াছে এবং তথায় গিয়া আবার জমাট হইয়া গিয়াছে। শেষোক্ত প্রকার লেটারাইটকে নিম্নভূমিস্থ (Low-level) এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকারকে উচ্চ ভূমিস্থ (High-level) লেটারাইট বলে। বঙ্গদেশের লেটারাইট প্রায়ই নিম্নভূমিস্থ লেটারাইট। অত্যন্ত জমাট লেটারাইট জল সংরক্ষণ করিতে পারে না বলিয়া উহাতে ভাল গাছ হয় না। কিন্তু অপেক্ষাকৃত চূর্ণীভূত লেটারাইটে মন্দ জমি হয় না।

এপর্য্যন্ত যে সমস্ত প্রস্তরস্তরের বিষয় বিবৃত হইল সেই গুলিই বঙ্গদেশের ভূপঞ্জর গঠন করিয়াছে। দার্জ্জিলিং জেলায় এই সমুদয় স্তর ব্যতীত টারসিয়ারী (Tertiary) উপযুগের কয়েকটি স্তর দৃষ্ট হয়। এই জেলায় ভূপঞ্জরের অবস্থান সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য্য বিষয় এই যে আধুনিক স্তর সমূহ নিচে পড়িয়া গিয়াছে এবং পুরাতন স্তরগুলি উপরে উঠিয়াছে। এরূপ বিপর্য্যয়ের কারণ সম্ভবতঃ স্তর সমূহের মুদ্রণ (folding) এবং স্থান চ্যুতি (faulting)।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সমস্ত পশ্চিম বঙ্গের মৃত্তিকা পলিস্তর ও নিস্‌স্তর দ্বারা প্রায় সমভাবে বিভক্ত। পলিস্তর (Indo-Gangetic Alluvium) নিয়োজোইক যুগের অন্তর্গত এবং ইহাই পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক স্তর। ইহা নিম্নস্থিত প্রস্তরাদির ধ্বংশাবশেষ দ্বারা গঠিত। উত্তরে হিমালয় পর্ব্বতের নিস্ স্তর এবং দক্ষিণে ভারতীয় উপদ্বীপের নিস্ ও নিস্‌জাত অপরাপর মৃত্তিকার মধ্যে বহু বিস্তীর্ণ পলিক্ষেত্র অবস্থিত। অন্যদিকে ইহা পঞ্চনদ হইতে আরম্ভ হইয়া আসাম অঞ্চলে শেষ হইয়াছে। এই ভারতপ্রান্তব্যাপী ক্ষেত্রের পরিমাণ তিন লক্ষ বর্গ মাইলের কম হইবে না। উৎপত্তির হিসাবে পলিস্তরকে নূতন ও পুরাতন এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। উভয়েরই মূল ভিত্তি অভ্র এবং চূণ সংযুক্ত কর্দ্দম। পুরাতন পলিস্তর অপেক্ষাকৃত উচ্চ এবং ক্রমাগত জলস্রোত দ্বারা ইহার উপরিভাগ ধৌত হওয়ায় ইহা অনেকটা তরঙ্গায়িত। পক্ষান্তরে নূতন স্তর নূতন পলি সহযোগে গঠিত হইতেছে। গঙ্গার ব-দ্বীপ এই স্তরের অন্তর্গত। পুরাতন স্তরে কাঁকর নামে পরিচিত কার্ব্বনেট অব্ লাইমের গুটি পাওয়া যায়। ইহা হইতে ঘুটিং চূণ প্রস্তুত হয় ও ইহা রাস্তা ঘাট ও গৃহ ভিত্তি গঠনে ব্যবহৃত হয়। বিহার অঞ্চলে ও বঙ্গদেশের, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় সরিষার ন্যায় ক্ষুদ্রাকার যে একপ্রকার কাঁকর পাওয়া যায় তাহা জল বিহীন লৌহ পেরক্সাইড (Hydrated iron peroxide) ভিন্ন আর কিছুই নহে। স্থানে স্থানে ইহাকে বন বুঁট বলিয়া থাকে। নূতন স্তরে এই উভয় প্রকারের কাঁকরই প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এরূপ পলিস্তরও আছে যাহা নূতন কি পুরাতন তাহা ঠিক বলিতে পারা যায় না। ভাগিরথীর পূর্ব্ব ভাগে অবস্থিত ব-দ্বীপ নূতন পলিস্তরের অন্তর্ভূক্ত। ইহার উত্তর বন্যা-রেখা (Flood level) হইতে অনেকটা উচ্চ হইয়াছে; কিন্তু দক্ষিণাংশ এখনও বন্যায় প্লাবিত

হইয়া যায়। অনেকে অনুমান করেন যে নূতন স্তরের জমি ৪৮১ ফুট বসিয়া গিয়াছে। কলিকাতায় একটি ৪৮১ ফুট গভীর কূপ খনন কালে দেখা যায় যে উহার নিম্নে আধুনিক সময়ের শম্বুক কাষ্ঠ প্রভৃতি রহিয়াছে। ইহা দ্বারা উক্ত অনুমান অনেকটা সত্য বলিয়া বোধ হয়। ইহার দ্বারা আরও বুঝিতে পারা যায় যে ভারতের বিশাল পলিজাত ভূখণ্ডের পূর্ব্বে সিন্ধুনদের দিক দিয়াই জল নিকাশি হইত। বঙ্গ উপসাগরের সম্মুখীন দেশ বসিয়া যাওয়ায় এখন দুই দিক দিয়াই জল নিকাশ হয়। এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে নূতন স্তরের জমি সমুদয় অপেক্ষাকৃত অধিক উর্ব্বরা। কারণ উহাতে বৎসর বৎসর পলি পড়ে। পক্ষান্তরে পুরাতন স্তরের নদী সমূহ পার্ব্বতীয় নদী, এবং উহাদের জলবেগ এত অধিক যে উহাতে পলি পড়া দূরে থাকুক বরং মৃত্তিকা ধৌত হইয়া নিম্নে স্থানান্তরিত হয়। পলিস্তরের মৃত্তিকা সাধারণতঃ কর্দ্দম হইলেও অধঃস্তন স্তর সমূহে পৃথক পৃথক বালুকা, কর্দ্দম ও দোঁয়াশ স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। এক একটি স্তর অনেক স্থলে যথেষ্ট গভীর। আবার উপরের মৃত্তিকা স্থানে স্থানে কেবল শুষ্ক বালুময়। স্থানে স্থানে মৃত্তিকার অধঃস্তন স্তর দ্বারা জল নিকাশি হয় না এবং তজ্জন্য সলফেট্ ও কার্ব্বনেট্ অব্ সোডা প্রভৃতি ক্ষার জমিয়া মৃত্তিকাকে একেবারে অনুর্ব্বর করিয়া দেয়। বিহার অঞ্চলেই এইরূপ জমি অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

বঙ্গদেশের পলিস্তর ও নিসজাত ক্ষেত্র সমূহের মৃত্তিকাকে সাধারণতঃ ছয় ভাগে বিভক্ত করা হয়। ভারি কাদা, কাদা, কাদা দোঁয়াশ, দোঁয়াশ, বেলে দোঁয়াশ ও বালি। বিভিন্ন বিভিন্ন জেলায় এই কয়েক জাতীয় মৃত্তিকার নাম বিভিন্ন। ভারি কাদাকে বিহারে করেল ও বঙ্গে এঁটেল অথবা মেটেল বলিয়া থাকে। কাদা—এঁটেল অথবা মেটেল, মর্তয়ার, কেওয়াল ; কাদা দোঁয়াশ—বেলে মেটেল, লালমাটি প্রভৃতি ; দোঁয়াশ—দোঁয়াশ, দোরস, প্রভৃতি ; বেলে দোঁয়াশ—বেলে দোঁয়াশ, বাল সুন্দর প্রভৃতি এবং বালি সাধারণতঃ বালু নামে পরিচিত।

বঙ্গদেশে ফলের বাগানের অবনতি।

অনেকেই অনুযোগ করেন যে আম, লিচু, কাঁটাল গাছে আর পূর্ব্বের মত ফল হয় না। কিন্তু আমাদের দেশের লোক এত অলস স্বভাব যে ইহার একটা দৈব কারণ নির্দ্ধারণ করিয়াই সন্তুষ্ট। ধর্ম্মপরায়ণ প্রবীনেরা বলিবেন যে কলিতে পাপের বৃদ্ধি হইয়াছে, লোকের ভোগ কমিয়া আসিতেছে, তাই মেদিনী এখন পূর্ব্ববৎ ফল প্রসব করে না। কোন কোন দল অত সত মানেন না, তাঁহারা বলেন যে জল বায়ুর পরিবর্ত্তনই ইহার কারণ। ঋতু বিপর্য্যয়ে কোন কোন বৎসর অধিক ফল হয়, কোন কোন বৎসর কম ফল হয়, এই রূপ চিরকালই হইয়া থাকে এবং হইবেও, ইহার উপর কাহারও কোন হাত নাই। কিন্তু বিশেষ ভাবনার কথা এই যে আবহাওয়ার অবস্থা অনুকূল থাকিলেও অনেক সময় বৃক্ষদিগকে উপযুক্ত ফল প্রসবে বিরত থাকিতে দেখা যায়। তাহারা কি সত্য সত্যই মানুষের পাপের জন্য তাহাদের উপর বিরক্ত হইয়া এরূপ উদাসীন ভাব অবলম্বন করিয়াছে?

আমাদের বিবেচনায় কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নহে। কর্ত্তব্য অবহেলায় যদি পাপ থাকে, তবে সেই পাপের জন্য বৃক্ষাদির এইরূপ অবস্থা হইয়াছে। উদ্যানস্বামীগণ গাছের কাছে ফল চান কিন্তু তাহাদিগকে যে আহার দিতে হয় তাহা তাঁহারা জানেন না। তাঁহাদের বিশ্বাস গাছ পুতিলেই প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে তাহাতে ফল ফলিবেই। তাহার ব্যতিক্রম দেখিলে হয় তাঁহারা নিজের ভাগ্যের দোষ দিবেন, না হয় প্রাকৃতিক নিয়মের দোষ দিবেন, এমন কি সময় সময় ভগবানের দোষ দিতেও ছাড়েন না। যাঁহারা কিন্তু নিজেদের কৃতকর্ম্মের ফল বলেন তাঁহারাই সত্য কথা বলেন।

যদি সারবান জমিতে গাছ বসান হয় তবে ৮ কিম্বা ১০ বৎসর মন্দ ফল ফলে না। তৎপরেই কিন্তু গাছ গুলিকে অকালে বৃদ্ধ হইতে দেখা যায় এবং তাহাতে ফল আর ভাল হয় না। সেই জন্য বৃক্ষাদির সেবা আবশ্যক। বর্ষাশেষে আইল বাঁধিয়া দিয়া জল খাওয়াইতে হইবে। আশ্বিন, কার্ত্তিক মাসে গোড়া কোপাইয়া তাহাতে সার ও নূতন মাটি দিয়া গোড়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। চারি পাঁচ ঝুড়ি পুরাতন পাঁক মাটি, দুই তিন ঝুড়ি পুরাতন গোময়, অর্দ্ধ সের হাড়ের গুঁড়া প্রতি বৎসর প্রত্যেক ফলবান ১০ বৎসর বয়স্ক বৃক্ষের উপযুক্ত আহার বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। পাশ্চাত্য দেশে কত অত্যধিক মূল্যে রাসায়নিক সার ব্যবহৃত হয়; ফলও তদ্রূপ হয়; ব্যয় অপেক্ষা আয় নিশ্চয় অনেক অধিক হয়। সার সম্বন্ধে অতি সূক্ষ্ম বিচার করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আমরা সার কথা এই বুঝাইতে চাই যে ফলের আশা করিতে হইলে বৃক্ষাদির পরিচর্য্যা আবশ্যক। আম, লিচু, জাম, জামরুল যে গাছই হউক না কেন, তাহা প্রতি বৎসর ছাঁটা আবশ্যক। পুরাতন ডালপালা কতক কতক ছাঁটিয়া বাদ না দিলে, শুক্না ডাল গুলি সযত্নে ছাঁটিয়া না ফেলিলে, তাহাতে ফল ফলিবে কি প্রকারে? কোন কোন গাছের পুরাতন ডাল একেবারে বাদ দিতে হয়। আতা, কুল প্রভৃতি জাতীয় গাছের পুরাতন ডাল কাটিয়া ফেলিবার পর যে নূতন ডাল বাহির হয় তাহাতেই বড়, বৃহৎ, সরস ও সুমিষ্ট ফল হয়। আম, লিচু গাছও অল্প বিস্তর প্রতি বৎসরই ছাঁটা আবশ্যক। আমরা এসকল কিছুই করিব না অথচ ফলাকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ; ইহাই বিচিত্র! বঙ্গদেশে শীতকালের শেষে প্রায় অধিকাংশ ফল বৃক্ষের অঙ্কুরোদ্গম হয়। এই অঙ্কুর উদ্গমের কিছু দিন পূর্ব্বে বৃক্ষে জলসেক আবশ্যক। স্বাভাবিক নিয়মে শীতের শেষে প্রায়ই বৃষ্টি হইয়া সেই কার্য্যের সহায়তা করে কিন্তু যদি সময় মত বৃষ্টি না হয় তবে বৃক্ষাদিতে জল সেকের কোন বন্দোবস্ত আমরা করি কি? পাশ্চাত্য দেশে এবং আরও অন্যান্য স্থানে গোড়ায় জল সেক ত অল্প কথা, ফল ও মুকুল রক্ষার জন্য গাছে পিচকারি দিবারও ব্যবস্থা আছে। তাঁহারা তাঁহাদের সেই অধ্যবসায়ের ফলও পান। আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই, বৃক্ষাদির আবার রোগ আছে এবং সেই রোগ নিবারণও আবশ্যক। কাঁটাল গাছে পোকা গর্ত্ত করিয়া প্রবেশ করিয়াছে এবং ক্ষত মুখ হইতে কাটের গুঁড়া ও রস নির্গত হইতেছে, লিচু পাতায় কোকড়া রোগ ধরিয়াছে, আম গাছের ডাল ক্ষত হইয়া ঘুণ পড়িতেছে—ইহা কি আমরা দেখিয়াও দেখি?—হইলই বা রোগ, তা

বলিয়া ফল হইবে না—এত বড় গাছটার এক জায়গায় একটু রোগ, তাতে কি হইবে! কিন্তু খুবই লোকসান হয়, গাছটী মরে, না হয় জীয়ন্তে মরা হইয়া থাকে। গাছে আগাছা জন্মিয়া, না হয় বন্যলতা উঠিয়া গাছটী ছাইয়া ফেলিয়াছে, তলায় ঘাস হইয়া গোড়াটী জঙ্গলে ভরিয়া গিয়াছে, তবুও কিন্তু আমাদের ফলের আশা কমে না। আমরা কখন কি ভাবি বৃক্ষাদিরও শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া আছে, রোগ আছে, আহারের আবশ্যকতা আছে? আবার নূতন বাগান তৈয়ারির সময়ও কত ভ্রম প্রমাদ। গাছ যেন বড় হইবে না, তাই ঘন ঘন গাছ বসাই, তাই বড় হইয়া গাছে গাছে জুড়িয়া যায়; সস্তায় গাছ পাইলে অধিক দাম দিয়া ভাল সতেজ, সঠিক গাছ ক্রয় করি না, কখন চাহিয়া, কখন রথের রথো গাছ কিনিয়া বসাইয়া থাকি। গাছ কিনিবার সময় কোন গাছের চারা, কি প্রকার ডালের চারা তার অনুসন্ধান করি কি? বীজের বীজটী সতেজ পূর্ণবয়স্ক ও সুপক্ক ফল হইতে সংগ্রহ কি না দেখি কি? গাছ হইলেই হইল, তাতে ফল ত হইবেই। পাশ্চাত্য ও অন্যান্য দেশে কত নূতন উপায়ে কলম ও সঙ্কর উৎপাদিত হইয়া কত প্রকার উন্নত জাতীয় ফলের সৃষ্টি হইতেছে আর সুজলা সুফলা বঙ্গদেশের ফলের বাগান সব খারাপ হইয়া যাইতেছে।

জনৈক পর্য্যবেক্ষক।

পত্রাদি।

শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র ধর, ঠাকুরাকোলা, বঙ্গলা, মৈমনসিংহ;—**শটি হইতে পালো প্রস্তুতের উপায়** জানিতে চাহিতেছেন।

[সাধারণতঃ ঢেঁকি দ্বারা কুটিয়া জলে ধুইয়া পালো প্রস্তুত হয়। আরারুট তৈয়ারি করিবার জন্য যেরূপ কল ব্যবহৃত হয়, যথা পিশিবার, ধুইবার, চালিবার এবং শুষ্ক করিবার যন্ত্রাদি, সেই রূপ কল প্রভৃতির দ্বারা শটি হইতেও পালো প্রস্তুত করিতে পারা যায়। দেশীয় মিস্ত্রী দ্বারা বিলাতী কলের অনুকরণে কল তৈয়ারি করাইয়া লইলে ৩০০৲।৪০০৲ শত টাকার মধ্যে হইতে পারে। কৃঃ সঃ।]

শ্রীদেবেশ্বর গোস্বামী বাদলিপার, আসাম;—

[আপনি যে পাতা পাঠাইয়াছেন, তাহা ভারবিনাসি বর্গস্থ (LANTANA) গণের গাছ। ইহার পাতায় অবশ্য সুগন্ধ আছে। কিন্তু তাহা হইতে বিশেষ কোন সুগন্ধজনক দ্রব্য উৎপন্ন হয় না। অধিকন্তু ইহা এত অধিক বৃদ্ধি পায় যে, এই জাতীয় আগাছা হইতে অনেক স্থানে চাষের বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে। কৃঃ সঃ।]

শ্রীঅনুপম মিত্র, পাইখাটি, ২৪-পরগণা;—**রেড়ির খৈল ও হাড়ের গুঁড়ার উপকারিতা** জানিতে চাহিতেছেন।

[রেড়ির খৈল পূর্ব্বে অন্যস্থানে পচাইয়া ফসলে প্রয়োগ করিতে হয়, কিম্বা সময়ে সময়ে ফসলের বপনের সহিতও প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। হাড়ের গুঁড়া ফসল বপনের ২।৩ মাস আগে প্রয়োগ করা উচিত। রেড়ির খৈলের উপকারিতা ৫ বৎসর পর্য্যন্ত এবং হাড়ের গুঁড়ার উপকারিতা ৭ বৎসর পর্য্যন্ত অল্পবিস্তর পরিমাণে বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু প্রথম হইতে উৎকৃষ্ট ফল প্রথম বৎসরে এবং দ্বিতীয় হইতে প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসরে পাওয়া যায়। কৃঃ সঃ।]

শ্রীতারকনাথ দেব, যোড়হাট—[অরহরে ও কুসুম গাছে লাক্ষা কীট পালন—দেশী ও পাট-নাই উভয়বিধ অরহর গাছেই লাক্ষা কীট পালন করা যাইতে পারে। আপনি কুসুম অর্থে সম্ভবতঃ কুসুম ফুল বুঝিয়াছেন। কিন্তু ইহা কুসুম ফলের গাছ। গাছ গুলি বেশ বড় হয়, ইহার ফলের আস্বাদ অম্ল। নিম্নলিখিত দুইটি পুস্তকে, বিশেষতঃ প্রথমটিতে লাক্ষা পালন সম্বন্ধে যাবতীয় সংবাদ পাইবেন;—A Note on Lac Insect by E. P. Stebbing Re. 1-4; Lac and the Lac Industries by G. Sir George Watt Rs. 2. 'পেশওয়ারী স্বাতি' ধান্য সমিতির অফিসেই পাওয়া যাইতে পারে; মূল্য প্রতি মণ ১০৲। বিঘা প্রতি বীজের পরিমাণ ៸৫ হইতে ៸৬ সের। কৃঃ সঃ।]

প্রাদেশিক কৃষি সংবাদ।

পঞ্জাবে রবি তৈল শস্য।—১৯০৮-০৯। তৈল শস্য আবাদের পক্ষে আবহাওয়া অনেকটা অনুকূল ছিল। কিন্তু শরতকালে যদি জমিতে জল বাঁধিয়া না থাকিত, কিম্বা রায়তের মধ্যে ম্যালেরিয়া জ্বর দেখা না দিত তাহা হইলে আরও অনেক জমিতে তৈল শস্যের আবাদ হইত।

বিগত দুই বৎসরের তৈল শস্যের আবাদী জমির পরিমাণ:—

বৎসর।	সেচন জলের সুবিধা ছিল।	সেচন জল ছিল না।	একুন।
	একর	একর	একর
১৯০৭-০৮	৪০৯,১০০	৪৩৩,৭০০	৮৪২,৮০০
১৯০৮-০৯	৪৯৬,১০০	৬৭৮,৩০০	১,১৭৪,৪০০

আবাদী জমির পরিমাণ বিগত পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৩৯ অংশ অধিক কিন্তু পাঁচ বৎসরের গড় অপেক্ষা ৫ অংশ কম।

নভেম্বর মাসে অমৃতসহরে তৈল শস্যের দর প্রতি মণ ৪৷৵০ আনা ছিল; ডিসেম্বর মাসে বাড়িতে আরম্ভ হয়। ৫৸০ আনা হইতে মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ৫৸৵০ আনা দাঁড়াইয়াছিল। তারপর এপ্রিল মাসে ৪৸০ আনা হইয়াছে। ফেরোজপুরের দর আরও অধিক; নভেম্বর মাসে ৬৷৷০ টাকা বিকাইয়াছে; মার্চ্চ মাসে ৫৲ টাকা হইয়াছিল। এ বৎসরের রপ্তানি কেবল মাত্র ১,৮৭৩ টন; কিন্তু ১৯০৭ সালে ৫১,৫৮৯ টন রপ্তানি হইয়াছিল। এ বৎসর কেন এত কম রপ্তানি হইল তাহার কারণ অনুসন্ধান করা হইতেছে।

বঙ্গদেশে আবহাওয়া ও শস্যের অবস্থা।—জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্য্যন্ত সমগ্র বঙ্গদেশে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। বিহারে, বীরভূমে, দার্জ্জিলিং এবং কুচবিহারে বারিপাতের পরিমাণ কিছু অধিক। ইতিমধ্যেই দার্জ্জিলিং পাহাড়ে ১৯·০৪ এবং কুচবিহারে ৩৬·৩৫ ইঞ্চি বৃষ্টি হইয়াছে। বাঁকুড়া, চম্পারণ, পূর্ণিয়া, এবং সাঁওতাল পরগণায় স্থানে স্থানে অতিবৃষ্টি হেতু চাষাবাদের কিছু বিলম্ব ঘটিয়াছে কিন্তু মোটের উপর চাষের অবস্থা ভাল। ক্ষেত্রস্থিত শস্যের অবস্থা ভাল। পাট এবং আখ উত্তমরূপ হইতেছে। মোটা চাউলের দর বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলী, ২৪-পরগণা গয়া, চম্পারণ, মুঙ্গের, সাওতাল পরগণা, বালেশ্বর এবং সম্বলপুরে চড়িয়াছে কিন্তু নদিয়া এবং যশোহরে কিছু কম হইয়াছে দেখা যায়। নদিয়া ও সম্বলপুরে গো-বসন্ত দেখা দিয়াছে। গবাদির অন্যান্য রোগ প্রায় সর্ব্বত্রই আছে কেবল পাটনা, ২৪-পরগণা এবং বিহারে কোন প্রকার গো-রোগের কথা আজও শুনা যায় নাই। মজঃফরপুরে দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ যে পূর্ত্তকার্য্য চলিতেছিল তথায় অতিবৃষ্টি হেতু লোক খাটিতে পারিতেছে না। ভাগলপুরে কেবল মাত্র ৫১১ জন পূর্ত্তকার্য্যে খাটিতেছে। দারবঙ্গে পূর্ত্তকার্য্যে ৪৫,৪০৭ জন খাটিতেছিল কিন্তু তাহাদের সংখ্যা এখন ২৩২৪ জন মাত্র। অত্যধিক বৃষ্টি হেতু সংখ্যা এত কমিয়া গিয়াছে। মজঃফরপুর, দারবঙ্গ, পূর্ণিয়া ও পালামৌয়ে ২৯,৩৭৮ জন সরকারি দানে নির্ভর করিয়া আছে।

বঙ্গদেশে আষাঢ় মাসে শস্যের অবস্থা।—আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে ত্রিহুত বিভাগে, মেদিনীপুরে, ২৪ পরগণায়, যশোহর, খুলনা এবং কুচবিহারে কোন কোন অংশে অতিশয় জল হওয়ায় নিচু জমিতে চাষ দেওয়া বা বুনানি কার্য্যের অসুবিধা হইয়াছে। বর্দ্ধমান, চম্পারণ, মজঃফরপুর, দ্বারবঙ্গ, কটক ও বালেশ্বরে ধান রোয়া হইতেছে কিন্তু বর্দ্ধমানের স্থান বিশেষে সময়ে জল হওয়ায় আজিও আওধান বোনা হইতেছে। পাট ও ইক্ষুর অবস্থা ভাল। নদিয়া ও যশোহরে আওধানে পোকা লাগিয়াছে। মুর্শীদাবাদের অন্তর্গত কান্দিতে এবং যশোহর, গয়া, সাহাবাদ, সারণ, মজঃফরপুর ও পুরীতে কোথাও কোথাও জলপ্লাবনের জন্য পাট ও ইক্ষুর ক্ষতি হইয়াছে।

টাঙ্গাইল।—কোন সংবাদদাতা লিখিতেছেন যে ছয় দিন ধরিয়া এখানে মুশলধারে বৃষ্টি হইতেছে। নদী পূর্ণ হইয়াছে এবং জলপ্লাবিত হইয়া গ্রামে ঢুকিতেছে। তিল আহরণ করা হইতেছে; তিলের ফলন খুব অধিক হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই বৃষ্টিতে আউস ও আমন উভয় ধান্যের অনেক উপকার দর্শিবে। পাট বেশ হইতেছে। ১৩ই জুন।

বগুড়া।—বিগত ১৪ই জুন জনৈক পত্রপ্রেরক লিখিতেছেন যে এখানে প্রায় প্রত্যহ অত্যধিক বৃষ্টি হইতেছে। ক্ষেত, মাট সব জলময় হইয়া গিয়াছে। আউস ধান ও পাটের ক্ষেত নিড়ান বা পাতলা করিয়া দিবার জন্য আঁচড়া দেওয়া হইল না। ইতিমধ্যেই অত্যন্ত অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, যদি এইরূপ অবস্থা এক সপ্তাহ কাল চলে তবে দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবী। মোটা রেঙ্গুন চাউল ৬০ তোলার ওজনে ১৩ সের টাকায় বিক্রয় হইতেছিল, এখন দর টাকায় ১০ সের উঠিয়াছে। এখানকার অন্নসত্র সমিতি কর্ত্তৃপক্ষের নিকট কত আবেদন নিবেদন করিতেছেন কিন্তু তাহা অরণ্যে রোদন মাত্র। দুই একজন সদাশয় কর্ম্মচারী কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিয়া তাঁহাদের বদান্যতার পরিচয় দিয়াছেন মাত্র।

ইক্ষুর আবাদ।—ইক্ষুর চাষ দিন দিন বাড়িতেছে। মহীশূরে চিনির কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। বিগত জুন ১৯০৮ সালের হিসাবে পাওয়া যায় যে ইক্ষু চাষে নিযুক্ত জমির পরিমাণ এখানে ৪৪.৫৫০ একর। গত পূর্ব্ব বর্ষে ইক্ষুর আবাদী জমির পরিমাণ ৪,২০০ একর মাত্র ছিল। ইহার ফলে ১,৭,৮০০/ মণ অধিক গুড় তৈয়ারি হইয়াছে।

যুক্তপ্রদেশে শারদীয় খন্দ।—বিগত ১৫ই জুন লক্ষ্ণৌ হইতে কোন সংবাদদাতা লিখিতেছেন যে বৈশাখের প্রথমে ও তারপর মাঝে মাঝে বৃষ্টি হইয়া শরৎকালের শস্যের জন্য জমির চাষ বেশ চলিতেছে। খাদ্য শস্যের দর এখনও অধিক। ক্ষেত্রস্থিত ফসলের মধ্যে ইক্ষু প্রধানতঃ উল্লেখ যোগ্য। এবার বর্ষা শীঘ্র আরম্ভ হওয়ায় ইক্ষু চারা মরিয়া যাইবার আশঙ্কা দূর হইয়াছে।

সার-সংগ্রহ।

"গোল্ডেন ক্রাউন"—মাছধরা সরকারি জাহাজ।

বিগত জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ্চ (১৯০৯) তিন মাসের বিবরণী পাঠে জানা যায় যে উক্ত জাহাজ খানি মৎস্য ধরিবার জন্য ছয় বার সমুদ্র যাত্রা করিয়াছিল। প্রথম বার ধৃত মৎস্যের ওজন ৪,২৬২ পাঃ, ২য় বারে ৮,৯৫৮ পাঃ, ৩য় বারে ১৭,৯৭৭ পাঃ, ৪র্থ বারে ১৭,৯৮৯ পাঃ, ৫ম বারে ৮,৯৫৮ পাঃ এবং ৬ষ্ঠ বারে ১৭,৯৭৭ পাউণ্ড মোট ধৃত মৎস্যের পরিমাণ ৮২,১২০ পাউণ্ড অর্থাৎ ৩৬৪ টন। একটা সোজা হিসাব ধরিয়া লইলে দেখা যায় যে প্রত্যেক বারে গড়পড়তা ১৩·৮০ হন্দর মৎস্য ধরা পড়িয়াছে এবং জাহাজ খানি প্রত্যেক বার গড়ে ৮·৮৪ দিন সমুদ্রে ছিল।

এই কয়বারের সমুদ্র যাত্রাতে অনেক নূতন জাতীয় মাছ ধরা পড়িয়াছে, ইতিপূর্ব্বে ঐ সকল মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায় নাই। বর্ত্তবান বিবরণীতে

নিম্নলিখিত মৎস্যের নাম উল্লেখ আছে। কড্ জাতীয় (Whitings), গুরনার্ড (Gurnards), ভেট্কি, চিংড়ি (Prawns), চেপ্টা মাছ (Small Flats, Red Flats, halibuts), সমুদ্র চাঁদা জাতীয় (Pomferts), বান জাতীয় (Eels), পার্ব্বতীয় সামন্ (Rock salmon), লাল ভেট্কি (Red perch) ও ইলিশ জাতীয় (herring)।

এই কয় মাসে ৫২৩/ মণ মাছ বিক্রয় করা হইয়াছে। চিংড়িঘাটায় যে মৎস্য চালান করা হইয়াছিল তাহা ওজন করা হয় নাই; যাহা লিণ্ডি বরফ গুদামে ছিল এবং তথা হইতে হগ সাহেবের বাজারে চালান গিয়াছে তাহারই ওজন উপরে প্রদত্ত হইয়াছে। ৩৬ নং আহিরীপুকুর রোডে এই জাহাজ দ্বারা ধৃত মৎস্য হইতে একপ্রকার শিরিশ (Isinglass), মাছের তৈল ও মৎস্যজ সার প্রস্তুতের ছোট খাট কারখানা খোলা হইয়াছে। মাছের পিত্ত জলে সিদ্ধ করিয়া মৎস্যের তৈল তৈয়ারি হইতেছে। এখানকার প্রস্তুত শিরিশ ব্যবহারিক বস্তু বিচারক (Reporter on Economic Products) হুপার সাহেবের নিকট পাঠান হইয়াছিল। তাঁহার মতে ইহা আরও ভাল উপায়ে ও ভালরূপে প্রস্তুত হওয়া উচিত। আমেরিকায় অনেক ব্যবসাদারকে নমুনা পাঠান হইয়াছিল, সকলেই এই শিরিশ (Isinglass) অধিক পরিমাণে লইতে প্রস্তুত আছেন কিন্তু গভর্ণমেন্টের এই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছা নাই। মৎস্য হইতে উক্ত পদার্থ গুলি কি উপায়ে সুচারুরূপে প্রস্তুত হয় তাহার কৌশল অবগত হওয়াই বর্ত্তমান কারখানা স্থাপনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

কার্পাস কথা।

কার্পাস সম্বন্ধে দুইখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। একখানি সার জর্জ ওয়াট কৃত, নাম Wild and Cultivated Cottons of the world; অপরখানি গ্যামি (Gammie) সাহেব কৃত; নাম Cotton cultivation in India, মূল্য ৭॥০ টাকা। কার্পাস চাষে যাহাদের অনুরাগ বা স্বার্থ আছে, তাহাদিগকে এই পুস্তকদ্বয় পাঠ করিতে পরামর্শ দিতেছি। কার্পাসের চাষ দেশভেদে বৈশাখ কি জ্যৈষ্ঠ মাসে আরম্ভ করিতে হয়। কিন্তু পূর্ব্বে তাহার বীজ সংগ্রহের ব্যবস্থা করা উচিত। শুধু বীজ না কিনিয়া তুলা সমেত বীজ, অর্থাৎ কার্পাস ক্রয় করাই বিধেয়; কারণ তুলার মধ্যে কার্পাস বীজে সজীবতা অধিক দিন থাকে; এবং কার্পাস কোন জাতীয়, তাহার তন্তু বা আঁশ কেমন লম্বা এবং সরু, তাহা কার্পাস দেখিয়া চিনিতে পারা যায়। বাঙ্গালীরা অনেকেই স্বগৃহে কপি, বেগুন, লঙ্কা, সীম ইত্যাদির চাষ করেন। এই সকল জিনিষ বাজারে কিনিতে পাওয়া যায় না, তাহা নয়। তথাপি এই সকল জিনিষের চাষ করেন। কিন্তু নিজের বাড়ীতে কার্পাসের চাষ করেন না কেন, তাহা আমরা কল্পনা করিতে পারি না। বালিশ, লেপ ও তোষক, গৃহস্থ মাত্রেরই অপরিহার্য্য, ইহা না হইলে কাহারও চলে না। এই বালিশ, লেপের জন্য স্বগৃহজাত কার্পাস প্রয়োজনে আসিতে পারে। কে জানে যে সকল লেপ, তোষক বিক্রয় হয়, তাহা মৃত বা পীড়িত লোকের পরিত্যক্ত শয্যা হইতে সংগৃহীত কি না, এবং নানা প্রকার ব্যাধির বীজ তাহার সঙ্গে ঘরে আনা হয় কি না। এই জন্য আমরা পাঠকবর্গকে অনুরোধ করিতেছি যে, সকলেই গৃহে গৃহে ১০।১২টা কার্পাস গাছ রাখিবেন। তাহা হইতে সামান্য গৃহস্থের লেপ, তোষক, দোলাই, বালাপোষ প্রভৃতির তুলার যোগাড় হইয়া যাইবে, এবং বাজার হইতে তুলা কিনিলে যে ব্যাধি বীজ লেপ-তোষকে পোষণ করিবার আশঙ্কা আছে, স্বগৃহজাত তুলা হইতে সেই আশঙ্কা থাকিবে না। আমরা কাপড়ের কল, স্বদেশী বস্ত্র বলিয়া অনেক বাগাড়ম্বর করি; কিন্তু অনেকে একবার একটা কার্পাসের গাছ দেখি নাই। সৌন্দর্য্য হিসাবে বাগানের শোভার হিসাবে দেখিলেও কার্পাস

গাছ নিতান্ত অনাদরের জিনিষ নয়। ইংরেজী ক্রোটনের জন্য লোকে পাগল। ক্রোটনের পাশে কার্পাস রোপণ করিয়া দেখ, শোভায় ক্রোটনকে পরাজয় করে কি না।

সিন্ধুপ্রদেশে মিসরী (Egyptian) কার্পাসের চাষ হয়। উক্ত কার্পাস নিলাম করিয়া বিক্রয় করা হয়। ইহাতে চাষী ও ক্রেতা উভয়েরই সুবিধা আছে। যত মিসরী কার্পাস উৎপন্ন হয়, তাহার আন্দাজ বার আনা অংশ কৃষক নীলাম স্থানে না যাইয়া নিজেই বিক্রী করে। নীলামস্থলে কার্পাস আনিবার খরচ গভর্ণমেণ্ট চাষীদের কাছে আদায় করেন। এই জন্যই অনেকে কার্পাস পাঠায় না। গভর্ণমেণ্ট অনেক বৎসর কার্পাস নীলাম করাইবেন। প্রজাদিগকে নীলাম স্থলে কার্পাস আনিবার খরচ হইতে প্রথম ৪।৫ বৎসর অব্যাহতি দিলে সদাশয়তার পরিচয় দেওয়া হইত। বৎসরে লক্ষ লক্ষ টাকা কৃষিকার্য্যের জন্য ব্যয় করিয়া অবশেষে পাঁচ কি ছয় হাজার টাকার জন্য পরিশ্রম পণ্ড করা উচিত নয়। (উদ্ধৃত)

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য।

বাঁকুধান।—এই ধান খুব অনাবৃষ্টিসহ। ১৯০৬ সালে মালাবার উপকূলে প্রথম ইহার চাষের বন্দোবস্ত হয় ; প্রায় ১০০ জন রায়তে এই ধানের আবাদ আরম্ভ করে। ঐ ধানের ফলন অধিক এবং অনাবৃষ্টিতে ইহার আবাদ নষ্ট হয় না। ইহার চাউল রৌপ্যের ন্যায় শুভ্রবর্ণ এবং সেই জন্য এই চাউলের আদর আছে। ইহাতে অতি সুন্দর পায়স হয়। ইহার খৈ উৎসবে ও পুণ্যকার্য্যে সাদরে ব্যবহৃত হয়। ইহার চাষের পরীক্ষায় আর কোন আবশ্যক নাই। ইহা মূলতঃ এদেশীয় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ধান্য বলিয়া উহাদের সহজে জন্মাইতে পারা যাইবে।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

শ্রাবণ মাস।

সব্জী বাগ।—এই সময় শাকাদি সীম, ঝিঙ্গে, লঙ্কা, শশা, লাউ, বিলাতী ও দেশী কুমড়া, পুঁই, বরবটী, বেগুন, শাঁকালু, টেঁপারি প্রভৃতি, পাটনাই ফুলকপি, পাটনাই শালগম ইত্যাদি দেশী সব্জী ক্রমান্বয়ে বপন করিতে হইবে।

পালম শাক ও টমাটোর জলদি ফসল করিতে গেলে এই সময় বীজ বপন করিতে হইবে। বিলাতি সব্জী বীজ—বাঁধাকপি, ফুলকপি প্রভৃতি বপনের এখনও সময় হয় নাই।

এ বৎসর বর্ষা জলদি তথাপি মোকাই (ছোট) এব দে-ধান চাষের এখনও সময় যায় নাই।

ফুল বাগিচা।—দোপাটী, ক্লিটোরিয়া (অপরাজিতা), এমারন্থস, কক্সকোম্ব, আইপোমিয়া, ধুতুরা, রাধাপদ্ম (Sun-flower) মার্টিনিয়া, ক্যানা ইত্যাদি ফুল বীজ লাগাইবার সময় এখনও গত হয় নাই। ক্যানার ঝাড় এই সময় পাত্‌লা করিয়া তাহা হইতে দুই একটী গাছ লইয়া অন্যত্র রোপণ করা উচিত।

গোলাপ, জবা, বেল, যুঁই প্রভৃতি পুষ্প বৃক্ষের কলম অর্থাৎ ডাল কাটিং করিয়া পুতিয়া চারা তৈয়ারি করিবার এই উপযুক্ত সময়।

জবা, চাঁপা, চামেলি, যুঁই বেল প্রভৃতি ফুলগাছ এই সময় বসাইতে হয়।

ফলের বাগান।—আম, লিচু, পেয়ারা প্রভৃতি ফলের গাছ এখন বসাইতে পারা যায়। বর্ষান্তে বসাইলে চলে কিন্তু সে সময় জল দিবার ভালরূপ বন্দোবস্ত করিতে হয়। এখন ঘন ঘন বৃষ্টিপাত হওয়ায় কিছু খরচ বাঁচিয়া যায়। কিন্তু সতর্ক হওয়া

উচিত, যেন গোড়ায় জল বসিয়া মারা না যায়। আম, লিচু, কুল, পীচ ও নানাপ্রকার লেবু গাছের গুলকলম করিতে আর কাল বিলম্ব করা উচিত নহে। লেবু প্রভৃতি গাছের ডাল মাটি চাপা দিয়া এখনও কলম করা যাইতে পারে। এইরূপ প্রথায় কলম করাকে লেয়ারিং (layering) করা বলে।

আনারসের গাছের কেঁকড়িগুলি ভাঙ্গিয়া বসাইয়া আনারসের আবাদ বাড়াইবার এই উপযুক্ত সময়।

আম, লিচু, পীচ, লেবু, গোলাপজাম প্রভৃতি ফল গাছের বীজ হইতে এই সময় চারা তৈয়ারি করিতে হয়। পেঁপের বীজ এই সময় বপন করিতে হয়।

যাঁহারা বেড়ার বীজ দ্বারা বেড়া প্রস্তুত করিবেন তাঁহারা এই বেলা সচেষ্ট হউন। এই বেলা বাগানের ধারে বেড়ার বীজ বপন করিলে বর্ষার মধ্যেই গাছগুলি দস্তুরমত গজাইতে পারে।

শস্য ক্ষেত্র।—কৃষকের এখন বড় মরশুম। বিশেষতঃ বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা ও আসামের কতক স্থানের কৃষকেরা এখন আমন ধান্যের আবাদ লইয়া বড় ব্যস্ত। পূর্ব্ব বঙ্গে অনেক স্থানে পাট কাটা হইয়া গিয়াছে। দক্ষিণ বঙ্গে পাট নাবি হয়। ধান্য রোপণ শ্রাবণের শেষে হইয়া যাইবে। আষাঢ় মাসে বীজ ধান্য বপনের উপযুক্ত সময়।

আম, নারিকেল, লিচু প্রভৃতি গাছের গোড়া খুঁড়িয়া তাহাতে বৃষ্টির জল খাওয়াইবার এই সময়। কাঁঠালের গোড়া খুঁড়িয়া দিবার এখন একটু বিলম্ব আছে। ফল শেষ হইয়া গেলে তবে গাছের গোড়ার মাটি বিচলিত করা কর্ত্তব্য। গুপারী গাছের গোড়ায় এই সময় গোবর মাটি দিতে হয়। এই সময় ঐ সকল গাছের গোড়ায় সামান্য পরিমাণ কাঁচা গোবর দিলে বিশেষ উপকার পাইবার সম্ভাবনা। হাড়ের গুঁড়াও এই সময় দেওয়া যাইতে পারে।

আয়কর বৃক্ষ যথা, শিশু, সেগুন, মেহগ্নি, খদির, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, কাঞ্চন প্রভৃতি বৃক্ষের বীজ এই সময় বপন করা উচিত।

ক্ষেতে জল না জমে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা ও ক্ষেতের পয়নালা ঠিক করিয়া রাখা এই সময় বিশেষ আবশ্যক।

যদি দেখিতে পাও, কোন গাছের গোড়ায় অনবরত জল বসিতেছে, তাহা হইলে তাহার আইল ভাঙ্গিয়া দিয়া এরূপে নালা কাটাইয়া দিবে যেন শীঘ্র গাছের গোড়া হইতে জল সরিয়া যায়। কলার তেউড় এমাসে পুতিলেও হইতে পারে। বেগুন, আদা ও হলুদের জমি পরিষ্কার করিয়া গোড়ায় মাটী ধরাইয়া দিবে। আখের গাছে কতকগুলি পাতা ভাঙ্গিয়া আর কতকগুলি তাহার গায়ে জড়াইয়া দিবে। গাছগুলি যখন বেশ বড় হইয়া উঠিবে তখন নিকটস্থ চারি গাছা আখ একত্রে বাঁধিয়া দিবে, নহিলে বাতাসে গাছ হেলিয়া পড়িবে কিম্বা ভাঙ্গিয়া যাইবে। যে স্থানে সর্ব্বদা রৌদ্র পায়, সেই স্থানের উত্তমরূপে চাষ দেওয়া জমিতে সারি করিয়া লঙ্কার চারা পুতিবে। এই মাসের প্রথম পনের দিনের মধ্যে লঙ্কা পুতিতেই হইবে, নচেৎ গাছ ও ফল ভাল হয় না। রৌদ্র না পাইলে লঙ্কার ঝাল হয় না। যে দোঁয়াশ মাটীতে বালির অংশ কিছু বেশী আছে, সেইরূপ জমিতে এক কি দেড় হাত অন্তর দাঁড়া বাঁধিয়া ঐ দাঁড়ার উপর আধ হাত অন্তর দুইটী করিয়া শাঁক আলুর বীজ পুতিবে। শাঁক আলুর ক্ষেত সর্ব্বদা আল্গা ও পরিষ্কার রাখিবে। এই মাসের শেষে কিম্বা ভাদ্রের প্রথমে আউস ধান কাটে।

REGISTERED No. C 192.

কৃষক

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসনের মুখপত্র

শ্রাবণ, ১৩১৬ ।

[redacted]

কৃষক।

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

দশম খণ্ড,—৪র্থ সংখ্যা।

সম্পাদক—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস্।

শ্রাবণ, ১৩১৬।



কলিকাতা ; ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে
শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা ; ১৯৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, দি মিলার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
এস, এইচ, রহমান দ্বারা মুদ্রিত।



কৃষক।

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১০ম খণ্ড। | শ্রাবণ, ১৩১৬ সাল। | ৪র্থ সংখ্যা।

পাট বা নালিতা।

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত, এম,আর,এ,সি, লিখিত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

১৯। রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা পাটের ফাস নির্ণয়।

আমরা এ পর্য্যন্ত পাটের ফাস সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহাতে হয় ত অনেক পাঠকের জ্ঞান-পিপাসা চরিতার্থ হইবে না। অনেকে হয় ত বৈজ্ঞানিক প্রণালী দ্বারা স্থিরীকৃত পাটের ফাসের সম্বন্ধে একটা বাঁধা সোজা উত্তর আশা করেন। বাস্তব কৃষিশাস্ত্রে এরূপ কোন বাঁধা উত্তর নাই। পাঁটের উৎকৃষ্ট ফাস কি? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমরা অক্ষম। প্রশ্নটী করা যত সোজা তাহার উত্তর দেওয়া তত সোজা নয়। কৃষিশাস্ত্রে কোন বাঁধা মন্ত্র নাই। কেবলই পরীক্ষা, পরীক্ষার উপর পরীক্ষা। পরীক্ষা করিতে হইলেই পয়সার উপর পয়সা ঢালিতে হয়। একজন মিস্ত্রী যতই সুশিক্ষিত হউক না কেন, যদি তাহার কাট বা যন্ত্র কিনিবার জন্য উপযুক্ত খরচা না জোটে তবে তাহার শিক্ষা চিরদিন বন্ধ্যাই থাকিবে। আমাদের অতি সুশিক্ষিত কৃষিবিৎদিগের কৃষিবিদ্যাও সেইরূপ। কৃষির অনুশীলনে যে দেশের অর্থ ব্যয় হইতেছে না এমন নয়। তবে সেই সকল যাঁহাদের তত্ত্বাবধানে ব্যয় হইতেছে তাঁহাদের এ দেশের কৃষকদিগের অবস্থা এবং অভাবাদির জ্ঞান অতি শোচনীয়। কৃষকের যাহা যাহা জানা হয় ত আবশ্যক তাহা সম্বন্ধে কোন পরীক্ষাই করেন না—অথবা পরীক্ষা করিয়াও এমনই সকল ব্যবস্থা করেন যাহা কৃষকের অবস্থার একেবারে অনুপযোগী। পাটের ভাল ফাস কি? এই প্রশ্নের বিজ্ঞান-সঙ্গত একটি সদুত্তর দিতে হইলে এই কয়টী কথা জানা আবশ্যক:—(১) পূর্ণবিকাশ-প্রাপ্ত পাট গাছে কোন্ কোন্ পদার্থ কি পরিমাণ থাকে। (২) যে জমিতে পাটের চাষ হইবে সেই জমিতে এই সকল পদার্থের কোন্টা পাটের গ্রহণ-যোগ্য অবস্থায় কি পরিমাণে আছে। (৩) যে সকল ফাস চাষারা ব্যবহার করিতে সক্ষম, তাহার মধ্যে ঐ সকল পদার্থের কোন্টা সেই সকল ফাসে কি পরিমাণে আছে অর্থাৎ পাটের গাছ, পাটের মাটী এবং পাটের ফাস এই তিনটিরই বিস্তারিত

রাসায়নিক বিশ্লেষণ ভালরূপে হওয়া আবশ্যক। বিলাতের কৃষিবিৎ পণ্ডিতেরা বিলাতী শস্য সকলের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া থাকেন, তাহার তুলনায় এখানে কিছুই হয় না।

আমাদের দেশে চা বা নীল সম্বন্ধে যতদূর বৈজ্ঞানিক অনুশীলন হইয়াছে, তাহার তুলনায় আমাদের প্রধান কৃষিশস্য পাট বা ধানের সম্বন্ধে যাহা হইয়াছে তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর। পাট বা ধানের বিস্তারিত কোনরূপ রাসায়নিক বিশ্লেষণ আমাদের দেশে হয় নাই। এমন কি এক বিঘা জমিতে কাটিবার যোগ্য পাট বা ধানগাছের ওজন কত হয়, তাহার একটা আনুমানিক সিদ্ধান্তও করা হয় নাই। ধানের জন্য তত ঠেকা নয়। কারণ ধান, যব, গমের সহিত এক শ্রেণীভুক্ত (Cereal) যব, গমের বিশ্লেষণ দ্বারাই ইহার ফাসের হিসাব করা মোটামুটী চলে। কিন্তু পাট বাঙ্গালারই শস্য এবং ইহার সমান জাতীয় অন্য কোন শস্য কোথাও নাই। বিনা রাসায়নিক বিশ্লেষণে ইহার ফাসের বৈজ্ঞানিক আলোচনা করা প্রায় অন্ধকারে ঢিল মারা। বিলাতের রথামষ্টেড্ (Rothamsted) অপেক্ষা আমাদের কৃষিপরীক্ষাদিতে যে কম অর্থ ব্যয় হইতেছে তাহা নয়। তবে সেখানকার কৃষকেরা নিজের কার্য্য নিজেরা তত্ত্বাবধান করে, আর আমাদের দেশে "কার বা গোয়াল কেবা দেয় ধূমা"। এই অবস্থায় পাটের ফাসের সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা একরূপ অসম্ভব। পাটের রাসায়নিক বিশ্লেষণ ফল কতকটা যব, গমেরই মতন হইবে এরূপ অনুমান ভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পাটের ফাসের হিসাব করার উপায়ান্তর নাই।

দ্বিতীয় কথা মাটীর বিশ্লেষণও আমাদের দেশে হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রত্যেক ক্ষেত্রের মাটীতে শস্যের খাদ্য বস্তু সকল ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে অবস্থিত। শুধু তাহা নয়। প্রত্যেক শস্যের চাষের পর সেই শস্যক্ষেত্রের শস্য-খাদ্যের পরিমাণের তারতম্য হয়। বিলাতের স্থানে স্থানেই রাসায়নিক বিশ্লেষণালয় (Chemical laboratory) রহিয়াছে এবং চাষারা অতি অল্প ব্যয়ে যখন যাহার ইচ্ছা এবং যে জমির ইচ্ছা মাটীর রাসায়নিক বিশ্লেষণ ফল পাইতে পারে। আমাদের চাষার সে সুবিধা নাই, সে সুবিধা পাইবার ইচ্ছাও নাই। সে সুবিধা করিয়া দিবার জন্যও কেহ ব্যস্ত নয়। ইংলণ্ড, আমেরিকায় সুশিক্ষিত আমাদের দেশীয় উপযুক্ত লোকের অভাব নাই, কিন্তু সুবিধার অভাবে "কামার মানুষের কুমার কামের" মত কেহ ফৌজদারী হাকিম, কেহ বা আদালতের জজ বা ব্যারিষ্টার, কেহ বা কৃষিবিভাগে থাকিয়াই নিরবচ্ছিন্ন কেরাণীস্থানীয় এসিষ্টাণ্টগিরি করিয়া দেহভার বহন করিতেছেন। জমির বিশ্লেষণ ফল পরস্পর এত ভিন্ন হয় হয় যে, ডাক্তার লেদার (Dr. Leather) এক শিবপুর কৃষিক্ষেত্রের জমি বিশ্লেষণ করিয়াই তিন রকম ফল পাইয়াছেন। আমরা ফাসের হিসাব করিবার জন্য শিবপুর কৃষি-ক্ষেত্রের আটাল মাটী এবং বৰ্দ্ধমান কৃষিক্ষেত্রের দোয়াঁশ মাটীর তাঁহার কৃত বিশ্লেষণ ফলকে বাধ্য হইয়া আমাদের হিসাবের ভিত্তি করিতেছি। "মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ।" প্রকৃতপক্ষে কোন্ জমিতে কোন্ ফাস কি পরিমাণে দিতে হইবে তাহা সেই জমি এবং সেই ফাসের রাসায়নিক বিশ্লেষণ ভিন্ন বলা যায় না। শিবপুর কৃষিক্ষেত্রের আটাল এবং বৰ্দ্ধমান ও ডুমরাউন কৃষিক্ষেত্রের দোয়াঁশ মাটীর রাসায়নিক বিশ্লেষণ করা হইয়াছিল। শিবপুরের এক ঘন ফুট মাটীরও ওজন সদ্য ৯৯·৭ পর্য্যন্ত, দুই মাস শুখাইয়া ৯৪·৫

পাউণ্ড। আমরা জানি যে পাট গাছ মাটীর একফুট পর্য্যন্ত নীচে বিস্তৃত হইয়াই আপন আপন খাদ্য সংগ্রহ করে। এখন দেখা যাউক সেই এক-ফুট গভীর মাটীর মধ্যে বিঘাপ্রতি কি পরিমাণ শস্যের খাদ্য বিদ্যমান আছে। এক ঘন ফুট মাটী শিবপুর কৃষিক্ষেত্র হইতে গ্রহণ করিয়া তাহা দুই মাস বাতাসে শুকাইয়া আমরা ওজন করিয়া দেখিয়াছি যে তাহার ওজন ৯৪.৪ পাউণ্ড। এক বিঘা জমি এক ফুট গভীর ধরিলে তাহার ওজন কত হয়? আমরা জানি এক একর জমি ৪৩৫৬০ স্কোয়ার ফুট। প্রায় ৩ বিঘাতে এক একর। অতএব এক বিঘা ১৪৮৫৩ স্কোয়ার ফুটের সমান এবং তাহার এক ফুট গভীর মাটীর ওজন হইবে ১৪৮৫৩×৯৪.৫ পাউণ্ড বা ১৪০৩৬০৮.৫ পাউণ্ড। শ্রম বাহুল্য বিধায় আমরা সমস্ত প্রকার শস্যখাদ্যের পরিমাণ না করিয়া সাধারণতঃ যে কয়টী খাদ্যবস্তুর মাটীতে অভাব দৃষ্ট হয়, তাহারই পরিমাণ হিসাব করিতেছি। তিনটী খাদ্যেরই সাধারণতঃ মাটীতে অভাব দৃষ্ট হয়—নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরিক এসিড এবং পটাস।* অপরাপর প্রায় সমস্ত খাদ্যই মাটীতে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। শিব-পুরের জমিতে শতকরা .০৬৫ ভাগ নাইট্রোজেন আছে, অতএব বিঘাপ্রতি (একফুট গভীর হইলে ১৪০৩৬০৮.৫ পাউণ্ড মাটীতে) ৯১২.৩ পাউণ্ড নাইট্রোজেন, বর্দ্ধমানের জমিতে শতকরা .০৪২ ভাগ নাইট্রোজেন অতএব বিঘাপ্রতি ৫৮৯.৫ পাউণ্ড আছে। পটাস সোডা শিবপুরে শতকরা .৮২ এবং বর্দ্ধমানে শতকরা .৫৬, অতএব বিঘাপ্রতি শিবপুরে ১১৫০৯.৫ পাউণ্ড এবং বর্দ্ধমানে ৭৮৬০.২ পাউণ্ড আছে। ফস্‌ফরিক শিবপুরে শতকরা .১১ এবং বর্দ্ধমানে .০৪ ভাগ, অতএব বিঘাপ্রতি শিবপুরে ১৫৪৩.৯ এবং বর্দ্ধমানে ৫৬১.৪ পাউণ্ড। চুণ সম্বন্ধেও বলা যায় শিবপুরে শতকরা ১.৫২ এবং বর্দ্ধমানে .২৮ ভাগ অতএব বিঘাপ্রতি এক ফুট গভীর মাটীতে শিবপুরে ২১৩৩৪.৮ এবং বর্দ্ধমানে ৩৯৩০.১ পাউণ্ড। এই তালিকা দৃষ্টে হয় ত পাঠক বলিবেন যে, তবে ত ফাসের আর কোন প্রয়োজন নাই। সবই ত যথেষ্ট পরিমাণে মাটীতেই আছে। তাহা নয়। ঠিক কারবারের বা ব্যাঙ্কের মূলধনের ন্যায় এগুলি মাটীতে এরূপ অবস্থায় আছে যে ইহার অতি অল্প অংশই শস্যের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় থাকে। ঠিক মহাজনির বা কোম্পানির কাগজের সুদের মত বায়ু, উত্তাপ এবং কৃষিকার্য্যের সাহায্যে ইহার অতি ক্ষুদ্র অংশই দিনের পর দিন জলে দ্রবণীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া শস্যের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয়। এই গ্রহণযোগ্য (available form) অবস্থায় পরিণত না হইলে সে সকল প্রয়োজনীয়

* ডাক্তার বল্কার (Dr. Voelcker) তাঁহার রিপোর্টে এবং ভূতপূর্ব্ব কৃষি অধ্যাপক স্বর্গীয় নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁহার পুস্তকে এই সকল শস্যখাদ্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার সারমর্ম্ম এই:—ভারতবর্ষের মাটিতে মোটে গড়ে শতকরা .১ ভাগ নাইট্রোজেন এবং তন্মধ্যে .০৩ ভাগ নাই-ট্রেটরূপে এবং .০০০২ হইতে .০০০৪ ভাগ পর্য্যন্ত এমোনিয়া-রূপে শস্যের গ্রহণীয় অবস্থায় আছে। এবং গঙ্গার পলি-ভূমিতে (Gangetic Alluvium) গড়ে শতকরা .০৫ ভাগ নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। ইহারই .৫ ভাগ মাত্র শস্যের গ্রহণযোগ্য নাইট্রেট (nitrate) রূপে থাকে।

ফস্‌ফরিক এসিড মাটিতে গড়ে শতকরা .১ ভাগ থাকে কিন্তু শস্যের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় (soluble in 1 p. c. solution of citric acid) মাত্র তাহার এক তৃতীয়াংশ কি এক চতুর্থাংশ থাকে। শস্যের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় যদি মাটিতে শতকরা .০১ ভাগ ফস্‌ফরিক এসিড থাকে তবে তাহাই যথেষ্ট, এবং ভারতীয় জমিতে শস্যের গ্রহণযোগ্য ফস্‌ফরিক .০১ ভাগের অধিকই আছে। মাটিতে গড়ে শতকরা .০০১ ভাগ হইতে .০৯৯ ভাগ পর্য্যন্ত পটাস শস্যের গ্রহণ যোগ্য অবস্থায় থাকে। গঙ্গার পলিভূমিতে (Gangetic alluvium) চুণের ভাগ শতকরা .৩ হইতে ২ পর্য্যন্ত আছে। শতকরা ১ ভাগ চুণ মাটিতে থাকিলেই শস্যের পক্ষে যথেষ্ট।

খাদ্যবস্তু মাটীতে থাকা না থাকা শস্যের পক্ষে সমান। ডাক্তার লেদারের পরীক্ষাতেই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে আমাদের দেশের মাটীতে গড়ে ·০৫ ভাগমাত্র নাইট্রোজেন আছে (*) (শিবপুরে ·০৬৫ এবং বর্দ্ধমানে ·৪২) এবং তাহার শতকরা মাত্র ·৫ ভাগ শস্যের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় (in an available form) থাকে—অর্থাৎ মাটীতে শতকরা মাত্র ·০০০২৫ ভাগ নাইট্রোজেন শস্যের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় থাকে, অর্থাৎ বিঘাপ্রতি এক ফুট গভীর মাটীতে মাত্র ৩·৪ পাউণ্ড। এইরূপে পটাস সম্বন্ধে দেখা যায় যে আমাদের দেশের মাটীতে মাত্র শতকরা ·০০১ হইতে ·০০৯ ভাগ পর্য্যন্ত শস্যের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় (available or soluble in 1 per cent. citric acid solution) থাকে অর্থাৎ বিঘাপ্রতি ১৩·৬ হইতে ১১৭ পাউণ্ড পর্য্যন্ত পটাস মাত্র শস্যের গ্রহণযোগ্য। আবার ফস্‌ফরিক এসিড সম্বন্ধে দেখা যায় যে আমাদের দেশের মাটীতে গড়ে শতকরা ·১ ভাগ মাত্র থাকে (শিবপুরে ·১১, বর্দ্ধমানে ·০৪) এবং তাহার মাত্র এক তৃতীয়াংশ হইতে এক চতুর্থাংশ পর্য্যন্ত বা শতকরা ·০৩ ভাগ হইতে ·২৫ পর্য্যন্ত শস্যের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় থাকে অর্থাৎ বিঘাপ্রতি একফুট গভীর মাটীর মধ্যে মাত্র ৩৪১ পাউণ্ড হইতে ৪০৯ পাউণ্ড পর্য্যন্ত থাকে।

শস্য বিশ্লেষণ সম্বন্ধে যদি পাটকে গমেরই স্থান দেওয়া যায়, তবে তাহার জন্য পূর্ব্বপ্রদত্ত ওয়ারিংটনের (Warington) তালিকা মতে একর প্রতি যে পদার্থ যে পরিমাণে লাগে বিঘা প্রতি তাহার এক তৃতীয়াংশ লাগিবে ; অর্থাৎ বিঘা প্রতি নাইট্রোজেন ১৬ পাউণ্ড, পটাস সোডা ১০·৪ পাউণ্ড, ফস্‌ফরিক এসিড ৭·০৩ এবং চুণ ৩·০৮ পাউণ্ড প্রয়োজন। ইহার সহিত মাটীস্থিত গ্রহণযোগ্য খাদ্যের তুলনা করিলে দেখা যায় যে, যে স্থলে ১৬ পাউণ্ড গ্রহণযোগ্য নাইট্রোজেন দরকার সেস্থলে মাটী হইতে মাত্র ৩·৪ পাউণ্ড পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন মিষ্টার ব্যাম্বার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, প্রতি বৎসর কলিকাতা অঞ্চলে বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত ছয় মাস মধ্যে, বৃষ্টির সঙ্গে বায়ু হইতে এমোনিয়ারূপে প্রতি একরে ৩·৪ পাউণ্ড অথবা বিঘা প্রতি ১·১ পাউণ্ড নাইট্রোজেন শস্যের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় মাটীতে পতিত হয়। এই ৪।৫ পাউণ্ড বাদে বাকি ১০।১২ পাউণ্ড নাইট্রোজেন ফাসরূপে প্রয়োগ না করিলে শস্য উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে পুষ্টিলাভ করিতে পারে না। এখন দেখা যাউক যদি গোবর সার দ্বারা এই ১০।১২ পাউণ্ড নাইট্রোজেন যোগাইতে হয়, তবে কি পরিমাণ গোবর সারের দরকার। ডাক্তার বল্‌কারের পরীক্ষাতে দেখা যায় যে, বাতাসে শুকান গোবরে

(*) "Among the soils representing the Gangetic alluvium, 3 out of 10 contain ·05 per cent. or a little more, (of Nitrogen) the rest less" (p.27) "Mr. Bamber, the then Chemist of the Indian Tea Association Calcutta, found that the Nitrogen in the rainfall at Calcutta from May to October was equal to 3·4 lbs. ammonia " (p. 40) "Of the Gangetic alluvium soils six contained ·08 or less, four contained ·09 to ·13" (p. 24). "It may then be fairly assumed that in these two great types of Indian soils (Gangetic alluvium and regur), about $\frac{1}{3}$ or $\frac{1}{4}$ of the total phoshoric acid is generally available." (p. 26). The amount of potash was not determined in all the samples analysed......It was generally present in very fair or even large amounts.....In those samples from the farms the proportion of *available* potash was in no case deficient." (p. 24). "The soils of the alluvium contained from ·3 to ·2 per cent." of lime. (p. 23). Final Report of Dr. Leather, *Agricultural Chemist, Govt. of India.*

শতকরা ১·৩৪ ভাগ নাইট্রোজেন আছে। এই অনুপাতে হিসাব করিলে দেখা যায় ৯৭০ পাউণ্ড গোবর সার প্রয়োগ করিলে ঐ ১০ পাইণ্ড নাইট্রোজেন পাওয়া যাইবে, অথবা বিঘা প্রতি ৯।১০ মণ বা আধ গাড়ী গোবর সার প্রয়োজন। আধ গাড়ী গোবরের দাম সুবিধা মত স্থানে ১৲ টাকা হয়। যদি গোবর সারের পরিবর্ত্তে খৈল ফাস দ্বারা এই ১০ পাউণ্ড নাইট্রোজেন প্রয়োগ করিতে হয়, তবে কত দিতে হইবে? পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে সরিষার খৈলে শতকরা প্রায় ৫ কি ৬ ভাগ নাইট্রোজেন আছে। এই অনুপাতে হিসাব করিলে দেখা যায় ১০ পাউণ্ড নাইট্রোজেন পাইবার জন্য ২০০ পাউণ্ড সরিষার খৈল ফাসরূপে ব্যবহার করিতে হয় অর্থাৎ বিঘা প্রতি ২/০ মণ বা ২॥০ মণ খৈল ফাস দিতে হয়, এবং তাহার মূল্য ৩৲ টাকা মণ হিসাবে ৬৲।৭৲ টাকা হইবে। যদি সোরা ফাসরূপে ব্যবহার করিয়া সেই ১০ পাউণ্ড নাইট্রোজেন প্রয়োগ করিতে হয় তবে কত লাগিবে? একথা বলা আবশ্যক যে বর্ষা আরম্ভ হইলে পর সোরা ব্যবহার করিবে না, কারণ ইহা সহজেই জলে ধুইয়া চলিয়া যায়, বর্ষারম্ভের অন্ততঃ ২ মাস পূর্ব্বে এবং গাছ অন্ততঃ আধ হাত উচ্চ হইলেই সার ব্যবহার করিতে হয়। আমাদের সচরাচর বাজারে যে সোরা পাওয়া যায় তাহাতে ভাল মন্দ অনুসারে শতকরা ৫০ হইতে ৯৫ ভাগ পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ সোরা (Nitrato of potash) থাকে এবং ভাল মন্দ অনুসারে সোরার দর ৩৲ টাকা হইতে ৮৲ টাকা পর্য্যন্ত মণ প্রতি লাগে। বিশুদ্ধ সোরার মধ্যে শতকরা ১৩·৮ ভাগ নাইট্রোজেন আছে এবং বাজারের সোরার মধ্যে গড়ে মাঝামাঝি শতকরা ৭০ ভাগ বিশুদ্ধ সোরা ধরিলে—(মূল্যও মাঝামাঝি ৬৲ টাকা মণ ধরিতে হয়) দেখা যায় যে বাজারের সোরাতে ৯·৬৬ ভাগ বা মোটামুটী ১০ ভাগ নাইট্রোজেন আছে। ফাসরূপে ১০ পাউণ্ড নাইট্রোজেন প্রয়োগ করিতে হইলে ১ মণ ১০ সের সোরা ব্যবহার করিতে হয় এবং তাহার মূল্য ৬৲ টাকা মণ হিসাবে প্রায় ৭৲ টাকা হয়। ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে জমিতে নাইট্রোজেন (সোরাজান) প্রয়োগ করিতে হইলে কৃষকের পক্ষে গোবর ফাস প্রয়োগেই সর্ব্বাপেক্ষা ব্যয় কম। ইহাও দেখা যায় যে, সচরাচর আমাদের জমিতে নাইট্রোজেন (সোরাজান) প্রয়োগ করিতে হইলে কৃষকের পক্ষে গোবর ফাস প্রয়োগেই সর্ব্বাপেক্ষা ব্যয় কম। ইহাও দেখা যায় যে, সচরাচর আমাদের জমিতে নাইট্রোজেন ভিন্ন অন্য কোন শস্য খাদ্যেরই অভাব নাই। তবে স্থল বিশেষে পটাসের ও ফস্‌ফরিকেরও (Potash and phosphates) অভাব হইতে পারে। পূর্ব্বপ্রদর্শিত বিলাতি শস্য বিশ্লেষণ তালিকা দৃষ্টে বলিতে হয় যে, পাটের জন্য ২৮·৮ পাউণ্ড গ্রহণযোগ্য পটাস মাটীতে আবশ্যক; কিন্তু মাটী বিশ্লেষণ দ্বারা দেখা যায় যে, স্থল বিশেষে মাটীতে মাত্র ১৩·৬ পাউণ্ড শস্যের গ্রহণযোগ্য পটাস থাকিতে পারে। ঐরূপ অবস্থায় অবশিষ্ট ১৫ পাউণ্ড পটাস ফাসরূপে যোগাইতে হয়, এবং সে জন্য সাধারণ ছাইই উৎকৃষ্ট। ছাইএর মধ্যে অন্ততঃ শতকরা ৪০ ভাগই শস্যের গ্রহণযোগ্য পটাস। কলাগাছ, মান্দার ও তামাকের ছাইয়েতে অনেক বেশী। বিঘাপ্রতি আধ মণ ছাই প্রয়োগ করিলেই পটাসের অভাব মোচন হইবে। আবার ডাক্তার লেদারের পরীক্ষাতে দেখা যায় যে, আমাদের জমিতে সাধারণতঃ ফস্‌ফরিক এসিডের অভাব নাই। বিস্তীর্ণ ভারতভূমির মাত্র ১০।১২ স্থানের ২।১ খণ্ড জমির মাটী বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। আবার বিদেশীয়েরা

ভারত হইতে অস্থি সকল স্ব স্ব দেশে রপ্তানি করিতেছে। আমাদের দেশে অস্থিসারের প্রয়োজন আছে এরূপ প্রতিপন্ন হইলে তাহাদের স্বার্থের ব্যাঘাত হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় অস্থিসার সম্বন্ধে বিদেশীয়দিগের মীমাংসার উপর কতদূর নির্ভর করা সঙ্গত পাঠকই তাহা বিবেচনা করিবেন। পূর্ব্বপ্রদর্শিত ওয়ারিংটনের গমের বিশ্লেষণ ফল দৃষ্টে ধরা যায় যে, আমাদের পাটের জন্যও ২১ পাউণ্ড ফস্ফরিক এসিডের প্রয়োজন। তাহার অর্দ্ধেকও যদি আমাদের মাটীতে গ্রহণযোগ্য অবস্থায় থাকে, তবে বাকি দশ পাউণ্ড ফস্ফরিক, অস্থিসার প্রয়োগ করিয়া যোগাইতে হয়। অস্থিসারে শতকরা ২১ ভাগ ফস্ফরিক এসিড পাওয়া যায়। বিঘাপ্রতি এক মণ অস্থিসার প্রয়োগ করিলেই পাটের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। ইহাও এস্থলে বলা আবশ্যক যে অস্থিসারে শতকরা ৪ ভাগ সোরাজান থাকে এবং অস্থিসার প্রয়োগ করিলে তদ্দ্বারা কতক পরিমাণে সোরাজান প্রয়োগেরও ফল পাওয়া যায়। অস্থিসার পাটের জমিতে প্রয়োগ করিয়া অনেকে ভাল ফল পাইয়াছেন। অনেক স্থলে সেই উপকার অস্থিসারের ফস্ফরিক এসিড দ্বারা সংঘটিত না হইয়া, তাহার সোরাজান দ্বারাও সংঘটিত হইতে পারে। অস্থিসার প্রয়োগ করিলে তাহাতে যে সোরাজান আছে তাহার অনুপাতে হিসাব করিয়া গোবরসার কি খৈল কম দিলে ক্ষতি হইবে না। যাহা হউক রাসায়নিক বিশ্লেষণ ফল লইয়া এত কথা বলিবার এখনও সময় আসে নাই। কারণ আমাদের কৃষক সমাজের বর্ত্তমান অবস্থাতে শস্য এবং মাটী উভয়ের রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা কোন্ জমিতে পাটের জন্য কোন্ ফাস কি পরিমাণ ব্যবহার করা উচিত, তাহা স্থির করিয়া কৃষিকার্য্য করা অতি দূরের কথা। এখন অন্য সহজসাধ্য উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক।

২০। ক্ষেত্রে ফাস পরীক্ষা।

আমরা দেখাইয়াছি যে শস্যের পুষ্টির জন্য চারিটী বস্তুই ফাসরূপে প্রয়োগ করা স্থলভেদে দরকর হয়ঃ—যথা—নাইট্রোজেন, পটাস, ফস্ফরিক, এবং চূণ। পরীক্ষা স্বরূপ অল্প পরিমাণ জমিতে অল্প পরিমাণে এই সকল বস্তু প্রয়োগ করিয়া ফসল সম্বন্ধে তাহার ফল দেখিয়া সেই শস্যের জন্য সেই জমিতে কোন্ কোন্টি ফাসরূপে ব্যবহার করা উচিত তাহা স্থির করা যায়। মনে কর তোমার জোত্ হইতে তুমি এক বিঘা জমি পাটের ফাস পরীক্ষার জন্য পৃথক করিয়া নিলে। সেই জমিটী সমানভাবে ছয়টি অংশে বিভক্ত কর। প্রথম অংশে বিনা ফাসে পাটের চাষ কর। দ্বিতীয় অংশে ওজন করিয়া অল্প পরিমাণ নাইট্রোজেন খৈলরূপে, অল্প পরিমাণ পটাস সাধারণ ছাই রূপে, এবং অল্প পরিমাণ ফস্ফরিক অস্থিসাররূপে এবং অল্প পরিমাণ চূণ প্রয়োগ কর। তৃতীয় অংশে নাইট্রোজেন বাদে বাকি ৩টি প্রয়োগ কর। চতুর্থ অংশে পটাস বাদে বাকি ৩টি প্রয়োগ কর। পঞ্চম অংশে ফস্ফরিক বাদে বাকি ৩টি প্রয়োগ কর। এবং ষষ্ঠ অংশে চূণ বাদে বাকি ৩টি প্রয়োগ কর। চাষ, বীজ

বপন, জল সেচন প্রভৃতি সম্বন্ধে সব অংশে সমানরূপ ব্যবহার করিবে। প্রত্যেক অংশের শস্য পৃথক পৃথক ভাবে সংগ্রহ করিয়া ওজন কর। ফসলের পরিমাণের তুলনা দ্বারাই প্রতিপন্ন হইবে তোমার জমিতে কোন বস্তুর অভাব এবং কি ফাস দিতে হইবে। মনে কর প্রথম অংশে ২০ সের, দ্বিতীয় অংশে ৪০ সের, তৃতীয় অংশে ২৫ সের, চতুর্থ অংশে ৪০ সের, পঞ্চম অংশে ৩৫ সের, এবং ষষ্ঠ অংশে ৪০ সের পাট হইয়াছে। প্রথমাংশে ফাস না দিয়া ফসল মাত্র ২০ সের হইল অতএব ফাস দেওয়া আবশ্যক। দ্বিতীয় অংশে চারি প্রকারের বস্তুই প্রয়োগ করিলাম ফসল পাইলাম ১ মণ—চতুর্থ অংশে পটাস না দিয়া পাইলাম ১ মণ—অতএব পটাস দিবার প্রয়োজন নাই। আবার ষষ্ঠ অংশে চূণ দিলাম না তাহাতেও সেই ১ মণই পাইলাম। অতএব চূণ দিবারও কোন প্রয়োজন নাই। আবার পঞ্চম অংশে ফস্‌ফরিক দিলাম না, ফসল ⁄৫ সের কমিয়া গেল, অতএব ইহা দিবার প্রয়োজন আছে। সেইরূপ তৃতীয় অংশে নাইট্রোজেন দিলাম না। ফসল ১৫ সের কমিয়া গেল। অতএব নাইট্রোজেন দেওয়া প্রয়োজন। এইরূপে পরীক্ষাদ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে পাটের জন্য তোমার জমিতে ফস্‌ফরিক এবং নাইট্রোজেনের প্রয়োজন। এইরূপ পরীক্ষাদ্বারা কৃষক অল্প ব্যয়েই আপনার জমির জন্য কোন্ শস্যের কি ফাস দেওয়া প্রয়োজন স্থির করিতে পারেন। আবার ফাস ঠিক হইলে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে তাহা ব্যবহার করিয়া পরীক্ষা দ্বারাই স্থির করিতে পারেন কোন্ শস্যের জন্য কোন্ জমিতে কি পরিমাণ ব্যবহার করিতে হইবে। আমাদের দেশের কৃষকদের জন্য ফাস ঠিক করিবার এই উপায়ই প্রশস্ত।

নিম্ন শ্রেণীয় জন্তুর চর্ম্ম।

ইউরোপ, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া দেশের প্রাণীতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদিগের মনোমধ্যে সম্প্রতি এক অভিনব প্রকারের দুঃখের উদয় হইয়াছে; সেই বিষম দুঃখের কথা শ্রবণ করিয়া পাঠক মহাশয়েরা হাসিবেন কি কাঁদিবেন, আমি তাহা জানিনা; কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, এইরূপ অপূর্ব্ব ভাবের বিলাপকারী পুরুষদিগের সহিত আমি কোন মতে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারি না। বিদেশীয় প্রাণীতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা কহিতেছেন, ইউরোপ, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া দেশের নদ, নদী, তড়াগ, কূপ, ঝিল, বিল, জলাশয় প্রভৃতিতে যত অসংখ্য কোটী ভেক বিচরণ করে, দুঃখের বিষয়, তাহাদের মাংস ভক্ষণ করিবার জন্য তত অসংখ্য কোটি মানব পৃথিবীতে নাই। সাহেবদের আরও দুঃখ এই যে, ভারতবর্ষের লোকেরা কুসংস্কার বর্জ্জন পূর্ব্বক যদি ভেকমাংস ভক্ষণ করিত এবং ভেকমাংসের ব্যবসায়ে মনোযোগী হইত তাহা হইলে ভারতের জাতীয় ধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ব্যাংএর মাংসে বহুবিধ ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া তদ্দেশবাসীরা অনেক সহস্র টাকা আয় করেন, ইহাও শুনা যায় এবং পড়া যায়। এই সকল মাংস ও মিষ্টান্ন, টাট্‌কা (তাজা) খাওয়া হয় এবং টিনের কৌটায় অথবা কাচের শিশিমধ্যে (বিক্রয়ার্থ) প্রবদ্ধ (Preserved) করিয়া রাখা হয়। তদ্ভিন্ন ভেকের চর্ম্ম বহুস্থানে বহুকারণে বিক্রীত হইয়া থাকে, এই চর্ম্মে নানাপ্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হয়। উপরি উক্ত প্রাণীতত্ত্ববিদ্

পণ্ডিতদিগের ইচ্ছা এই, ভারতবর্ষের লোকেরা যেন ভেকের মাংস ভক্ষণ ভেকের মাংসে খাদ্য-দ্রব্য প্রস্তুত এবং ভেকের চর্ম্ম বিক্রয় করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। দুঃখের বিষয়, ইঁহাদের এই কথা গুলি ভারতবাসীরা কখন পালন করিতে সম্মত হইবেন না ইহা নিশ্চয়, কারণ ভারতের লোকের ইহা সমাজ, ধর্ম্মশাস্ত্র ও দেশাচার বিরুদ্ধ। ইংরাজি ১৯০৪—৫ অব্দে পৃথিবীর কোন্ কোন্ দেশে ব্যাংএর ব্যবসায়ে কত টাকা আদায় হইয়াছে, নিম্নে তাহার একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা দেখুন।

		ভেকের চর্ম্ম বিক্রয়	ভেকের মাংস বিক্রয়	ভেকের মাংসেপ্রস্তুত মিষ্টান্ন প্রভৃতি।
		পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড
১	ইংলণ্ড	১৩৬৭	৫৭৬	২৯৮১
২	স্কটলণ্ড	১৪০০	৭৮০	১৪৯১
৩	চীন	২০০০	৯০১	১০২১
৪	হলণ্ড	৮০০	৬৫১	৮৮২
৫	পর্টুগাল	৯৮৪	১১১২	৩১১
৬	স্পেন	২০১৩	৪৮০	৫০১
৭	নিউ আমেরিকা	৪০৯৯	৭৯১	৯০১
৮	ফ্রান্স	৬০৩২	১০০০	৮০৯
৯	অষ্ট্রীয়া	১১৭	২৮৮	৩৭৭
১০	বুয়রদেশ	২৮২	১১১	৩৩৪

হিন্দুস্থানে গো জাতীয় পশুর ও মহিষের চামড়ার কারবার যে পরিমাণে হয় অন্য কোন পশুর চর্ম্মের ব্যবসা তাহার শতাংশের একাংশও হয় না। কিন্তু তাহাতে মুসলমান জাতির আয় বৃদ্ধি হয়, হিন্দুর কোন লাভ নাই; কারণ হিন্দুর পক্ষে ইহা শাস্ত্রীয় ও সামাজিক প্রথার বিরোধী। কতকগুলি কার্য্য মুসলমান জাতির এদেশে একচেটিয়া হইয়া গিয়াছে, অতি অল্প সংখ্যক অত্যন্ত নীচ জাতীয় সঙ্করবর্ণের হিন্দু ব্যতীত তাহাতে আর কেহ হস্তার্পণ করে না। দপ্তুরী, খালাসী, সারং, চামড়া বিক্রেতা, খানসামা, বাবুর্চ্চী প্রভৃতির কার্য্য ইসলামীয় ব্যক্তিদিগের এক চেটিয়া, সুতরাং গো-চর্ম্ম বা মহিষ-চর্ম্মের ব্যবসায়ে সর্ব্ব-শ্রেণীর লোকের অধিকার নাই। ভারতবর্ষে ইংরাজি ১৯০৬-৭ বৎসরে গো-চর্ম্ম ও মহিষ-চর্ম্মে গড়ে প্রায় উনিশ লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছিল। ইহার মধ্য হইতে শুল্ক, ইনকমট্যাক্স, লাইসেন্স ফি, খরচার টাকা প্রভৃতি বাদ দিয়া একাদশ লক্ষ টাকা মাত্র লাভ ছিল। ইহার কিয়দংশ নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুর হস্তগত হইয়াছে, বাকী টাকা গ্রীক সওদাগর, য়িহুদী বণিক, ইংরাজ ব্যবসায়ী এবং মুসলমানদিগের করায়ত্ব হইয়া গিয়াছে।

মেষ, মৃগ, ব্যাঘ্র, সিংহ, ভল্লুক প্রভৃতির চর্ম্ম, এদেশে কোন কালে প্রকৃত ব্যবসার জিনিষ বলিয়া সংগৃহীত হয় নাই। শার্দ্দূল, সিংহ, মৃগ, ও হস্তীর চর্ম্ম বিক্রয় করা হিন্দুশাস্ত্র মতে নিষিদ্ধ। কারণ এই সকল চর্ম্ম যোগাসন রূপে ব্যবহৃত হইবার বিধি আছে। মেষের চর্ম্ম কখন কখন কোন কোন স্থানে বিক্রীত হইয়া থাকে। কিন্তু বিদেশে যেমন তাহার আদর, এদেশে তত নহে। এদেশে মেষের চর্ম্মে অতি অল্প সংখ্যক জিনিষ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ Capital (ক্যাপিটাল) নামক ইংরাজী সংবাদপত্রের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত লুক সাহেব বিবেচনা করেন, কুম্ভীরের চর্ম্মের ব্যবসায়ে ভারতবর্ষবাসী প্রতিবর্ষে অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতে পারেন। কথাটা আমরা কখন পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই, কিন্তু বৃন্দাবন ধামে আমি অনেক বৎসর পূর্ব্বে এক ইউরোপীয় পুরুষকে বহুমূল্য দিয়া হস্তীচর্ম্ম ও কুম্ভীর চর্ম্ম ক্রয় করিতে দেখিয়াছিলাম। তিনি একটা সুবৃহৎ হস্তীচর্ম্ম ১৫০৲ টাকায় খরিদ করিয়াছিলেন এবং একটা বৃহদাকার কুম্ভীর চামড়া ন্যূনাধিক দুই শত টাকায় ক্রয় করিয়া ইউরোপে লইয়া গিয়াছিলেন। এই কুম্ভীর মধ্যপ্রদেশের সম্বলপুর নগরতলবাহিনী মহানদীতে নিহত হইয়াছিল এবং ঐ হাতী ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজার রাজ্যস্থিত এক প্রকাণ্ড অরণ্যে বিচরণ করিত। ভারতবর্ষে কুম্ভীরগণ বাইশ শ্রেণীতে বিভক্ত, ইহার মধ্যে দশ প্রকার পুরুষ এবং বার প্রকার স্ত্রী। কুম্ভীরদিগের মধ্যে পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীর সংখ্যা অধিক। ইহাদের নাম নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে। পুরুষ জাতীয় কুম্ভীরের নাম—(১) অলক (২) অঞ্জন (৩) কোটাল (৪) জলহর (৫) নক্র (৬) সুপক্ষ (৭) গবাক্ষ (৮) ভৈরব (৯) চিত্রক (১০) গজকচ্ছপ। স্ত্রী জাতীয় দিগের দ্বাদশ নাম এই—(১) পরোক্ষী (২) চতুরা (৩) জ্যোতি (৪) শিশু (৫) সোহনা (৬) কমলা (৭) কৃষ্ণকান্তি (৮) জটাহী (৯) ময়ূরী (১০) তাপসী (১১) তড়িতা (১২) পাণিপদা। লুক সাহেব বলেন, ভুবনবিখ্যাত আমেরিকার কুম্ভীর অপেক্ষাও ভারতবর্ষীয় কুম্ভীরের চর্ম্ম বহু মূল্যবান। আমরা এ বিষয়েরও কখন উত্তম রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই। অগাধ জলে কুমীর ধরিয়া তাহাকে নিহত করিয়া, তদনন্তর তাহার চর্ম্ম সংগ্রহপূর্ব্বক ব্যবসা করা ভারতবাসীর প্রবৃত্তি ও পরিশ্রমে কুলায় না। সুতরাং এ বিষয়ে বিশেষরূপে কেহ উৎসাহ প্রাপ্ত হইবেন বলিয়া আমরা আশা রাখি না।

বাকী আছে সাপের চামড়ার ব্যবসা। এই বিষয়টা একটু বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিব মনে করিতেছি। প্রতিবর্ষে গড়ে এদেশে বিংশ সহস্র সপ্তশত মনুষ্য সর্প দংশনে প্রাণত্যাগ করে। তদ্ভিন্ন লক্ষাধিক পশু সাপের বিষে মরিয়া যায়। ইউরোপীয় রাজকর্ত্তৃপক্ষগণ অনুমান করেন, সর্পের বিষে যত প্রাণী মরে মনুষ্যের হাতে বা রোগাদি কারণে তত সাপ মরে না; স্বভাবতঃ সর্পগণ দীর্ঘজীবি হইয়া থাকে, কারণ ইহারা যোগীর ন্যায় বায়ুভূক এবং বৎসরের মধ্যে গুহায় প্রায় ছয় মাস কাল যোগসাধন করে। প্রতীচ্য দেশের স্ত্রীলোকেরা পক্ষীপুচ্ছ দ্বারা যেমন অনেক সৌখীন জিনিষ প্রস্তুত করাইয়া লন, তেমনি সাপের চামড়ায় টাকা রাখিবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাগ, কোমরবন্ধন, কেশের দড়ি প্রভৃতি অনেক প্রকার ভাল ভাল জিনিষ তৈয়ার হইতে পারে। হলণ্ড ও আমেরিকার অনেক ধনবান ব্যক্তি জাবা দেশে Java Reptile Skin Company নাম দিয়া সম্প্রতি এইরূপ ব্যবসাগার খুলিয়াছেন, তদ্দ্বারা অনেক টাকা লাভ হইতেছে এবং পৃথিবীর নানাদেশের লোকেরা সর্পচর্ম্ম চাহিয়া পাঠাইতেছেন। ইঁহাদের পুঁজি মোটে দেড় লক্ষ টাকা মাত্র। ইঁহারা এক আনা হইতে ৫৲ টাকা পর্য্যন্ত মূল্য দিয়া সর্প বা সর্পের চর্ম্ম খরিদ করিয়া থাকেন। জাবা দেশে সাধারণ সর্পের মূল্য এক আনা। ত্রয়োদশ ফিট্ দীর্ঘ সাপের দাম দুই টাকা মাত্র। মালয় দ্বীপের ১৮ ফিট লম্বা এক প্রকার কৃষ্ণ সর্পের মূল্য সাড়ে চারি টাকার অধিক নহে। মান্দ্রাজের বাণিজ্য-

বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী চাটারটন সাহেব লিখিয়াছেন, দক্ষিণাবর্ত্তে সম্প্রতি সাপের চামড়ার কারখানা খুলায় তথায় ইহা প্রচুর পরিমাণে বিক্রীত হইতেছে এবং এতদ্বারা অনেকে অনেক দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া নূতন আয়ের পথ উন্মোচন করিতেছে।

ডাক্তার ফেরার সাহেব বহুকাল ভারতবর্ষীয় চিকিৎসা-বিভাগে চাকুরী করিয়াছিলেন। ইনি জীবিতাবস্থায় একখানি বিরাট গ্রন্থ রচনা করিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের নাম Thantatopia, ইহার মূল্য একশত টাকা। কলিকাতার সুবিখ্যাত পুস্তক বিক্রেতা থ্যাকার স্পিঙ্ক কোম্পানীর দোকানে ইহা ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। ইহাতে ন্যূনাধিক সপ্ত শত প্রকার ভারতবর্ষীয় সর্পের বিস্তৃত বা সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং তৎসঙ্গে সর্প চিকিৎসার ইতিবৃত্ত সন্নিবিষ্ট আছে। তদ্ভিন্ন বহুশত চিত্রও দৃষ্ট হইয়া থাকে। ফেরার সাহেব লিখিয়াছেন, "এই সকল সর্প মধ্যে এমন অনেক সাপ আছে, যাহাদের চর্ম্ম গো ও মহিষের চর্ম্মের ন্যায় মজবুত অর্থাৎ দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং সহজে অগ্নিতে দগ্ধ বা বৃষ্টিতে বিকৃত হয় না। এই চর্ম্ম দ্বারা বহু প্রকার মূল্যবান জিনিষ প্রস্তুত হইতে পারে এবং তাহা রাজা ও সম্রাটদিগের ব্যবহারের উপযুক্ত। এক একটা সর্পের চামড়া বহুমূল্যে এবং দেশ বিদেশে আদরে বিক্রীত হয়। মধ্য প্রদেশের অরণ্যের এক একটা অজাগর সর্পের চর্ম্ম আমেরিকায় ৬৮ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। সাঁওতাল পরগণার বনের বড় বড় সর্পচর্ম্ম ৫০ টাকার ন্যূনে বিক্রী হয় না।" ইত্যাদি, ইত্যাদি। সাহেবের মতে পাইথন (Pythonus Molurus) নামক সর্প ৩০ ফিট পর্য্যন্ত লম্বা হয়; বর্ণ ধূসর, ল্যাজ কৃষ্ণ এবং ফণা ধূম্র রঙ্গের হইয়া থাকে। ফণার উপরে বড় বড় ফোঁটার মত চিত্র আছে। পশ্চিমঘাট পর্ব্বতে ও বনে ইহা পর্য্যাপ্ত সংখ্যায় বিচরণ করে এবং মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অনেক স্থানে ইহা তদ্দেশীয় অর্দ্ধ সভ্য লোকদিগের দ্বারা গৃহপালিত হইয়া থাকে। মান্দ্রাজ অঞ্চলে ইহার চর্ম্মের মূল্য ৪০৲ টাকা পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়। সার্পেন্টীভোর (Serpentivore) নামে আর এক প্রকার বৃহদাকার সর্প সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে এবং ইহাদের এমন অদ্ভুত প্রতিভা যে, ব্যাঘ্র হইতে কাষ্ঠ বিড়াল পর্য্যন্ত সকল প্রকার বন্য জন্তুর রব ইহারা অনুকরণ করিতে সক্ষম হয়। এই সাপ দেখিতে অনেকটা গোক্ষুর সর্পের ন্যায়। ইহাদের চর্ম্ম একশত টাকাতেও বিলাতের বাজারে বিক্রীত হইতে দেখা গিয়াছে। কানাডা, ব্রহ্ম দেশ ও ত্রিবাঙ্কুরের বনে অজাগর সর্প অনেক থাকে, ইহাদের চামড়া যোগী ও রাজা এবং সম্রাটগণ আসনরূপে ব্যবহার করেন। পর্টুগালের রাণী একদা এইরূপ এক সুবৃহৎ চর্ম্ম কোন ভারতবর্ষ প্রবাসী গ্রীক বণিকের নিকট হইতে এক সহস্র মুদ্রা মূল্যে খরিদ করিয়াছিলেন। উড়িষ্যার বনের কৃষ্ণ সর্প (কালিয়া) ও গোক্ষুর সাপদিগের চর্ম্ম এত আশ্চর্য্য ভাবে চিত্রিত যে ইউরোপীয় রাসায়নিক পণ্ডিতেরা বহুপ্রকার চেষ্টা করিয়াও ইহার রং বদলাইতে পারেন নাই এবং ঐ চিত্রের অনুকরণ করিতেও অক্ষম হইয়াছেন। ইহাদের চামড়াতেও অনেক ভাল ভাল সৌখীন এবং মূল্যবান জিনিষ প্রস্তুত হয়। ঘাটশীলা, সপ্তভূম, ময়ূরভঞ্জ, ত্রিবাঙ্কুর, গিধোড় প্রভৃতি স্থানের অরণ্যে সর্পসংখ্যা বহু।

"করাত" বা কিরাত নামে এক প্রকার সর্প দক্ষিণাবর্ত্তের প্রায় সর্ব্বস্থানে পাওয়া যায়। বম্বে প্রেসিডেন্সিতেও ইহা যথেষ্ট সংখ্যায় দৃষ্ট হইয়া

থাকে। বাঙ্গালা, আসাম, উড়িষ্যা, বিহার ও পশ্চিমোত্তর প্রদেশে ইহা প্রায় মানুষের চক্ষে পড়ে না; এ সকল অঞ্চলে ইহাদের বসতি নহে বলিয়া বোধ হয়। ইহাদের আকার ৫ ফিট পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইতে দেখা যায়। এই সাপ দেখিতে অতীব সুন্দর এবং ইহাদের চর্ম্ম অতিশয় কোমল, সুখস্পর্শ ও মনোহর। এমন শোভাময় চামড়া কোন জন্তুর প্রায়ই দেখা যায় না। বহু প্রকার সুন্দর ও কৌতুককর চিত্রে ইহাদের চর্ম্ম স্বভাবতঃ চিত্রিত। এই সকল চিত্রের বর্ণও ভিন্ন ভিন্ন। ইহার লাটিন নাম Bungarus Cœruleans। ইহার বিষ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ; ইহা দংশন করিলে তিন চারি ঘণ্টাকাল মধ্যে মানুষ মরিয়া যায়। ইহার চর্ম্মের নির্দ্দিষ্ট মূল্য নাই, কিন্তু ইউরোপের বড় বড় ঘরের স্ত্রীলোকেরা অত্যুচ্চ মূল্যে ইহা খরিদ করিয়া থাকেন। তদনন্তর আর এক প্রকার সুন্দর সর্প আছে, তাহার নাম Daboea Elegans। ইহার দেশীয় নাম "দুর্ব্বাদল"। মালাবার উপকূলে ইহার জন্ম। শুনা যায় ইহার চর্ম্ম বহুমূল্য। আর এক জাতীয় সাপ আছে, যাহার নাম "দরী"। দরী শব্দের অন্য অর্থ সতরঞ্চ, কার্পেট এবং বিছানা; এই জন্য ইংরাজীতে এই সাপের নাম Carpet Snake। পারস্য, আরব্য, তাতার, মরক্কো, মিশর, তুরস্ক ও য়িহুদীদেশে ইহার চর্ম্ম বহু কাজে লাগে এবং প্রতি বৎসর তথায় অনেক টাকার কারবার হয়। আর এক প্রকার সর্পের নাম "নুরাশী" অর্থাৎ হীরক; ইংরাজিতে ইহার নাম Diamond Snake। ইহার চর্ম্ম এত উজ্জ্বল (Bright) যে, সর্প মরিয়া গেলেও চামড়ার সুন্দর ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয় না। এই সাপের চর্ম্মও বহু মূল্যবান। নীল বর্ণের আর এক জাতীয় সর্পের নাম Echis Carinata; দেশীয় নাম "কৃতান্ত"। ইহার বিষ অত্যন্ত তীব্র, চিকিৎসক আসিবার পূর্ব্বেই দষ্ট ব্যক্তি জীবলীলা সম্বরণ করে। ইহার বিষদণ্ড দীর্ঘ হয় এবং ল্যাজ ক্ষুদ্র ভিন্ন দীর্ঘ হয় না। এই সর্পের চর্ম্ম প্রশস্ত, সুকোমল, বৃহৎ, সুশোভন এবং বহু মূল্যবান, কিন্তু সচরাচর সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না।

এইরূপে বহুপ্রকার সর্পের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে, যাহাদের চর্ম্মে বিবিধ প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া ব্যবসা দ্বারা অর্থোপার্জ্জন হইতে পারে, কিন্তু সর্প না "পুষিলে" (ছাগাদি পশুর ন্যায় গৃহে প্রতিপালন না করিলে) এই ব্যবসা চলা কঠিন অথবা অসম্ভব। সাপকে Domesticate করা অর্থাৎ পোষমানান কি সহজ কথা? সাপের চামড়ার ব্যবসায়ে অনেক টাকা লাভ হইতে পারে ইহা স্বীকার করি, কিন্তু নানা কারণে ইহা আমাদের পক্ষে অসুবিধাজনক, তদ্ভিন্ন ইহা নিরাপদ নহে। দুঃখের বিষয় ভারতবাসী হিন্দুর পক্ষে এই একটা বিভাগের ব্যবসায়ে কিছুই আয় হইবার সম্ভাবনা নাই, এই বিভাগীয় কারবারে আমাদের আয়ের ঘরে শূন্য ভিন্ন আর কিছুই দেখি না।

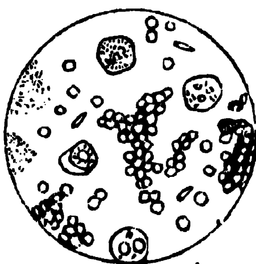
শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

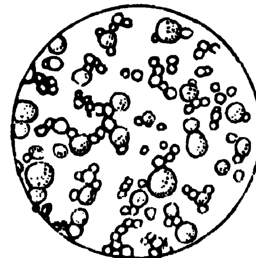
দুগ্ধ।

শিশু ও রোগীর পক্ষে দুগ্ধই একমাত্র খাদ্য। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষে যেরূপ ভাবে দুগ্ধের ব্যবসা চলিতেছে তাহা চিন্তা করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। কলিকাতা সহর ও সহরতলীতে দুগ্ধ দোহন করিতে গোপগণ যে নিষ্ঠুর প্রণালী অবলম্বন করে তাহা পৃথিবীর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। গোপগণ গাভীর গর্ভে বাঁশের চুঙ্গা প্রবেশ করাইয়া ফুক দেয়; ইহাতে রক্তমিশ্রিত দুগ্ধ গাভীর স্তনে প্রবেশ করে। পরে গোপগণ এই দুগ্ধ দোহন করিয়া লয়। তখন গাভী যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে। কিন্তু নির্দ্দয় গোপের প্রাণে কখনও দয়ার উদ্রেক হয় না। বলা বাহুল্য মাত্র যে এই দুগ্ধ অতিশয় অস্বাস্থ্যকর। হিন্দুগণ গাভীকে মাতৃরূপে পূজা করে। কিন্তু এই হিন্দু গোপগণ কখনও গাভীর প্রতি দয়া প্রকাশ করে না। তাহারা গাভীদিগকে যে কিরূপ কদর্য্য ভাবে রাখে তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। তাহারা কদাচিৎ গোয়াল ঘরের মলমূত্র পরিষ্কার করে। গাভীগণ এই মলমূত্রযুক্ত ক্লেদের উপর শয়ন করে। এই ক্লেদ দুগ্ধ দোহন কালে দুগ্ধে পতিত হয়। ইহাতে দুগ্ধ—বিষাক্ত হইবে না কেন?

ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে টাইফয়েড্‌ জ্বর, কলেরা, ধনুষ্টঙ্কার, ডিপ্‌থেরিয়া প্রভৃতি মারাত্মক পীড়ার বীজ-মিশ্রিত জল, দুগ্ধে মিশ্রণ করায় এই সকল ব্যাধি মনুষ্য শরীরে প্রবেশ করিয়া বহু লোকের জীবন সংহার করে। বিষাক্ত জল দুগ্ধে মিশ্রিত করিলে দুগ্ধত বিষাক্ত হইবেই, এমন কি বিষাক্ত জলে দুগ্ধের পাত্র ধৌত করিলেও দুগ্ধ বিষাক্ত হইয়া থাকে। গাভীকে বিষাক্ত জল পান ও বিষাক্ত খাদ্য গ্রহণ করিতে দিলেও দুগ্ধ বিষাক্ত হয়। এতদ্দেশীয় গোপ ও অন্যান্য দুগ্ধ ব্যবসায়ী চাষা লোক এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাহারা গাভীর খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে কিছুই বিচার করে না; পরন্ত দুগ্ধে, ডোবা নালার দূষিত জল মিশ্রিত করিতেও ইতস্ততঃ করে না। অতিশয় পরিতাপের বিষয় এই যে, যাঁহারা এই দুগ্ধ পান করেন তাঁহারাও দুগ্ধের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে কখনও চিন্তা করেন না। বিষাক্ত দুগ্ধ পান করিয়া এতদ্দেশীয় হাজার হাজার শিশু সন্তান পিতা মাতার অঙ্ক শূন্য করিয়া প্রস্থান করে। যতদিন শিশু মাতৃস্তন্য পান করে ততদিন তাহার কমল নধর দেহ দর্শন করিয়া পিতা মাতা আনন্দে পুলকিত হয়, কিন্তু যেই খরিদা দুগ্ধ প্রবর্ত্তন অমনই শিশুর অজীর্ণ রোগের আবির্ভাব। শিক্ষিত সম্প্রদায় দুগ্ধের ব্যবসা নিজেদের হাতে গ্রহণ না করিলে কখনও এদেশ হইতে এই অকাল মৃত্যু তিরোহিত হইবে না।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত দূষিত কিম্বা বিশুদ্ধ দুগ্ধের পার্থক্য নির্দ্দেশ করা যায় না। অণুবীক্ষণ যন্ত্রস্থ উভয় বিধ দুগ্ধের প্রতিকৃতি নিম্ন স্থলে প্রদত্ত হইল :—





দুগ্ধের উপাদান শর্করা, নবনী, ছানা, (কেজিন্) এবং কয়েক প্রকার লবণ। এই সকল পদার্থ জলে মিশ্রিত হইয়া দুগ্ধ প্রস্তুত হয়। দুগ্ধের উপাদান রক্তের উপাদানের অনুরূপ। বিভিন্ন জন্তুর দুগ্ধে এই সকল উপাদান বিভিন্ন পরিমাণে অবস্থান করে।

বিভিন্ন দুগ্ধের একশত ভাগে কোন্ উপাদান কত পরিমাণে অবস্থান করে তাহার এক তালিকা নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

দুগ্ধের বিবরণ।	জল	শর্করা	নবনী	ছানা	লবণ বা ভস্ম
নারী দুগ্ধ	৮৯·০	৪·৩	২·৬	৩·৯	০·২
গাভী দুগ্ধ	৮৬·০	৫·০	৪·০	৩·৩	০·৭
মহিষ দুগ্ধ	৮৩·০	৫·০	৭·২	৪·০	০·৮
ছাগ দুগ্ধ	৮৭·৬	৪·০	৪·০	৩·৫	০·৯
গর্দ্দভ দুগ্ধ	৯০·০	৬·০	১·৩	২·৩	০·৪

মাতৃ দুগ্ধ ও গর্দ্দভ দুগ্ধ প্রায় একরূপ। এই জন্য মাতৃস্তন্যের অভাব হইলে গর্দ্দভ দুগ্ধ ব্যবস্থা করা যায়। মহিষ দুগ্ধে অধিক পরিমাণে নবনী থাকায় ইহা শিশুর পক্ষে দুষ্পাচ্য। গাভীর দুগ্ধেও মাতৃ দুগ্ধ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে নবনী অবস্থিত; এই জন্য গাভীর দুগ্ধও জীর্ণ করা শিশুর পক্ষে কঠিন। গাভীর দুগ্ধে সমপরিমাণে ফুটন্ত জল ও কিঞ্চিৎ দুগ্ধ শর্করা মিশ্রিত করিলে শিশুর পক্ষে ইহা উপযুক্ত খাদ্য হয়। ছাগ দুগ্ধ সর্দ্দি, কাশী ও পেটের পীড়ার পক্ষে অতিশয় উত্তম। কিন্তু ইহা মাতৃ কিম্বা গর্দ্দভ দুগ্ধের ন্যায় সুপাচ্য নহে।

বায়ুমণ্ডলে নানাপ্রকার অদৃশ্য বীজাণু (উদ্ভিদণু) অবস্থান করে। ইহাদের এক জাতি, দুগ্ধের শর্করা ত্বরায় বিকৃত করিয়া অম্লত্বে পরিণত করে। এই অম্ল, দুগ্ধের ছানা গাঢ় করিয়া দুগ্ধ বিকৃত করে ও ক্রমশঃ দধিতে পরিণত করে। এতদ্ব্যতীত আরও কয়েক প্রকার উদ্ভিদণু দুগ্ধ বিকৃত করিয়া থাকে।

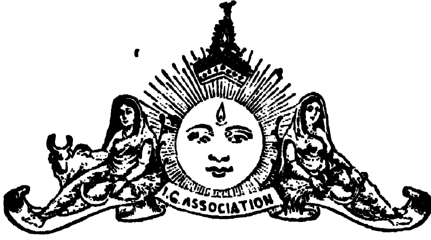
কলিকাতায় বাসী দুগ্ধ ব্যতীত টাট্কা দুগ্ধ পাওয়া দুর্ঘট। দুগ্ধ ব্যবসায়ীগণ পূর্ব্ব দিন অপরাহ্ণের দুগ্ধ লৌহ কটাহে জ্বাল দিয়া রাখিয়া দেয়। পরদিন প্রাতে এই দুগ্ধের সর উঠাইয়া রাখে এবং পরে উহা বাজারে বিক্রয় করে। এই বাসী দুগ্ধ যে কেবল নানা রূপ উদ্ভিদণু দ্বারা দুষ্ট হয় এমন নয়, ইহা কটাহে অনেকক্ষণ থাকে বলিয়া ইহাতে কটাহের কলঙ্কও মিশ্রিত হয়। চা প্রস্তুত করিতে এই দুগ্ধ ব্যবহার করিলে চা কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হয়। কারণ চার ট্যানিক্-এসিড্ দুগ্ধের লৌহ সংযোগে কালী প্রস্তুত করে। লৌহ মিশ্রিত খাদ্য অতিশয় দুষ্পাচ্য এবং ইহাতে কোষ্ঠ কঠিন করে।

দুগ্ধ রক্ষা করিবার নিমিত্ত কয়েক প্রকার প্রণালী নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

এক সের দুগ্ধে ২০ গ্রেন বাইকার্ব্বনেট্-অব্-সোডা যোগ করিলে দুগ্ধ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় রক্ষা করা যাইতে পারে।

দুগ্ধ ১৬০ ডিগ্রি (ফারেনহিট্) উত্তাপে ১৫ হইতে ২০ মিনিট জ্বাল দিয়া ফুটন্ত জলে ধৌত বোতলে উত্তমরূপে বন্ধ করিলে ইহা কয়েক দিন পর্য্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় রাখিতে পারা যায়।

২১০ ডিগ্রি (ফারেনহিট্) উত্তাপে দুগ্ধ ১৫ মিনিট জ্বাল দিলে দুগ্ধ বিকৃতকারী সমুদায় বীজাণু বিনষ্ট হয়। কিন্তু ইহাতেও দুই একটী বীজাণু জীবিত থাকে এই জন্য ঐ দুগ্ধ বোতলে ভরিয়া কর্ক দ্বারা মুখ বন্ধ করিয়া পুনরায় ইহাকে ২২০ ডিগ্রি (ফারেনহিট্) উত্তাপে ফুটন্ত জলের মধ্যে ২০ মিনিট রাখিতে হয়। তৎপরে জল শীতল হইলে ঐ বোতল বাহির করিতে হয়; নচেৎ উত্তপ্ত বোতল বাহির করিলে ইহা ফাটিয়া যাইতে পারে। লবণ মিশ্রিত জলে বোতল উত্তপ্ত করিলে আরো ভাল হয়। এইরূপে দুগ্ধের জীবাণু ধ্বংস করিলে এই দুগ্ধ বহু দিন অবিকৃত অবস্থায় রক্ষা করা যাইতে পারে।　　শ্রীনিবারণ চন্দ্র চৌধুরী।



শ্রাবণ—১৩১৬।

ভারতে ব্যবসায়ের জন্য ফল উৎপাদন।

অতি প্রাচীনকাল হইতে ফল মানুষের একটা প্রধান খাদ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। তখন অন্যান্য খাদ্যশস্য উৎপাদন এবং তৎসমুদয় সম্পূর্ণ খাদ্যোপযোগী করিবার জন্য রন্ধনাদি করা অপেক্ষা ফল মূলাদি সংগ্রহ সহজ বলিয়া বিবেচিত হইত। লোক সংখ্যা বৃদ্ধির ও সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ফলের আদর কিছু কমিয়াছে এবং অন্যান্য খাদ্যাদির প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে, তথাপি দেখা যায় যে, ফল মানুষের খাদ্যের একটী প্রধান উপাদান এবং এমন কোন দ্রব্যই নাই, যাহা ইহার স্থান অধিকার করিতে পারে।

ভারতের ফল ব্যবসায়ের বর্ত্তমান অবস্থা।

সাধারতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইউরোপীয়গণ ফলের জন্য যেরূপ লালায়িত, ভারতবর্ষীয়েরা তদ্রূপ নহে। তাহার কারণ ইউরোপে অতিকষ্টে ফল উৎপাদন করিতে হয়, আর এখানে অনায়াসে উৎপন্ন হয়, তথাপিও এখানে লোকের কোন না কোন ফল ব্যবহারের ইচ্ছা স্বতঃই বলবতী। এমন কি হিন্দু শাস্ত্রে শ্রাদ্ধাদি কিম্বা বিবাহ প্রভৃতি মাঙ্গলিক উৎসবে নারিকেল, বেল, কলা প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় ফল ব্যবহারের বিধি নিবদ্ধ আছে। কিন্তু দারিদ্র বশতঃ অনেক লোকে এখন ফল ত দূরের কথা, খাদ্যশস্যই সংগ্রহ করিতে পারে না; অধিকন্তু ফল, বিশেষ পুষ্টিকর খাদ্য বলিয়া অনেকের ধারণাও কমিয়াছে; এই সকল কারণে বঙ্গদেশে ফলের ব্যবহার ক্রমশঃই কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইতেছে। ভারতের অন্যত্র যথেষ্ট ফল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আবার সাধারণতঃ সহরের লোক অপেক্ষা মফঃস্বলের লোক অধিক ফল ব্যবহার করে। কারণ পল্লিগ্রামে ইহা সহজপ্রাপ্য ও সুলভ, কিন্তু সহরে দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্ম্মূল্য। সুতরাং ভারতে ফলের ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা করিতে গেলে, ফলের মূল্য যাহাতে হ্রাস হয় এবং সহজে যাহাতে ভাল ফল পাওয়া যায় তাহারই চেষ্টা করা আবশ্যক। অধিক মাত্রায় ফল উৎপাদন করিতে পারিলে ফলের দাম নিশ্চয়ই কমিয়া যাইবে, কিন্তু নিকৃষ্ট ফল বাজার হইতে অপসারিত করিতে দীর্ঘকালব্যাপী প্রযত্নের আবশ্যক। এক্ষণে যাঁহারা ফলের বাগান করিয়া ফলের ব্যবসা চালাইতেছেন কিম্বা যাঁহারা ফল ক্রয় করেন, উভয় পক্ষই বুঝেন না যে, নিকৃষ্ট ফল সমুদয়ে বাজার ছাইয়া পড়িয়া কি অনিষ্টই সাধিত হইতেছে। এক পক্ষ যাহা হউক কিঞ্চিৎ উপস্থিত লাভের জন্য এবং অপর পক্ষ সস্তায় কাজ মিটাইতেই ব্যস্ত। ইহাতে পরিণামে ভাল জাতীয় ফল বাজারে ক্রমশঃ দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিবে। অনেক জাতীয় ভাল আম ও দুই এক জাতীয় গোলাপজাম এখন আর বাজারে দেখিতে পাওয়া যায় না এবং যদি প্রদেশের ভদ্রমণ্ডলীর ভাল ফল ব্যবহারের দিকে এখনও দৃষ্টি না পড়ে, তবে উৎকৃষ্ট ফল সকল কাহার জন্য উৎপন্ন হইবে!

ভারতের ফল বৃক্ষ।

উদ্ভিদ শাস্ত্রানুসারে বিভাগ করিলে ভারতের ফল বৃক্ষাদি বহুবিধ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। সামান্য টেঁপারি গাছ হইতে প্রকাণ্ড কাঁটাল গাছ পর্য্যন্ত বহুতর গাছই এই ফল বৃক্ষের অন্তর্গত। প্রায় ১২৫ প্রকার উল্লেখযোগ্য ফল বৃক্ষ ভারতবর্ষে আছে এবং এই গুলি ৩৯টী বর্গে বিভক্ত ; ইহার মধ্যে কতকগুলি অবশ্য নূতন—সম্প্রতি এদেশে আমদানী হইয়াছে। প্রত্যেক প্রকার ফল গাছই বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মৃত্তিকায় উত্তমরূপ জন্মে। কতকগুলি ভারতের সমুদ্রোপকুল ব্যাপিয়া সর্ব্বত্রই আছে, কিন্তু এপ্রিকট, নেক্টারিণ, আলুবোখারা, বেরী, কুইন্সি, ষ্ট্রবেরী প্রভৃতি সমতল ভূমিভাগে হয়ই না; কেবলমাত্র কোন মৃত্তিকা বিশেষে এবং অনুকুল আবহাওয়া বিশেষে জন্মিতে দেখা যায়। আবার যে গুলি সমতল প্রদেশে জন্মায়, সেগুলি পার্ব্বত্য প্রদেশে বা অধিক উচ্চ ভূমিভাগে জন্মায় না। ফলের ব্যবসা করিতে হইলেই যেন কেহ না মনে করেন যে, সব রকম ফলের গাছ করিতেই হইবে। এখানে প্রধানতঃ নিম্ন কয়েকপ্রকার ফল উৎপাদনে লাভ হইতে পারেঃ—আনারস, কলা, টেঁপারি, ফুটী, তরমুজ ইত্যাদি, পেঁপে, দাড়িম, পেয়ারা, পিচ, কুল, লকেট, আতা, আম, লিচু, বেল, লেবু, সপেটা, কাঁটাল, নারিকেল, কমলা লেবু, এবং গোলাপজামই ফলের মধ্যে প্রধান। ইহাদের মধ্যে গোলাপজাম, কাঁটাল, কুল প্রভৃতি স্থানীয় ব্যবহারের জন্য উৎপন্ন করা চলিতে পারে এবং আনারস, কলা, আম, কমলা প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানি করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষ ব্যতীত এত প্রকার নানাবিধ ফল আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না; সুতরাং এখানের মত ফলের ব্যবসায়ের সুবিধা ও সুযোগ কোথায় মিলিবে?

ফলের ব্যবসায়ের প্রাধান্য।

ফল ব্যবসায়ের গুরুত্ব—১৯০৬–০৭ সালের সরকারি বিবরণী পাঠে সবিশেষ বুঝা যায়। উক্ত বিবরণীতে প্রকাশ যে, ৪২ লক্ষ একর ভূমি ফলের বাগানে আবদ্ধ। ভারতে কোথায় কত ফলের বাগান আছে নিম্নে তাহার একটী তালিকা প্রদত্ত হইল।

নম্বর।	প্রদেশের নাম।	১৯০২–০৩।	১৯০৬–০৭।	বেশী+কম–
	ক—ব্রীটিস অধিকৃত ভারতবর্ষ।			
১	উত্তর ব্রহ্মদেশ ...	৩৯৪৫২	৪০৭৩৮	+১২৮৬
২	নিম্ন ,, ...	৩৩৯৫২২	৩৬৮২১০	+২৮৬৮৮
৩	আসাম ...	৩৫৮৭২৩	৩৫২৩৭৭	–৬৩৪৬
৪	পূর্ব্ববঙ্গ ...	৩০৬১০০	৬৭১৬৬৯	+৩৬৫৫৬৯

নম্বর।	প্রদেশের নাম।	১৯০২—০৩।	১৯০৬—০৭।	বেশী+কম—
৫	বঙ্গদেশ ...	৭৩৬৬৮৯	৭৬০৮০০	+২৪১১১
৬	আগ্রা ...	২৬৫৮৯১	৩৩১১৪৩	+৬৫২৫২
৭	অযোধ্যা ...	৯৩৫৩	১২২৫৯৩	+২৯০৬০
৮	আজমীর-মারওয়ার। ...	২৫২	১৬১	—৭১
৯	মানপুর মধ্য প্রদেশ। ...	......	......	......
১০	পঞ্জাব ...	১২৬৯২৯	১৬১৬৬০	+৩৪৭৩১
১১	উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ।	৮১৭৪	৫১৮৭	—২৯৮৭
১২	সিন্ধু ...	৩৫১৮২	৪০৪৯২	+৫৩১০
১৩	বোম্বাই ...	১২৮৩৮৪	১২০০৬৫	—৮৩১৯
১৪	মধ্যপ্রদেশ ...	৭৬৯৩৫	৮৪৭৫৯	+৭৮২৪
১৫	বেরার ...	২৮৪৭৪	২১২৬৭	—৭২০৭
১৬	মান্দ্রাজ ...	৭৬৭৪৫৭	৯৩৪৬১৮	+১৬৭১৬১
১৭	কুর্গ ...	৩২৪৮	৪৩৯৭	+১১৪৯
	মোট ...	৩৩২৪৯৪৫	৪০২০১৩৬	+৬৯৫১৯১
	খ—দেশীয় রাজ্য।			
১৮	মহীশূর ...	১৫৭৬৫৩	১৭৭২৮০	+১৯৬২৭
১৯	গোয়ালিয়র ...	১৩৩৩৯	১৩২২৬	—১১৩
২০	জয়পুর ...	২০২৭	১৫৮৯	—৪৩৮
২১	বিকানীর ...	৫২	৫৫	+৩
২২	মারওয়ার ...	৫	৫৮	+৫৩

নম্বর।	প্রদেশের নাম।	১৯০২–০৩।	১৯০৬–০৭।	বেশী+কম–
২৩	টঙ্ক ...	২৫৬	১৬৫	–৯১
২৪	আলওয়ার ...	২০৭৫	২২৬২	+১৮৭
২৫	কিষণগড় ...	৬১৮	৫৮৮	+৩০
২৬	ভরতপুর ...	১২৪১	১২৬১	+২০
২৭	ঝালওয়ার ...	......	......	......
২৮	কোটা ...	৪৪৮	২২৮	–২২০
	মোট ...	১৭৭৭৫০	১৯৬৬৬২	+১৮৯১২
	ব্রীটিশভারত ও দেশীয়রাজ্যের মোট ...	৩৫০২৬৯৫	৪২১৬৭৯৮	+৭১৪১০৩

এই তালিকা পাঠে ঠিক বুঝা যায় না যে কি পরিমাণ জমিতে কেবলমাত্র ফলের গাছ আছে। ফলের বাগানের একটী স্বতন্ত্র তালিকা প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। কারণ সাধারণে তাহা হইলে ফলের ব্যবসায়ের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিবে। উপরের ঐ তালিকা হইতে তথাপি এই ধারণা হয় যে ভারতে সমগ্র আবাদী জমির প্রায় শতকরা ১½ অংশ ফলের বাগানে আবদ্ধ।

এক্ষণে ১৯০৬-০৭ সালে সমস্ত আবাদী জমির পরিমাণ ২,২৮,৯৫০,৫০ একর এবং ইহার মধ্যে ৪,২১৬,৭৯৮ একরে ফলের বাগান আছে। উক্ত ১৯০৭ সালে গ্রেটব্রিটনে মোট আবাদী জমির পরিমাণ ৩২,২৪৩,৪৪৭ একর, ফলের বাগানের পরিমাণ ৩০৮,৮৫৯ একর অর্থাৎ শতকরা ১ অংশের ও কম। ইহা কিন্তু মনে রাখা উচিত যে গ্রেটব্রিটনের ৩০৮,৮৫৯ একর জমিতে ফলের বাগান ব্যতীত অন্য কোন প্রকার মিশ্রিত উদ্যানজাত ফসল নাই, কিন্তু ভারতের উক্ত হিসাবে অন্যান্য ফসল কিছু না কিছু মিশ্রিত আছে। ১৯০৭ সালে ইংলণ্ডে স্বদেশ উৎপন্ন ফল ব্যতীত পর দেশ হইতে ১০,৯৪,০৯,৪৬০৲ টাকার ফল আমদানী হইয়াছিল। যদি ভারতবর্ষীয়েরা আশানুরূপ অধ্যবসায়ী হইতেন এবং এই দিকে তাঁহাদের যত্ন থাকিত তাহা হইলে অধিকাংশ ফলই ভারত হইতে চালান যাইত। ভারতে ফলের ব্যবসায়ের এখনও তাদৃশ পসার বৃদ্ধি হয় নাই। ভারতে যে পরিমাণ ফল উৎপন্ন হয় তাহার অধিকাংশই এদেশে খরচ হইয়া যায়, অতি অল্প মাত্রাই বিদেশে রপ্তানির জন্য থাকে। বিদেশে রপ্তানির তালিকা দেখিলে তাহা অতিশয় অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়। ১৯০৭-০৮ সালে মোটে ৫০,৬৬,৭৪২৲ টাকার ফল বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। অপরপক্ষে আবার ৯৯,৯২,৭৪৪৲ টাকার ফল বিদেশ হইতে ভারতে আসিয়াছে। যদিও এখনও ফল ব্যবসায়ে বিদেশীয় প্রতিযোগীতা তাদৃশ পরিলক্ষিত হইতেছে না, তথাপি মনে হয় শীঘ্রই সমুদ্রের পর পারের বিদেশী বন্ধুরা এই ফলের ব্যবসায়েও এদেশে

আসিয়া আমাদিগকে পরাভূত করিবেন। এখনও সময় থাকিতে ফলের চাষের ও ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে মনোনিবেশ না করিলে অন্যান্য ব্যবসায়ের ন্যায় এ ব্যবসায়েও বিদেশীয় প্রতিযোগীতায় আমাদিগকে হঠিয়া যাইতে হইবে। অথচ সময় থাকিতে আমরা ইহা বুঝিতেছি না। অন্যান্য চাষ আবাদের অপেক্ষা ফলের বাগানে সমধিক লাভ আছে, তবে কিছুকাল ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয় সত্য। যাঁহারা সুশিক্ষিত বা অর্দ্ধ শিক্ষিত তাঁহারা যদি চাকুরির জন্য লালায়িত না হইয়া এই ব্যবসায়ে মনঃসংযোগ করেন তবে তাঁহাদের ও দেশের উভয়দিকেই মঙ্গল হয়। আর একটী সূক্ষ্ম কথা এই যে অনেক দরিদ্র লোক ধান, পাট কিম্বা রবিশস্য আহরণের পর আর কাজ খুঁজিয়া পায় না। ভারতে এই ফলের চাষের বৃদ্ধি হইলে তাহারা বাকী সময় ফলের বাগানে কাজ করিয়া দিন গুজরান করিতে পারে। অন্যান্য শস্য চাষের ন্যায় ফলের বাগান তৈয়ারিতে তাদৃশ কষ্ট বা খুঁটীনাটী নাই সেই জন্য ইহা ভদ্রসন্তানের পক্ষে সুবিধাজনক। ফলের বাগান করায় আর একটা সুবিধা এই যে ইহাতে মূলধন এবং পরিশ্রম এককালে নষ্ট হয় না, কিন্তু অন্য ফসল উৎপাদন করিতে হইলে যদি তাহা দৈবাৎ নষ্ট হইয়া গেল তবে পর বৎসর আবার নূতন করিয়া পত্তন করিতে হইবে। ফলের গাছ অবশ্য প্রতি বৎসর সমান ফল দেয় না, তা না হইলেও ফল গাছগুলিত জীবিত থাকে এবং তাহারা কোন না কোন বৎসর লোকসানটা পূরণ করিয়া দেয়।

ক্রমশঃ।

পত্রাদি।

নারিকেল গাছের ফল ঝরা।

শ্রীচন্দ্রভূষণ সরকার,
১৬২, চাঁদনী চক, কলিকাতা।

মহাশয়,

আমার একটী নারিকেল গাছ আছে। গাছটী খুব তেজাল; প্রায় তিন বৎসর হইল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। গাছটীতে ফলও প্রচুর আসে কিন্তু ফলগুলি ওজনে প্রায় এক পোয়া হইলেই পড়িয়া যায়। যে স্থানের উপর গাছটী হইয়াছে তথাকার মাটী এঁটেল এবং বালিতে মিশ্রিত। ফলিবার এক বৎসর পূর্ব্বে গোড়া খুলিয়া প্রায় ২ হাত গভীর স্থান পাঁক দিয়া পূর্ণ করিয়া দিয়াছি এবং প্রতি বৎসরই গোড়ায় নূতন নূতন মাটী দিয়া থাকি, তথাপি ফলগুলি গাছে থাকিতেছে না। সুতরাং যাহাতে ফলগুলি থাকে তাহার উপায় লিখিয়া বাধিত করিবেন।

[দুইটী কারণে নারিকেল বৃক্ষের ফল ঝরিয়া পড়িতে পারে। প্রচুর সার পাইয়া গাছটীতে ফল অনেক হয় কিন্তু হয়ত রসাভাবে নারিকেল গুলি ছোট অবস্থায় ঝরিয়া যাইতেছে। এই কারণ কিনা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতে হইবে এবং তাহা হইলে গাছে জলসেকের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। গাছে পোকা লাগিয়াও এই প্রকার অনিষ্ট হইতে দেখা যায়। এক প্রকার পোকা আছে তাহা সচরাচর নারিকেল ও তালজাতীয় বৃক্ষাদির মাজের মধ্যে থাকিয়া ফলের ও পাতার রস শোষণ করে। পোকা সহজে দেখিতে পাওয়া যায় না। রাত্রে গাছের তলায় এক প্রশস্ত পাত্রে

কেরোসিন তৈল মিশ্রিত জল রাখিয়া তাহার মধ্যে একটা আলো জ্বালিয়া রাখিলে, যদি গাছে পোকা লাগিয়া থাকে, তবে সেই পোকা আলো দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ঐ পাত্রে আসিয়া পড়িবে। কি জন্য ফল ঝরিয়া যাইতেছে তাহার নিশ্চিত কারণ অনুসন্ধান করিতে না পারিলে প্রতিকারের ব্যবস্থা সম্ভব নহে।—কৃঃ সঃ।]

গাছের কলম।

শ্রীপঞ্চানন সিংহ,
কেশবপুর, মলয়পুর, হুগলি।

গাছের কলম কতপ্রকার আছে এবং তাহাদের প্রস্তুতপ্রণালী কৃষকে প্রকাশ করিলে বাধিত হইব।

[উত্তর:—বহুপ্রকারের কলম করার প্রথা আছে, তন্মধ্যে জোড় কলম, চোখ কলম, ধাপ কলম, কাটি কলম, গুল কলম, জিব কলম সাধারণতঃ প্রচলিত। একটী আঁটির চারার সহিত অন্য একটি ভাল আমের ডালের সহিত জোড় বাঁধিয়া যে কলম হয়, তাহাকে জোড় কলম বলে। আমের গুল কলমও হয়, লিচুর গুল কলম হয়—কোন একটি ডাল বাছিয়া লইয়া তাহার কতক অংশের ত্বক উঠাইয়া সেই ক্ষত স্থানে সারবান মাটি দ্বারা বাঁধিয়া দিয়া গুল কলম তৈয়ারি হয়, লেবু, পিচ প্রভৃতি ফলের এবং অধিকাংশ ফুল গাছের ডাল মাটি চাপা দিয়া রাখিলে তাহা হইতে বর্ষাকালে শিকড় বাহির হয়। ডালটি একটু চাঁচিয়া মাটি চাপা দিলে ভাল হয়। ইহাকেই ধাপ কলম বলে। কোন গাছের তরুণ ডাল হইতে চোখ উঠাইয়া অন্য গাছে বসাইলে চোখ কলম—কুল, গোলাপ প্রভৃতির চোখ কলম করা যায়। গাছের ডাল, কলম কাটার মত ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া মাটিতে হেলাইয়া পুতিয়া রাখিলে কাটি কলম হয়। একটি গাছের কাণ্ড জিহ্বার ন্যায় কাটিয়া অপর গাছের কাণ্ডে সেইটী বসাইবার মত গর্ত্ত করিয়া বসানর নাম জিব কলম। কলম করিবার বিশেষ প্রণালী প্রবোধ* বাবুর ফলকর পুস্তকে কিম্বা ৺নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হ্যাণ্ডবুক নামক পুস্তকে জানিতে পারিবেন। কৃষকেও ভবিষ্যতে কলম করার অভিনব প্রণালী ও সাধারণতঃ কলম প্রস্তুত প্রণালী সমালোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।—কৃঃ সঃ।]

হাজারি কাঁটাল্।

এচ, এন, জোয়ারদার,
মহালছড়ি, চট্টগ্রাম।

মহাশয়,

বসুমতী পত্রিকায় হাজারি কাঁটাল তৈয়ারি করিবার একটী অভিনব উপায় দেখিলাম। সেইটী এই,—

"একটা পাকা আস্ত কাঁঠাল ডাটা উপর দিকে করিয়া মাটীতে কোনও স্থানে রোপণ করিতে হইবে। এমন ভাবে রোপণ করিতে হইবে যে, উপরের মুখের উপর যেন মাটী না থাকে। কাঁঠালটি যাহাতে শিয়াল-কুকুরে খাইতে না পারে, সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। কয়েক-দিন পরে আস্তে আস্তে কাঁঠালের ডাঁটাটি নাড়িয়া দেখিতে হয়, যদি ডাঁটাটি নরম বোধ হয় এবং সহজে উঠিয়া আসে, তাহা হইলে আস্তে আস্তে তুলিয়া ফেলিতে হইবে। প্রায় আট দশ দিন পরে এই ডাঁটার ছিদ্র দিয়া এক ঝোপ কাঁঠালের চারা উঠিবে। এই চারাগুলি একটু বড় হইলেই গোময় দিয়া সকলগুলি একত্রে বাঁধিয়া দিতে হয়। তাহা হইলেই ক্রমে ক্রমে সকল চারার গুড়ি মিলিয়া একটি গাছ হইয়া যাইবে। 'হাজারি কাঁঠাল' গাছ

করিবার ইহাই সহজ উপায়। ইহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে আপনার জানা আছে কিনা আমাদিগকে জ্ঞাপন করিলে আমরা বাধিত হইব।

[উপায়টী অভিনব নহে। ইহা আমাদের পরীক্ষিত। উক্ত উপায়·ব্যতীত অনেকগুলি কাঁঠাল বীজ একত্র রোপণ করিয়া পরে গাছগুলি বাঁধিয়া দিয়া গোময় বা চিক্কণ মাটীর প্রলেপ দিলেও ঐরূপ ফল হয় এবং এই প্রথায় দৃশ্যতঃ একটা কাঁঠাল গাছে খাজা, নেয়ো,, রস খাজা প্রভৃতি দুই তিন প্রকার কাঁঠাল ফলাইতে পারা যায়। উক্ত প্রকারে গাছ তৈয়ারি করিলে গাছ বলবান হয় এবং বহু ফল প্রসব করে।] কৃঃ সঃ।

শ্রীপ্রেমচাঁদ দাস, বরানগর, কাশিপুর।

সস্তায় বীজ।

মহাশয়,

আমি আপনাদের নিকট সুপরিচিত, আপনাদের নিকট হইতে অনেক বীজাদি লইয়াছি ও আপনাদের দ্বারা অনেক বীজ আনাইয়াছি। এক্ষণে আমি আমেরিকায় ল্যাণ্ডেথ, ও বিলাতের সটনের বীজ স্বয়ং আনাই। ভাল অথচ দাম খুব অধিক না হয় এমন বীজ পাইবার আমার একান্ত ইচ্ছা। আপনারা জানেন যে, আমার অনেক বিঘা কপির চাষ আছে আমার ফসল কখন খারাপ হয় না এবং কলিকাতার সকল প্রদর্শনীতে আমি সর্ব্বোচ্চ পারিতোষিক লাভ করিয়াছি। আপনারাও বলেন যে ল্যাণ্ডেথের হাজার হাজার বিঘা বীজ উৎপন্ন করিবার জন্য চাষ আছে, সটনের হাজার হাজার বর্গফুট কাঁচের ঘর আছে, বীজ উৎপন্নকারীগণের মধ্যে ইহাঁরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অন্যান্য স্থানের বীজ ও ইহাঁদের বীজ লইয়া আজ নূতন নহে বহু পরীক্ষাই হইয়াছে,—ইহাঁদের বীজ ভালই হয়। কলিকাতার কোন নর্শরীর তালিকা আমি পাইয়াছি তাহাতে লেখা আছে ঃ—

(কলিকাতার প্রায় সকল নর্শরী আমেরিকার ল্যাণ্ডেথ ও ইংলণ্ডের সটনের নিকট বীজ ক্রয় করেন ; আমরা কিন্তু, ঐ আমেরিকা ও ইংলণ্ডের কোম্পানিদ্বয় যে যে স্থান হইতে ক্রয় করেন, সেই সেই স্থান হইতে ক্রয় করি। এই দুই কারণে আমাদের বীজের মূল্য কম পড়ায়. আমরাও সেইরূপ কম মূল্যে বিক্রয় করি। অন্য কোন নর্শরী আমাদের মত কম মূল্যে বিক্রয় করিতে পারেন না।)

একথা কি সত্য ? সেই মূল স্থান কোথায় আপনারা তাহার সন্ধান লইয়া আমাকে জানাইলে চাষী—সকলের একটা বড় উপকার করা হয়।

[আমেরিকার ল্যাণ্ডেথ ও ইংলণ্ডের সটন বিখ্যাত বীজ বিক্রেতা ও বীজ উৎপন্নকারী,—তাঁহাদের সমকক্ষ এক্ষণে কেহই নাই। কতিপয় বড় জার্ম্মানি, ফরাসি ও ইংরেজ বীজ ব্যবসায়ী আছেন। তাঁহাদের বীজ ভাল কি মন্দ, আমাদের দেশের উপযোগী কি না তাহা আমরা এই ৪।৫ বৎসর যাবৎ পরীক্ষা করিয়াও ঠিক করিতে পারি নাই। মোটের উপর কিন্তু তাঁহাদের বীজের নির্ব্বাচন ভাল নহে। তবে সস্তা বটে, কিন্তু প্রথমে দামে সস্তা হইলে কি হয় শেষ পর্য্যন্ত থাকিয়া সস্তা হওয়া চাই। সটন ও ল্যাণ্ডেথ, জার্ম্মান ও ফরাসী বীজ ক্রয় করেন সত্য কিন্তু তাহা পরীক্ষার জন্য, ক্রেতাগণকে দিবার জন্য নহে। আমরাও আজ কয়েক বৎসর আমেরিকায় পরীক্ষার জন্য কোন কোন প্রকার দেশী বীজ পাঠাইতেছি।] কৃঃ সঃ।

প্রাদেশিক কৃষি সংবাদ।

শ্রাবণ মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত শস্যের অবস্থা।—সমগ্র বঙ্গ দেশেই সুবৃষ্টি হইয়াছে। কটক, পুরী ও দার্জ্জিলিঙ্গের স্থানে স্থানে কিছু অধিক বারিপাত হইয়াছে। মেদিনীপুর, খুলনা, বালেশ্বর, আন্দুল, সম্বলপুর, হাজারিবাগ, রাঁচি এবং পালামাউয়ে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে এবং অন্যত্র সামান্য বারিপাত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই হৈমন্তিক ধান্য রোপণ চলিতেছে। অনেক স্থানে উক্ত কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বর্দ্ধমান এবং প্রেসিডেন্সি বিভাগের কোন কোন জেলায় জলের অভাবে ধান্য রোপণ চলিতেছে না। সারণ, ভাগলপুর, পূর্ণিয়া, সাঁওতালপরগণা ও মানভূমেও জলের অভাব অনুভূত হইতেছে, কিন্তু মজঃফরপুর ও দারবঙ্গে বৃষ্টি বন্ধ হওয়ায় শারদীয় ফসলের বেশ উপকার হইয়াছে। পাট, ইক্ষু এবং অন্যান্য ফসল যাহা এখন ক্ষেতে আছে সেগুলির অবস্থা ভাল। নদীয়ায় পাটে পোকা লাগিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। সাহাবাদে জলপ্লাবনে আশু ধান্যের কিছু ক্ষতি করিয়াছে। নদীয়া, মজঃফরপুর, পুরী, হাজারিবাগ, রাঁচি এবং মানভূমে মোটা চাউলের দর চড়িয়াছে, যশোহর, সারণ এবং চম্পারণে কমিয়াছে। সম্বলপুরে গো-বসন্ত দেখা দিয়াছে, মুর্শিদাবাদেও কোথাও কোথাও গবাদি পশু রোগাক্রান্ত হইতেছে, এতদ্ব্যতীত বর্দ্ধমান, নদীয়া, যশোহর, পাটনা, গয়া, সারণ, চম্পারণ, মজঃফরপুর, ভাগলপুর, পূর্ণিয়া, আন্দুল, পালামাউ এবং মানভূম হইতেও গবাদির রোগের কথা শুনা যাইতেছে। কোথাও এখন পানীয় জল বা পশু খাদ্যের অভাব নাই। দারবঙ্গে ৯৯৩ জন দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ পূর্ত্তকার্য্যে নিযুক্ত ছিল। এখন উক্ত কার্য্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মজঃফরপুর, দারবঙ্গ এবং পালামাউয়ে আজিও ২৮,১৬১ জন সরকারি ভিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া আছে।

বঙ্গদেশে পাট চাষের বর্ত্তমান অবস্থা ১৯০৯।—বর্ত্তমান বর্ষে ৫১২,৮০০ একর জমিতে পাটের আবাদ হইয়াছে। বিগত বর্ষে ৫৪৮,৭০০ একর এবং তৎপূর্ব্ব বর্ষে ৯৩১,২০০ একর জমিতে পাটের আবাদ হইয়াছিল। ১৯০৮ সালে কুচবিহার রাজ্যে ২২,০০০ একর পরিমাণ জমিতে পাট বপন হইয়াছিল, এ বৎসর পাটের জমির পরিমাণ ২০,০০০ একর মাত্র। অন্যান্য স্থান অপেক্ষা পূর্ণিয়ায় পাটের আবাদ সমধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। তথায় এ বৎসর পাটের দর খুব কম বলিয়া এবং চাউল ধানের দর অত্যন্ত বাড়ায় পাটের আবাদ এত কমিয়া গিয়াছে। পূর্ণিয়া, সারণ, হুগলি, হাওড়া, ২৪ পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ এবং যশোহরে প্রধানতঃ পাট চাষ অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে।

পাটের পক্ষে এবার ঐ সকল স্থানে জলহাওয়া অনুকূল। প্রত্যেক জেলা হইতে বিশেষ তদন্তে স্থির হইয়াছে যে, বর্ত্তমান বর্ষে আবাদী জমির পরিমাণ ৫৩২,৮০০ একরের কম হইবে না। সর্ব্বত্রই পাটের অবস্থা ভাল কেবল দার্জ্জিলিং ও কুচবিহারে খারাপ। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের বিবরণীতে প্রকাশ যে বর্ত্তমান বর্ষে ২,১৯৫,৩০০ একর জমিতে পাটের আবাদ হইয়াছে। অন্য বৎসর অপেক্ষা শতকরা প্রায় ৪ ভাগ কম।

তিল। ১৯০৯।—২৪টী জেলার মধ্যে মেদিনীপুর, মানভূম, সিংভূম, যশোহর, সাহাবাদ, এবং বর্দ্ধমানই তিল চাষের জন্য প্রসিদ্ধ। বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হাওড়া, খুলনা, সারণ, পুরী এবং মানভূম এই নয়টী জেলায় প্রায় ১৫,৩০০ একর পরিমাণ জমিতে তিলের আবাদ হইয়াছে। বিগত বর্ষের জমির পরিমাণ ২৯,০০০ একর।

সার-সংগ্রহ।

আফগানিস্থানে আফিমের চাষ।

আফগান রাজ্যে এখন প্রচুর আফিম উৎপন্ন হইতেছে। ১৯০৬-০৭ সালে পেশওয়ার হইতে পাঞ্জাবে ১২৫ হন্দর আফিম আমদানী হইয়াছিল। এই আফিম, আফিম সেবনকারীদের মতে ভাল এবং প্রায় মালওয়া আফিমের সমতুল্য সুতরাং ব্যবসাদারেরা এই বাজারে এই আফিম চালাইবার চেষ্টা করিবেন সন্দেহ নাই। গভর্ণমেণ্ট কিন্তু আফিম চাষ কমাইবার চেষ্টা করিতেছেন সুতরাং এই আমদানী আফিমের উপর একটা কর না বসাইলে আর নিস্তার নাই।

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য।

গরুর খুরুয়া রোগ।—আমাদের দেশে অনেক গরু খুরুয়ার ব্যারামে ভোগে. এই ব্যারামকে স্থানে স্থানে খুর ফুটা, বাদলা, ম্বরা ও খুর পাকা বলে। এই রোগে গরু বড় কষ্ট পায়, কিন্তু বেশী মরে না। রোগ প্রকাশ পাইলে গরুর জ্বর হয়, জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বায়, পায়ে ও পালানে ফোস্‌কা উঠে; প্রায় এক দিনের মধ্যেই ফোস্‌কা ফাটিয়া যায় ও ঐ সকল জায়গায় বড় বড় ঘা হয়; জিহ্বায় ঘা হয় বলিয়া গরু খাইতে পারে না। এই রোগে বসন্তের মত পাতলা বাহে হয় না; আমাশয়ও হয় না। ভালরূপ যত্ন করিলে ও ঔষধ লাগাইলে গরু ১৫ দিনের মধ্যেই ভাল হয়; আর যদি গরুকে কোনও রূপ যত্ন না করিয়া গৃহস্থ উহাকে লাঙ্গলে বা গাড়ীতে জোতে তাহা হইলে গরুর জ্বর বাড়ে, পা ফোলে, পায়ে ফোড়া হয়, কখনও কখন খুর খসিয়া যায় এবং দশ দিনের মধ্যেই মারা যায়। ব্যারামের সময় পীড়িত গরুর মুখ ফিটকারীর জল দিয়া রোজ দুই বেলা ধোয়াইতে হইবে, পায়ের ঘা পরিষ্কার করিয়া তাহাতে আল্‌কাতরা ও তারপিন তৈল মিলাইয়া লাগাইতে হইবে, অথবা খড়ি মাটির গুঁড়া আধ পোয়া, অঙ্গারের গুঁড়া সিকি ছটাক এবং ফিটকারীর গুঁড়া তিন কাঁচ্চা একত্রে মিলাইয়া ঘায়ে প্রয়োগ করিতে হইবে, ইহাতে পায়ে পোকা পড়িবে না এবং ঘা শীঘ্র শুকাইবে। পীড়িত গরুকে কেবল ভাতের মাড় ও কাঁচা নরম ঘাস খাইতে দেওয়া উচিত।

চীনের ধান্য।—চীনদেশে এক প্রকার ধানগাছ আছে, উহা প্রায় ৫০।৫৫ ফিট্ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। গোড়াও প্রায় ৪ ইঞ্চি হইতে ৬ ইঞ্চি পর্য্যন্ত মোটা হয়। ধান্যের চাউল মন্দ হয় না। অধিকন্তু ইহার ত্বক হইতে এক প্রকার সূক্ষ্ম ও সুন্দর কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

পশু চিকিৎসকের অভাব (কাটোয়া)।—কাটোয়া মহকুমার অধিবাসীগণ শতকরা ৯৫ জন কৃষিজীবী। যে কৃষিকার্য্য এদেশের লোকের জীবিকা এবং যে কৃষিকার্য্যের অদ্বিতীয় সহায় পশুকুল, সেই পশুকুল অকালে মরিয়া যাইলে কৃষকগণের ক্ষতির একশেষ হইয়া থাকে। যে পশুটী মরিয়া যায় তাহার স্থান পূরণ করিতে কৃষককে ঋণ করিতে হয়। যাহার ঋণ করিবার কোন উপায় নাই, তাহার আর সে বৎসর চাষাবাদ হয় না, তাহাকে সে বৎসরের জন্য উদারান্নেও বঞ্চিত হইতে হয়। পূর্ব্বে এ অঞ্চলে এক শ্রেণীর অশিক্ষিত লোক গবাদির চিকিৎসা করিত। তাহারা যে ঔষধ ব্যবহার করিত, তাহা দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ উপকারই পাওয়া যাইত। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সেরূপ গো-চিকিৎসকও আর নাই। যাহারা আছে তাহাদের দ্বারা উপকার না হইয়া অপকারই হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত কোন সংক্রামক ব্যাধি উপস্থিত হইলে পশুকুলকে কিরূপ যত্ন ও তদ্বিরের সহিত রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয় তাহা এদেশের কৃষকগণ আদৌ জানে না। এই অনভিজ্ঞতার জন্যও অনেক সময়ে অত্যন্ত মন্দ ফল হইয়া থাকে। এ অঞ্চলে একজন পশু চিকিৎসকের অত্যন্ত প্রয়োজন। পল্লীসমূহের কেন্দ্রস্থল মহকুমার মধ্যে একজন পশু চিকিৎসক থাকিলে কৃষিজীবিগণের অশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে। ভরসা করি ডিষ্ট্রীক্ট ও লোকাল বোর্ড এবং মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তৃপক্ষগণ আমাদের এ কথার সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া যথাকর্ত্তব্য অবধারণ করিবেন।

প্রাপ্তি স্বীকার।—সনাতন সাধনতত্ত্ব বা তন্ত্র-রহস্য। শ্রীমৎসচ্চিদানন্দ স্বামী প্রণীত। কলিকাতা ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল হইতে প্রকাশিত মূল্য ৸০ আনা। ইহাতে সনাতন হিন্দুধর্ম্মতত্ত্ব অতি সহজ সরল ভাষায় সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। তন্ত্রানুমোদিত সাধনার কথা মনে আনিলে অনেকের আতঙ্ক উপস্থিত হয় এবং কি যেন একটা দুরূহ ব্যাপার বলিয়া ধারণা হয় গ্রন্থকার সে ভ্রম দূর করিয়াছেন, তিনি দেখাইয়াছেন তন্ত্র-রহস্য পূর্ণ হইলেও দুর্ব্বোধ্য নহে, সাধনা সুকঠিন হইলেও অসাধ্য নহে। এই গ্রন্থের প্রকাশ সময়োপযোগী হইয়াছে বহুল প্রচার হইলে স্বামীজির শ্রম সার্থক হইবে।

কাজের লোক। এক খানি গার্হস্থ্য মাসিক পত্র। ১ নং অভয় হালদারের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। "কাজের লোক" কাজের লোকের জন্য। শিল্প, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কৃষি-সম্বন্ধে কিছু না কিছু খবর ইহাতে থাকে। আশা করি উত্তরোত্তর ইহা প্রকৃত কাজের লোকের সহায় হইবে। ইহাতে ক্রমশঃ অনেকানেক কাজের কথা প্রকাশ হয়, ইহা আমাদের একান্ত ইচ্ছা। "কাজের লোকের" তৃতীয় খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

ভাদ্র—আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর

কৃষিক্ষেত্র। যে সকল জমিতে শীতকালের ফসল করিতে হইবে, তাহাতে এই মাসে গোময়াদি সার প্রয়োগ করিয়া চষিয়া ঠিক করিয়া লইতে হইবে।

সার মিশ্রিত গামলা বা কাটের বাক্সে কপি বীজ বপন করিয়া এই সময় চারা তৈয়ারি করিতে হয়। মৃত্তিকার সমপরিমাণ পাতা সার মিশ্রিত করিতে পারিলে ভাল হয়। জলদি ফসলের জন্য ইতিপূর্ব্বেই চারা প্রস্তুত হওয়া উচিত। আর একটি কথা এস্থলে বলা আবশ্যক যে, অধিক জমিতে চাষ করিতে গেলে বাক্সে বা গামলায় বীজ বপন করিয়া পোষায় না। উচ্চ জমিতে চারিদিকে আইল বাঁধিয়া বীজ বপন করিতে হয়। বীজতলা আবশ্যক মত হোগলা দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হয়। কোন কোন সুনিপুণ চাষী থেঁতো বাঁশের মাচান করিয়া তাহার উপর "৬।৮" ইঞ্চি পুরু মাটি ছড়াইয়া বীজ বপন করে।

অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র বিশিষ্ট বোমা বা বিচালি গুচ্ছের অগ্রভাগ দ্বারা বীজ ক্ষেত্রে জল ছিটাইতে হয়।

আশ্বিন কিম্বা কার্ত্তিক মাসে যাহাতে আলু বসাইবে তাহাতেও এই সময় উত্তমরূপ চাষ দিতে হইবে ও সার ছিটাইতে হইবে।

শীতকালের জন্য লাউ, কুমড় বীজ এই সময় বসাইবে। লাউ, কুমড়া বীজ ৩।৪ দিন হুকার জলে ভিজাইয়া বপন করিলে বীজ গুলি পোকায় নষ্ট করিতে পারে না।

ওল ও মানকচু এই তুলিবার সময়। এই সময় তাহারা খাইবার উপযুক্ত হয়।

এই মাসের প্রথমেই, উত্তর-পশ্চিম, বেহার প্রভৃতি স্থানের কপির চারা ক্ষেতে বসান শেষ হইয়া যাইবে। বাঙ্গালা প্রদেশে এই মাসের শেষে কার্য্য আরম্ভ হইবে। পাটনাই ফুলকপির চারা ক্ষেতে বসান এতদিন হইয়া যাওয়া উচিত।

সেলেরী (Colery), এসপারেগস (Asparagus) ও দুই এক জাতীয় টমাটোর (Tomato) চাষ এই সময় হওয়া উচিত।

লাউ, কুমড়া, শাঁকালু, বীট, পাটনাই শালগম ও গাজর, পালম, নটে প্রভৃতি নানাপ্রকার শাক সব্জী, শসা প্রভৃতি দেশী সব্জী তৈয়ারি করিতে আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে।

মূলা, মটর প্রভৃতির জন্য জমিতে গোবর সার দিয়া ভাল করিয়া চষিয়া তৈয়ার করিয়া রাখিতে হইবে।

ফলের বাগান।—লিচু, লেবু, প্রভৃতি ফল গাছের যাহাদের গুল কলম করিতে হইবে তাহাদের গুল কলম করা শেষ হইয়াছে, কিন্তু আম প্রভৃতির জোড়কলম বাঁধা এখনও চলিতেছে।

বীজ নারিকেল হইতে চারা করিবার জন্য এই সময় মাটিতে বসাইতে হইবে।

যে সকল নারিকেল, গাছ হইতে পাকিয়া ও শুকাইয়া আপনি পড়ে, তাহাদিগের গলন নারিকেল কহে। একটী শীতল স্থানে কাদা করিয়া তাহাতে গলন নারিকেল এক পাশে হেলাইয়া বোঁটার দিক উপরে রাখিয়া বসাইতে হয় ও আবশ্যক মত জল সিঞ্চন করিতে হয়।

ফুলের বাগান।—বালসম (Balsam) জিনিয়া (Zinnia), কনভলভিউলাস মেজার (Convolvulus Major), আইপোমিয়া (Ipomœa) প্রভৃতি ফুল গাছ তৈয়ার করিবার এই সময়। কতকগুলি জাপানী লিলি আছে সেগুলি জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় মাসে বসান উচিত কারণ সেগুলির বর্ষাতেই ফুল ফুটিতে আরম্ভ হয়। এই সময় প্যান্সী, এষ্টার, মিগ্নোনেট বীজ প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে বপন করা উচিত।

REGISTERED No. C. 192.



ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসনের মুখপত্র

ভাদ্র, ১৩১৬।

REGISTERED No C. 192.

কৃষক।

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।



দশম খণ্ড,—৫ম সংখ্যা।

সম্পাদক—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস্।

ভাদ্র, ১৩১৬।

কলিকাতা : ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে
শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা ; ১৯৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, দি মিলার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
এস, এইচ, রহমান দ্বারা মুদ্রিত।



কৃষক।

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১০ম খণ্ড। ভাদ্র, ১৩১৬ সাল। ৫ম সংখ্যা।

পাট বা নালিতা।

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত, এম,আর,এ,সি লিখিত।

৪র্থ অধ্যায়—পাট কাটা ও পণ্য আঁস প্রস্তুতপ্রণালী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

২১। পাট কাটিবার উপযুক্ত সময়।

সাধারণ ভাবে বলা যায় যে আউসি পাট আষাঢ় মাসে কাটা আরম্ভ হইয়া শ্রাবণ মাসে শেষ হয়, এবং আমনিয়া পাট ভাদ্র মাসে কাটা আরম্ভ হইয়া আশ্বিন মাসে শেষ হয়। যে সকল স্থানে জল কম হয়, সেই সকল স্থানের পাট—(যেমন উত্তরাঞ্চলে রংপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানের পাট) অন্যান্য স্থানের তুলনায় অনেক পূর্ব্বেই কাটিবার যোগ্য হইয়া থাকে। পাট কি পরিমাণ বিকাশ প্রাপ্ত হইলে কাটিবার যোগ্য হয়, এ সম্বন্ধে নানাপ্রকার মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয়। আমাদের দেশে পাট গাছে ফুল ধরা অবধি পাটের ফল অর্দ্ধপক্ক হওয়া পর্য্যন্ত কালই পাট কাটিবার উপযুক্ত কাল বলিয়া পরিগণিত। ফুল ধরিবার পূর্ব্বে কাটিলে যে পাট প্রস্তুত হয় তাহার আঁস রেশমের মত চিক্কণ ও মসৃণ হয় বটে, কিন্তু সে আঁস ওজনে কম হয় এবং সহজে ছিঁড়িয়া যায়। আবার ফল ধরিলে পর পাট কাটিলে যে আঁস প্রস্তুত হয়, যদিও তাহা ওজনে অধিকতর এবং অধিকতর শক্ত হয়, কিন্তু আঁশ মোটা ও কর্কশ হয়। মোটামুটি বোধ হয়, ক্ষেত্রের পাটগাছ গুলিতে কলি ধরিয়া যখন তাহার অধিকাংশ ফুল ফুটিয়া যায়, তখনই পাট কাটা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভজনক। একথা মনে রাখা কর্ত্তব্য যে সব গাছে এক সময়ে কলি ধরে না, কি ফুল ফোটে না। অথচ পাট কাটা একবার আরম্ভ করিলে তখনই শেষ করিতে হয়। সিরাজগঞ্জ অঞ্চলে অধিকাংশ গাছে ফুল ফুটিলেই পাট কাটা হয়। আবার ঢাকা অঞ্চলে অধিকাংশ গাছে ফল ধরিলে পাট কাটা হয়। কৃষক সমাজের অভিজ্ঞতার ফল দৃষ্টে বলা যায় যে পাট গাছে ফুলের কলি হওয়া অবধি পাটের ফল অর্দ্ধপক হওয়া পর্য্যন্তই পাট কাটিবার উপযুক্ত সময়, এবং এই কালেরই যত পূর্ব্ব ভাগে পাট কাটা যায়, আঁস ততই রেশমের মত চিক্কণ ও মসৃণ হইবে, কিন্তু ওজনে কম ও ভঙ্গপ্রবণ হইবে।

আবার এই কালের যত শেষ ভাগে কাটা যায়, পণ্য আঁসের ওজন ততই বেশী হয়। কিন্তু আঁস মোটা কর্কশ ও শক্ত হয়। পণ্য আঁসের ওজন বেশী হইলেই কৃষকেরও অধিকতর লাভ হইবার সম্ভাবনা। আবার পাট কাটিবার লোক পাওয়া না পাওয়ার উপরেও পাট কাটার সময় কতকটা নির্ভর করে।

২২। পাট কাটার সরকারী পরীক্ষা।

কি পরিমাণ বিকাশ লাভ করিলে পাট গাছ কাটিবার উপযুক্ত হয়, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য সরকার পক্ষে কিছু কিছু পরীক্ষা করা হইয়াছে। কৃষক সমাজের অভাব পর্য্যালোচনা করিয়া পাট চাষের উন্নতির জন্য বৈজ্ঞানিক অনুশীলন দ্বারা কৃষক সমাজের অবস্থার উপযোগী উপায় সকল উদ্ভাবন করা আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। তাহা যতদূর করা হউক আর না হউক—বিলাতের পাট ব্যবসায়ীদিগের অনুরোধে সরকার পক্ষে পাট সম্বন্ধে সময়ে সময়ে কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক অনুশীলন করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা এত অকিঞ্চিৎকর যে তাহার সাহায্যে কোন স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। সরকারী অর্থনৈতিক বিভাগের প্রধান সচিবের (Economic Reporter) অধীনে পাট কাটার উপযুক্ত অবস্থা নির্ণয় বিষয়ে একবার অতি সামান্য মাত্রায় পরীক্ষা হইয়া যে ফল পাওয়া গিয়াছে তাহার মর্ম্ম প্রদত্ত হইল।

(ক) ফুলের কলি জন্মিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে কতকগুলি পাটগাছ কাটিয়া, চারদিন স্তূপ করিয়া রাখিয়া পরে পাতাগুলি ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া জলে ভিজাইয়া ১৪ দিন রাখা হইয়াছিল—তাহার পর আঁস প্রস্তুত করা হয়। তাহাতে দেখা যায় ৫৲ মণ কাণ্ড হইতে ১২ বার সের কোমল রেশমের মত চিক্কণ উৎকৃষ্ট পাট পাওয়া যায়। (খ) কতকগুলি গাছ ঠিক ফুলের কলি হওয়ার পর কাটিয়া পূর্ব্ববৎ ৪ দিন স্তূপে রাখিয়া পাতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া জলে ভিজাইয়া আঁস প্রস্তুত করা হইয়াছিল। ঐস্থলে গাছগুলি ২০ দিন ভিজিবার পর আঁস ছাড়াইবার যোগ্য হইয়াছিল. এবং ইহার ৫৲ মণ কাণ্ড হইতে ১৪॥০ সাড়ে চৌদ্দ সের উৎকৃষ্ট পাট পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু কলি হওয়ার পূর্ব্বের কাটা পাট অপেক্ষা তাহা কিঞ্চিৎ অপকৃষ্ট। (গ) কতকগুলি গাছ ফুল ফুটিবার পর কাটিয়া পূর্ব্ববৎ ৪ দিন স্তূপে রাখিয়া পাতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া জলে ভিজাইয়া আঁস বাহির করা হইয়াছিল। এস্থলে ২২ দিন ভিজিবার পর আঁস ছাড়াইবার যোগ্য হইয়াছিল. ও ইহার ৫৲ মণ কাণ্ড হইতে ১৩ তের সের মাত্র পাট পাওয়া গিয়াছিল এবং পূর্ব্বের পাটগুলির তুলনায় এ পাট কিঞ্চিৎ নিকৃষ্ট এবং মোটা। (ঘ) কতকগুলি গাছ ফল ধরিবামাত্র কাটিয়া পূর্ব্ববৎ ৪ দিন স্তূপে রাখিয়া পাতা ছাড়াইয়া জলে ভিজাইয়া আঁস বাহির করা হয়। এস্থলে ২১ দিন ভিজাইতে হইয়াছিল, এবং ইহার ৫৲ মণ কাণ্ড হইতে ১৩ তের সের নিকৃষ্ট মোটা পাট পাওয়া গিয়াছিল। (ঙ) আবার কতকগুলি গাছ ফল পাকিলে পর কাটিয়া পূর্ব্ববৎ ৪ দিন স্তূপে রাখিয়া পাতা ছাড়াইয়া জলে ভিজাইয়া আঁস বাহির করা হয়। এস্থলেও ৫৲ মণ পাট হইতে অতি নিকৃষ্ট এবং মোটা ১৩ তের সের পাট পাওয়া গিয়াছিল। এই সরকারী ফল দৃষ্টে এই মীমাংসা করিতে হয় যে ফুলের কলি ধরিবার পর এবং ফুল ফুটিবার পূর্ব্বেই পাট কাটিবার উপযুক্ত সময়। তবে দুএকবারের পরীক্ষার ফলের উপরে কোনরূপ সিদ্ধান্ত করা কৃষিশাস্ত্রসঙ্গত নয়। হইতে পারে উক্ত পরীক্ষার বিষয়ীভূত কাণ্ডগুলির

শাখা প্রশাখার পরিমাণ সমান ছিল না, অথবা কোনটা হয়ত অতিরিক্ত ভিজিয়া আঁস পর্য্যন্ত পচিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এইরূপ পরীক্ষা অন্ততঃ ১০।১৫ বার করিয়া তাহা হইতে একটা গড়পড়তা ফল হিসাব করিয়া লইলে তাহা কথঞ্চিৎ গ্রহণযোগ্য হইতে পারে। তবে পূর্ব্বেও বলিয়াছি এদেশের কৃষি নিতান্ত "অশিরস্কশিরঃব্যথার"ই অভিনয় মাত্র। অর্থনীতি সচিবের (Economic Reporter) মীমাংসার সহিত আমাদের অভিজ্ঞ কৃষকদিগের মীমাংসার সামঞ্জস্য হইতেছে না। তিনি বলিলেন কলি ধরিয়া ফুল ফুটিবার পূর্ব্বে কাট—অভিজ্ঞ কৃষক বলিবে ফুল ফুটিলে পর ফল পাকিবার পূর্ব্বে কাট। কৃষিবিষয়ক সমস্ত পরীক্ষারই শেষ ফল কৃষকদিগের লাভালাভের উপরে নির্ভর করে। যতদিন না কৃষকেরা নিজের লাভালাভ দৃষ্টে পরীক্ষা করিয়া সরকারী কর্ম্মচারীদের সিদ্ধান্তের অনুকূলে বা প্রতিকূলে আপনাদিগের রায় প্রকাশ করিতেছেন, ততদিন কৃষিবিভাগের বহুব্যয়সিদ্ধ সিদ্ধান্ত সকল "পুস্তকে স্থাপিতা বিদ্যার" ন্যায় চিরদিন নিষ্ফলাই থাকিয়া যাইবে। অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও কৃষি বিষয়ে কৃষকবৃন্দের রায়ই হাইকোর্টের রায় অপেক্ষা অধিক সম্মানার্হ। যাহাদের নিজের স্বার্থের সহিত পরীক্ষাফলের কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, অথবা যাহাদের বান্ধা বেতন স্ব স্ব কৃত পরীক্ষাফলের যুক্তিযুক্ততার উপর নির্ভর করে না সেরূপ লোকের কৃত ২।১ টা পরীক্ষার ফলের উপরে কতদূর আস্থা স্থাপন করা যায় তাহা কৃষকসমাজই বিবেচনা করিবেন। এইরূপ অবস্থায় কৃষকের অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভর করিয়া আমাদেরও বলিতে হয় ফুল ফুটিবার পরই পাট কাটিবার উপযুক্ত সময়।

২৩। পাট কাটা।

পাট গাছ কাটিবার সময় মাটির উপরে কাণ্ডের ২।৪ আঙ্গুল বাদ দিয়া কাটিলেই ভাল হয়, কারণ কাণ্ডের নিম্নতম ভাগে এক প্রকার শিকড়গুচ্ছ জন্মে. সে গুলি বেশী থাকিলে পাটের বাজার দর কম হয়। মিঠা পাট গাছ সর্ব্বত্রই কাটিতে হয়, কিন্তু তিতা পাট গাছের জমিতে অনেক সময় এত বেশী জল থাকে যে তাহা কাটিয়া সংগ্রহ করা কঠিন। এজন্য সে সকল স্থলে পাট গাছ না কাটিয়া টানিয়া উৎপাটন করাই সুবিধা। আবার যাহাদের ভাল ডুব দিবার অভ্যাস আছে তাহারা অধিক জলের পাটও ডুব দিয়া দিয়াই কাটিয়া থাকে। পাট কাটিয়া সমান লম্বা বা সমান পরিপক্ক দেখিয়া কাণ্ডগুলি পৃথক ভাবে আঁটি বান্ধিলেই ভাল। তাহাতে আঁস প্রস্তুত করিতে অনেক বেশী সুবিধা হয়, কারণ পরিপক্ক গাছগুলি উপযুক্তরূপে পচিতে কচি গাছ অপেক্ষা অধিক সময় লাগে, এবং পরিপক্ক ও কচি গাছ গুলি একই আটিতে বান্ধিয়া পচাইলে পরিপক্ক গাছগুলি উপযুক্ত মাত্রায় পচাইতে হইলে, সেই সময় মধ্যেই কচি গাছ গুলি অতি মাত্রায় পচিয়া তাহার আস গুলি একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। আবার পাট বিক্রীর সময়ও লম্বা পাটের সহিত বেশি কম লম্বা পাট মিশ্রিত না থাকিলে বাজার দরও বেশি পাওয়া যায়। পাটক্ষেত্রে কি তাহার নিকটে যদি একটু শুষ্ক জমি থাকে, তবে সেই শুষ্ক জমির উপরে কাণ্ডের আটিগুলি একত্রে স্তূপ করিয়া ২।৪ দিন রাখিয়া দিলে ভাল হয়। যদি শুষ্ক জমি না থাকে, এবং জল এক হাতের কম গভীর হয়, তবে আটিগুলি খাড়া করিয়া গোড়ার দিক নীচে রাখিয়া ১০।১৫ হাত বেড়ের এক একটি খাড়া স্তূপ করিয়া ২।৪

দিন রাখা উচিত। এইরূপ ভাবে গোড়াটা অল্প জলে ২।৪ দিন আগে পচিতে আরম্ভ করিলে ভালই হইবে। কারণ গোড়ার ভাগটা বেশি শক্ত এবং পচিতে বেশি সময় লাগে। অনেক সময় গোড়ার আঁস ছাড়াইবার যোগ্য হইতে হইতে আগার দিকের আঁস পচিতে আরম্ভ করে। পাট কাটিয়া এইরূপ ভাবে ২।৪ দিন স্তূপ করিয়া রাখিলে একটু সামান্য রকম পচন ক্রিয়া (fermentation) আরম্ভ হয়, যাহার ফলে পাতাগুলি নরম হইয়া নিজ হইতেই খসিয়া পড়ে অথবা সামান্য রকম ঝাড়া দিলেই ঝরিয়া পড়িয়া যায়। তাহাতে পাতা পচার দাগ লাগিয়া পাটের রং নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে না। কাণ্ডের আটির আয়তন কমিয়া এবং বোঝা পাতলা হইয়া জলে ভিজাইবার পক্ষেও সুবিধা হয়। কিন্তু পূর্ব্ববাঙ্গলার অধিকাংশ পাটের জমিই পাট কাটার সময়ে অনেক জলের নীচে থাকে। এই সকল স্থলে পাট কাটিয়া ২।৪ দিন একত্রে স্তূপ করিয়া রাখা চলে না। পাট কাটিয়াই পাতা সহিত আটি বান্ধিয়া জলে ভিজাইতে হয়। তবে লম্বা, পরিপক্ক বা এবং খাট বা কচি কাণ্ডের আটি পৃথক পৃথক করিয়া বান্ধিতে পারিলেই ভাল। যাহা হউক পাতা সহিত পচাইলে পাতার দাগ লাগিয়া পাটের রং খারাপ হইবার আশঙ্কা থাকে। তদ্ভিন্ন পাতা দ্বারা আটির আয়তন এবং আবর্জ্জনা বৃদ্ধি হওয়াতে অতি মাত্রায় পচিয়া পাটের আঁস পচিবার আশঙ্কা এবং আঁস বাহির করিবার পরিশ্রম ও কতকটা বাড়িয়া যায়।

২৪। জল ও পচনক্রিয়া।

জলে পচাইয়া আঁস ছাড়াইবার প্রথা অতি আদিমকাল হইতে পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচলিত। আমাদের দেশে কোষ্টা ও শণ পাট সম্বন্ধে এবং ইউরোপে তিসির (flax) এবং ভাঙ্গের (hemp) পাট সম্বন্ধে আঁস ছাড়াইবার জন্য এই প্রণালীই অতি প্রশস্ত বলিয়া পরিগণিত ছিল। বাল্মীকির রামায়ণে হনুমানের লঙ্কাদাহনের সময় তাহার লেজ জড়াইবার শণ এবং কোষ্টা পাট ব্যবহারের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। হনুমান্ বলিতেছে "ততস্তস্য বচঃ শ্রুত্বা মম পুচ্ছং সমন্ততঃ। বেষ্টিতং শণবল্কৈশ্চ পট্টৈঃ কার্পাসিকৈস্তথা॥" (১৮২-৫৮ অঃ সুন্দরাকাণ্ড)। তাহাতে অনুমান হয় যে শণ এবং পাটের আঁস প্রস্তুত করিবার জন্য তখনও এই প্রথাই প্রচলিত ছিল। অবশ্য এস্থলে পট্টশব্দে মেস্তা পাটকেও বুঝাইতে পারে। নালিতার কি শণের কি মেষ্টা কি তিসি ইত্যাদির কাণ্ডগুলি জলে ভিজাইলে তাহাতে এক প্রকার উদ্ভিদণু (bacteria) বিকাশ পাইয়া পচন ক্রিয়া (fermentation) আরম্ভ হয়। এই জাতীয় উদ্ভিদণু গাছের আঁস অংশের বেষ্টনকারী বল্কলের নানা প্রকার পদার্থ মধ্যে—যথা তৈল (fats) মম (waxes), আঠা (gums), রঞ্জন (resins), এবং কষায় (pectin bodies) পদার্থ মধ্যে একপ্রকার রাসায়নিক পরিবর্ত্তন উপস্থিত করে। তদ্দ্বারা সে সকল পদার্থ দ্রবনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া জলের সঙ্গেই অনেকটা চলিয়া যায়, অথবা বায়বীয় আকার ধারণ করিয়া বুদবুদ রূপে উড়িয়া যায়। এই ব্যাপারকেই আমরা চলিত ভাষায় পচানি (fermentation) বলি। ইহাতে আঁসগুলি শিথিল ও পরস্পর পৃথক হইয়া পড়ে। তাহার পর আঁসগুলি ছাড়াইয়া ধুইয়া রৌদ্রে এবং বাতাসে শুকাইয়া সেই আঁস আরও পরিষ্কার হয় (bleaching)। পচন ক্রিয়ার প্রথম আরম্ভে যে জাতীয় উদ্ভিদণু প্রকাশ পায় তাহারা পাটের আঁসের কোন অনিষ্ট করে না। কিন্তু অধিক দিন জলে রাখিয়া পচন ক্রিয়ার ঠিক মাত্রা

অতিক্রম করিলে অপর একপ্রকার অনিষ্টকারী উদ্ভিদণু বিকাশ লাভ করে এবং সেগুলি পাটের আঁসও পচাইয়া নষ্ট করে। পচাইবার জন্য পাটের কাণ্ড ২।৩ হাতের বেশি গভীর জলের নীচে রাখিতে হয় না, কারণ ২।৩ হাতের বেশি গভীর জলের নীচে এই পচনকারী উদ্ভিদণুর বিকাশ হয় না। আর যে জলে পাট পচাইতে হয় তাহাতে লৌহের অংশ না থাকাই ভাল কারণ তাহা হইলে পাটের বর্ণ পরিষ্কার হয় না। পাট পচাইবার জন্য লোনা জল অপেক্ষা মিঠা (soft or sweet) জল ব্যবহার করাই ভাল, এবং সেই জলে চুণের ভাগ বেশী থাকা উচিত নয়, কারণ চুণে আঁস খাইয়া ফেলে। মিঠা জলে এবং গরম বেশি পড়িলে ঐ পচনকারী উদ্ভিদণু সত্বর বৃদ্ধি পাইয়া পচন ক্রিয়া সত্বর সমাধা করে। লোনা জলে, কিম্বা বেশি শীত পড়িলে, ঐ পচনকারী উদ্ভিদণু সকল সত্বর বিকাশ পায় না এবং পচন ক্রিয়া সমাধা হইতে বিলম্ব হয়। আমরা সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই জল এবং উত্তাপ ৭৫° হইতে ৯৫° ফ ই বিশেষ উপযোগী দেখা যায়। স্রোত জলে সেই সকল উদ্ভিদণু বিকাশ হইয়াও স্রোতের সঙ্গে অনেকটা চলিয়া যায়। এ জন্য স্রোত জল অপেক্ষা স্থির জলই পাট পচাইবার পক্ষে অধিক উপযোগী। লোনা জলের ন্যায় স্রোত জলে ভিজান পাটের বর্ণও তত পরিষ্কার হয় না। স্রোত জলে ভিজান নালিতার 'ভুর' বা স্তূপের বহির্ভাগস্থ পচনকারী উদ্ভিদণুই অধিক পরিমাণে স্রোতের সঙ্গে চলিয়া যায়। এ জন্যই সেই স্তূপের ভিতরের গাছগুলির পচন কার্য্য আগে শেষ হয়, বহির্ভাগস্থ গাছগুলি পচিতে বিলম্ব হয়। এমন কি বহির্ভাগস্থ গাছগুলির পচন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে গেলে ভিতরের গাছগুলি অতি মাত্রায় পচিয়া তাহার আঁস পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়। এই কারণে স্রোতজলে পাট পচাইতে হইলে সময়ে সময়ে স্তূপ ভাঙ্গিয়া ভিতরের গাছগুলির আঁস আগেই ছাড়াইয়া ফেলিতে হয়। ইহাতে শ্রম এবং ব্যয় বাহুল্য অনিবার্য্য। কর্দ্দমাক্ত ময়লা জলে নালিতা ভিজাইলে পাটের রং ধূসর বর্ণ হয়। মোটামুটি যতদুর সম্ভব পরিষ্কার, মিঠা (soft and sweet) এবং স্থির জলে পাট ভিজানই বিধি। তবে কাটা নালিতার বোঝা এত বেশি যে তাহা দূরে আনা নেওয়া পোষায় না। নিকটে যেরূপ জলই পাওয়া যায় তাহাতেই ভিজাইতে হয়। বৈজ্ঞানিকের বিধি নিষেধ মানিয়া চলা খরচের দিক দেখিলে কৃষকের পক্ষে পোষায় না। পুকুর, শড়কের ধারের ঝিল, খাল ও বিল ইত্যাদিতেই পাট ভিজাইতে হয়।

এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে জলে ভিজাইয়া নালিতার আঁস ছাড়াইবার এই অতি পুরাতন প্রথাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বৈজ্ঞানিক অনুশীলন দ্বারাও এই প্রণালীর কোন বিশেষ উন্নতি সম্ভব হয় নাই। বৈজ্ঞানিকেরা অনেক যত্নের পর তিসির (flax) ও ভাঙ্গের (hemp) আঁস বাহির করা সম্বন্ধে এই পুরাতন প্রথানুযায়ী পচন প্রণালীর অনেকটা সময় সংক্ষেপ করিতে পারিয়াছেন। পুকুরের পরিবর্ত্তে বড় বড় কাঠের পাত্রে গরম জলে (75°F to 95°F) কাণ্ডগুলি খুব প্যাক্ করিয়া ভিজাইয়া উপরে ঢাকুনি দিয়া রাখিলে ৫০।৬০ ঘণ্টাতেই পচনক্রিয়া সমাধা হয়। যাহা হউক নালিতা পচানির সময় সংক্ষেপ করা সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত কোন প্রশ্নও উঠে নাই এবং কোথাও কোন পরীক্ষা করাও হয় নাই।

গোরুর সংক্রামক রোগ।

শ্রীকুঞ্জবিহারি দে, ডাক্তার লিখিত।

বড়ই পরিতাপের বিষয় যে অনেকেই গো-চিকিৎসা অতি হেয় জ্ঞান করেন, কিন্তু যে দেশে গবাদি গৃহস্থের জীবনোপযোগী একমাত্র সম্পত্তি সে ভারতবর্ষের সুসন্তানগণ এখনও চেষ্টা করিলে অনেক গোরুকে অকালে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিতে পারেন। অশেষ চেষ্টার ফলে বহুদর্শী পশু চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক সংক্রামক রোগের প্রতি-বিধানোপযোগী যে সমস্ত উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, গবাদি রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের রীতমত তাহা পালন করা উচিত। নিম্নে নিয়মগুলি সংক্ষেপে বিবৃত হইল ঃ—

১। যখন হাট বা কোন মেলা হইতে গোরু ক্রয় করা হয় তখন উহা কোন সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইয়াছে এরূপ মনে করিবে। যেহেতু হাটে বা মেলাতে নানা স্থান হইতে গবাদি আনীত হয়, ঐ সকল স্থানের কোন না কোন একটীতে সংক্রামক রোগ পূর্ব্বে হইয়াছিল বা এখনও বিদ্যমান আছে এরূপ মনে করিবে এবং সতর্কতা অবলম্বন করিবে।

২। গোরুকে বাটী আনিবার সময় পথিমধ্যে অন্য কোন পশুর সহিত মিশিতে দিবে না। ৫।৬ ক্রোশের অধিক গোরুকে চলিতে দিবে না এবং রাত্রে এমন স্থানে রাখিবে যেখানে অন্য কোন গোরু বা পশু ছিল না। পেট ভরিয়া পশুকে খাইতে দিবে ও পরিষ্কৃত জল পান করিতে দিবে। এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিবার কারণ এই যে মনে কর পূর্ব্বে গোরুটীর কোন ব্যারাম ছিল না কিন্তু পথিমধ্যে সংক্রামক পশুর সহিত মিশিয়া কিম্বা সংক্রামিত স্থানে নীত হইয়া রোগগ্রস্ত হইয়াছে।

৩। বাটীতে আনিয়া গোরুটীকে অন্যান্য গোরুর সহিত মিশিতে দিবে না। ৩ মাস পর্য্যন্ত গোরুটীকে পৃথক রাখিবে কারণ রোগ থাকিলে ঐ সময়ের মধ্যে লক্ষণ প্রকাশ পাইবে। এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিবার কারণ এই যে মনে কর ক্রীত গোরুটী রোগগ্রস্ত হইয়াছে এবং যাহাতে ঐ গোরুটীর সহিত মিশিয়া অন্যান্য গোরুর ব্যারাম না হইতে পারে তাহার জন্য সতকতা অবলম্বন করা হইল।

৩ মাসের মধ্যে গোরুটীর কোন ব্যারাম না হইলে অন্যান্য নীরোগী গোরুর সহিত নিরাপদে খাইতে দেওয়া ও থাকিতে দেওয়া যাইতে পারে।

৪। যখন গোরু এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে নীত হয় তখন উহার সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে; সময়ে সময়ে সংক্রামক রোগগ্রস্ত প্রদেশ দিয়া আনীত হয় এই হেতু গোরুকে বাড়ীতে আনিয়া কিছুকাল পৃথক ভাবে রাখিবে ও ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবে।

৫। যদি কোন পশুর কোন রোগ হয়, তখন ঐ পীড়িত পশুকে সুস্থ পশুগণ হইতে পৃথক রাখিবে। যে কোন ব্যারাম হইলেই পৃথক রাখিবে, কারণ রোগের প্রথমাবস্থাতে সংক্রামক রোগ নির্ণয় করা সহজ নহে।

৬। পীড়িত পশুটীকে চিকিৎসাধীন রাখিবে।

৭। নীরোগী পশুগুলিকে প্রত্যহ পরীক্ষা করিয়া দেখিবে যে তাহাদের মধ্যে কোনটীর রোগ

হইয়াছে কি না; যদি কোন পশু রোগের লক্ষণ প্রকাশ করে, অগৌণে পীড়িত পশুটী অন্য স্থানে রাখিবে। মোটকথা নীরোগী ও পীড়িত পশু পৃথক পৃথক রাখিবে।

৮। পীড়িত পশুদিগকে নীরোগী পশু হইতে অনেক দূরে রাখিবে। পীড়িত পশুর শুশ্রূষাকারীগণ নীরোগী পশুর শুশ্রূষা করিতে পারিবে না। পীড়িত পশুর চিকিৎসালয় হইতে কোনও খাদ্য, পানীয়, খড় ইত্যাদি এমন কি শুশ্রূষাকারীগণের কাপড় ইত্যাদি ও অন্য স্থানে লইয়া যাইতে দিবে না। কুকুর ইত্যাদি পশুগণ সংক্রামক রোগের বীজ লইয়া গিয়া রোগ পরিব্যাপ্ত করিতে পারে, এই জন্য চিকিৎসালয়ে কোন পশুকে যাইতে দিবে না। চিকিৎসালয়ের চারিদিকে বেড়া দিবে।

৯। পীড়িত গোরুর চিকিৎসা—পীড়িত পশুকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে; পরিস্কৃত জল পান করিতে দিবে; পরিস্কৃত জলের অভাব হইলে গরম জল ঠাণ্ডা করিয়া পান করিতে দিবে; ফেন, ভূষি, খৈল ইত্যাদি পুষ্টিকর খাদ্য খাইতে দিবে। তাজা ঘাস খাইতে দিবে। শুষ্ক খড়, কুটা খাইতে দিবে না। যদি শুষ্ক খড় দিতে হয় তবে ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া ভূষি ও জলের সহিত মিশাইয়া খাইতে দিবে। রোগী দুর্ব্বল হইলে বলকারক ঔষধ খাইতে দিবে। সেবা-শুশ্রূষা রোগমুক্তির প্রধান সহায় সুতরাং সেবা-শুশ্রূষাকারীগণ বিশেষ সাবধানতার সহিত পীড়িত পশুর সেবা-শুশ্রূষা করিবে।

১০। পীড়িত পশুদিগকে এমন স্থানে রাখিবে যেখানে বিশুদ্ধ বায়ু উত্তমরূপে চলাচল করিতে পারিবে। মশক ও মাছির প্রাদুর্ভাব হইলে শুষ্ক খড়, কাট, ঘুঁটে ইত্যাদি প্রজ্জ্বলিত করিয়া ধোঁয়া দিবে। মশক, মক্ষিকা প্রভৃতি রোগ বিস্তার করিতে পারে। গন্ধক জ্বালাইয়া ধোঁয়া দেওয়া মন্দ নহে।

১১। চারণ ভূমি সংক্রামিত হইলে নীরোগী গোরুদিগকে উক্ত ভূমিতে চরিতে দিবে না। চাষ আবাদ করিয়া চারণ ভূমি ব্যবহারোপযোগী করিয়া নিবে। রোগগ্রস্ত গোরুর ব্যবহৃত প্রত্যেক জিনিষই পোড়াইয়া ফেলিবে এবং যাহা পোড়াইতে পারিবে না, তাহা মাটীর নিম্নে পুতিয়া ফেলিবে, আর যাহা পোড়াইলে বা মাটীতে পুতিলে অধিক আর্থিক ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, তাহা প্রথমে গরম জলে ধৌত করিয়া বা সিদ্ধ করিয়া পরে ফিনাইল জল, তুতিয়ার জল (১—২০০) অথবা রসকর্পূরের জল (১—৫০০) দিয়া ধৌত করিয়া ২।৩ দিন রৌদ্রে দিয়া ব্যবহার করিতে দিতে পারিবে। পীড়িত গোরুর ব্যবহৃত শুষ্ক আবর্জ্জনা পোড়াইয়া ফেলিবে; মল মূত্রাদি ও আর্দ্র আবর্জ্জনা মাটীতে গর্ত্ত করিয়া পুতিবে এবং চূণ ও মৃত্তিকা দিয়া গর্ত্ত পূর্ণ করিবে। গোয়ালঘরের মাটী চাঁচিয়া ফেলিয়া প্রথমে ঘুঁটে বা অন্য কোন জ্বালানি পোড়াইবে; পরে তুতিয়ার জল বা রসকর্পূরের জল দিয়া ধৌত করিয়া নূতন মাটী দিবে এবং উপরে চূণ ছড়াইয়া দিলে বেশ ভাল হইবে। গোয়ালঘরের বেড়া ইত্যাদি যাহা রাখিবার দরকার হইবে তাহা গরম জলে ধৌত করিয়া নিবে, পরে তুতিয়ার জলে ধৌত করিয়া চূণ ইত্যাদি দিলে ভয়ের কোন সম্ভাবনা থাকে না। যে সমস্ত জিনিষ রাখিবার দরকার নাই তাহা পোড়াইয়া ফেলিবে। গোয়ালের উদ্ধৃত মাটী টাটকা চূণের সহিত মাটীতে গর্ত্ত করিয়া প্রোথিত করিবে। মোট কথা যত দূর সম্ভব সংক্রামক রোগ প্রতিবিধানের উপায় অবলম্বন করিবে।

১২। যে সকল গোরু সংক্রামক রোগে মরে তাহাদের মৃত দেহ পোড়াইবে। যদি পোড়াইবার

কাহারও আপত্তি থাকে, তবে মৃত দেহ ৩।৪ হাত মাটীর নিম্নে প্রোথিত করিবে। মৃত দেহের চর্ম্ম স্থানে স্থানে কাটিয়া দিলে চর্ম্ম ব্যবসায়ীগণ উক্ত চর্ম্ম লইয়া রোগ ব্যাপ্ত করিতে পারিবে না। মৃত দেহের সহিত টাটকা কলিচুণ দিবে। জলে বা ডাঙ্গাতে মৃত দেহ নিক্ষেপ করা বিধেয় নহে। ইহাতে রোগ বিস্তৃত হয়।

১৩। যে সকল পশু আরোগ্য হয়, তাহাদিগকে স্থানান্তরিত করিবার পূর্ব্বে গরম জল ও সাবান দিয়া উত্তমরূপে ধৌত করিবে। জলের সহিত কার্ব্বলিক লোসন মিশাইয়া ধৌত করা অতি উত্তম। প্রতি ৵৫ সের জলে ½ ছটাক কার্ব্বলিক এসিড্ মিশাইবে। যখন সংক্রামক রোগ আবির্ভূত হয় তখন রোগাক্রান্ত দলের পশুদিগের মধ্যে সর্ব্বশেষ রোগ ঘটনার পর তিন মাস কাল অতীত না হইলে সুস্থ পশুদিগের সহিত তাহাদিগকে একত্রে মিশিতে দিবে না। সেবা-শুশ্রূষাকারীগণের ব্যবহৃত প্রত্যেক জিনিষই সংক্রামক দোষনাশক পদার্থ দ্বারা বিশুদ্ধ করিয়া লইবে। সংক্রামক পশু কর্ত্তৃক ব্যবহৃত প্রত্যেক জিনিষই সংক্রামক দোষনাশক পদার্থ দ্বারা ধৌত করিয়া লইবে।

১৪। মৃত দেহ অধিকক্ষণ ফেলিয়া রাখিবে না, কারণ দূষিত পদার্থ শরীর হইতে নিঃসৃত হইয়া নিকটবর্ত্তী দেশকে সংক্রামিত করে। যে গ্রামে বা প্রদেশে সংক্রামক রোগ হয় ঐ গ্রাম হইতে রোগকালীন কোনও পশু অন্য গ্রামে, হাটে বা মেলাতে লইবে না অথবা অন্য স্থান হইতে ঐ সময়ে কোন পশু আনিবে না।

১৫। সংক্রামক রোগ হওয়া মাত্র অনেকে গোরুর দলকে তিন ভাগে শ্রেণীবদ্ধ করেন, তাহা অতি উত্তম।

(ক) রোগাক্রান্ত গোরু।

(খ) যাহারা নীরোগী অথচ রোগগ্রস্ত গোরুর সংস্পর্শে আসিয়াছে।

(গ) যাহারা নীরোগী অথচ রোগগ্রস্ত গোরুর সংস্পর্শে আসে নাই।

যে স্থানে বা যে গোয়ালে সংক্রামক রোগ প্রথমে দৃষ্ট হয় ঐ স্থানে পীড়িত পশু রাখিয়া স্থানান্তরে (খ) ও (গ) চিহ্নিত পশুদিগকে রাখিবার ব্যবস্থা করিবে। গ্রামবাসীগণ একযোগে কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হইলে গ্রামের বহিঃপার্শ্বে কোনও স্থান মনোনীত করিয়া তাহাতে নীরোগী পশুদিগকে স্থানান্তরিত করিয়া তাহাদের সেবা-শুশ্রূষার জন্য পৃথক লোক নিযুক্ত করিয়া দিলে রোগ পরিব্যাপ্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। এস্থলে ইহা বলা বাহুল্য যে এই সকল নীরোগী গোরু পীড়িত পশুর সংস্পর্শে আসিবে না এবং নীরোগী গোরুর দলের মধ্যে কাহারও ব্যারাম হইলে অগৌণে উক্ত পীড়িত পশুটীকে স্থানান্তরিত করা বিধেয়। (গ) চিহ্নিত পশুদিগের মধ্যে কাহারও ব্যারাম হইবার সম্ভাবনা নাই বটে কিন্তু (খ) চিহ্নিত পশুদিগের মধ্যে কাহারও ব্যারাম হইলে (ক) চিহ্নিত পশুদের দলে মিশিতে দিবে। (খ) ও (গ) চিহ্নিত পশুদিগকে প্রত্যহ ½ অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণ লবণ খাইতে দিলে রোগ প্রায়ই হয় না। বর্ষাকাল না হইলে এবং বৃষ্টিতে ভিজিবার সম্ভাবনা না থাকিলে (খ) ও (গ) চিহ্নিত পশুদিগকে গাছের ছায়াতে রাখা যাইতে পারে, অন্যথা অল্প ব্যয়ে গোশালা তৈয়ার করিবে।

১৬। বসন্ত, মড়ক, ইত্যাদি ব্যারামের স্থিতিকাল ১ মাস। অতএব যে গোরুর শরীরে এই সকল রোগের বীজ প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়, তাহাকে ১ মাস পরে কোনও রোগ লক্ষণ প্রকাশ না করিলে নীরোগী গোরুর সহিত একত্র রাখিবার উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে।

সংক্রামক রোগ হইলে সকল স্থলেই উপরোক্ত নিয়ম প্রতিপালন করা বিধেয় এবং নিয়ম গুলি যথাযথ প্রতিপালন করিলে রোগ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয় এবং রোগ পরিব্যাপ্ত হইতে পারে না। কিন্তু এস্থলে ইহা বলা বোধ হয়, অপ্রীতিকর হইবে না যে আমাদের সদাশয় সরকার বাহাদুর কর্তৃক গো-বসন্ত ইত্যাদি সংক্রামক রোগ নিবারণ জন্য টিকা দিবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। পশু চিকিৎসার জন্য বঙ্গ দেশের প্রায় প্রত্যেক জেলাতে একজন বা ততোধিক পশু চিকিৎসক আছেন। সংক্রামক রোগ হওয়া মাত্র পশু চিকিৎসার জন্য মাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের নিকট আবেদন করিতে হইবে। ইহাও দেখা যায় যে অনেকে অনেক গোরু মরিবার পরে, এমন কি মহামারির প্রকোপ কমিয়া যাওয়ার পরে রাজ দ্বারে আবেদন করে, ইহাতে যে কোন প্রকার উপকার পাওয়া যায় না ইহা বলাই বাহুল্য। কয়েকটী গোরুর এক সময়ে ব্যারাম হইলে অথবা একটী গোরুরও সংক্রামক রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে স্থানীয় চৌকিদার বা পুলিশ কর্ম্মচারীর নিকট সংবাদ পাঠাইবে। পুলিশ কর্ম্মচারী জেলাস্থ উপরিতন রাজ-কর্ম্মচারীর নিকট সংবাদ পাঠাইয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন রোগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সহিত আবেদন পশু চিকিৎসকের নিকট অগৌণে পাঠাইলে, পশু চিকিৎসক রোগ পরিব্যাপ্ত হইবার পূর্ব্বে ঘটনা স্থলে উপস্থিত থাকিয়া যথোচিত ও সময়োপযোগী ব্যবস্থাদি দিতে পারেন।

ইহাও অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে অনেকে পশু চিকিৎসকের উপদেশ মত কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হয় না, এমন কি প্রতিবেশীগণকে তাহার উপদেশ মত কার্য্য করিতে পরামর্শ দেয় না; অনেকে কোন প্রকার সাহায্য করে না এবং কেহ কেহ সাহায্য করিলে তাহার প্রতি-কুলাচরণ করে। এবম্বিধ নানারূপ অসুবিধা সত্ত্বেও পশু চিকিৎসকগণ যেরূপ উৎসাহ, অধ্যবসায় ও একাগ্রতার সহিত কার্য্য করিয়া থাকেন তাহা অতীব প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই। চিকিৎসকের উপ-দেশানুযায়ী কার্য্য না করিলে গৃহস্থের ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই। সকলেই যে চিকিৎসকের উপদেশ মত কার্য্য করে না আমি এরূপ কথা বলি না, কিন্তু অনেকেই পূর্ব্বতন সংস্কারানুযায়ী কার্য্য করিতে ভাল বাসে। সরকার বাহাদুর গো-জাতির উন্নতি বিষয়ে অত্যন্ত মনযোগী এবং সরকার নিয়োগ-প্রাপ্ত পশু চিকিৎসকগণও তাহাদের উদ্দেশ্যানুযায়ী কার্য্য করিতে যত্নবান। অতএব আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে প্রত্যেকেরই চিকিৎসকের উপদেশ মত কার্য্য করিতে আগ্রহান্বিত হওয়া কর্ত্তব্য।

ইক্ষুবীজ।—আমাদের দেশে ইক্ষুর সাধারণতঃ কলম অর্থাৎ ডগা কাটিয়া রোপিত হয়। কিন্তু মেক্সিকো প্রভৃতি দেশের অধিবাসীরা সাধারণতঃ ইহার বীজ কৃষিক্ষেত্রে বপন করিয়া থাকেন। অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দৈববিড়ম্বনা ব্যতিরেকেও কৃষকগণের ইক্ষুচাষে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার আর একটি মুখ্য কারণ —ইক্ষুর পোকা। ক্ষেত্রস্থিত একটি দণ্ডে পোকার আক্রমণ হইলে সমস্ত দণ্ডগুলিকেই ক্রমশঃ তদ্রূপাবস্থাপ্রাপ্ত হইতে হয়, ইহাই নিয়ম। কৃষকগণ পর বৎসরের জন্য কলম (ডগা) রাখিবার সময় ইক্ষুদণ্ড পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বাছিয়া লয় না; সুতরাং সেই পোকার বীজ সেই কলমেই রহিয়া যায়। আবার কালে সেইগুলি পরিবর্দ্ধিত ও পরিপোষিত হইয়া থাকে। মেক্সিকো প্রভৃতি দ্বীপবাসী কৃষকগণ ইক্ষুর বীজ বপন করিয়া থাকে। মাঘ মাসে পাতা সার ও অর্দ্ধেক মাটী ময়দার মত করিয়া পরে ভাঙ্গা বাক্সে বা টবে বোঝাই করিয়া বীজগুলি আস্তে আস্তে ছড়াইয়া দেয়, এবং কোন পোকায় নষ্ট করিতে না পারে, এই অভিপ্রায়ে তাহার উপর সেই পাতা সার ও মৃত্তিকা সামান্য পরিমাণে ছিটাইয়া দেয়—জল দেওয়া নিষেধ। সমস্ত রাত্রিতে শিশিরে এবং দিবাভাগে রৌদ্রে অর্থাৎ অনাবৃত স্থানে ফেলিয়া রাখিতে হয়। যাহাতে বীজ কোনরূপে পোকায় নষ্ট করিতে না পারে, কিম্বা অতিরিক্ত বৃষ্টি হইয়া বীজগুলিকে পচাইয়া না দেয়, সে বিষয়ে মাত্র সাবধানতা এক সপ্তাহকাল অবলম্বন করিলেই বীজ হইতে ঠিক ধানগাছের ন্যায় চারা দেখা দেয়। তৎপরে বীজের চারা করিয়া সামান্য জল দিতে আরম্ভ করে ও একমাস পরে গাছগুলিকে তুলিয়া অন্য স্থানে পাতলা পাতলা করিয়া চারাইয়া দেয়। দেড় মাসকাল সেইরূপ অবস্থায় রাখিয়া পরে আমাদের দেশের পদ্ধতিক্রমে ক্ষেত্রে চাষ করিলেই হইল। তবে বীজ হইতে ইক্ষুর আবাদ কিছু অধিক সময় ও পরিশ্রম সাপেক্ষ। কিন্তু আখে পোকা লাগিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ইক্ষু নষ্ট হওয়া অপেক্ষা এ পরিশ্রম স্বীকার করা ভাল। পূর্ণ পনর মাসে ইক্ষুর বীজ হয়। যখন ইক্ষুবীজের উৎপত্তি হয়, তখন ইক্ষুদণ্ডগুলি দেখিতে প্রায় সর-খড়ির ন্যায় হইয়া থাকে। চারিটা ইক্ষুদণ্ডে যে পরিমাণে বীজ হয়, তাহাতে এক একর (তিন বিঘা) জমি স্বচ্ছন্দভাবে চাষ হইতে পারে। (উদ্ধৃত।)

পক্ষধারী বিভাজ্যদেহ পোকা।

এই শ্রেণীর পূর্ণাবয়বপ্রাপ্ত পোকার দেহ তিনটি প্রধান অঙ্গে বিভক্ত. যথা—মস্তক, বক্ষঃ ও উদর। মস্তকে চক্ষু, মুখ বা আহার শোষণ নিমিত্ত কর্ষণী এবং এক জোড়া শৃঙ্গের ন্যায় স্পর্ষণী বিদ্যমান আছে। বক্ষে এক বা দুই জোড়া পক্ষ এবং তিন জোড়া পদ থাকে। উদরে পাকস্থলী প্রভৃতি যন্ত্র আছে। পোকা সাধারণতঃ তের ভার্গে বিভক্ত; প্রথম ভাগে মস্তক. পরবর্ত্তী তিন ভাগে তিন জোড়া পদ ও পক্ষ অবস্থিত। পরবর্ত্তী নয় ভাগে উদর। পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্তির পূর্ব্বে এই পোকা গুটী অবস্থা প্রাপ্ত হয়। গুটীর পূর্ব্বে ইহা কীড়া অবস্থায় কাটায়। ডিম্ব ফুটিয়া কীড়া উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত পোকা ইহার জীবনের চতুর্থ অবস্থা। প্রথম অবস্থা ডিম্ব বা ডিম্বস্থ ভ্রূণ, দ্বিতীয় অবস্থা কীড়া, তৃতীয় অবস্থা গুটী, চতুর্থ অবস্থা পতঙ্গ।

সাধারণতঃ কীট কীড়া অবস্থায় অধিক অপকারী। কীড়া অবস্থায় পোকা অনেকস্থলে পনের দিন কাটায়, এবং এই সময়ের মধ্যে ইহারা সাধারণতঃ পাঁচ বার দেহের আবরণ পরিবর্ত্তন করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পূর্ণ অবয়ব প্রাপ্ত হইলে কীড়া আহার পরিত্যাগ করিয়া বাসস্থান অন্বেষণ করে। এই সময়ে কোন কোন কীড়া মুখ হইতে আঠা বাহির করিয়া বাসা প্রস্তুত করে। এই বাসা হইতেই রেশম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কীড়ার অনেক পদ আছে বলিয়া মনে হয়। বাস্তবিক ইহার সম্মুখ ভাগে (বক্ষে) তিন জোড়া মাত্র প্রকৃত পদ বিদ্যমান, এবং উদরে চারি জোড়া এবং পুচ্ছে এক জোড়া আকর্ষণী পদ দৃষ্ট হয়। এই আকর্ষণী পদ দ্বারা ইহারা চলিতে পারে এবং খাদ্যাদি দৃঢ়রূপে ধরিতে পারে। প্রায় সপ্তাহ কাল পোকা বাসায় নিদ্রিত অবস্থায় কাটায়। তখন ইহারা কিছুই খায় না। এই অবস্থাকে গুটী বলা হয়। গুটীর অবস্থা পূর্ণ হইলে ইহারা পক্ষাদি পূর্ণ অঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া বহির্গত হয়।

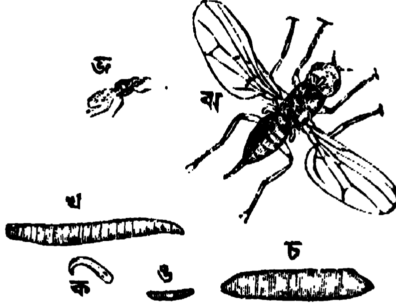
কোন কোন পোকা ডিম্বের পরিবর্ত্তে কীড়া প্রসব করে। কোন কোন পোকা (যেমন পঙ্গপাল) গুটী অবস্থা ধারণ না করিয়াই পূর্ণ অবয়ব প্রাপ্ত হয়।

কোন পোকা মুখের দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করে না। ইহাদের শরীরের সর্ব্বত্র বায়ু গ্রহণের নিমিত্ত এক প্রকার শিরা বিদ্যমান আছে। শিরার বহির্ভাগে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে, তদ্বারা ইহারা বায়ু গ্রহণ করে।

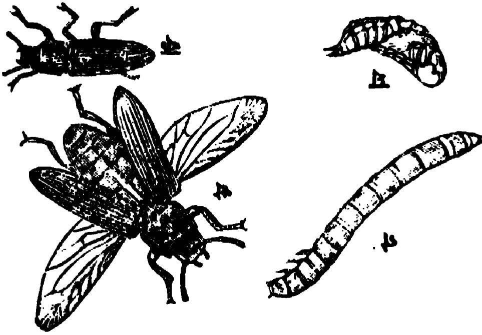
কোন কোন পোকা দ্বিপক্ষী, কতকগুলি চতুঃপক্ষী। দ্বিপক্ষী পোকাদিগকে আমরা সাধারণতঃ মক্ষী নামে অভিহিত করিয়া থাকি। চতুঃপক্ষী পোকা নানা জাতিতে বিভাগ করা যায়। ইহাদের কতকগুলির এক জোড়া পক্ষ অন্য আর এক জোড়া কঠিন পক্ষ দ্বারা আচ্ছাদিত। কতকগুলির দুই জোড়া পক্ষই অদৃশ্য ও অব্যবহার্য্য। কতকগুলির চারি পক্ষ ঝিল্লি সদৃশ। কতকগুলির পক্ষে সূক্ষ্ম শল্কের ন্যায় পদার্থ বিদ্যমান। এইরূপ নানা পার্থক্য দ্বারা আমরা মক্ষী ও পতঙ্গকে নানা জাতিতে বিভাগ করিতে পারি। আমরা কোন পোকার বৈজ্ঞানিক নাম না জানিয়াও ইহাদের আকৃতি ও প্রকৃতি অধ্যয়ন দ্বারা কীটের জাতি বিচারে পারদর্শিতা লাভ করিতে পারি।

সাধারণতঃ পোকাদিগকে একাদশ জাতিতে বিভাগ করা যায়। তন্মধ্যে আট জাতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে বিবৃত করা হইল :—

১। দ্বিপক্ষ পোকা বা মক্ষী—(Diptera)—flies—ইহাদের এক জোড়া পক্ষ বিদ্যমান। অন্য আর এক জোড়া পক্ষের স্থানে আলপিনের ন্যায় এক জোড়া উপ অঙ্গ দৃষ্ট হয়। এই পোকার কীড়া পদহীন। মশা, মাছি প্রভৃতি এই জাতির অন্তর্গত।

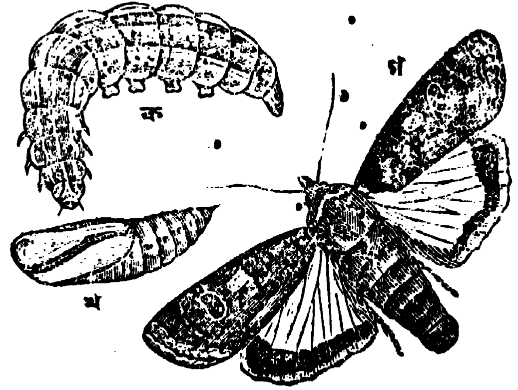


২। কঠিন পক্ষ পোকা (Coleoptera)—Beetles—ইহাদের দুই জোড়া পক্ষ আছে।



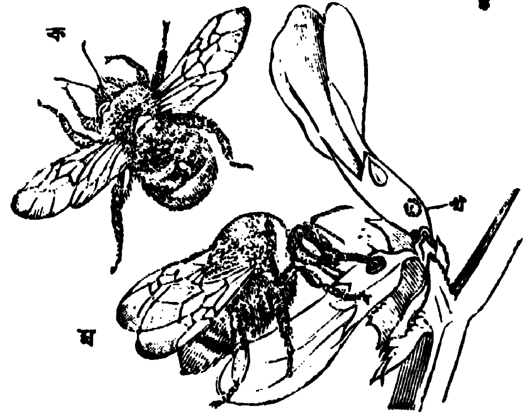
বহির্ভাগের পক্ষদ্বয় কঠিন। এই পক্ষদ্বয় পোকার দেহ ঢাকিয়া রাখে। কোন কোন পোকার কীড়া পদহীন। কোন কোন কীড়ার তিন জোড়া পদ ও পুচ্ছে একখানা শোষক পদ থাকে। গোবরে পোকা, ঘুণ পোকা, চেলে পোকা, আমের ভেঁা পোকা প্রভৃতি এই জাতির অন্তর্ভুক্ত।

৩। শল্ক পক্ষ পোকা বা প্রজাপতি (Lepidoptera)—Butterflies.—ইহাদের চারি পক্ষে শল্কের ন্যায় পদার্থ বিদ্যমান। কীড়ার তিন



জোড়া পদ ও পুচ্ছে একখানা শোষক পদ আছে। এই জাতীয় পোকার কীড়া নানা ফল ও শস্য বিনষ্ট করে। ইক্ষুর মাজরা পোকা, শেঁায়া পোকা প্রভৃতি এই জাতির অন্তর্গত।

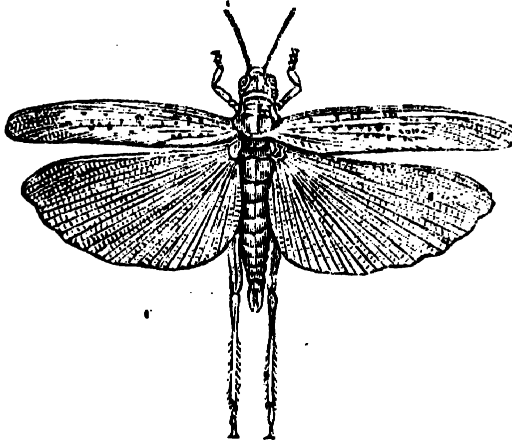
৪। ঝিল্লি-পক্ষ পতঙ্গ (Hymenoptera)—



ইহারা দুই জোড়া স্বচ্ছ পাতলা পক্ষধারী পতঙ্গ। কোন কোন প্রকারের কীড়া পদহীন, কোন প্রকারের কীড়ার তিন জোড়া থাবাল পদ, পুচ্ছে এক জোড়া কর্ষণী পদ ব্যতীত আরো পাঁচ হইতে সাত জোড়া কর্ষণী পদ আছে। মৌ পোকা, পিপীলিকা, বোলতা, ভীমরুল, কুমার পোকা প্রভৃতি এই জাতির অন্তর্ভুক্ত। এই জাতীয় কোন কোন পতঙ্গ অন্য পোকার গাত্রে ডিম্ব প্রসব করে।

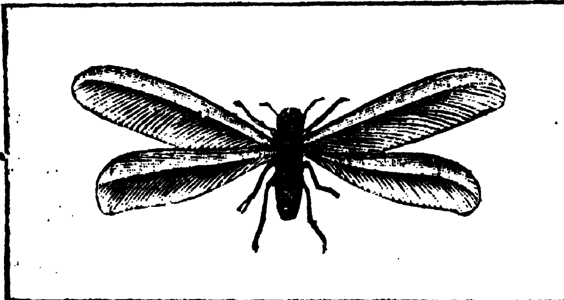
এবং ইহার কীড়া ঐ পোকা ধ্বংশ করিয়া কৃষকের সাহায্য করে।

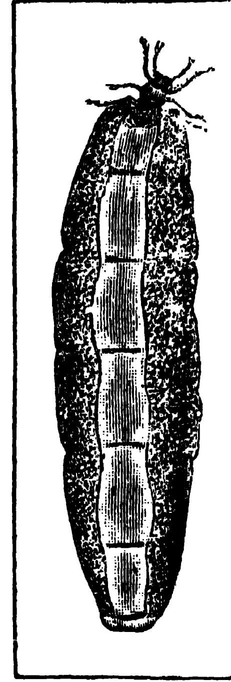
৫। ঋজু পক্ষ পতঙ্গ (Orthoptera)—Locust.—এই জাতীয় পতঙ্গের ঊর্দ্ধস্থ পক্ষদ্বয়



মসৃণ; চর্ম্মের ন্যায় দৃঢ়। অধস্থিত পক্ষদ্বয় ঊর্দ্ধস্থ পক্ষ হইতে অনেক বড়। এই পক্ষদ্বয় ঋজু ভাবে তাল পত্রের ন্যায় যোজিত হইয়া পৃষ্ঠোপরি অবস্থিতি করে, এই জন্য ইহার নাম ঋজু-পক্ষ পতঙ্গ। পঙ্গপাল, আরশুলা, উইচিংড়ি প্রভৃতি এই জাতীয় পোকা।

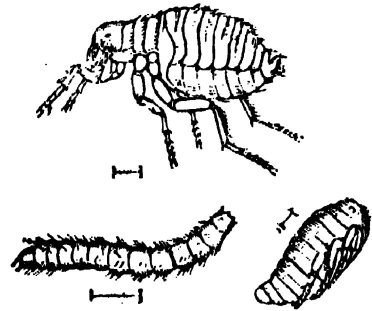
৬। স্নায়ু-পক্ষ পোকা (Neuroptera)—এই জাতীয় পোকার পক্ষগুলি স্নায়ুর ন্যায় রেখাযুক্ত এই জন্য ইহারা স্নায়ু-পক্ষ পোকা। ইহাদের সবগুলি পক্ষই অতিশয় পাতলা এবং প্রায় সমমাপক। ঝিঁঝি পোকা, উই পোকা এই জাতির





অন্তর্গত। ঝিঁঝি পোকা, জাব পোকা খাইয়া কৃষকের উপকার করে।

৭। অর্দ্ধ-পক্ষ পোকা (Hemiptera)—



The bugs—এই জাতীয় পোকার পক্ষ যোষিত। হইয়া অবস্থিতি করে। ইহারা শস্যের ভয়ানক শত্রু।



ভাদ্র—১৩১৬।

নাগপুরে কৃষি-বৈঠক।

বিগত কয়েক বৎসর হইতে প্রতি বৎসরই যে পুষায় অথবা অন্য কোন স্থানে একটি সরকারী কৃষি বৈঠকের অধিবেশন হইতেছে, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। গতবারে নাগপুরে এই বৈঠকের অধিবেশন হইয়াছিল। সরকারী কৃষিনীতি নির্দ্ধারণ এই বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য বলিতে পারা যায় এবং এই জন্য প্রত্যেক অধিবেশনে ভারত-গভর্ণমেণ্ট ও প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টের কতিপয় কর্ম্মচারী একত্রিত হইয়া বিগত বৎসরের কৃত কার্য্য ও আগামী বৎসরের কর্ত্তব্যকার্য্য সমালোচনা করেন। বলা বাহুল্য যে এই বৈঠকে সাধারণের অথবা কৃষকবৃন্দের কোন প্রতিনিধি উপস্থিত থাকেন না। বিগত বৈঠকে ভারতীয় কৃষি-বিভাগের ৮ জন ও প্রাদেশিক কৃষিবিভাগ সমূহের ২৫ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন ও এতদ্ভিন্ন অপরাপর ১১ জন সরকারী কর্ম্মচারী ও দর্শকও যোগদান করিয়াছিলেন।

কৃষি বৈঠকের প্রথম প্রতিষ্ঠা ১৯০৫ সালে। সুতরাং গত বারে ইহার পঞ্চম অধিবেশন হইয়া গেল। এই পাঁচবার অধিবেশনের ফলে ভারতীয় কৃষি সম্বন্ধে কি উন্নতি সাধিত হইয়াছে অথবা উন্নতি সাধনের উপায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করার বোধ হয় এখন সময় আসিয়াছে। আমরা আপাততঃ ভারতীয় অথবা প্রাদেশিক কৃষি-বিভাগ সমূহের কার্য্যতালিকার বিষয় ছাড়িয়া দিতেছি। কারণ তৎসমুদায় সম্যক্‌রূপে বিবেচনা করিতে হইলে প্রত্যেক প্রদেশের আর্থিক ও কৃষি-অবস্থাগত বিশেষ বিশেষ বিষয় সমূহের পর্য্যালোচনা করিতে হয়। এইগুলি ছাড়িয়া দিয়া কৃষি-বৈঠকের বিবেচনাধীন বিষয় সমূহকে মোটামুটি পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়ঃ—(১) বিশেষ বিশেষ ফসল সম্বন্ধে অনুসন্ধান, উন্নতি সাধন ও উহাদের প্রসারণ—(২) চাষ ও কৃষি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ও গৃহাদি নির্ম্মাণ—(৩) পশু চিকিৎসা—(৪) কৃষি বিষয়ক শিক্ষা ও—(৫) বিবিধ কার্য্যের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ স্থাপন ও কৃষিবিভাগের সাধারণ গঠন প্রণালী।

প্রথম হইতেই এই কয়েকটি বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা চলিয়া আসিতেছে। প্রথম বিভাগে ১৯০৫ সালে কার্পাস ও পাট, ১৯০৬ সালে গোধূম ও তামাক, ১৯০৭ সালে ইক্ষু ও কার্পাস এবং ১৯০৮ সালে তুলা ও পাট ভিন্ন অন্যান্য তন্তু-উৎপাদক ফসল আলোচিত হয়। ১৯০৯ সালের বৈঠকে বিশেষ কোন ফসলের বিষয় উত্থাপিত হয় নাই, তবে কার্য্য তালিকায় কতকগুলি আবশ্যকীয় পরীক্ষার উল্লেখ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় বিভাগে ১ম বৎসর জল সেচন, ২য় বৎসর কৃত্রিম সার, ৩য় বৎসর নদীর পলি, কৃত্রিম সার ও মৃত্তিকা বিশ্লেষণের প্রণালী নির্দ্দিষ্টকরণ ও বিগত বৈঠকে কৃষি পরীক্ষা ও প্রদর্শন ক্ষেত্রের উপযুক্ত পরিমাণ জমির বিষয় সমালোচিত হয়। এস্থলে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, চতুর্থ বৎসরে অর্থাৎ ১৯০৮

সালে দ্বিতীয় বিভাগভূত কোন বিষয় বৈঠকের সম্মুখে উপস্থিত করা হয় নাই। তৃতীয় বিভাগে প্রথম তিন বৎসর সাধারণ পশু চিকিৎসা ও চতুর্থ বৎসরে মুরগী, হাঁস প্রভৃতি পক্ষী পালনের বিষয় আলোচিত হয়। পশুবিদ্যা যে ক্রমশঃ ক্রমশঃ বৈঠকের দৃষ্টির অন্তরালে গিয়া পড়িতেছে তাহা ইহা হইতে অনেকটা প্রতীয়মান হয়।

চতুর্থ অথবা কৃষিশিক্ষা বিভাগই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আলোচনাযোগ্য। আমরা দেখিতে পাই যে ১৯০৫ সাল হইতে ১৯০৭ সাল পর্য্যন্ত বৈঠক ক্রমান্বয়ে নিম্নলিখিত বিষয় গুলি বিবেচনা করেনঃ—ওভারশিয়রগণকে শিক্ষাপ্রদান ও বালক দিগের জন্য ক্ষেত্রে কৃষিশ্রেণী খুলিবার প্রস্তাব: কৃষিকলেজ সমূহের জন্য পাঠ্য বিষয় নির্দ্ধারণ; কৃষি-ইঞ্জিনিয়ারগণকে শিক্ষাপ্রদান: কৃষি শিক্ষার জন্য ইউরোপ অথবা আমেরিকায় প্রেরিত ভারতীয় কর্ম্মচারীগণের পাঠ্য বিষয় নির্দ্ধারণ; কৃষিক্ষেত্রের অধ্যক্ষগণকে শিক্ষাপ্রদান, কৃষি-শিক্ষার জন্য কোন্ শ্রেণীর ছাত্রের আধিক্য হওয়া বাঞ্ছনীয় তাহা স্থিরী-করণ, কৃষি শিক্ষার পথে বাধা বিঘ্ন; পুষায় শিক্ষা প্রদান প্রণালী ও স্থায়ী শিক্ষা কমিটি। এই বিষয় গুলির মধ্যে কোনটি যে অনাবশ্যক তাহা বলিতে পারা যায় না। তথাপি এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনায় বৈঠক যে নীতি অনুসরণ করিতেছেন তাহার ঐক্যতা অথবা সামঞ্জস্য বিষয়ে সাধারণের বিশেষ আস্থা না থাকিতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা একটি বিষয় উল্লেখ করিতেছি। বিগত বৈঠকে কৃষি শিক্ষা প্রদানের জন্য কোন্ শ্রেণীর ছাত্র আকর্ষণ করা বাঞ্ছনীয় তাহা লইয়া একটা বিষম বাদানুবাদ হয়। অবশেষে ইহা স্থির হয় যে এই সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় না কিন্তু যতদুর বুঝিতে পারা যায় তাহাতে বোধ হয় বিজ্ঞানদক্ষ ব্যক্তিকে কৃষি সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা কৃষিদক্ষ ব্যক্তিকে বিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া অধিকতর বাঞ্ছনীয়। আমরা ইহার সার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না। আমাদের দেশে যাহারা কৃষক, যাহাদের মধ্যে প্রকৃত কৃষি বিষয়ক জ্ঞান আছে বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায়, তাহাদের সাধারণ শিক্ষা এত অল্প যে কলেজের কথা দূরে থাকুক, তাহারা স্কুলের শিক্ষা হইতেও কোন উপকার প্রাপ্ত হইবে না। এ স্থলে ইহাও মনে রাখা কর্ত্তব্য যে কৃষি বিষয়ক শিক্ষা কিছু দেশীয় ভাষায় প্রদত্ত হইবে না। সুতরাং উক্ত শিক্ষার দ্বারা লাভবান হইতে হইলে প্রথমতঃ ইংরাজী জ্ঞানের আবশ্যক। সাধারণতঃ কৃষক সন্তানের সে জ্ঞান নাই। মধ্যবিত্ত লোকেরাই সেরূপ শিক্ষা পাইয়া থাকে এবং দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহারাই বৈজ্ঞানিক কৃষি প্রণালী শিক্ষা করিতে সক্ষম। অবশ্য এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোকের বংশানুক্রমে চাষ আবাদের উপর যে একটা অশ্রদ্ধার ভাব রহিয়াছে তাহা একেবারে তিরোহিত হইতে সময় লাগিবে। এই ঘৃণার ভাব যে চলিয়া যাওয়া সম্ভবপর তাহার লক্ষণ এখনই দেখা যাই-তেছে। ভদ্র লোকের কৃষি কার্য্যের উপর যে নজর পড়িয়াছে তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। সুতরাং বৈঠকের সদস্যগণের এই বিষয় লইয়া বাদানুবাদ করা, সময় অপচয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। সদস্যগণের অধিকাংশই যদি বিদেশ-বাসী না হইতেন তাহা হইলে তাঁহারা অনায়াসে বুঝিতে পারিতেন যে, তাঁহাদের কৃষকের সংসর্গে আসিবার একমাত্র উপায়—মধ্যবিত্ত ভদ্র সন্তান-গণকে কৃষি বিষয়ে সুশিক্ষিত করা। তাঁহাদের সাহায্য ব্যতীত কিছুতেই জনসাধারণের সংস্পর্শে আশা সম্ভব পর নহে। কৃষিজীবিগণের জন্যই

প্রধানতঃ কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া উচিত বটে, কিন্তু কৃষি বিদ্যালয়ের দ্বারও সকলের জন্য উন্মুক্ত রাখা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু উচ্চ শিক্ষা বা উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের প্রতি সরকারী কর্ম্মচারী-বর্গের কেমন একটা বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে—তাঁহারা উচ্চ শিক্ষার কোন নিদর্শনই চক্ষুর সম্মুখে রাখিতে চান না।

আমরা পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা কৃষি শিক্ষা বিষয়ে সরকারী কর্ম্মচারীগণের কিরূপ ভ্রান্ত ধারণা আছে তাহা দেখাইলাম। বিশেষ ভাবে পর্য্যালোচনা করিলে সরকারী কৃষি শিক্ষা নীতির আরও অনেক দোষ দেখিতে পাওয়া যাইবে। আমরা সেগুলি ভবিষ্যতে বিবেচনা করিব। এক্ষণে ৫ম বিভাগে বৈঠক কতদূর সফলতা লাভ করিতে পারিয়াছেন তাহা দেখা যাউক। পঞ্চম বিভাগটিকে তিনটি উপবিভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়ঃ—(১) কৃষক ও কৃষি বিভাগের সহিত সম্বন্ধ, (২) কৃষি বিভাগের আভ্যন্তরিক গঠন প্রণালী এবং (৩) কৃষি বিভাগ ও সাধারণের সহিত সম্বন্ধ। কি প্রকারে কৃষকগণের সংস্পর্শে আসা যায় এবং কি উপায়ে পরীক্ষিত ফল সমূহ কৃষকের গোচরীভূত করা যায় এই দুইটি প্রথম উপবিভাগে প্রধান আলোচনার বিষয়। এই বিষয়গুলি আলোচনা করিবার জন্য গত পূর্ব্ব বৎসর একটি কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটির বিবরণী সম্পূর্ণ না হওয়ায় গত বৈঠকে তাহা পেশ হয় নাই। সুতরাং এ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ অযৌক্তিক। তবে এ সম্বন্ধে ডাক্তার ম্যান্ যে কয়েকটি কথা বলেন সেগুলি সকল কৃষিকর্ম্মচারীরই স্মরণ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। তিনি বলেন যে যাঁহারা রায়তের বিশ্বাস ভাজন হইতে চান তাঁহাদের ব্যক্তিগত বিশেষ গুণ থাকা আবশ্যক ও স্থানীয় অবস্থা সম্যকরূপে পরিজ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন। এতদ্ভিন্ন তাঁহাদের কেবল এইরূপ নব প্রথা প্রবর্ত্তন করা উচিত যদ্দ্বারা খরচ খরচা বাদ দিয়া বাস্তবিকই লাভ হয়। দ্বিতীয় উপবিভাগে এক প্রদেশের কর্ম্মচারীগণের নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য অন্য প্রদেশে পরিভ্রমণ করিবার যে প্রস্তাব হইয়াছে তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে অনেক উপকার দর্শিতে পারে। এতদ্বারা এক দেশের উৎকৃষ্ট কৃষি প্রণালী, বীজ ও যন্ত্রাদি অন্য দেশে প্রবর্ত্তিত হইবে এবং কর্ম্মচারীগণের জ্ঞানও অনেকটা প্রসার লাভ করিবে।

সর্ব্বশেষে বৈঠক সাধারণের সহিত কৃষি বিভাগ সমূহের কিরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চান তাহা বিশেষ বিবেচ্য। আপাততঃ কৃষি বিভাগগুলি হইতে নানা বিষয়ক পুস্তক, পুস্তিকা, বিবরণী ও সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে। খাস ভারতীয় বিভাগের মুখ পত্র, "এগ্রিকলচারল্ জর্ণাল অব্ ইণ্ডিয়া" যে একটি মূল্যবান কৃষি বিষয়ক পত্র তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। এতদ্ভিন্ন কতিপয় প্রাদেশিক কৃষি বিভাগেরও বিশেষ বিশেষ মুখ পত্র আছে। সেগুলি উৎকৃষ্ট কি অপকৃষ্ট তাহা এস্থলে বিবেচনা করিবার আবশ্যক নাই। তৎসমুদয়ের দ্বারা সাধারণের কোন উপকার হইতেছে কি না তাহাই আলোচনার বিষয়। নিরপেক্ষ ভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে দেশের অশিক্ষিত কৃষকের কথা দূরে থাকুক, অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও ঠিক কৃষি বিভাগের অস্তিত্বের কথা না হউক, অন্ততঃ উহার কার্য্য প্রণালীর বিষয় কিছুই অবগত নহেন। আর যাঁহারা কৃষি বিভাগের পুস্তকাদির খবর রাখেন তাঁহারাও উহার জটিল ভাষা ও অঙ্কাদির জন্য মাথা ঘামাইতে রাজি নহেন। কৃষি বিভাগের কর্ত্তারা যে কৃষি পরীক্ষার ফলাফল প্রচার করিবার জন্য সাধারণ সংবাদ পত্রের সাহায্য

গ্রহণ করিতে মনস্থ করিয়াছেন তাহা অবশ্য সুখের বিষয়। কিন্তু সাধারণ দৈনিক অথবা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র নানাবিধ বিষয় লইয়া এত ব্যাপৃত থাকে যে, তাহারা কৃষি কথার জন্য সামান্য স্থানই দিতে পারে। এরূপ অবস্থায় দেশ মধ্যে কৃষি বিভাগের উদ্দেশ্য এবং কার্য্যাদির ফলাফল বিস্তৃতরূপে প্রচার করিতে হইলে, প্রথমতঃ যে কয়েকটি কৃষিবিষয়কপত্র আছে সেগুলির সহিত সমবেত কার্য্য করা আবশ্যক, এবং তৎসঙ্গে বিশেষ পরীক্ষিত ফলগুলি পত্রিকা-রূপে ছাপাইয়া কোন দায়ীত্বভাবযুক্ত ব্যক্তি, সমিতি অথবা সংবাদ পত্র দ্বারা বিতরণ করা আবশ্যক। এতদ্ভিন্ন কৃষকের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংস্পর্শে আসা ত প্রথমেই প্রয়োজনীয়। ফলতঃ কৃষিবিভাগের বিদেশীয় কর্ম্মচারীগণ যদি দেশীয় ব্যক্তির ন্যায় দেশীয়ের সহিত আচরণ করিতে পারেন তাহা হইলেই সফলতা সম্ভবপর। নতুবা সরকারী ও বেসরকারীর মধ্যে ব্যবধান অন্তর্হিত হওয়া সুকঠিন।

মহীশূরে ইক্ষুর আবাদ।—এখানে সম্প্রতি আখের আবাদ খুব বাড়িয়াছে। ১৯০৮ সালে ৪৪,৫৫০ একর পরিমাণ জমিতে আখের চাষ হইয়াছিল। অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা জমির পরিমাণ ৪,২০০ একর অধিক এবং অন্য বৎসরের সহিত তুলনায় ১০৭,৮০০ মণ অধিক গুড় উৎপন্ন হইয়াছে।

জম্মুতে রেশমের আবাদ।—নানাজাতীয় তুঁত গাছ জম্মুতে জন্মায়। সেইজন্য এখানে রেশম চাষের বিশেষ সুবিধা। কুলেতেও তসর গুটিপোকার চাষ সুন্দর হইয়া থাকে। সাধারণ জাতীয় কুলও (Zizyphus Jujube) জম্মুতে অধিক পরিমাণে জন্মিতে দেখা যায়। ২০টি সাত হইতে দশ বৎসরের তুঁত গাছে এক আউন্স পরিমাণ গুটি পোকার বীজ প্রতি-পালিত হইতে পারে এবং অনুকূল অবস্থায় এই সকল কীট হইতে এক মণ অসংস্কৃত গুটি পাওয়া যায়। এখানে এই গুটি ১৫৲ টাকা মণ দরে বিকাইতে দেখা যায়। ১৯০৭ সালে ১,৫০০ আউন্স বীজ চাষীদের মধ্যে বিতরিত হইয়াছিল, কিন্তু সে হিসাবে গুটি উৎপন্ন হয় নাই, মোট ৪৯৫ মণ মাত্র গুটি পাওয়া গিয়াছিল। তৎপূর্ব্ব বৎসরে কিন্তু ৩৫০ আউন্স বীজ হইতে ৩০৪।।০ মণ গুটি হইয়াছিল। এখানে তসর গুটি তৈয়ারির চেষ্টা হইতেছে। কুলেতেও এখানে তসর কীট স্বভাবতই জন্মায়। এরণ্ডের চাষ করিয়া এড়ি রেশম তৈয়ারি করিবার উদ্যোগ চলিতেছে।

স্বদেশীর অপব্যবহার।

আমরা অনেক দিন হইতেই নিজ বাস ভূমে বিদেশী সাজিয়া কাল কাটাইতেছি। আহারে, বিহারে, বসনে, ভূষণে বিদেশী ভাব ঢুকিয়া গিয়াছে। আমরা বাহিরে ফিরিঙ্গি সাজিতে ভাল-বাসি এবং অন্দরেও বিবিয়ানার চূড়ান্ত। কত রকমের বিবিয়ানা পোষাক ও কত রকমের বিবি-য়ানা অলঙ্কার। আয় বাড়িতেছে না অথচ খরচ হু হু বাড়িয়া যাইতেছে। তখন মোটামুটি সোণা, রূপার গহনায় সেক্‌রা যৎকিঞ্চিৎ বানি লইয়া সন্তুষ্ট হইত। সোণা, রূপা থান থান বজায় থাকিত। এখন প্রতি ভরিতে রকম ওয়ারি কাজে ৬৲।৮৲ টাকা বানি (মজুরি) দিতে কুণ্ঠিত নহি। তার উপর পান দেওয়া আছে। এখন সোণার গহনা দুইবার ভাঙ্গিয়া গলাইলেই রাঙ্গে পরিণত হইল। আমাদের ভিতর বিদেশী সখ ঢুকিয়া কত যে বাজে খরচ বাড়িয়াছে, দেশের কত যে অনিষ্ট হইতেছে তাহার গণনা করা যায় না। ভারতবর্ষে সোণা, রূপার উৎকৃষ্ট অলঙ্কার চিরকালই ছিল, এখনও আছে, সেগুলি কিন্তু খাঁটি জিনিষ তাহার মজুরিও কম নহে; তাহা রাজা, মহারাজা, ধনী, জমিদার পরিবারবর্গের ভূষণ কার্য্য সম্পাদন করিত, এখনও করে, তাহাতে ভেল নাই, সেগুলি নকল নহে আসল। কিন্তু সকলের আসল ব্যবহারের ক্ষমতা নাই তবুও সখ মিটান চাই, তাই আমাদের দেশে যাহা কখন হইত না—নকল বিলাতী মুক্তা ব্যবহৃত হয়—তাই আমেরিকান ব্যবসাদার টেট কাঁচ কাটিয়া হীরা বলিয়া চালাইয়া দেশের কত পয়সা লুটিয়া লইয়া গেল। এখনও আমরা সাহেবী

ধরণে ১৮ কেরেট সোণার চেন, আংটি প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া কত বিদেশী স্বর্ণকারের পসার বাড়াইতেছি। অথচ আমরা মুখে খুব স্বদেশী। যদি পারি তবে আসল ব্যবহার করিব নচেৎ বিলাস ছাড়িব, আমাদের এ বুদ্ধি অন্তর্হিত হইয়াছে। এখন আমরা বুঝি যে "হোক না কেন গিল্টি সোণা থাক্‌লেই হল চকচকানি"। এই কি আসল স্বদেশী ভাব, না ইহা নকল স্বদেশী! এই জন্যই আমরা মন্দ লোকের নিকট পদে পদে প্রতারিত হইতেছি।

স্বদেশীর নামে কত জুয়াচুরী চলিতেছে। এখন কত স্বদেশী এসেন্স তৈয়ারি হইতেছে। তখন আতর, গোলাপজলে কাজ চলিত এখন কত সখ—কত বিদেশীর মত সখ। আতর, গোলাপে কি হইবে, লেভেণ্ডার, অডিকলম চাই, এখন নানা প্রকার "বোকে" না হইলে কাজ চলে না। যেগুলি এখন হাজারে হাজার বাজারে পাওয়া যায়, সেগুলি কি সব স্বদেশী?—না, নলচে খোল সবই বিলাতী, ভিতরের বস্তুটী যায় শিশিটী সবই বিলাতী, খালি নামটা দেশী তাও বিলাতী ধরণের। এখন বল দেখি আমরা কি রকমের স্বদেশী, কতটুকু স্বদেশী? স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে কত সাবানের কারখানা বসিয়া গেল, বার আনা বিদেশী উপাদান লইয়া সেই সাবান ত তৈয়ারি হইতেছে তথাপি বিদেশীর মত হয় কি? কোন সাবানটা বিলাতী সন্‌লাইট সোপের মত হয় নাই। কোন সাবানটা পিয়ারের সোপের মত না হউক অন্ততঃ তার ধারে ধারেও যায় না। কি কি উপাদান লাগে জানিলে কি হইবে, উপাদান গুলি সংগ্রহ হইলে কি হয়, সে গুলি মিশ্রণের কৌশল জানা আবশ্যক, উন্নতির চেষ্টা আবশ্যক। তবে অনেক কৃতবিদ্য লোক একার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহাদের যত্ন সময়ে নিশ্চয়ই ফলবতী হইবে বলিয়া আশা করা যায়। স্বদেশী হইয়া অপর পক্ষে দুষ্টের বড় সুবিধা হইয়াছে—দেশের লোক একাগ্রতাবশতঃ যা তা কিনিতেছে। স্বদেশ-জাত হইলেই হইল। স্বদেশীর নামে দুষ্ট লোকের দু পয়সা রোজগার হইতেছে তবে, আর ভাল মন্দ বিচারের দরকার কি? তাদের ব্যবসা এরূপ ভাবে চলিলে ব্যবসা স্থায়ী হইবে কি? একেই বাঙ্গালী জাতি বড় অল্পে সন্তুষ্ট, যাহোক কিছু আসিলেই হইল, যেরূপে হউক দিনটা কাটিয়া গেলেই ভাল। তার উপর এই সকল স্বার্থপর লোক দ্বারা বিশেষ অনিষ্ট হইবে। স্বদেশীর প্রারম্ভ খুব চমৎকার। নষ্ট শিল্পের পুনরুদ্ধার ইচ্ছা শতধা জাগিয়া উঠিয়াছে। এখন আরব্ধ কার্য্যের স্থায়িত্ব আমাদের দেশের লোকের উদ্যম ও উৎসাহ ও সততার উপর নির্ভর করিতেছে। আমাদের হতাশ বা নিরুৎসাহ হইবার কিছুই নাই; সাধনায় সিদ্ধি এ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এই সাবানের কথাই ধর কত বৎসরের চেষ্টার ফলে বিলাতের এই পিয়ার্সের সাবান অতুলনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

স্বদেশীর নামে কত অনিষ্ট সাধিত হইতেছে। বিদেশী অতি অপকৃষ্ট তামাক আনাইয়া বিদেশী কাগজ আনাইয়া দেশী ছাপ দিয়া দেশী সিগারেট বলিয়া বাজারে চলিতেছে। অপরিণামদর্শী ব্যবসা-দারগণ যদি নিজেদের ক্ষণস্থায়ী স্বার্থ ভুলিয়া একা না হয় সমবেত চেষ্টাতে ভাল তামাক উৎপাদনের চেষ্টা করিতেন, যদি এদেশী উপাদানে ভাল চুরুট বা তামাক প্রস্তুতের প্রয়াস পাইতেন তাহা হইলে দেশের একটা সামান্য অভাবও এতদিনে চিরকালের জন্য সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হইত। কিন্তু আপাততঃ লাভের আশা তাঁহারা ভুলিতে পারিবেন কি? আমরা অমুক দত্ত, অমুক বসুর ছাতা মাথায় দিয়া স্বদেশী ছাতা বলিয়া গর্ব্ব করি। কিন্তু ছাতাগুলির কোন খানটা স্বদেশী—কল, কজা, কাপড়, বাঁট ছাতাটা আমূল স্বদেশী হওয়া উচিত নহে কি?

কিন্তু সবই বিদেশী নহে কি? স্বদেশীর প্রভাবে শ্রমশিল্পের উদ্দীপনা হইয়াছে মাত্র, কিন্তু এখনও অধিকদূর অগ্রসর হয় নাই।

স্বদেশীর সুভ সুচনায় কতকগুলি যৌথকারবার প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। আগে আমাদের এই বাঙ্গালার লোক পরস্পর কেহ কাহাকেও তাদৃশ বিশ্বাস করিত না; দশ জনে মিলিয়া কোন কাজ করিতে পারিত না; সাধারণের টাকা দশ জনে হাতে করিয়া কোন কাজ করিবার সুযোগ বড় ঘটিত না, স্বদেশী সেই নষ্ট বিশ্বাস পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, স্বদেশী এখন পরস্পরকে মিলাইয়াছে। সুচনা ভাল, সাধনা ভাল হইলে সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, অনেক হুজুগে লোক স্বদেশী সাজিয়া লোক মাতাইয়া অনর্থ ঘটাইতেছেন, ইহাঁদের সঙ্গে যে গণ্যমান্য লোক নাই এমন নহে। তাঁহাদেরই নামে সাধারণে ভুলিতেছে কিন্তু আমাদের বোধ হয় এ দলের সঙ্গে প্রকৃত ব্যবসাদার মিলিত হয় নাই, প্রকৃত কাজের লোক এ দলের ভিতর নাই। সুধু অর্থ সংগ্রহ হইলে হয় না.—অর্থ, অধ্যবসায়, সততা ও কর্ম্মনিপুণতা এই চারিটী ভিত্তি স্তম্ভের উপর ব্যবসা প্রতিষ্ঠিত। বড় লোক পয়সা দিতে পারেন তাঁহাদের নামে পয়সা সংগ্রহ হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত কাজের লোক না জুটিলে সে কর্ম্ম কুশলতা, সে অধ্যবসায় মিলিবে কোথা হইতে? আবার শুধু কাজের লোক জুটিলে হইবে না. তাঁহাদের সততা থাকা আবশ্যক; সৎ লোকের সমাবেশ না হইলে ব্যবসা তিন দিনে উঠিয়া যায়।

তাই আমরা বলিতে চাই যে, অব্যবসায়ীর হাতে ব্যবসা পড়িয়া অনেক ব্যবসা নষ্ট হইতে বসিয়াছে। মোজা. গেঞ্জির কলের দাম তত অধিক নহে। যে সে ঐ কল কিনিয়া মোজা গেঞ্জি বুনিতেছেন—তা ভাল সুতা কে জানে, আর মন্দ সুতা কে জানে—বোনা ভাল হউক বা মন্দ হউক সে দিকে দৃষ্টি নাই। তাঁহারা জানেন যে যাঁহাদের প্রাণে স্বদেশী পিপাসা জগিয়াছে তাঁহারা তাহা কিনিবেই। এ সকল লোক দামের দিকেও বড় একটা তাকান না। যাহা হউক কিঞ্চিৎ পারিশ্রমিক হইলেই হইল। ইহাতে ঘোরতর অনিষ্ট হইতেছে, ভাল জিনিষের আদর কমিয়া যাইতেছে। যাঁহারা ভাল জিনিষ তৈয়ারি করিতেছেন, তাঁহাদের জিনিষ অযত্নে পড়িয়া রহিয়াছে। জিনিষ সস্তা চাই—সস্তায় খাঁটি জিনিষ হইলে সেই সস্তা। সস্তায় খারাপ জিনিষের দুরবস্থা চিরকালই।

উপসংহারে আমরা বুঝাইতে চাই যে দুই শ্রেণীর লোক দ্বারা এমন যে সুভ স্বদেশী তাহার অনিষ্ট হইতে বসিয়াছে। এক দল লোক স্বদেশীর ভাণ করিয়া নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য স্বদেশীর মূলে কুঠারাঘাত করিতে বসিয়াছেন। আর এক দল লোক প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য ব্যগ্র; ভাল মন্দ বিচার না করিয়া বিদেশী অনুকরণে একেবারে বড় বড় কাজে হস্তক্ষেপ করিতেছেন অথচ সে কাজের জন্য যাহা আবশ্যক তাহার যোগাড় নাই। আমেরিকায় কালিফার্ণীয়ায় বড় বড় ফলের বাগান আছে, এক একটা বাগান ২০০০ একরের কম নহে। তথা হইতে দেশ বিদেশে ফল রপ্তানি হয়। এই দৃষ্টান্ত মাথায় লইয়া এদেশের কোন কোন লোক দুই, চারি শত বিঘা জমির যোগাড় করিয়া ফলের বাগান আরম্ভ করিয়া দিলেন! শুধু ফলের বাগান কেন, ফুলের চাষও আরম্ভ হইল। জমি সকল হাসিল হইল না, জমির মাটি, ফল বা ফুল বাগানের উপযুক্ত কি না দেখা হইল না, লোক জনের ভালরূপ বন্দোবস্ত হইল না, দুই, চারি শত ফলের গাছ পাঁচ, সাত শত ফুলের চারা বসিয়া গেল। এরূপ কার্য্যে প্রতিষ্ঠা লাভ ত পরের কথা নিশ্চয় ভবিষ্যতে অপ্রতিভ হইতে হইবে। আর সাধারণে, যাহারা

পূর্ব্বে এক পয়সা পরহস্তে দিবার আগে সাতবার ভাবিত, তাহারা যে স্বদেশী সাধনার একাগ্রতায় সাধ্যানুসারে কখন কখন বা সাধ্যাতিরিক্ত টাকা ব্যবসায়ের খাতিরে, ভাবী উন্নতির আশায়, দেশ-হিতকামনায় পরহস্তে তুলিয়া দিতেছে তাহাদের আশায় এবং উৎসাহে কি চিরদিনের জন্য ভস্ম নিক্ষেপ করা হইবে না? বিদ্যা, বুদ্ধি, সমাজে খ্যাতি থাকিলেই কি একের দ্বারা সব কাজ হয়? কাজ করিতে গেলে কাজের লোককে সঙ্গে লইতে হয়।

জনৈক পর্য্যবেক্ষক।

ইন্দুর চর্ম্মের ব্যবহার।—ইউরোপে ইন্দুরের চর্ম্মে নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হয়। মূষিক-চর্ম্মের দস্তানা, মনিব্যাগ প্রভৃতি বিলাসীর স্পৃহনীয় বস্তু। ইউরোপের কারিগরী বিদ্যালয়ে মূষিক চর্ম্ম পাট করিবার পদ্ধতি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। পাশ্চাত্যখণ্ডে প্রতি বৎসর প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ টাকার মূষিক-চর্ম্মের কারবার হইয়া থাকে। আমেরিকার সাপের চামড়াও বাদ যায় না। ভুজঙ্গ চর্ম্ম নির্ম্মিত পাদুকা আমেরিকায় আদরের বস্তু; অনেক বিলাসী ও বিলাসিনী উরগ চর্ম্মে সুকোমল চরণ কমল আবৃত করিয়া থাকেন। পাখীর পালক, সাপের চামড়া, ঝিনুকের খোলা, কচ্ছপের কঠিন দেহাবরণ, বাঘের ও কুমিরের দাঁত, হরিণ, মহিষ প্রভৃতির শিং, গবাদির অস্থি প্রভৃতি বিবিধ বস্তু প্রতীচ্য সভ্যতার বিলাস-ভুষণ।—অশ্বচর্ম্ম-নির্ম্মিত পাদুকা ভারতেও আসিয়া থাকে। যাহা আমাদের দেশে অতি তুচ্ছ তাহা ইউরোপ ও আমেরিকার লোকে কাজে লাগায় এবং তাহার ব্যবসায়ে আমাদের নিকট হইতে পয়সা রোজগার করে।

অতিবর্ষণ।—কাটোয়ায় অতিবর্ষণের ফলে অজয় নদীতে জলপ্লাবন উপস্থিত হইয়াছে। বহু শস্য ক্ষেত্র ডুবিয়া গিয়াছে। নবরোপিত ধান গাছ সব পচিয়া যাইতেছে! বর্ষার প্রথমে জল হইল না, কৃষকগণ শ্রাবণের শেষে জল পাইয়া আবাদ করিল, অতিবৃষ্টিতে বন্যায় সব নষ্ট হইতে চলিল।

অতিরিক্ত বর্ষণে ও জলপ্লাবনে মহকুমার কিরূপ ক্ষতি হইয়াছে তাহা ক্রমশঃ জানাইব।

বাংলার মাটীতে দীর্ঘ সূত্র ও সূক্ষ্ম আঁস কার্পাস।

১। প্রকৃত ঢাকাই কার্পাস ব্যতীত ভারতবর্ষে কার্পাসের আঁস এক ইঞ্চির বেশী লম্বা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম আঁস বিশিষ্ট কার্পাস প্রস্তুত করিবার জন্য কোম্পানির অধিকার সময়ে বিস্তর পরীক্ষা হইয়া লম্বা আঁস বিশিষ্ট বিদেশী কার্পাস এদেশে জন্মিবে না সাব্যস্ত হইয়াছিল। দেশী কার্পাসের আঁস লম্বা করিবার বিশেষ কোন চেষ্টা করা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। বিদেশীয়রা অল্প সময়ের জন্য পরীক্ষা করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিয়া উহাও প্রায় হইতে পারে না বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছিল।

২। সম্প্রতি ভারত গভর্ণমেণ্টের কৃষি-বিভাগ হইতে স্থানে স্থানে উভয় প্রকারেই কার্পাসের আঁস লম্বা ও সূক্ষ্ম করিবার জন্য পুনরায় চেষ্টা করা হইতেছে। আমাদের বাংলার কৃষি-বিভাগের কর্তৃপক্ষগণও চেষ্টা করিতেছেন। বাংলা প্রভিন্সিয়াল্ কৃষি সমিতির ১৯০৯ সালের ৩রা এপ্রেল তারিখের রিপোর্টে প্রকাশ যে, বাংলা দেশে ব্যবসায় উপযোগী তুলা জন্মাইতে পারা যাইবে না বলিয়া, ডেপুটি ডাইরেক্টর স্মিথ সাহেব বাহাদুর মত প্রকাশ করিয়াছেন। এক বৎসরের জন্য ব্যর্থ মনোরথ হইয়া, চিরকালের জন্য একটা মত স্থির করা যেন সঙ্গত হয় নাই। উড়িষ্যা, বিহার ও ছোটনাগপুরের স্থানে স্থানে ব্যবসায়োপযোগী কার্পাস প্রস্তুত হইয়া থাকে। কলের কাপড় এদেশে প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে যখন দেশী কাপড়ের প্রচলন ছিল তখনকার বৃদ্ধ চাষীদের নিকট শুনিয়াছি বাঙ্গলায় সকল গ্রামেই বৎসরী কার্পাসের চাষ ছিল। বৈশাখ ও কার্ত্তিক মাসে ঐ চাষ হইত। আশ্বিন হইতে চৈত্র মাস মধ্যে তুলা চয়ন কার্য্য শেষ হইত। ঐ তুলা দ্বারা গ্রামের তাঁতি ও জোলারা কাপড় প্রস্তুত করিত। ঐ সকল তুলা ঢাকাই তুলা ব্যতীত, লম্বা ও সূক্ষ্ম আঁসের ছিল না সত্য, কিন্তু লম্বা ও সূক্ষ্ম আঁস বিশিষ্ট কার্পাস প্রস্তুত

করিতে আশানুরূপ চেষ্টা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

৩। ইউরোপ ও আমেরিকায় বর্ত্তমান কৃষিজাত দ্রব্যের উৎকর্ষ সাধন জন্য যে প্রকার পরিশ্রম ও অধ্যাবসায় অবলম্বিত হইতেছে, এবং তাহার ফলে যেরূপ সর্ব্বপ্রকার উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, তাহা বোধ হয় অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তিই অবগত আছেন। যে সি-আইল্যাণ্ড তুলা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান পাইয়াছে, উহাও স্বভাবজাত এক দিনের বা এক বৎসরের ফল নহে। উহা এখন পর্য্যন্ত আমেরিকার সর্ব্বত্র জন্মে না, কিম্বা অতিরিক্ত পরিমাণে জন্মে না, সর্ব্বপ্রকার জল বায়ু সহ্য করিয়া সর্ব্বপ্রকার মাটিতে জন্মে না। আমেরিকাবাসীরা লম্বা আঁস বিশিষ্ট কার্পাস অতিরিক্ত পরিমাণে জন্মাইবার জন্য এখনও পরীক্ষায় বিরত হন নাই; তাহার জন্য নানাপ্রকার পরীক্ষাদি হইতেছে, এবং কতক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। এদেশেও আশানুরূপ চেষ্টা হইলে যে বিফল মনোরথ হইতে হইবে, এরূপ বোধ হয় না।

৪। আমেরিকা ও ইউরোপবাসীরা গৃহপালিত পশু, পক্ষী, শাকসব্জী, শস্য, ফল, ফুল প্রভৃতির শঙ্কর উৎপন্ন দ্বারা যে প্রকার উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন, এদেশেও তদনুরূপ পরিশ্রমাদি করিলে যে ঐ প্রকার উন্নতি করা যাইবে না, ইহা বলা যাইতে পারে না।

৫। শঙ্কর উৎপন্ন দ্বারা কোন দ্রব্যের উন্নতি করিতে হইলে, তাহার কোন্ বিষয়ের উন্নতি করিতে হইবে তাহা প্রথমত স্থির করিয়া কি প্রকারে তাহা সংগ্রহ করা যাইবে তাহা স্থির করিতে হয়। তুলার আঁস দীর্ঘ, সূক্ষ্ম ও শক্ত করিতে হইবে, উহা ব্যবসায়োপযোগী অতিরিক্ত পরিমাণে জন্মাইতে হইবে, এবং দেশের মাটি ও জলবায়ুর উপযোগী করিয়া জন্মাইতে হইবে। সূক্ষ্ম, শক্ত ও দীর্ঘ আঁস বিশিষ্ট তুলা দীর্ঘকালস্থায়ী অতিরিক্ত পরিমাণে বর্ষাবিশিষ্ট স্থানে জন্মায় না। ভারতবর্ষের সিন্ধুদেশে বর্ষার পরিমাণ অল্প থাকায় এবং সেচ দেওয়ার উপযোগী নদী, নালা থাকায় দীর্ঘ আঁসের ইজিপ্সিয়ান ও সি-আইল্যাণ্ড তুলা জন্মিতেছে। বাংলা দেশে অতিরিক্ত পরিমাণ বর্ষা হয়, কিন্তু উহা অতি দীর্ঘস্থায়ী নহে। আশ্বিন মাসে হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত সকল বৎসর অতিরিক্ত বর্ষা হয় না। ঐ সময়ের মধ্যে কার্পাসের গাছ জন্মাইয়া তুলা চয়নের কার্য্য শেষ করিয়া লইবার উপযোগী কোন তুলা জন্মাইতে পারিলে বোধ হয় তাহা মন্দ হইবে না। বাংলার মাটিতে বুড়ি কার্পাস এক প্রকার মন্দ জন্মায় না। গভর্ণমেণ্ট পরীক্ষা ক্ষেত্রে ইহা এক প্রকার প্রমাণিত হইয়াছে। বুড়ি কার্পাস শ্রাবণ মাসের শেষে লাগাইয়া, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাস মধ্যে শেষ তুলা তুলিয়া লওয়া যাইতে পারে, আমরা দুই তিন বৎসর চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি। ব্যবসায় হিসাবে যে পরিমাণ তুলা একর প্রতি জন্মিলে লাভজনক হইতে পারে তাহাও ২।১ বার জন্মিয়াছে। এই দুই বিষয় পূর্ব্বে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া, বুড়ি কার্পাসের আঁস বর্ত্তমান যাহা আছে, তাহা অপেক্ষা লম্বা করা যায় কি না তাহার পরীক্ষা গত দুই বৎসর হইতে করা হইতেছে। কলিকাতায় গত কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীতে আমাদিগের প্রদর্শিত সি-আইল্যাণ্ড কার্পাস সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছিল। তাহাতেই উৎসাহিত হইয়া বুড়ি ও সি-আইল্যাণ্ড কার্পাসের গুণ মিশ্রণের চেষ্টা করা হইতেছে। বুড়ি কার্পাসের এদেশের জলবায়ু ও সর্ব্বপ্রকার মাটিতে জন্মাইবার গুণ, ও একটী পাকড়ায় যে অতিরিক্ত পরিমাণ তুলা থাকার গুণ আছে তাহার সহিত সি-আইল্যাণ্ডের লম্বা আঁসের গুণ মিশ্রণ করিতে পারিলে বর্ত্তমান সময়োপযোগী তুলা বাংলায় জন্মান যাইতে পারিবে বলিয়া আশা করিয়া, গত দুই বৎসর যাবৎ পরীক্ষা করা যাইতেছে। প্রথম বৎসর বীজ উৎপন্ন করা হইয়াছিল। বীজের পরিমাণ অতি অল্প হইয়াছিল, তাহা হইতে গত বৎসর তুলা উৎপন্ন করা হইয়াছে। তাহার কয়েকটী গুণ মন্দ হয় নাই। কয়েকজন বিশেষজ্ঞ লোকও দেখিয়া ভাল বলিয়াছেন। এইক্ষণ উহার আরও উৎকর্ষ সাধন জন্য চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিলে সাধারণে প্রকাশ ইচ্ছা আছে। গত বৎসর উক্ত শঙ্কর জাতীয় কার্পাস গাছ বুড়ি কার্পাসের গাছ অপেক্ষাও বিলম্বে হইয়াছিল, আঁস প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা

হইয়াছে, সি-আইল্যাণ্ডের ন্যায় সূক্ষ্ম, লম্বা ও রেশমী-গুণ বিশিষ্ট আঁস না হইলেও তাহার কাছাকাছি হইয়াছে। একটী পাকড়া তুলার পরিমাণ প্রায় বুড়ির সমান হইয়াছে। এইক্ষণ ঐ গুণগুলি একটী বীজে স্থায়ী করিয়া আরও উন্নতি করার চেষ্টা করা হইতেছে, উহা স্থিরিকৃত হওয়া সময় সাপেক্ষ।

শ্রীত্রৈলোক্য নাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রাদেশিক কৃষি-সমিতির মেম্বর, ঘাটভোগ, খুলনা।

পত্রাদি।

কৃষিক্ষেত্রের উপযুক্ত জমি।

বীরভূম জেলায় কৃষিকার্য্যের উপযুক্ত একখণ্ড জমি রহিয়াছে। এতদ্সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ ভূস্বামীর তরফ হইতে আমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। জমি বিষয়ক অন্যান্য বিবরণ কৃষক কার্য্যালয় হইতেই পাওয়া যাইতে পারে ঃ—

"আমাদের জমিদারির অধীন বীরভূম জেলায় রামপুরহাট সবডিভিসনের অন্তর্গত মল্লারপুর ষ্টেশন হইতে ৪ মাইল পশ্চিমে এক প্লট আন্দাজ ২০০/ দুই শত বিঘা জমি আছে। (ইহার মধ্যে কতক পতিত ও কতক আবাদী ধান্য জমি আছে) উক্ত প্লট আমরা চিরস্থায়ী ভাবে বন্দোবস্ত করিতে ইচ্ছুক আছি। এ অঞ্চলে জমির জমার হার এখনও সামান্য আছে অর্থাৎ উক্ত জমির জমা বিঘায় সেলামির হার অনুসারে ।৵০ হইতে ॥০ আনার অধিক হইবে না। উক্ত জমির সেলামিও যথা সম্ভব জমার পড়তা অনুসারে ধার্য্য করিয়া দেওয়া যাইবে তাহাতেও কিছু আটকাইবে না। স্থানটী খুব স্বাস্থ্যকর এবং জলবায়ু খুব ভাল কারণ সাঁওতাল পরগণা বীরভূম উক্ত জেলার মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত। ম্যালেরিয়া বা প্লেগ এ অঞ্চলে এখনও আইসে নাই, স্থানটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীর নিকটবর্ত্তী, ষ্টেশন হইতে যাতায়াতের সুবিধা আছে ও পাকা রাস্তা আছে। এখানে মজুর খুব সুবিধায় পাওয়া যায় এবং আবশ্যক মত যত ইচ্ছা পাওয়া যায়। কারণ নিকটে অনেক সাঁওতাল পল্লী আছে। এমন কি ১ জন পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ মজুরের মজুরি দৈনিক ৵০, ৵১০ পয়সার অধিক নহে। উক্ত স্থানটী এক প্লটে বন্দোবস্ত করিতে আমাদের ইচ্ছা আছে, তজ্জন্য খুচরা ভাবে বন্দোবস্ত করি নাই এবং কোন শিক্ষিত ভদ্রলোক বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যদ্যপি স্থানটী লয়েন তবে তাঁহার বসবাসের জন্য যতদূর সম্ভব সাহায্য ও সুবিধা করিয়া দিতে রাজি আছি।

বাঁকুধান্য।

শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মজুমদার, জালঙ্গি, মুর্শিদাবাদ।

বাঁকু আমন জাতীয় ধান্য। ইহা ডাঙ্গা জমিতে জন্মাইতে পারে এবং ইহা অপেক্ষাকৃত অধিক অনাবৃষ্টি সহ। বীজ রোপণ করিতে হয়। ইহার চাউল সরু এবং মসৃণ। বাঁকুধান চারি মাসে পক্ক হয়; ইহার বিচালী উৎকৃষ্ট, ধান সহজে কুটিতে পারা যায়। মধ্যপ্রদেশে নাগপুরে ইহা যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদিত হয়। বীজ আবশ্যক হইলে সমিতির কার্য্যালয়ে অর্ডার দিলে আনাইয়া দিতে পারা যায়। কৃঃ সঃ।

ফলবৃক্ষের চাষ।

শ্রীনবীনচন্দ্র দে, জাফরাবাদ, চট্টগ্রাম।

ফল শেষ হইয়া গেলে সাধারণতঃ ফলবৃক্ষ ছাঁটিয়া দিতে হয়। সমস্ত শুষ্ক, ভগ্ন এবং তেজহীন ডালপালা ছাঁটিয়া দেওয়াই উত্তম। বৃক্ষ বিশেষে বিশেষরূপ কেয়ারি আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ পূর্ব্বোক্ত নিয়মই সকল ফলবৃক্ষের পক্ষে প্রযুজ্য। কৃঃ সঃ।

কৃষি-কলেজ।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র আইচ, দুর্গাপুর, চট্টগ্রাম।

পুষায় কৃষি অনুসন্ধানাগার ও কলেজ ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থলেও কৃষি-কলেজ খোলা হইয়াছে অথবা শীঘ্র খোলা হইবে। মান্দ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের প্রাদেশিক কলেজ সমূহ ইতিমধ্যেই খোলা হইয়াছে এবং তৎ-সমুদয়ে শিক্ষা প্রদান করা হইতেছে। পঞ্জাব কলেজ শীঘ্রই খুলিবে এবং বঙ্গদেশের কলেজ আগামী বৎসরে খোলা হইবে। শেষোক্ত কলেজটি

ভাগলপুরের নিকটবর্ত্তী সবর নামক স্থানে অবস্থিত। সবরে ছাত্রাবাসেরও বন্দোবস্ত হইবে। উক্ত স্থানে কিরূপ খরচপত্র পড়িবে তাহা এখন বলিতে পারা যায় না, তবে পুষার শিক্ষার্থীগণের মাসিক ২৫৲ টাকা খরচ পড়িতে পারে বলিয়া কৃষিবিভাগের কর্ম্মচারীগণ অনুমান করেন। ইহা কেবল শিক্ষার খরচ। কলেজে থাকিবার স্থান বিনা ভাড়ায় পাওয়া যাইবে, কিন্তু আহারাদি বন্দোবস্ত নিজেই করিতে হইবে—বিদেশে কৃষি-কলেজ সমূহে অধ্যয়ন করিতে কি পরিমাণ খরচ পড়ে আমরা তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছি। সমস্ত সংবাদ আমাদের হস্তগত হইলে "কৃষকে" প্রকাশিত হইবে। কলিকাতার শিল্প-বিজ্ঞান-সমিতি কৃষি কিম্বা অন্যান্য বিজ্ঞান শিক্ষার্থীগণকে বিদেশে অধ্যয়ন করিবার জন্য আংশিক অথবা সম্পূর্ণরূপে অর্থ সাহায্য করেন। তাঁহাদের কার্য্যালয়ে পত্রাদি লিখিলে সবিশেষ সংবাদ অবগত হইতে পারিবেন।

শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ গুপ্ত, পানবাজার, গৌহাটি।

আপনার প্রশ্ন সমূহের উত্তরের জন্য উপরোক্ত পত্র দেখুন। কৃঃ সঃ।

প্রাদেশিক কৃষি সংবাদ।

বঙ্গদেশে ইক্ষুর আবাদ।—বিহার অঞ্চলেই সমধিক পরিমাণে আখের চাষ হয়। গঙ্গার উত্তর তীর ভূমিতে বিনা জল সেচনে আখের চাষ সুন্দররূপ হয় কিন্তু দক্ষিণ তীরে এবং উক্ত প্রদেশের অন্যান্য স্থানে গ্রীষ্মে প্রায়ই জল সেচনের আবশ্যক হয়। নিম্নবঙ্গ ও বিহারে ইক্ষুর আবাদের সময় সুবৃষ্টির অভাবে আখের চাষের কিয়ৎ পরিমাণে বিঘ্ন ঘটিয়াছে এবং কোন কোন স্থানে চাষ নাবী হইয়া পড়িয়াছিল এবং চারা অবস্থায়ও ফসলে জলের অভাব হইয়াছিল। তারপর কিন্তু বৃষ্টি হওয়ায় এখন ইক্ষুর আবাদের অবস্থা মন্দ নহে। উড়িষ্যায় এবং ছোটনাগপুরে আবহাওয়া ইক্ষু চাষের অনুকূল বলিতে হইবে।

বর্ত্তমান বর্ষে ৩৫৩,৭০০ একর পরিমাণ জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছে। বিগত বর্ষে আবাদী জমির পরিমাণ ৩৭৫,২০০ একর সাধারণতঃ কিন্তু ৪৩০,২০০ একর জমিতেই ইক্ষুর আবাদ হইয়া থাকে। আবাদের সময় সুবৃষ্টির অভাবই ইক্ষুর আবাদের অল্পতার একমাত্র কারণ বলিতে হইবে। যাহা হউক যতদূর দেখা যাইতেছে তাহাতে বোধ হয় সম্বলপুর ও সাঁওতাল পরগণায় প্রায় সতেরো আনা, বালেশ্বর, আন্দুল, রাঁচি ও পালামাউয়ে ষোল আনা ফসল হইবে। অন্যান্য ৮টী জেলায় ৸৶০ আনা, ৫টীতে ৸৵০ আনা, বাকী ছয়টী জেলার মধ্যে সারণে ৷৶০ আনা এবং পাটনা, চম্পারণ, বীরভূম, মুর্শিদাবাদে ৷৵০ আনার অধিক হইবে না।

বঙ্গে তুলার আবাদ।—বর্ষারম্ভের পূর্ব্বে ও পরে দুইবার তুলার আবাদ হইয়া থাকে। সাঁওতাল পরগণা, মানভূম, সিংভূম, সম্বলপুর, রাঁচি ও অন্দুলে প্রধাণতঃ জলদী জাতীয় তুলার আবাদ হয়। বর্ষার পূর্ব্বেই ইহার বুনানি শেষ হয়। উত্তর বিহারই নাবী তুলার প্রধান কেন্দ্র এবং সারণেই নাবী তুলার প্রায় অর্দ্ধেক পরিমাণ উৎপন্ন হয়। জলদী তুলার আবাদের অবস্থা ভাল। উত্তর বিহারে নাবী তুলার বুনানী চলিতেছে কিন্তু বাঁকুড়া, কটক, বালেশ্বরে এবং আন্দুলে এখনও নাবী তুলার বীজ বোনা হয় নাই। সাহাবাদে জলপ্লাবন হইয়া তুলার আবাদ কিছু পরিমাণে নষ্ট করিয়াছে।

বর্ত্তমান বর্ষে জলদী তুলার আবাদী জমির পরিমাণ ৩৪,১৯৩ একর। বিগত বৎসর অপেক্ষা অধিক। বিগত বর্ষের অনুমিত জমির পরিমাণ ৩১,২৩০ একর মাত্র।

নাবী তুলার বুনান এখন শেষ হয় নাই, আগষ্ট মাসের প্রথম পর্য্যন্ত ২৭,৫৮২ একর পরিমাণ জমিতে তুলার আবাদ হইয়াছে। বিগত বৎসরের তুলনায় কিছু কম। বিগত বর্ষে শেষ সরকারি বিবরণীতে নাবী তুলার পরিমাণ ৩২,৮৬৯ একর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

হৈমন্তিক ধান্যের আবাদ।—এবার শীঘ্র বর্ষারম্ভ হওয়ায় ভাদ্র মাসের প্রথমেই হৈমন্তিক ধান্য রোপণ কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। আশু

ধান্য কাটা হইতেছে। সর্ব্বত্র সুবৃষ্টি হওয়ায় ধান্য চাষ সুচারুরূপ হইয়াছে। কিন্তু বর্দ্ধমান অঞ্চলে দামোদরের বন্যায় হৈমন্তিক ধান্য ও অন্যান্য আবাদের সমূহ ক্ষতি করিয়াছে।

সার-সংগ্রহ।

আলুর চাষ।

আমি এ বৎসর এক বিঘা জমিতে আলু রোপণ করিয়াছিলাম. নিম্নে তাহার আয় ব্যয় হিসাব দিলাম. ভাল মনে করিলে আগামী কৃষকে প্রকাশ করিবেন। গত বৎসর আমাদের এ দিনে বর্ষা শীঘ্র তিরোহিত না হওয়ায় কার্ত্তিক মাসে রোপণ কাজ কোনও মতেই হয় নাই, অগ্রহায়ণের প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া ১৪ই তারিখে রোপণ কাজ শেষ করা হয়। জমিতে আউস ধান রোপণ করা হইয়াছিল, আশ্বিনের প্রথম জমি হইতে ঐ ধান্য উঠিয়া গেলে গোবর দেওয়া হয়। তৎপরে পর পর লাঙ্গল দিয়া জমি চষা হইয়াছিল ইত্যাদি রোপণ কালে গর্ত্ত করিয়া ১ মুঠা শরিষার খৈল ও ২ মুঠা করিয়া কাঠের ছাই অর্থাৎ (ভস্ম) প্রত্যেক গর্ত্ত দিয়া ১টী করিয়া আলু লাগাইয়াছিলাম, ফাল্গুনের মধ্য মাসেই আলু উঠান হইয়াছিল, অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত ৪টী সেচ দিয়াছিলাম এক প্রকার লাল উই এবং ২।৩ অঙ্গুলি লম্বা এক প্রকার কীট (পোকা বিশেষ) দেখা গিয়াছিল। শেষোক্ত কীট গাছের ডগা কাটিয়া দেয়, জল সেচ কি ফেনাইল নামক আরক জলে মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিয়া দেখিয়াছি কোনও ফল লক্ষিত হয় নাই কেবল প্রত্যুষে খেতে যাইয়া কর্ত্তিত গাছের গোড়া একটু খুঁড়িলেই পোকা পাওয়া যাইত, তৎক্ষণাৎ মারিয়া ফেলাই রক্ষার প্রধান উপায় দেখিয়াছি আমার এই এক বিঘা জমি হইতে প্রায় পৌষ মাসেও মাঘের প্রথম কয়েক দিনের মধ্যে ৬০০ পরিমাণ পোকা মারা হইয়াছিল, লাল উই কেবল জল সেচ দিলে কিছু কমে নচেৎ ইহাকে দূর করিতে কোনও রকমে পারি নাই। উক্ত লাল উই আলুর গোড়া খাইয়া সব আলুকে ছিদ্র বিশিষ্ট করিয়া দেয় অর্থাৎ যে গাছ উক্ত উই আক্রান্ত করে তাহার আশা একে বারে না করিলও হয়।

কোনও প্রতিকার থাকিলে জানাইলে উপকৃত হইব।

আয়		ব্যয়	
ছোট বড় সর্ব্ব রকম ৬৮/ মণ		গোবর সার ৫০০/ মণ	৭৷৹
		সরিশার খৈল ২/ মণ	৪৲
		হাল চাষ ইত্যাদি	৪৲
প্রত্যেক মণ গড়পড়তা ২॥৹ টাকা হিসাব বিক্রয় হইয়া		ননীতাল জাতীয় বীজ ৬॥৹ মণ	২৯৲
মোট	১৭০৲ টাকা	বেড়া দেওয়া	২॥৹
বাদ	৬১৲	জল দেওয়া মাটী দেওয়া নিড়ানী ইত্যাদি বাজে কাজ সহ মোট খরচ	১২৲
	১০৯৲		
			৫৯৲
		ছাই ৫/ মণ	২৲
			৬১৲

আমার বিশ্বাস সময় মত রোপণ না হওয়ায় ও জমিতে পর্য্যায় ক্রমে ধান্য ইত্যাদি ফসল হওয়াতে ফলনের মাত্রা অল্প হইয়াছে নচেৎ ৮০/৯০/ মণ হওয়ার খুব সম্ভব ছিল।

শ্রীমথুরাচন্দ্র সোম, কর্ম্মধা চৌধুরি বাটী ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য।

কুমিল্লায় জলপ্লাবন।—বর্ত্তমান ভাদ্র মাসের প্রথমে অতিবর্ষণ হেতু গোমতীর অপর পারে এবার ভীষণ কাণ্ড। সহর হইতে দুই মাইল দূরে রত্নবতী নামক স্থানে নদীর বাঁধ ছুটিয়া তীর মাঠ সব ভাসিয়া যাইবার যোগাড় হইয়াছিল। যে দিকে চাওয়া যায় শুধু জল। কতকগুলি গ্রামের ঘরবাড়ী, কৃষি একেবারে বিনষ্ট হইয়াছে। রত্নবতী হইতে রাজাপুর ষ্টেসন পর্য্যন্ত এই আক্রমণের পরিসর। কুমিল্লা সহর এক্ষণে ধ্বংসের আশঙ্কা হইতে রক্ষা পাইয়াছে, কিন্তু গরীব কৃষক-

কুল ও গ্রামবাসী গৃহস্থেরা হাহাকারে গগন বিদীর্ণ করিতেছে। এক্ষণে ক্রমাগত রৌদ্র হওয়ায় কতক ধান ক্ষেত রক্ষা পাওয়ার একটু একটু আশা করা যায়।

বর্দ্ধমানে স্বদেশী শিল্প।—বর্দ্ধমান জেলার সাহেবগঞ্জ থানার অধীন বনপাশ কামারপাড়া গ্রাম একখানি প্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রাম। গ্রামে অন্যূন দুই হাজার লোকের বাস। গ্রামের প্রায় সমস্ত লোকেই শিল্প ব্যবসায়ী। এখানে উৎকৃষ্ট স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কার, পিতল কাঁসার দ্রব্য এবং লৌহ নির্ম্মিত নানাপ্রকার অস্ত্র তৈয়ারী হয়। এই সকল লৌহাস্ত্র বিদেশ জাত অস্ত্র অপেক্ষা গুণে ও স্থায়ীত্বে কোন অংশেই হীন নহে। আজিকালি সুন্দর জার্ম্মান সিলভারের নানাপ্রকারের অলঙ্কার ও দ্রব্যাদিও প্রস্তুত হইতেছে। চাকচিক্যে ও শিল্প কৌশলে এই সকল জার্ম্মান সিলভার দ্রব্য বিদেশী জার্ম্মান সিলভার দ্রব্য অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। এখানকার রেসম বস্ত্র ও কম্বল প্রসিদ্ধ। ৫৲ টাকা হইতে ১৫৲ টাকা মূল্যের কম্বল পর্য্যন্ত এখানে তৈয়ারী হয়। কম্বলগুলি যেমন সুদৃশ্য তেমনি বহুদিন স্থায়ী। গ্রামের অধিকাংশ লোক শিল্প ব্যবসায়ী বলিয়া কাহারও ঘরে অন্নাভাব নাই।

কোন পত্রপ্রেরক লিখিতেছেন, যে, নবদ্বীপে একপ্রকার লতা আছে, যাহা হইতে মিষ্ট অথচ তীব্র সৌরভ বাহির হয়। দূর হইতে এই সৌরভ আঘ্রাণ করিলে মন প্রফুল্ল হয়, কিন্তু নিকটে আসিয়া অধিকক্ষণ ঘ্রাণ লইলে মানুষ তৎক্ষণাৎ অচৈতন্য হইয়া পড়ে। কীট পতঙ্গাদি উহার উপর অধিকক্ষণ বসিলে মরিয়া যায়। কথা যদি সত্য হয়, তবে আমরা নবদ্বীপবাসী "কৃষকের" কোন গ্রাহক বা কোন ভদ্রলোককে উক্ত লতা ফলফুল সমেত ব্লটিং কাগজের মধ্যে কিছুক্ষণ চাপা দিয়া রাখিয়া পরে টীন কিম্বা পাতলা কাষ্ঠের বাক্সে প্যাক করিয়া পাঠাইতে অনুরোধ করি, কারণ তাহা হইলে আমরা তাহার শাস্ত্রীয় নাম বলিয়া দিতে পারি এবং তাহার গুণাগুণ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিতে পারি। কৃঃ সঃ।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

আশ্বিন—সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর।

সব্জী বাগান। এই সময় শীতের আবাদ ভরপুর আরম্ভ হয়। ইতিপূর্ব্বেই জল্দি জাতীয় কপি, টমাটো, বিলাতি লঙ্কা প্রভৃতি বপন করা হইয়া চারা তৈয়ারি হইয়াছে। এই সময় নাবী জাতীয় বীজ বপন করিতে হয়। মূলজ সব্জীর চাষ এই সময় হইতে আরম্ভ। মূলা সালগম বীটের এই সময় চাষ আরম্ভ করিবে। বেগুন চারা ইতি পূর্ব্বেই ক্ষেত্রে বসান হইয়া গিয়াছে, সেগুলি এক্ষণে দাঁড়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। সীম, মটর বীজ এই সময় বপন করিতে হইবে। জল্দি কপি চারা যাহা ক্ষেত্রে বসান হইয়াছে তাঁহাতেও এই সময় মাটি দিতে হইবে ও পাকা পাতা গুলি ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। আলুও এই সময় বসাইবে, পিঁয়াজ চাষেরও এই সময়।

ফুলের বাগান। এই সময় এষ্টার, প্যান্সি, ভার্ব্বিনা, ডালিয়া, ক্লিয়ান্থাস, পিটুনিয়া প্রভৃতি মরসুমী ফুল বীজ বপন করিতে আরম্ভ করিবে।

পার্ব্বত্য প্রদেশে এই সময় বেগেনিয়া, জিরেনিয়ম প্রভৃতি কোমল গাছগুলির বিশেষ পাট করিতে হয়। এই সকলের কটিং বসাইতে পারা যায়, কিন্তু পাহাড়ে অত্যন্ত অধিক বৃষ্টি হয়—সুতরাং সাসি দ্বারা অবৃত স্থানে সে সকল কাটিং পোতা উচিত। গোলাপের কলম (Budding) এখন করা যাইতে পারে—বিশেষতঃ হাইব্রীড পারপেচুয়াল জাতীয় গোলাপের, চিনা, টি, বুরবণ জাতীয় গোলাপের কটিং পূর্ব্বোক্ত প্রকারে এখন করা যাইতে পারে। বৃষ্টির সম্পূর্ণ অবসান না হইলে পার্ব্বত্য প্রদেশে সব্জী তৈয়ারি করা হইয়া উঠে না। তবে আচ্ছাদনের ভিতর যত্ন করিয়া করিলে কিছু কিছু হইতে পারে। পর্ব্বতে দ্রাক্ষালতার এই সময় বড় বাড় হয়। সেগুলির কাটিয়া ছাঁটিয়া গোড়া খুঁড়িয়া একটু বাড় কমাইতে হইবে।

পশ্চিম ভারতে যেখানে বৃষ্টির আতিশয্য আদৌ নাই, তথায় গোলাপ হাপর হইতে নাড়িয়া বসাইয়া গোলাপ ক্ষেত তৈয়ারি করা যাইতে পারে। এই সময় উক্ত প্রদেশে ফুলকপির চারা ক্ষেতে বসান হইতেছে। আশ্বিন মাসের শেষে কার্ত্তিকের প্রথমেই তথায় ফুলকপি তৈয়ারি হইয়া উঠিবে।

REGISTERED No. C 192.



ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসনের মুখপত্র

আশ্বিন, ১৩১৬।

REGISTERED No C. 192.

কৃষক।

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

দশম খণ্ড,—৬ষ্ঠ সংখ্যা।

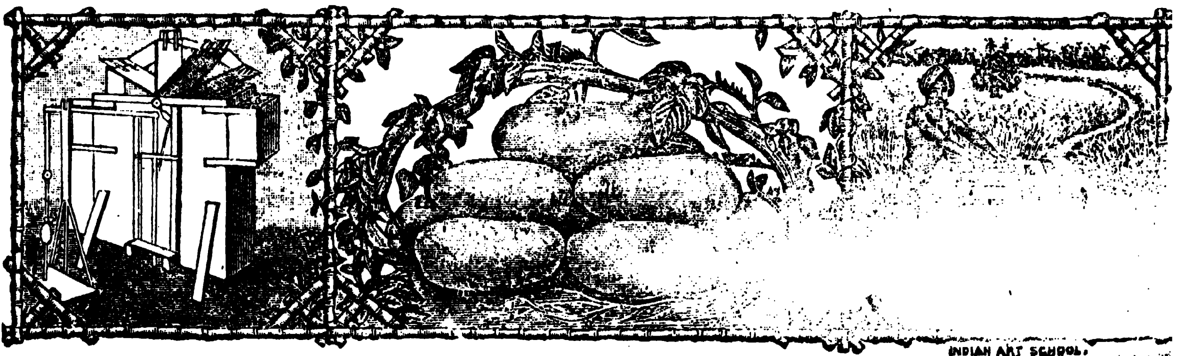


সম্পাদক—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস্।

আশ্বিন, ১৩১৬।

কলিকাতা: ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট. ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে
শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা; ১২৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট. দি সিলার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
এস. এইচ, রহমান দ্বারা মুদ্রিত।



INDIAN ART SCHOOL.

কৃষক।

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১০ম খণ্ড। | আশ্বিন, ১৩১৬ সাল। | ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

পাট বা নালিতা।

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত, এম,আর,এ,সি লিখিত।

৪র্থ অধ্যায়—পাট কাটা ও পণ্য আঁস প্রস্তুতপ্রণালী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

২৫। পাট পচানি।

পাট কাটিয়া লম্বা বা পরিপক্ক এবং খাট বা কচি কাণ্ডের পৃথক পৃথক আটি বান্ধিয়া সুবিধা হইলে পাতা ছাড়াইয়া, আর সুবিধা না হইলে পাতা সমেতই জলে ভিজাইতে হয়। এক একটি আটিতে ১৫।২০টি হইতে ৪০।৫০টি পর্য্যন্ত কাণ্ড কি তাহা অপেক্ষা অনেক বেশীও থাকে। যে সকল স্থানে কাণ্ডের মাঝখানে ভাঙ্গিয়া আঁস ছাড়াইতে হয় সে সকল স্থানে আটি ছোট হয়—প্রায় ১৫।২০টির বেশী থাকে না; অথবা আটির মধ্যস্থানটা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা চাপিয়া ধরা যায় এই পরিমাণ কাণ্ড এক একটি আটিতে থাকে। যে সকল স্থানে কাণ্ডগুলি না ভাঙ্গিয়া পৃথক পৃথক ভাবে প্রত্যেক কাণ্ডের আঁস ছাড়াইতে হয় সে সকল স্থানে আটি প্রায় তাহার দ্বিগুণ বড় হয়; অর্থাৎ দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী যোগ করিয়া,বেড়াইয়া মধ্যভাগে ধরা যায় এই পরিমাণ বড় হয়। ৪০।৫০টি হইতে ১০০টি পর্য্যন্ত কাণ্ড এইরূপ এক একটি আটিতে থাকে। নালিতা কাটিয়া আটি বান্ধা শেষ হইলে পর মাথায় বোঝা করিয়া সেই সকল নালিতার আটি জলে লইয়া গিয়া একটার উপরে আর একটা লম্বাভাবে শোয়াইয়া 'ভুর' বা স্তূপ বান্ধিয়া জলে ভিজাইতে হয়। স্তূপের নীচের আটিগুলি আড়াই হাত কি তিন হাতের বেশী গভীর জলের নীচে থাকা উচিত নয়; কারণ আড়াই কি তিন হাতের বেশী গভীর জলে পচনকারী উদ্ভিদণুর ভালরূপ বিকাশ হয় না। আবার অপর দিকে ঐ স্তূপের উপরিভাগ যেন জলের উপরে না ভাসিয়া বরং অন্ততঃ দুই চার আঙ্গুল জলের নীচে ডুবিয়া থাকে তাহার উপায় করিতে হয়; কারণ এই সকল পচনকারী উদ্ভিদণু জলের উপরে বিকাশ পায় না। যাহাতে নালিতাস্তূপের উপরিভাগ জলের উপরে না ভাসিয়া থাকে সেজন্য চারিদিকে খুঁটা গাড়িয়া এবং উপরে বাঁশ বান্ধিয়া চাপিয়া জলের দুই চার আঙ্গুল নীচে রাখিতে হয়; অথবা ঐ স্তূপের উপরে পাতা খড় কি দলঘাস

কিম্বা ঘাসের চাপ্‌ড়া কাটিয়া উল্টাইয়া মাটির দিক উপরে এবং ঘাসের দিক নীচে করিয়া তাহার উপর ইট কি পাথর চাপা দিয়া দিতে হয়। মোট কথা যেরূপেই হউক স্তূপের উপরিভাগ দুই চার আঙ্গুল জলের নীচে রাখিবে। কিছু দিন এইরূপে রাখিলেই দেখিবে বেগের সহিত পচনক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। তাহার চিহ্নস্বরূপ বুদ্‌বুদাকারে নানাপ্রকার গ্যাস (gas) স্তূপের উপরে এবং চতুর্দ্দিকে উঠিতে দেখা যাইবে।

২৬। পচানির সময়।

কত দিনের মধ্যে পাট পচিয়া আঁস ছাড়াইবার যোগ্য হইবে তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। গরম বেশী পড়িলে এক সপ্তাহ মধ্যেই পচনক্রিয়া সমাধা হইতে পারে, আবার ঠাণ্ডা বেশী পড়িলে পচনক্রিয়া সমাধা হইতে এক মাসও লাগিতে পারে। শীতকালে ভিজা পাট পচিতে অনেক সময় লাগে এবং আঁসও তত ভাল হয় না। পাট উপযুক্ত পরিমাণে পচিয়াছে কিনা তাহা স্থির করিবার জন্য কৃষককে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে। তাহার মনে রাখিতে হইবে যে পচনক্রিয়ার ঠিকমাত্রা অতিক্রম করিলে পাটের আঁসও পচিতে আরম্ভ করে এবং নরম হইয়া পড়ে। এজন্য কৃষক প্রত্যহ কি একদিন অন্তর আপনার ভিজান নালিতার ভুর বা স্তূপ পরীক্ষা করিবে এবং তাহার উপরের, নীচের এবং মধ্যের দুই চারটি কাণ্ডের গোড়ার দিকের আঁস কতকটা ছাড়াইয়া দেখিবে পচনের মাত্রা ঠিক হইয়াছে কি না। অনেক সময় দেখা যায় স্তূপ বা ভুরের নীচের আটি গুলিতে পচনকারী উদ্ভিদণুর অধিকতর বিকাশ হেতু সে গুলি উপরের আটি গুলির আগেই আঁস ছাড়াইবার উপযুক্ত হইয়াছে। এরূপ স্থলে 'ভুর' ভাঙ্গিয়া নীচের আটি গুলির আঁস আগেই ছাড়াইতে হয়, এবং ভুর উল্টাইয়া উপরের আটি গুলি নীচে ফেলিতে হয়। কখনও বা মাঝের আটি গুলি আগে আঁস ছাড়াইবার উপযুক্ত হয়, তখন 'ভুর' ভাঙ্গিয়া মাঝের আটি গুলি বাহির করিয়া তাহার আঁস আগে ছাড়াইতে হয়। মোট কথা পচনের মাত্রা ঠিক হইলেই অবিলম্বে 'ভুর' ভাঙ্গিয়া আটি গুলি বাহির করিয়া আঁস ছাড়াইয়া ফেলিবে। নতুবা অনিষ্টকারী উদ্ভিদণুর বিকাশ হেতু পাটের আঁসও পচিয়া নষ্ট হইবে।

২৭। পণ্য আঁস প্রস্তুতপ্রণালী।

উপযুক্ত মাত্রায় নালিতা পচানি কার্য্য সমাধা হইলে পর 'ভুর' বা স্তূপ ভাঙ্গিয়া আঁস ছাড়াইতে হয়। আঁস ছাড়াইবার জন্য দেশভেদে নানাপ্রকার প্রণালী অবলম্বিত হইতে দেখা যায়। কোথাও বা একই দেশে সুবিধানুসারে নানাপ্রকার প্রণালী অবলম্বিত হইতে দেখা যায়। প্রথম প্রণালী (১)। পচাইবার জন্য আটি গুলি এই পরিমাণ ছোট করিয়া বান্ধিতে হয়, যেন তর্জ্জনী এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা আটির মধ্য স্থানটি বেড়াইয়া ধরা যায়। ১০।২০টি কাণ্ডের এক একটি আটি বান্ধিতে হয়। পচান পাটের 'ভুর' ভাঙ্গিয়া তাহা হইতে একটি একটি আটি লইয়া বা হাতের তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা তাহা বেড়াইয়া ধরিতে হয়, এবং ডান হাতের তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলি ঐরূপে আটি বেড়াইয়া মুষ্টিবদ্ধ করিয়া একবার গোড়ার দিকে এবং আর একবার আগার দিকে চালাইয়া পচা পাতা, বল্কল, শিকড়-গুচ্ছ প্রভৃতি যাহা সহজে ছাড়ান যায়, তাহা ছাড়াইতে হয়। কৃষককে মুঠি (Handle) কাটা হাত খানিক লম্বা বৈঠা বা বেটের (Bat) আকৃতি একখণ্ড ছোট কাঠ সঙ্গে রাখিতে হয়। প্রথমে সেই বৈঠা দ্বারা আটির গোড়ায় আস্তে আস্তে ঘা দিয়া সবগুলি কাণ্ডের গোড়া এক সমতলে

আনিতে হয়। পরে আবার ঐ আটির গোড়ায় বাম হাতে শক্ত করিয়া ধরিয়া, ডান হাতে ঐ ক্ষুদ্র বৈঠা দ্বারা আটির গোড়ার অংশে আঘাত করিতে হয়; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বাম হাতে আটিটি আস্তে আস্তে এইরূপে ঘুরাইতে হয় যেন সে আঘাত ঐ আটির গোড়ার চারিদিকে সমানভাবে লাগে। এইরূপ আঘাত আটির গোড়াতে লাগিলে পর কাণ্ডের গোড়ার আঁস শিথিল হইয়া পড়ে। তখন আটিটির মাঝখানে উভয় হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া একবার নীচের দিকে চাপিয়া আবার উপরের দিকে চাপিয়া ঐ আটিটির মাঝখানে ভাঙ্গিতে হয়। তার পর ঐ ভাঙ্গা আটির আগার ভাগ বাম হাতের মুষ্টিতে বদ্ধ রাখিয়া গোড়ার ভাগের ভগ্ন স্থানে ঐ বৈঠা দ্বারা আস্তে আস্তে ঘা দিয়া ঠেলিলে এবং বাম হাতের মুষ্টিবদ্ধ আগার অংশ জলের মধ্যে এদিক ওদিক অল্প অল্প টানিলে, অতি সহজেই গোড়ার অংশের যোলার ভাগ আঁস ভাগ হইতে পৃথক হইয়া বাহির হইয়া যায়, এবং আঁসগুলি স্বতন্ত্রভাবে জলের উপরে বিস্তৃতভাবে ভাসিতে থাকে। কৃষক তখন ঐ গোড়ার আঁস-গুলি ডান হাতের মুষ্টিতে সমস্তটা জড়াইয়া বাম হস্তের মুষ্টি ছাড়িয়া দিয়া ডান হাতে মুষ্টিবদ্ধ আঁস-গুলি আস্তে আস্তে হেঁচ্‌কা টানিলে কাণ্ডের আগার অংশেরও আঁসগুলি যোলা হইতে পৃথক হইয়া যায়। তারপর ঐ ছাড়ান আঁসগুলি জলের উপর ছড়াইয়া মেলিয়া দিয়া হস্ত দ্বারা ভগ্ন যোলার কি বাকলের টুকরা অথবা অন্য কোন প্রকার ময়লা যাহা কিছু থাকে বাছিয়া ফেলিতে হয়। বর্দ্ধমান, ২৪ পরগণা, জলপাইগুড়ি ও সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে আঁস ছাড়াইবার এই প্রণালীই প্রচলিত।

দ্বিতীয় প্রণালী (২)। যে সকল স্থানে দ্বিতীয় প্রণালী প্রচলিত সেই সকল স্থানে গাছ কাটিয়া আটি বান্ধিবার সময় ৫০।১০০ কি তাহা অপেক্ষা ন্যূনাধিক সংখ্যক কাণ্ডের এক একটি আটি বান্ধা হয়। অবশ্য গণিয়া আটি বান্ধা হয় না। উভয় হস্তের তর্জ্জনী এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি যোগ করিলে মাঝ-খানে যে বেড় পাওয়া যায় সেই পরিমাণ কাণ্ড এক দুই কি তিন মাত্রা লইয়া এক একটি আটি বান্ধা হয়। পাট পচানি ঠিক মত হইলে পর 'ভুর' ভাঙ্গিয়া যে সকল আটি আগে পচিয়াছে দেখা যায় সেই সকল একটি একটি করিয়া বাহির করিয়া আগে আঁস ছাড়াইতে হয়। যাহারা বিশেষ অভ্যস্ত তাহারা ৪।৫টি কাণ্ড আর যাহারা তত অভ্যস্ত নয় তাহারা ১।২টি কাণ্ড একত্র বাম হস্তে গ্রহণ করিয়া তাহার উপর ডান হাতের বদ্ধমুষ্টি চালাইয়া পচা পাতা বল্কল ইত্যাদি ফেলিয়া দেয়; পরে নখ ও আঙ্গুল দ্বারা প্রত্যেকটি কাণ্ডের গোড়ার আঁস ৮।১০ আঙ্গুল পরিমাণ ছাড়াইয়া, পরে বাম হাতে যোলাগুলি এবং ডান হাতে আঁস গুলি একত্র ধরিয়া আস্তে হেঁচ্‌কা টান দিয়া আঁস গুলি গোড়া হইতে আগা পর্য্যন্ত ছাড়াইতে হয়; এবং ছাড়ান আঁস গুলি লম্বালম্বি বিছাইয়া একত্র করিতে হয়। এই প্রণালীতে যোলাগুলি আস্ত থাকে এবং অনেক সময় বেড়া দিবার জন্য কি জ্বালাইবার জন্য এক আনা হাজার দরে বিক্রি হয়। অনেক স্থলে স্ত্রীলোক এবং বালকেরা আঁস ছাড়াইয়া বেতনের পরিবর্ত্তে যোলাগুলি গ্রহণ করে। ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, ত্রিপুরা, নোয়াখালী প্রভৃতি স্থানে আঁস ছাড়াইবার এই প্রণালীই অধিক প্রচলিত।

যে প্রণালীতেই হউক আঁসগুলি ছাড়ান হইলে পর তাহার এক এক মুষ্টি হাতে লইয়া গোড়ায় ধরিয়া জলে সজোরে কয়েকবার আছড়াইয়া পরিষ্কার করিতে হয়; এবং এক এক বার জলের

উপর ছড়াইয়া মেলিয়া দিয়া ভগ্ন ষোলাখণ্ড কি অন্যপ্রকার ময়লা যাহা কিছু থাকে তাহা হাতে বাছিয়া ফেলিতে হয়। জলে আছড়াইয়া এবং মাঝে মাঝে জলে ছড়াইয়া দিয়া এদিক ওদিক টানিয়া যতদূর সম্ভব পরিষ্কার করিয়া শেষে জল নিংড়াইয়া (চিপিয়া) বাহির করিয়া দিয়া আঁস-গুলি একত্র করিতে হয়, এবং পরিস্কৃত আঁস কতক পরিমাণ একত্র হইলে পর অবিলম্বে দড়ি কি বাঁশের উপর ঝুলাইয়া মেলিয়া দিয়া ৫।৭ দিন রৌদ্র এবং বাতাস খাওয়াইতে হয়। তবে বৃষ্টিতে যেন না ভিজে সে বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হয়, কারণ জল লাগিলে পাট পচিয়া যায়। রৌদ্র ও বাতাস খাওয়াইলে যে কেবল পাট শুকায় তাহা নয়। রৌদ্র এবং বাতাসের মধ্যে ৫।৭ দিন মেলিয়া রাখিলে ঐ আঁসের মধ্যে একপ্রকার রাসায়নিক ক্রিয়া (Bleaching) সংঘটিত হয় যদ্দ্বারা পাটের বর্ণ আস্তে আস্তে বেশ উজ্জ্বল শুভ্র বর্ণে পরিণত হয়। বৃষ্টির ভয়ে আমাদের কৃষকেরা ২।৪ দিনের বেশী পাটে রোদ পাওয়ায় না।

২৮। আঁস প্রস্তুত করিবার সময়।

পাটের আঁস ছাড়াইয়া পরিষ্কার করিতে বিঘা প্রতি কত সময় লাগে তাহার একটা অনুমান করিতে হইলে, এক বিঘা জমিতে কতটি পাট গাছ হয় তাহার একটা অনুমান করা আবশ্যক। ১৮ ইঞ্চি হাতের ৮০ হাত দীর্ঘ এবং ৮০ হাত চৌড়া স্থান এক বিঘা। অর্থাৎ ৮০×১৮=১৪৪০ ইঞ্চি দীর্ঘ এবং ১৪৪০ ইঞ্চি চৌড়া স্থান এক বিঘা। আবার পাটের ক্ষেত্রে, ৬ ইঞ্চি অন্তর এক একটি গাছ ধরা যায়। (এক হাতের মধ্যে সচরাচর ৪টি করিয়া গাছ রাখা হয়) ইহার উপরে হিসাব করিলে দেখা যায় এক বিঘা পাট ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্যে ১৪৪০ ইঞ্চির এক সারিতে $\frac{১৪৪০}{৬}$ = ২৪০টি গাছ হইবে। সেইরূপে আবার তাহার ১৪৪০ ইঞ্চি প্রস্থের এক সারিতেও ২৪০টি গাছ হইবে এবং মোটে এক বিঘা পাট ক্ষেত্রে ২৪০×২৪০= ৫৭৬০০টি গাছ হইবে। সাধারণভাবে একটি পাট ক্ষেত্রে বিঘা প্রতি ৬০০০০ গাছ ধরা যায়। প্রথম প্রণালীতে কাণ্ডের মাঝখানে ভাঙ্গিয়া আঁস ছাড়াইতে হইলে ২০টি কাণ্ডের এক একটি আটি ধরা যায় এবং তাহা হইলে বিঘা প্রতি $\frac{৬০০০০}{২০}$ = ৩০০০ তিন হাজার আটি হয়; এবং কেহ যদি ঘড়ি ধরিয়া একটি কাণ্ডের আঁস ছাড়াইবার সময়টা গণনা করেন তবে দেখিবেন যে গড়ে এক একটি আটিতে প্রায় ২ মিনিট সময় লাগে; এবং বিঘা প্রতি ৩০০০ আটিতে গড়ে ৬০০০ মিনিট বা $\frac{৬০০০}{৬০}$ = ১০০ ঘণ্টা লাগিবে। ৮ ঘণ্টা হিসাবেই কৃষকের রোজ ধরা যায়। এই হিসাবে দেখা যায় বিঘা প্রতি আঁস ছাড়াইতে এক জনের প্রায় ১২ দিন লাগে। দ্বিতীয় প্রণালীতে কাণ্ডটি আস্ত রাখিয়া আঁস ছাড়াইতে হইলে ১০০টি কাণ্ডের এক একটি আটি ধরা যায়। তাহা হইলে বিঘা প্রতি ৬০০০০ গাছে $\frac{৬০০০০}{১০০}$ = ৬০০ আটি হইবে। এবং ঘড়ি ধরিয়া দেখিলে পাওয়া যাইবে যে ১০০ গাছের একটি আটির আঁস ছাড়াইতে প্রায় ৭।৮ মিনিট সময় লাগে। প্রতি আটিতে ৭ মিনিট ৬০০ আটিতে বা বিঘা প্রতি ৪২০০ মিনিট বা $\frac{৪২০০}{৬০}$ = ৭০ ঘণ্টা লাগিবে এবং ৮ ঘণ্টা হিসাবে কামলার রোজ ধরিলে বিঘা প্রতি একজন লোকের প্রায় ৯ দিন লাগিবে। আমাদের এই হিসাব একটি সামান্য অনুমান মাত্র। কৃষকের নিপুণতা অনুসারে, সময়ের অত্যন্ত তারতম্য হয়। কৃষক-দিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া সময় সম্বন্ধে প্রকৃত খবর পাওয়া কঠিন, কারণ তাহাদের সময় সম্বন্ধে ধারণা বড়ই শোচনীয়। কৃষকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া

আমরা যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে এই বলা যায় যে একজন কৃষক প্রথম প্রণালীতে রোজ গড়ে ২০ সের এবং দ্বিতীয় প্রণালীতে গড়ে ২৫ সের পাট উঠাইতে পারে। বিঘা প্রতি গড়ে ৬ মণ পাট ধরিলে প্রথম প্রণালীতে এই হিসাবে বিঘা প্রতি প্রায় ১২ দিন এবং দ্বিতীয় প্রণালীতে প্রায় ১০ দিন লাগিবে। ইহাও এস্থলে উল্লেখ করা যায় যে গড়ে বিঘা প্রতি ৬০০০০ গাছে ৬ মণ পাট ধরিলে ১০০০০ দশ হাজার গাছে গড়ে এক মণ, এবং ২৫০ গাছে গড়ে এক সের পাট হয়।

২৯। সময় সংক্ষেপ করিবার কৌশল।

আঁস ছাড়াইবার সময় সংক্ষেপ করিবার জন্য নানাস্থানের কৃষকেরা নানাপ্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকেন। তাহার দুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। (১) পচানি শেষ হইলে ৫০।১০০ কাণ্ডের একটি আটি লইয়া পুকুর কি খালের কিনারায় বসিয়া সেই আটির গোড়ার দিকের এক হাত আন্দাজ মাটিতে এবং বাকিটা জলে রাখিয়া, নখ এবং অঙ্গুলি দ্বারা আটির গোড়ার দিকের ঐ এক হাত আন্দাজ আঁস ছাড়াইয়া আটির বাহিরে রাখিয়া যোলাগুলির গোড়ায় আটি বান্ধিতে হয়। পরে আটির বাকি অংশ জলে রাখিয়া আঁসের ছাড়ান অংশ গুলি একত্রে দুই হাতের দুই মুষ্টিতে বদ্ধ রাখিয়া আস্তে আস্তে হেঁচ্‌কা টানিলে সমস্ত আটির আঁসগুলি একত্রেই পৃথক করা যায়। কৃষকেরা বলেন যে এই প্রণালীতে তাহাদের মধ্যে যাহারা নিপুণ তাহারা এক মণ পর্য্যন্ত পাট উঠাইতে পারেন। তবে গড়ে ৩০ সের পাট রোজ সাধারণ কৃষকও উঠাইতে পারে। (২) সময় সংক্ষেপ করিবার জন্য কোন কোন স্থানে আর একটী কৌশল অবলম্বিত হইয়া থাকে। দুই কি তিন হাত ব্যবধান রাখিয়া ২টী খোঁটা মাটীতে বসাইতে হয়: এবং এই খোঁটা দুটীর মাথায় মাটীর দুই হাত উপরে এক খণ্ড সরু বাঁশ (আড়া) বান্ধিতে হয়। পচানি ঠিক হইলে পর এক একটী আটি লইয়া নখ ও আঙ্গুল দ্বারা সবগুলি কাণ্ডের গোড়ার আধ হাত আন্দাজ আঁস ছাড়াইতে হয়। পরে এই কাণ্ডগুলি এক এক হাতে ৪।৫টী করিয়া লইয়া গোড়ার যোলার ভাগ ঐ বাঁশের (আড়ার) উপরে এবং ছাড়ান আঁস ভাগ নীচের দিকে রাখিয়া ডান দিকের আঁসগুলি ডান হাতে এবং বাম দিকের আঁসগুলি বাম হাতে একত্রে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া হেঁচ্‌কা টানিলেই যোলা গুলি পৃথক হইয়া দূরে পড়িয়া যায়; এবং আঁস গুলি মুষ্টিমধ্যে থাকিয়া যায়। কৃষকেরা বলে এই প্রণালীতে একজন অভ্যস্ত কৃষক একত্রে ৮।১০টী কাণ্ডের আঁস ছাড়াইতে পারে এবং ৮ ঘণ্টা কার্য্য করিয়া রোজ এক মণ আন্দাজ পাট উঠাইতে পারে।

কৃষিবিৎ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় তাঁহার কৃত ইংরাজী পাটের গ্রন্থে (Jute in Bengal) আঁস ছাড়াইবার যে নূতন প্রণালীর উল্লেখ করিয়াছেন, বস্তুতঃ তাহা চাষাদের প্রবর্ত্তিত এই প্রণালীরই রূপান্তর মাত্র। তাহা এই;— ১ হাত কি ১।০ হাত লম্বা একখণ্ড বাঁশ কি কাঠ গ্রহণ কর। তাহাতে সমান দূরে ২।৩ আঙ্গুল অন্তর ৮।১০টী আঙ্গুলের মত, ১২।১৪ আঙ্গুল লম্বা, শাল (হাল্যা) লাগাও। তাহার পর উপযুক্ত ব্যবধান রাখিয়া মাটীতে দুইটী খোটা বসাও: এবং মাটী হইতে হাত দুই উপরে যেন দাঁড়াইয়া কার্য্য করা যায় এই ভাবে ঐ আঙ্গুল বা শালযুক্ত বাঁশ বা কাষ্ঠ খণ্ড আঙ্গুল গুলি উপরের দিকে করিয়া ঐ খোঁটা দুটীর মাথায় আটকাইয়া দাও। এখন পূর্ব্বের মত পাটের কাণ্ডের গোড়ার দিকের আঁস কতকটা ছাড়াইয়া প্রত্যেক ২টী শালের মধ্যের

ফাঁকে এক একটী কাণ্ড রাখিয়া এক এক মুষ্টিতে ৪।৫টী করিয়া কাণ্ডের আঁস জড়াইয়া হেঁচ্‌কা টানিলে সবগুলি কাণ্ডের আঁস অতি সহজেই বাহির হইয়া যাইবে।

৩০। উড়িষ্যার প্রণালী।

উড়িষ্যা দেশের পাট ছাড়াইবার প্রণালীর কথা শ্রীযুক্ত নিবারণ বাবু যাহা বলিয়াছেন তাহাও উল্লেখযোগ্য, যদিও উড়িষ্যা পাটের জন্য বিখ্যাত নয়। উড়িষ্যাতে পাট পচানি সমাধা হইলে পর, কৃষক আঁস না ছাড়াইয়া এক এক মুষ্টি আঁসযুক্ত কাণ্ড লইয়া দুই হাতে গোড়ায় ধরিয়া, সজোরে মাথার চারিদিকে ঘুরাইয়া জলে আছড়াইয়া ঐ আঁসযুক্ত কাণ্ডগুলি পরিষ্কার করে; এবং আঁস ছাড়াইবার পরিবর্ত্তে সেই পরিষ্কৃত আঁসযুক্ত কাণ্ড-গুলি রৌদ্রে পাতলা করিয়া বিছাইয়া শুকাইতে দেয়। ভালরূপ শুকাইলে পর আপনা হইতেই আঁসগুলি সোলা হইতে অনেকটা পৃথক হইয়া পড়ে। পরে আঘাত দ্বারা সোলাগুলি ভাঙ্গিয়া ঝাড়িলেই আঁসগুলি পৃথক থাকিয়া যায় এবং সোলাগুলি ঝরিয়া যায়। উড়িষ্যার এই প্রণালী অনেকটা ইউরোপের তিসির (Linum) আঁস (flax) কি ভাঙ্গের (Cannabis) আঁস (hemp) ছাড়াইবার প্রণালীরই অনুরূপ। ইউরোপেও তিসি কি ভাঙ্গের গাছ গুলির পচন ক্রিয়া ঠিক হইলে পর ঐ আঁসযুক্ত কাণ্ডগুলি পাতলা করিয়া ঘাসের উপরে সমানভাবে ছড়াইয়া দিয়া দিন পনর (১৫) রৌদ্র খাওয়াইয়া থাকে। তাহাতে আঁস গুলি আপনা হইতেই অনেকটা পৃথক হইয়া পড়ে। তখন আবার সেই অর্দ্ধ ছাড়ান আঁসযুক্ত কাণ্ড-গুলি একত্র করিয়া কিছুদিন স্তূপে রাখিয়া দেয়। অবশেষে আকমাড়া যাঁতার (Behia mill) মত যাঁতার (Roller) ভিতর দিয়া চালাইয়া ঐ আঁস-যুক্ত কাণ্ডগুলির সোলার ভাগ চূর্ণ করিয়া পরে ভালরূপে ঝাড়িয়া (Scutching) আঁসগুলি সোলামুক্ত করা করা যায়।

পঞ্চম অধ্যায়—পাটের কাণ্ডের স্তরভেদ ও পণ্য আঁস।

৩১। পাট গাছের সাঁস (Pith) ও জনন চক্র (Cambium)।

আমাদের প্রধান কৃষিশস্য পাট। পাট গাছের কোন অংশ কি কি কার্য্য সাধন করে, পণ্য আঁসই বা গাছের কোন অংশে থাকে, এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সাধারণ জ্ঞান সকলেরই থাকা বাঞ্ছনীয়। আমরা একটী পাটের গাছ সদ্য উঠাইয়া একটা ভোঁতা ছুরী দ্বারা কাণ্ডের গোড়ার দিক দিয়া একটী ৪।৬ আঙ্গুল পরিমাণ খণ্ড কাটিতে গিয়া দেখি কাণ্ডের মধ্যস্থিত সোলাটি অতি সহজেই উপরের বল্কল ভাগ হইতে পৃথক হইয়া যায়। কাটা খণ্ডের সোলাটির কেন্দ্রস্থানে দেখিতে পাই এক প্রকার ঈষৎ নীল আভাযুক্ত সাদা কোষাকার (cells) কোমল পদার্থ (Parenchyma) যুক্ত একটী শলাকা ঠিক কেন্দ্র স্থান দিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই শলাকাটিই গাছের সাঁস (Pith)। যতদিন পাট গাছ সতেজে জীবিত থাকে ততদিন তাহার সাঁসের কোষগুলি (Parenchyma) একপ্রকার কোমল জীবনী পদার্থে (Protoplasm) পূর্ণ থাকে। গাছটী মরিয়া গেলে সেই জীবনী পদার্থ শুকাইয়া যায়, এবং সেই সঙ্গেই গাছের সাঁসটাও সঙ্কুচিত হইয়া গাছের ঠিক মধ্যস্থানে একটী ফাঁপা নলাকার ছিদ্র মাত্র অবশিষ্ট থাকে। আবার সোলাটী বল্কল হইতে ছাড়াইয়া সোলার গায়ে এবং বল্কলের ভিতরের দিকে হাত দিলে একপ্রকার বিজল বা জেলির মত তরল পদার্থ অনুভূত হয়। কাণ্ডের

এই অংশের সর্ব্বত্রই একটী স্তরের মত চক্রাকারে তরল জীবনী পদার্থ (Protoplasm) বর্ত্তমান। এই তরল পদার্থের চক্রকে কাণ্ডের জননচক্র (Cambium) বলা যায়, কারণ এক অপূর্ব্ব জনন শক্তি এই পদার্থের মধ্যে বর্ত্তমান, যাহার প্রভাবে এই জননচক্রের ভিতরের দিকে কাষ্ঠের ন্যায় যোলা (xylem or wood) এবং বাহিরের দিকে সূতার ন্যায় আঁস (Phloem or bast) উৎপন্ন হয়। কৃষক মাত্রেরই এই জননচক্র সম্বন্ধে একটু জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, কারণ গাছের জীবন মরণ ইহারই উপরে অনেকটা নির্ভর করে। অনেক সময় দেখা যায় একপ্রকার লাল পিপড়া লাগিয়া চারা গাছের গোড়ার এক আদ ইঞ্চি স্থানের চারিদিক দিয়া খাইতে খাইতে অবশেষে এই জননচক্র (Cambium) পর্য্যন্ত খাইয়া ফেলিয়াছে। তখনই গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হয়, এবং আস্তে আস্তে গাছটী মরিয়া যায়। কৃষক অনেক চেষ্টা করিয়াও বাঁচাইতে পারে না। বেগুন গাছেই এই পিপড়ার উৎপাত সচরাচর দৃষ্ট হয়। "যোড়" কলম করিবার সময়ে গাছের শাখার এবং চারা গাছের গায়ের ছাল চাঁচিয়া উভয়ের জননচক্র পরস্পর ভাল করিয়া চাপিয়া সংলগ্ন করিয়া দিলেই যোড়া লাগিয়া কলম প্রস্তুত হয়। পাট গাছ কি যে গাছই হউক মরিয়া গেলে জননচক্রটী শুকাইয়া গিয়া ছালটা এমন দৃঢ়ভাবে যোলার গায়ে লাগিয়া যায়, যে মৃত শুষ্ক গাছের যোলা হইতে বাকল জীবিত গাছের মত সহজে পৃথক করা যায় না।

৩২। বহির্ব্বল্কল (Epidermis) ।

আবার সেই কাণ্ডখণ্ডের ছাল ভাগটী হাতে লইয়া আস্তে আস্তে তাহার উপরিভাগ নখ দ্বারা খুঁটিয়া দেখিতে পাই একটা অতি পাতলা, সাদা সাদা কিঞ্চিৎ ময়লা পরদা (Membrane) পৃথক হইয়া যায়। কাণ্ডখণ্ডটী আধ ঘণ্টা কাল জলে সিদ্ধ করিলে এই পরদার অধিকাংশই অতি সহজে পৃথক করা যায়। এই পরদাটিকে বহির্ব্বল্কল বলা যায়। এই বহির্ব্বল্কল এত পাতলা যে, গাছের জীবন ধারণের জন্য আলো এবং বাতাস এই পরদার ভিতরে গাছের শরীরে যাতায়াত করিতে পারে। কিন্তু গাছের গায়ের জল বাহির হইয়া গিয়া পাছে গাছ শুকাইয়া মরিয়া যায়, এই বহির্ব্বল্কল যতদুর প্রয়োজন, তাহার বাধা দেয়। কাণ্ডের গায়ে যেখানেই নখ দিয়া খুটা যায়, সেই খানেই এই বহির্ব্বল্কল দৃষ্ট হয়, যেন গাছটী আপাদ মস্তক একপ্রকার অতি পাতলা কাগজে মোড়া।

৩৩। ছাল (Cortex) ।

পাট গাছের বহির্ব্বল্কলটী নখদ্বারা অপসারিত করিলে পর কাণ্ডের গায়ে আর একপ্রকার কতক সবুজ বর্ণ পদার্থের একটী স্তর দৃষ্ট হয়। ইহাকেই প্রকৃত ছাল (Cortex) বলা যায়, পাট গাছে এই স্তরটী অপেক্ষাকৃত কম বিকাশ প্রাপ্ত। কিন্তু পাটের ন্যায় আঁসপ্রধান অন্য গাছ যথা ঢেঁড়স কি জবার ডাল লইয়া পরীক্ষা করিলে পর দেখা যায় এই সবুজ বর্ণ ছালের স্তরটী বেশ গভীর এবং ইহার রেণুগুলি পরস্পর সংযুক্ত নয়। এই স্তরে নানাপ্রকার বর্ণের পদার্থ মিশ্রিত থাকে (Collenchyma and Parenchyma)। ছালের ও পত্রাদির সবুজ বর্ণ পদার্থের রেণুগুলি (Chlorophyll grains)ই সূর্য্যরশ্মির রাসায়নিক ভাগ (Chemical rays) সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত করিয়া বায়ুস্থিত অঙ্গারজান গাছের ভিতরের রস হইতে গাছের ভিতরে ময়দা (starch) চিনি, তৈল প্রভৃতি নানাপ্রকার বস্তু প্রস্তুত করে। এই জন্যই ছায়াতে পাট গাছের কি অন্য কোন গাছেরই ভাল বিকাশ হয় না। (ক্রমশঃ)

কাগজ ও কাগজের কারবার।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী লিখিত।

প্রথম প্রস্তাব।

দুই বর্ষাধিককাল পূর্ব্বে কাগজ সম্বন্ধে আমি কৃষক পত্রে দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম; ঐ প্রবন্ধ দ্বয় মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবার পরে, কাগজের ইতিবৃত্ত, তৈয়ারি প্রকরণ এবং কারবারের লাভালাভ সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারা গিয়াছে। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে সেগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া বহু নূতন বিষয়ের অবতারণা করিবার ইচ্ছা আছে।

আসাম প্রদেশে কাগজের কারবার কেহ কখন করে নাই এবং কাগজ তৈয়ারি করিবার প্রণালীও কেহ জানিত না। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আসামে কাগজের কল স্থাপিত হইতে পারে এবং হইলে লাভ ভিন্ন ক্ষতি হইবে না। কাগজ তৈয়ারি করিবার জন্য যে সকল দ্রব্যের প্রয়োজন, আসামে তাহা প্রচুর পরিমাণে আছে। তদ্ভিন্ন মজুর, মূলধন, অন্যান্য উপাদান ও উপকরণ যথা তথা মিলিতে পারে। আসামে কাগজের কারবার ও কল বসাইবার অনেক সুবিধা আছে। বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে যত কাগজ আইসে তাহার ৮০ অংশ পরিমাণ এদেশে তৈয়ারি হয়। তাহা হইলে দেখুন আমাদের দেশে সমুদয় উপকরণ বর্ত্তমান থাকিতেও আমরা বিদেশ হইতে কাগজ আনাইতে বাধ্য হই। লাভের টাকা বিদেশীদিগের উদর পূর্ণ করে। গত ৫ বৎসরকাল মধ্যে কত প্রকারের কত পরিমাণ কাগজ বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানি হইয়াছে, নিম্নে তাহার তালিকা দেখুন। এই তালিকা "Industrial India" নামক সুপরিচিত পত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পাঠক শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন অল্প দিন পূর্ব্বে কাগজের যে মূল্য ছিল, এক্ষণে তাহার প্রায় আড়াই গুণ দাম বাড়িয়াছে।

খৃষ্টাব্দ		আমদানী কাগজের মূল্য।
১৯০৪	...	৫২১৮৩৯৬৲
১৯০৫	...	৬৪৩৭২৮৮৲
১৯০৬	...	৭০৬৮৯৭৩৲
১৯০৭	...	৮০১১১০৫৲
১৯০৮	...	৯৯২৪২৬২৲

সমুদয় ভারতবর্ষের মধ্যে এক্ষণে নয়টি মাত্র কাগজের কল আছে। বঙ্গে ৩, বোম্বাইয়ে ৪, গোয়ালিয়রে ১, পশ্চিমোত্তর প্রদেশে ১। ১৯০৫ এবং ১৯০৬ এবং ১৯০৭ এই তিন বৎসরে এদেশী কাগজের উত্তরোত্তর পরিমাণ কমিয়াছে এবং বিদেশী কাগজের আমদানী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষের যেখানে যেখানে কাগজের কল আছে, সেখানে বিদেশী কাগজের ব্যবহার বা আমদানী ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া যাইতেছে। অন্যান্য স্থানে ১৯০৪ অব্দ হইতে আমদানীর পরিমাণ শতকরা ৫৩৲ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিদেশ হইতে আমরা যত প্রকারের কাগজ পাইতে পারি, ভারতবর্ষে এখন এমন কারিকর নাই যে, তত প্রকার কাগজ তৈয়ারি করিয়া দিতে পারে, অথবা বিদেশী কাগজ যেরূপ উৎকৃষ্ট হয়, এদেশের কাগজ তত উৎকৃষ্ট হয় না। কিন্তু বর্ত্তমান কালে ইউরোপ ও আমেরিকায় যে সকল নূতন ধরণের কাগজের কল তৈয়ারি হইয়াছে তাহা আনাইয়া ভারতবর্ষে স্থাপন করিলে এবং ভাল মিস্ত্রি দ্বারা

কাগজ তৈয়ারি করিতে শিক্ষা দিলে, সত্বরে এদেশে উৎকৃষ্ট কাগজ প্রচুর পরিমাণে তৈয়ারি হইতে পারে এবং কাগজের কারবারেও যথেষ্ট পরিমাণে লাভ হওয়া সম্ভব। কাগজের কারবারে সর্ব্বপ্রকারে গড়ে ৩৬৲ টাকা লাভ হইতে পারে।

আসাম দেশে নিম্নলিখিত কারণে, কাগজ প্রস্তুত করিবার জন্য সুন্দর কুঠি, কল, কারখানা ও কারবার বসান যাইতে পারে। যদি কেহ যথেষ্ট মূলধন লইয়া আসামে কাগজের কল বসান, তাহা হইলে সত্বরে ধনবান হইতে পারিবেন ইহা ধ্রুবসত্য। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে এরূপ কল একটিও নাই অথচ কাগজের কাট্‌তি যথেষ্ট। কলিকাতা হইতে কাগজ না পাঠাইলে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম-বাসীরা কাগজ প্রাপ্ত হয়েন না। নূতন প্রদেশে (অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গে ও আসামে) বিদেশ হইতে গত বর্ষে নানাপ্রকারের কাগজ ও মলাট ন্যূনাধিক ২৭৭৭৪ মণ আমদানী হইয়াছিল, ইহাদের মূল্য দুই লক্ষ পয়তাল্লিশ সহস্র ছয় শত পয়ত্রিশ টাকা। কাগজ তৈয়ারি করিবার জন্য তৃণ, লতা, পাতা প্রভৃতি যাহা কিছু প্রয়োজন হয়, তাহা আসাম দেশে যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ছিন্ন কাপড়, ছিন্ন কাগজ, খড়, ঘাস, শণ প্রভৃতিও প্রচুর পরিমাণে যথাতথা মিলে। কল বসাইবার সুবিধাজনক অনেক স্থান সহজে পাওয়া যায়। ধনেশ্রী নদীতটে, শিবসাগর জেলায়, বরপাথর নামক স্থানে কল বসাইলে, নিকটে অরণ্য পাওয়া যায়, রেল নিকটে দেখা যায়, জল যথেষ্ট পরিমাণে মিলে, মাল বহিয়া লইয়া যাইবার নৌকা হস্তগত থাকিতে পারে, বলদ শকট পাওয়া যায় এবং প্রায় সর্ব্বপ্রকার সুবিধা ভোগ করা অসম্ভব হয় না। বস্তুতঃ এদেশে কাগজের কলের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইলে, সর্ব্ব প্রথমে আসামে তাহার পরীক্ষা হওয়া উচিত।

প্রকৃত কথা এই, কাগজ প্রস্তুত করিবার জন্য যে সকল উপকরণের প্রয়োজন, যে দেশে তাহা বার মাস প্রচুর পরিমাণে মিলে, সে দেশে কাগজের কল স্থাপন করা অলাভজনক হয় না। কাঠের গুঁড়া, কাগজ তৈয়ারি করিবার জন্য এক প্রধান উপাদান। বন থাকিলে ইহার অভাব হয় না। কিন্তু ভারতের সর্ব্বত্র এক্ষণে কাষ্ঠের মূল্য দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতেছে, এই কারণে বাঁশের সাহায্যে নানাস্থানে কাগজ তৈয়ারি হইতেছে। রুট্‌লেজ, সিণ্ডেল, রেট্‌ প্রভৃতি সাহেবেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, বাঁশের কাগজ মন্দ হয় না এবং সকল জেলাতেই বাঁশ পাওয়া যায়। কাঠের গুঁড়া এবং বাঁশ এতদুভয়ের মিশ্রণে সুলভে কাগজ তৈয়ারি হইতে পারে। তিন বৎসরের বাঁশ হইলেই উপকরণ সংগ্রহ করা যায়। মালয় উপদ্বীপ, শ্যামদেশ, ব্রহ্মদেশ, আনাম প্রভৃতি স্থানে বাঁশের উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত হয় এবং এই সকল প্রদেশে এত বাঁশ জন্মে যে, তাহা দেখিলে বোধ হয় যেন অনন্তকাল পর্য্যন্ত বাঁশের ক্ষয় হইবে না। এই সকল স্থানে ৫৪২১ একার পরিমাণ ভূমিতে যে বাঁশ জন্মে তাহার উপকরণে প্রতি সপ্তাহে দুই শত টন কাগজ তৈয়ারি হইতে পারে। এক একার প্রায় তিন বিঘা, এক টন প্রায় ২৭৷৷০ মণ। ব্রহ্মদেশে সম্প্রতি এক বিলাতী কোম্পানীর আফিস খোলা হইয়াছে। অনেকে আশা করেন, বহুপ্রকারের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কাগজ এখানে প্রস্তুত হইতে পারিবে।

সাধারণ প্রকারের স্বদেশী কাগজ আমরা সহজেই প্রস্তুত করিতে পারি, কিন্তু সেজন্য একটু

ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও সাবধানতা আবশ্যক করে। ছেঁড়া কাগজে চূণ মাখাইয়া অথবা চূণের জলে ফেলিয়া রাখিয়া দশ দিবস পর্য্যন্ত উহা ছায়ায় রাখিতে হয়। মাটীর বড় গামলায় উহা ভিজান দরকার। প্রতি মণ ছেঁড়া কাগজে ৪ সের চূণ ব্যবহার করিলে যথেষ্ট হয়। যখন খুব ভিজিয়া নরম হইয়া যায়, তখন ঢেঁকিতে কুটিয়া চূর্ণ করিতে হয়। ধান ভাণার ঢেঁকি হইলে কাজ চলিতে পারে, কিন্তু ঢেঁকি শক্ত হওয়া চাই। তদনন্তর আঠাবৎ ঐ চূর্ণ পদার্থকে বাহির করিয়া লইয়া পায়ের দ্বারা মাড়াইয়া আর একটা বড় গামলায় রাখিয়া দিতে হয়। উপরে যে চূর্ণের (গুঁড়ার) কথা লেখা হইয়াছে তাহার অবস্থা এক্ষণে গঁদ, আটা বা মলমবৎ। ইহাকে ধীরে ধীরে অল্প অল্প পরিমাণে কাপড়ে ছাকিয়া লইতে হয়। ছাকিবার পরে যাহা পাওয়া যায় তাহাতে জল মিশাইয়া এক বৃহৎ পাত্রে রাখিয়া দাও। ইহার পরে একটা যষ্টি লইয়া ক্রমাগত ইহাকে নাড়িতে থাক, যেন তলে জমিয়া না যায়। তদনন্তর অন্ততঃ ২৩ ইঞ্চি × ১৮ ইঞ্চি প্রমাণ বাঁশের চালুনী দ্বারা উহা সাবধানে ছাঁকিয়া লও। এই চালুনী কাঠের ছাঁচের উপর রাখিতে হয়, ঐ কাঠের ছাঁচে (mould) ফিলম্ (Film) পড়িতে আরম্ভ হইলে উহাকে পুনঃপুনঃ নাড়িতে হইবে। মোটা চটের থলে দিয়া চাপিয়া ধরিয়া ফিলম্‌কে প্রশস্ত করিয়া দিলে উহা কাগজের আকার ধারণ করে। উহাকে শুখাইয়া লইয়া মোটামুটি সাধারণ ধরণের কাগজ পাওয়া যাইতে পারে। আতপ তণ্ডুলের মাড় বা ফেন কাগজে লাগাইয়া দিয়া রৌদ্রে ভাল করিয়া শুষ্ক করিয়া লইলে, কাগজ আরও সুন্দর এবং মজবুদ হইয়া থাকে। ইহার উপরে শঙ্খ বুলাইয়া দিলে কাগজের বেশ "পলিশ" (Polish) হইতে পারে। ইহা শুভ্র বর্ণের কাগজ তৈয়ার করিবার প্রথা। নীল বর্ণের তৈয়ার করিতে হইলে, "নীল" (Indigo) জলে ভিজাইয়া তাহার সহিত মাটির বাসনের আটাবৎ পদার্থ মিশাইতে হয়। হরিদ্রা বর্ণের কাগজ প্রস্তুত করিতে হইলে ভাতের ফেনে হলুদ ভিজাইয়া তাহার জল, কাগজে মাখাইতে হয়। প্রতি দিবস গড়ে ১৮০ খানা কাগজ তৈয়ার করা যায়। পল্লীগ্রামের গরিব "কাগজীরা" (Paper-makers) ইহাতে প্রতি মাসে গড়ে বার টাকা হইতে ১৫৲ টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিতে পারে।

এক মণ ছেড়া কাগজে, ৩০ সের পর্য্যন্ত দেশী কাগজ প্রস্তুত হয়। নানাপ্রকার দেশী কাগজের আকার ও মূল্য এইরূপ ঃ—

	নাম	আকার	মূল্য (প্রতি টাকায়)
১।	"বড়রুখী"	(৪০ আঙ্গুল লম্বা)	১২ দিস্তা
২।	"সোলারুখী"	(৫৬ আঙ্গুল ,,)	৫ দিস্তা
৩।	"বয়রা"	(৫৬ আঙ্গুল ,,)	৮৷৷০ দিস্তা
৪।	বালেশ্বরী	(বড় কাগজ মজবুত, মোটা ও মসৃণ)	২ দিস্তা
৫।	হোগলা	(হুগলী জেলার নীলবর্ণের কাগজ) ৩৮ অঙ্গুলি প্রমাণ।	৬ দিস্তা

কাষ্ঠ চূর্ণ বা বাঁশ অপেক্ষা, গাছের পাতা, খড়, ঘাস, ছেঁড়া কাপড় প্রভৃতি হইতে প্রস্তুত কাগজ অধিকতর ভাল হয়। মলাট বা ছবির জন্য খুব মোটা কাগজ তৈয়ার করিতে হইলে মাটির বাসনের (গামলার) সেই আটাবৎ পদার্থকে জলে গুলিয়া বাবলা গাছের আটার সহিত মিশাইতে হয়। এই জিনিষ কাগজে মাখাইতে মাখাইতে কাগজ খুব পুরু হইয়া উঠে। এই মোটা কাগজে ছবি, বাক্স, ছবির ফ্রেম প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারে।

ইহা হাতে প্রস্তুত হইতে পারে, আবার কলেও তৈয়ার হয়। ইহার জন্য এক প্রকার কল আছে তাহার মূল্য অধিক নয়।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে এক সময়ে কাগজ তৈয়ারি করিবার জন্য অনেক লোক বাস করিত, কিন্তু সম্প্রতি সে দেশে কাগজের কারখানা একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। মিষ্টার জে, এন, গুপ্ত, আই, সি, এস. ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয় লিখিয়াছেন, একদা পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে ন্যূনাধিক সাত প্রকার কাগজ প্রস্তুত হইত। ইহার মধ্যে সেরাজগঞ্জ অঞ্চলে এখনও অনেক কাগ্‌জীকে দেখা যায় এবং তদঞ্চলে এখনও একপ্রকার কাগজ তৈয়ারি হইয়া থাকে। বাঙ্গালী ও মাড়োয়ারীগণ এই কাগজে হিসাবের খাতা প্রস্তুত করে। শচিপৎ নামক আর একবিধ কাগজ শচি গাছের বল্কল হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে; ইহা মজবুদ ও বহুবর্ষকাল স্থায়ী বলিয়া ইহাদ্বারা কোষ্ঠি তৈয়ারি হয়। চট্টগ্রাম জেলায় এখন কোন প্রকার ভাল কাগজ প্রস্তুত হয় না; সামান্য ধরণের এক প্রকার যে স্বল্পমূল্যের কাগজ তৈয়ারি হইয়া থাকে, তাহাতে আকাশে উড়াইবার ঘুড়ি বা আতসবাজি প্রস্তুত করা যাইতে পারে। পাবনা জেলায় বর্ত্তমান কালে পঞ্চদশ ঘর কাগ্‌জীর বসতি, ইহাদের বার্ষিক আয় (প্রত্যেকের) ৭০৲ টাকার অধিক নহে। এক সময়ে তথায় ৫০০ শত ঘরের অধিক সংখ্যক কাগ্‌জীর বসতি ছিল। কাশ্মীর রাজ্যে অতি পুরাতন কাল হইতে বহুপ্রকার উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে। একদা পূর্ব্ববঙ্গের লোকেরা ঐ কাগজ তৈয়ারি করিতে শিখিয়াছিল, এখন তাহাদের বংশধর নাই, কেবল দুই জন লোক উহা এখনও তৈয়ারি করিতে পারে। ইহাদের একজনের নাম বাবু প্রকাশচন্দ্র রায়, গ্রাম ছতিয়ান, মহকুমা হবিগঞ্জ, জেলা শ্রীহট্ট। অপরের নাম বাবু সতীশচন্দ্র কুণ্ডু, গ্রাম কাঞ্চনপুর, থানা আদমদীঘি, জেলা বগুড়া। ঈশ্বরগঞ্জ থানার অন্তর্গত দেবকোলা গ্রামের বাবু দুর্গাচরণ সরকার মহাশয় কাগজ তৈয়ারি করিতে জানেন এবং কাগজ হইতে নানাপ্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছেন। দেবকোলা গ্রাম, ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত। স্থূলকথা এই, কি পশ্চিমবঙ্গে কি পূর্ব্ববঙ্গে, সর্ব্বত্রই কাগ্‌জীর সংখ্যা কম হইয়া গিয়াছে এবং কাগজ তৈয়ারি করিবার কারখানাও উঠিয়া গিয়াছে। প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র মণ কাগজ ভারতবাসীর ব্যবহারে আইসে, এই সমস্ত কাগজ যদি এদেশে তৈয়ারি হইত এবং স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগের মূলধনে কলে বা কুঠিতে তৈয়ারি হইত তাহা হইলে ভারতবাসী কত ধনবান হইত ভাব দেখি!

হুগলী, হাবড়া ও মুর্শিদাবাদে কাগজ এখনও তৈয়ারি হয়। কিন্তু তাহাদের পরিমাণ যথেষ্ট নহে। উলুবেড়িয়া মহকুমায়, আমতা রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে দুই ক্রোশ দূরে ময়নাগ্রামে অনেক

কাগ্‌জী বাস করে; ইহারা মুসলমান। ময়নাগ্রাম হাবড়া জেলার অন্তর্গত। মুর্শিদাবাদ জেলার দুইটী গ্রামে এখনও কতকগুলি কাগ্‌জী দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণপুর ও শ্রীরামপুর এই দুই গ্রাম সমসেরগঞ্জ থানার অন্তর্গত; মহকুমা জঙ্গীপুর। হুগলী জেলার ভিতরে অনেক গ্রামে কাগজ প্রস্তুত হয়। পাড়াম্বো গ্রামের কাগজ মন্দ নয়। পলবা পুলিশষ্টেশনাধীন মাহানদে ও গোঁসাইমালপাড়া গ্রামে ভাল দেশী কাগজ নির্ম্মিত হইয়া থাকে। পাণ্ডুয়া থানার অধীন নিয়ালা গ্রামে অনেক কাগজী বসতি করে। ধনিয়াখালি থানার অন্তঃপাতী সাবাজার গ্রামে এবং আরামবাগ পুলিশ ষ্টেসনের অধীন বালীদেওয়ানগঞ্জ গ্রামে এখনও সুন্দর এবং মজবুদ কাগজ তৈয়ারি হইতে দেখা যায়। সর্ব্বত্র মুসলমানেরা এই ব্যবসাকে একপ্রকার এক চেটিয়া করিয়া লইয়াছে। কিন্তু সকল স্থানেই কাগ্‌জীর সংখ্যা কম হইয়া গিয়াছে। প্রতিদ্বন্দীতা ও দারিদ্রতা ইহার প্রধান কারণ। ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে ময়না গ্রামে প্রায় ১০০ ঘর কাগ্‌জী ছিল, এখন সেখানে ৭ ঘর মাত্র কাগ্‌জীর বসতি। বেহারের সাহাবাদ জেলার অন্তর্গত নশ্‌রীগঞ্জে এক সময়ে কাগজের বিশিষ্ট কারবার ও কারখানা ছিল। এখন সেখানে আর কিছুই নাই। কটক জেলায় ৩০ বর্ষকাল পূর্ব্বে হরিহরপুরের মুসলমানেরা কাগজ প্রস্তুত করিয়া বিশেষ ধনবান হইয়াছিল, এখন সেখানে ছয় সাত জন মাত্র লোক কাগজ নির্ম্মাণ করিতে পারে। তারকেশ্বরের নিকট সাবাজারে একদা কাগজ প্রস্তুত জন্য ৭০টা ঢেঁকি চলিত, এখন সেখানে দুইটা মাত্র ঢেঁকি আছে। এখানে কাগজ তৈয়ারি করিয়া জন সাধারণের জন্য কাগ্‌জীরা দীঘি ও পুষ্করিণী পর্য্যন্ত খনন করিয়া দিয়াছিল, এখন সেখানে কেবল দরিদ্রের পর্ণকুটীর ভিন্ন আর কিছুই নাই। তাহা হইলেই দেখ, ক্রমে ক্রমে দেশের সকল প্রকার ব্যবসাগুলি উঠিয়া যাইতেছে এবং তৎস্থানে বিদেশী বণিক ও ব্যবসায়ীরা আসর জমকাইয়া বসিতেছে।

প্রাচ্যদেশে অর্থাৎ এসিয়া খণ্ডে কলে কাগজ নির্ম্মাণ করিবার প্রথা কোনকালে প্রচলিত ছিলনা। ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের আমলে কাগজের কলের সৃষ্টি হইয়াছে। চীন ও জাপানে এখনও হাতে কাগজ তৈয়ারি হয়। চীন ও জাপান স্বাধীন রাজ্য; সেখানে লক্ষ লক্ষ মণ কাগজের প্রয়োজন হয়। কেবল লিখিবার জন্য নহে; কাগজে সে দেশে অসংখ্য প্রকার জিনিষ ও খেলনা প্রস্তুত হইয়া থাকে। সে দেশে এত কাগ্‌জীর বসতি যে, সমগ্র রাজ্যদ্বয়ে দেশী কাগজের কখন অভাব হয় না। চীনদেশে প্রত্যেক জেলায় অগণ্য কাগজের কুঠি আছে। তুঁত গাছের বল্কল হইতে চীন ও জাপানে প্রধানতঃ কাগজ নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে কাগজ তৈয়ারি জন্য বহুবিধ দ্রব্যের ব্যবহার হইত। ভূর্জ্জপত্র (Birch-Bark or Betula Bhojpattra) কাগজরূপে বহু সহস্র বর্ষকাল পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়াছে।

কার্পাস চাষ।

ভূর্জ্জপত্র কাগজরূপে ব্যবহৃত হইত বটে কিন্তু ইহা প্রস্তুত করিবার একটা প্রণালী ছিল, সে সুন্দর প্রণালীটী এখনকার লোকে ভুলিয়া গিয়াছে। কাশ্মীরদেশে প্রচলিত বহু প্রাচীন পুস্তক ভূর্জ্জপত্রে লিখিত দেখা যায়। নেপাল রাজ্যের অধিকাংশ পুরাতন পুঁথি তালপত্রে লিখিত। পশুচর্ম্মে পুঁথি লেখার প্রথা হিন্দুজাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল না, কিন্তু অন্যান্য জাতির অনেক পুঁথি পশুচর্ম্মে লিখিত আছে। গজনির মামুদের সহিত আল্‌বুরিনি নামে যে প্রসিদ্ধ মুসলমান পণ্ডিত ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন, তিনি লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষে বৃক্ষপত্র ও বৃক্ষবল্কলে পুঁথি লেখা হয়, পশুচর্ম্ম কোথাও প্রচলিত নাই। সুবিখ্যাত সেকেন্দর সাহ (Alexander the Great) যখন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সহিত নিয়ার্কশ নামে এক গ্রীক সেনাপতি ছিলেন; তিনি লিখিয়াছেন, এক প্রকার মজবুদ ও মোটা তুলার চাদরে হিন্দুরা পুঁথি লেখে। এই প্রথা কখন হইতে উঠিয়া গিয়াছে আমরা জানি না। মহীশূর প্রদেশে কানাড়ী ব্যবসায়ীরা তুলা হইতে "কদতম্" নামে একপ্রকার কাপড় তৈয়ারি করে ও তাহার উপরে তিন্তিড়ি বীজের কাই দ্বারা প্রস্তুত মাড় দেওয়া হয় এবং তদনন্তর পাথুরে কয়লা দিয়া ইহাকে কাল বর্ণ করা হয়। বর্ত্তমান কালেও কদতম্ কাগজ মহীশূর প্রদেশে প্রচলিত আছে। (Mysore and Coorg Gazette, 1877.)

স্পেনবাসী মুরজাতি দ্বারা ইউরোপে সর্ব্বপ্রথম কাগজ তৈয়ারি হইতে আরম্ভ হয়। সিসিলি দ্বীপের আরব অধিবাসীগণ কর্ত্তৃক ইটালীতে কাগজের কুঠি স্থাপিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত ইউরোপে হাতের দ্বারাই কাগজ প্রস্তুত হইত। লুই রবার্ট নামে এক ব্যক্তি ইউরোপে সর্ব্বপ্রথমে কাগজের কল নির্ম্মাণ করেন। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা কহেন, সম্রাট আকবর সাহার শাসনকালের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে কাগজ প্রস্তুত হইত না। আকবরের চেষ্টায় কাশ্মীর রাজ্যে সর্ব্বপ্রথম কাগজ তৈয়ারি হইতে আরম্ভ হয়। অনেকে অনুমান করেন, চীনদেশেই সর্ব্বপ্রথম কাগজের সৃষ্টি হইয়াছিল। আকবর কর্ত্তৃক কাশ্মীরে কাগজ তৈয়ারি হইবার অনেক পূর্ব্বকালে ভারতে কাগজের ব্যবহার ছিল। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখিয়াছেন, একাদশ শতাব্দীতে মালবের ধারা নগরের সুপ্রসিদ্ধ ভোজরাজার সভায় কাগজ চলিত। নেপালে একাদশ শতাব্দীতে কাগজে লিখিত সংস্কৃত পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেখানে বাঁশ ও "মহাদেব পুষ্প" (Daphne Cannabina) হইতে কাগজ তৈয়ারি হয়। এই কাগজ খুব মজবুত ও স্থায়ী। ভুটান দেশেও এই প্রকার কাগজ তৈয়ারি হইয়া থাকে। যাহা হউক বর্ত্তমানকালে, এই স্বদেশী আন্দোলনের দিনে ভরসা করা যায়, এদেশের প্রকৃত কল্যাণাকাঙ্ক্ষী মহোদয়গণ কাগজ তৈয়ারি প্রক্রিয়া বিষয়ে উদাসীন না থাকিয়া ইহার উন্নতি কল্পে বিশেষরূপে যত্ন করিবেন।



আশ্বিন—১৩১৬।

ভারতীয় কীটতত্ত্ব।

প্রকৃতি ভারতভূমিকে যেরূপ নানাপ্রকার বৃক্ষ লতা, পশুপক্ষী প্রভৃতি দ্বারা ভূষিত করিয়াছেন, সেই রূপ অসংখ্য পরিমাণ কীট দ্বারা যাহাতে উহাদের অব্যাহত বংশবৃদ্ধি হইতে না পারে তাহারও ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। জগতে যে সমস্ত উদ্ভিদ অথবা প্রাণী জাতি দৃষ্ট হয়, সে সকল যদি নির্ব্বিবাদে স্বীয় স্বীয় বংশ বৃদ্ধি করিতে পারিত, তাহা হইলে এ বিশাল পৃথিবীতেও তাহাদের স্থান হইত না। কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে তাহা হইতে পারে না। উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতে পরস্পরের মধ্যে অহোরাত্র ভীষণ সংগ্রাম চলিতেছে। এই জীবন সংগ্রামে যে জয়ী হইতেছে তাহারই বংশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে এবং যে স্থানীয় অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া শত্রুজয় করিতে না পারিতেছে, সে ধরাপৃষ্ঠ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। বিবর্ত্তনবাদে এই 'ক্রিয়ার নাম 'যোগ্যতমের জয়'। জগতে কীটের সংখ্যা প্রায় অগণিত এবং উহাদের বংশ-বৃদ্ধির হারও জাতি বিশেষে প্রায় স্বপ্নাতীত। এক প্রকার সবুজবর্ণ অত্যন্ত ক্ষুদ্র কীট দ্বারা গোলাপ গাছ একেবারে বিনষ্ট হইয়া যাইতে অনেকেই দেখিয়াছেন। ইহা এফিস (Aphis) জাতীয় পোকা। পণ্ডিতপ্রবর হক্সলী একবার হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলেন যে যদি একটী এফিসকে ক্রমান্বয়ে দশ পুরুষ নির্ব্বিবাদে বংশ বৃদ্ধি করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহাদের ওজন ৫০ কোটী লোকের সমতুল্য হইবে; অর্থাৎ চীন দেশের জন সংখ্যা অপেক্ষাও অধিক হইবে। ইহা হইতে কোন কোন জীবতত্ত্ববিৎ অনুমান করেন যে, যদি কোন কারণে কীট জাতির স্বাভাবিক শত্রুর সংখ্যা কমিয়া যায়, তাহা হইলে জগতে কীট ভিন্ন অপর সামান্য সংখ্যক প্রাণী অথবা উদ্ভিদেরই স্থান হইবে। কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ কীটের বংশ বৃদ্ধির মাত্রাও যেমন অত্যধিক, উহাদের শত্রুর সংখ্যাও তেমনই অপরিমিত। সন্তানোৎপাদনের পূর্ব্বে উই পোকা যখন নূতন পক্ষ সহকারে উড়িতে থাকে, তখন কত পশুপক্ষী যে উহাদের বিনাশ সাধনের জন্য উপস্থিত হয়, তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন। যে পরিমাণ পোকা ঢীপি হইতে বাহির হয়, তাহার শতাংশের এক অংশও গৃহে ফিরিয়া যায় না। অপরাপর জাতীয় পোকা সম্বন্ধেও এইরূপ। হিংস্রক কীট, নানাজাতীয় পশু, অধিকাংশ জাতীয় পক্ষী এবং দেশ ভেদে মনুষ্য পর্য্যন্তও আহারের জন্য কীটের প্রাণনাশ করিয়া থাকে। কিন্তু এত প্রভূত পরিমাণ ধ্বংশ সত্বেও গৃহে, ক্ষেত্রে অথব অরণ্যে কীটের উপদ্রব আদৌ কম নহে। প্রবল শত্রুকে পরাভূত করিতে হইলে উহার গতিবিধি, স্বভাব সামর্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে সম্যক জ্ঞানলাভ আবশ্যক। কীট যে কৃষকের প্রধান শত্রু তাহা বলা বাহুল্য। সুতরাং কীট দমনের চেষ্টা কৃষকের অন্যতম কার্য্য। এই বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে হইলে অনিষ্টকারী কীট

সমূহের জীবন বৃত্তান্ত জ্ঞাত থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়।

এতদিন পর্য্যন্ত কীট পতঙ্গাদির আক্রমণ নিবারণের উপায় নিরূপণের ভার কৃষকের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। কৃষক তাহার সামান্য বুদ্ধিতে যতটুকু পারিত করিত এবং উপদ্রবের মাত্রা অধিক হইলে অদৃষ্টের দোহাই দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিত। বর্ত্তমান ভারতীয় কৃষি বিভাগের প্রতিষ্ঠার পর হইতেই এতদ্দেশে ব্যবহারিক কীটতত্ত্বের চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে প্রাণালিক কীটতত্ত্ব (Systematic Entomology) সম্বন্ধে Fauna of British India প্রণেতাগণ দ্বারা ভারতীয় কীটতত্ত্বের অশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু উহা দ্বারা কীটতত্ত্ববিদগণেরই সুবিধা হইয়াছিল। সাধারণের তেমন কিছু সুবিধা হয় নাই। ভারতীয় কৃষিবিভাগের কীটতত্ত্ববিৎ মিঃ ম্যাক্সওয়েল-লিফ্রয় প্রণীত Indian Insect Pests নামক পুস্তক প্রকাশই সাধারণ ভাবে কীটতত্ত্ব আলোচনার প্রথম উদ্যম। ইতিপূর্ব্বে নানাবিধ সরকারী, বেসরকারী, দেশীয় ও বিদেশীয় গ্রন্থাদিতে ভারতীয় কীটসমূহের বিবরণ বিক্ষিপ্ত ছিল। লিফ্রয় সাহেব তাঁহার প্রণীত Insect Pests পুস্তকে বিশেষ বিশেষ কীট সম্বন্ধে উক্ত বিবরণ সমূহ একত্রিত করিয়া সাধারণের যে কি উপকার করিয়াছেন তাহা সম্যকরূপে বলা যায় না। লিফ্রয় সাহেবের পুস্তক প্রকাশের পর তিনি অথবা ভারতীয় অন্যান্য কীটতত্ত্ববিদগণ নিশ্চেষ্ট নাই। সম্প্রতি কীটতত্ত্ব বিষয়ক দুইটী পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথমটী লিফ্রয় সাহেব প্রণীত Indian Insect Life। ইহা ৬০০ শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এবং প্রায় ৬০০ শত চিত্র সম্বলিত। মূল্য ২০৲ টাকা। দ্বিতীয়টী বন বিভাগের কীটতত্ত্ববিৎ মিঃ ই, পি, ষ্টেবিং প্রণীত Insect Intruders in Indian Homes। ইহা ১৫৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এবং প্রত্যেক পৃষ্ঠাই এক অথবা ততোধিক চিত্র সম্বলিত। মূল্য ৪৷৷৹ টাকা।

এই দুই খানি পুস্তক সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের। লিফ্রয় সাহেবের পুস্তকের উদ্দেশ্য আমাদের প্রধান প্রধান ইষ্ট ও অনিষ্টকারী কীট সমূহের বৈজ্ঞানিক বিবরণ, জীবন বৃত্তান্ত, বিশেষ বিশেষ লক্ষণ প্রভৃতি একত্রিত করিয়া এমন একটি পুস্তক প্রকাশ যদ্বারা বৈজ্ঞানিক কীটতত্ত্ববিৎ ও কীট শাস্ত্রের ছাত্রগণ উপকৃত হইতে পারেন। পক্ষান্তরে ষ্টেবিং সাহেবের পুস্তক কীট শাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ পাঠক পাঠিকাগণের জন্য লিখিত। উদ্দেশ্য অনুসারে উভয় পুস্তকই বিশেষ প্রশংসাযোগ্য হইয়াছে। লিফ্রয় সাহেবের পুস্তকের সমালোচনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজনীয়। কারণ এতদ্দেশে সাধারণের মধ্যে কীট শাস্ত্রের মূলসূত্র সমূহ সম্বন্ধে জ্ঞান এখনও প্রচারিত হয় নাই। যাঁহারা কতক পরিমাণে কীট শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষেই লিফ্রয় সাহেবের পুস্তক পঠনযোগ্য। সুতরাং এস্থলে ষ্টেবিং সাহেবের পুস্তক সম্বন্ধেই আমরা কিছু আলোচনা করিব।

ষ্টেবিং সাহেবের পুস্তক পড়িয়া মনে হয় কতদিনে বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইবে। কীট সমুদয়ের দুরূহ লাটিন নাম, তাহাদের বর্ণ, গণ জাতি বিচার প্রভৃতি বিষয় সাধারণের নিকট কখনই মনোরম পাঠ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না। বিশেষ পাণ্ডিত্য

এবং গবেষণা পূর্ণ পুস্তকে সেই জন্য সাধারণের বিশেষ লাভ নাই। অন্যদিকে যে পুস্তকে বৈজ্ঞানিক নামাবলীর বাহুল্য নাই, যাহাতে গল্পচ্ছলে গ্রন্থকার আমাদিগকে আমাদের প্রধান প্রধান কীটশত্রুর সহিত পরিচিত করিয়া দেন এবং কীট জীবনের বিশেষত্বগুলি আমাদের নয়নগোচর করিয়া আমাদিগের পর্যবেক্ষণ শক্তির উত্তেজনা করেন—সেই পুস্তক দ্বারাই শিক্ষার পথ প্রশস্ত হয় এবং তাহার দ্বারাই সমাজের সমধিক উপকার সাধিত হয়। ষ্টেবিং সাহেবের পুস্তকে এ সমস্তই বর্ত্তমান। তাঁহার লিপি কৌশল বিশেষ প্রশংসাযোগ্য, পাঠক পড়িতে আদৌ কষ্ট অনুভব করেন না এবং চিত্র সমূহ জীবন্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পুস্তক খানি কৃষকের জন্য লিখিত নহে। ইহার চারিটী অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম অধ্যায়ে সাধারণ ভাবে কীট বংশের বৈচিত্র দেখান হইয়াছে। দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে ক্রমান্বয়ে গৃহে, বাগানে ও বনমধ্যস্থ তাঁবুতে যে সমুদয় অনাহূত পতঙ্গ অতিথি আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাদের কৌতুহলোদ্দীপক বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। কোন কোন কীটের স্বভাব এরূপ ভাবে চিত্রিত হইয়াছে যে তাহা পড়িলে হাসিতে হয়। স্থানাভাব না হইলে আমরা ডাইন ফড়িং (Praying Mantis) উইচিংড়ি, পিপীলিকা প্রভৃতির বিবরণ অনুবাদ করিয়া পাঠককে উপহার প্রদান করিতাম।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে প্রথমেই মনে হয় বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ পুস্তক কত দিনে প্রকাশিত হইবে। বস্তুতঃ বাঙ্গালা ভাষায় এই রূপ একখানি পুস্তকের একান্ত অভাব। কীটতত্ব সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় দুই এক খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু সে সমুদয়ের লিখন ভঙ্গী এবং বিষয় নির্ব্বাচন পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ না করিয়া বরং বিতাড়ন করে। কোন বিজ্ঞানে শিক্ষাপ্রদান করিতে হইলে উক্ত বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি এরূপ সহজ ভাষায় ও সরসভাবে বিবৃত করিতে হয় যে, তাহা যেন পাঠকের চিত্তরঞ্জন করিতে পারে। যদি পাঠক প্রথমেই বিজ্ঞানের কঠোর সত্যসমূহ অনাবৃত ভাবে ও কর্কশ ভাষায় প্রকটিত হইতে দেখেন, তাহা হইলে অধিকাংশ স্থলে তাঁহার বিজ্ঞান শিক্ষার আগ্রহ উন্মেষমাত্রই নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয়। পশ্চিম জগতে বিশেষতঃ আমেরিকায় এমন কতকগুলি পুস্তক ও পুস্তিকা আজকাল প্রকাশিত হইতেছে, যাহা পাঠ করিতে অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর। পড়িতে গেলে বোধ হয় না যে পুস্তকের উদ্দেশ্য বিজ্ঞানবিষয়ক শিক্ষাপ্রদান। অথচ পাঠ শেষ হইলে আমরা দেখিতে পাই যে, কোন বিশেষ বিজ্ঞান বিষয়ে কতকগুলি মূল সত্য আমাদিগের আয়ত্ত হইয়া গিয়াছে। প্রথম বিজ্ঞান চর্চ্চার সময়ে এইরূপ পুস্তকই আবশ্যক। যাঁহারা বর্ত্তমান সময় বঙ্গভাষায় কীটতত্ব প্রণয়নে ব্রতী আছেন তাঁহারা যদি এই সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করেন, তাহা হইলে কীট বিষয়ক জ্ঞান যথেষ্ট পরিমাণে প্রসার লাভ করে।

ভারতে ব্যবসায়ের জন্য ফলোৎপাদন।

ফলের বাগানের উন্নতি।

ভারতে অনেক ফলের বাগান আছে বটে কিন্তু উৎকৃষ্ট ফল উৎপাদন করিবার চেষ্টা অতি বিরল। উৎকৃষ্ট ফল উৎপাদনের অভিনব ও সুন্দর প্রণালী সমূহ সম্যক বর্ণনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধে অল্পবিস্তর না হইলেও, কি প্রধান উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া ফলের বাগান প্রস্তুত করা উচিত, তাহা সর্ব্বাগ্রে বলিয়া রাখা ভাল। এদেশের লোকে গাছে অধিক ফল ফলুক আশা করে, কিন্তু সে সকল ফল যা তা হইলেও ক্ষতি নাই। উৎকৃষ্ট অথচ অধিক ফল হইবে, অধিক যদি নাই হয়, তবু যেন উৎকৃষ্ট ফল হয় এইটী কি উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে? আম হউক, লিচু হউক, জাম, জামরুল, লেবু, গোলাপজাম, আতা, পিয়ারা, যে কোন জাতীয় গাছ হউক, তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বর্ণের গাছটী বাছিয়া লইতে হইবে। সেই বর্ণের সর্ব্বাপেক্ষা তেজস্কর পূর্ণবয়স্ক গাছ হইতে বীজ সংগ্রহ করিয়া তবে বৃক্ষ উৎপাদন করা কর্ত্তব্য; কিম্বা বিভিন্ন প্রদেশের উৎকৃষ্ট জাতীয় বিভিন্ন বর্ণের বৃক্ষাদির পরস্পরের সহিত কলম, অথবা সঙ্কর উৎপাদন করিয়া নূতন বর্ণের উত্তম ফল প্রসবকারী বৃক্ষাদি প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। ক্রমান্বয়ে এক জাতির মধ্যে উৎকৃষ্টতর নির্ব্বাচন করিতে করিতে ভাল ফল উৎপন্ন হইবে। কিন্তু আমাদের দেশের লোকের ততটুকু অধ্যবসায় নাই। এই অধ্যবসায়ের অভাবে ভারতে ফলের বাগানের ক্রমশঃ অবনতি ঘটিতেছে। তার উপর আমাদের লোকেত ফলের বাগানের পাইট করিতে জানেই না। বাগান কোপান, গাছের ডাল বা শিকড় ছাঁটা, বা গোড়ায় সার দেওয়া যেন একটা বাজে কাজ; সুতরাং এদেশে যে ফলের বাগানের অবনতি ঘটিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? বরং আমাদের এই প্রেসিডেন্সি বিভাগ অপেক্ষা বাঙ্গালার মজঃফরপুরাদি কোন কোন জেলায় ফলের বাগানের তদ্বির হয়। বাঙ্গালার ৫টী জেলাতেই প্রায় ৫০০,০০০ একর পরিমাণ জমিতে সব্জী চাষ ও ফলের বাগান আছে, তন্মধ্যে মজঃফরপুরে ৮০,০০০, কটকে ৭৬,০০০, সারণে ৭৩,০০০, চম্পারণে ৫৫,০০০ এবং বালেশ্বরে ৫০,০০০ একর; পূর্ব্ববঙ্গের বাখরগঞ্জে ২৭১,৪৬৯,০ নোয়াখালিতে ১২১,৩০, ত্রিপুরায় ৭১,২০০, মৈমনসিংহে ৫৮,০০০ এবং মালদহে ৫০,০০০ একর জমি ফল ও সব্জী বাগানে আবদ্ধ। পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থান এবং মজঃফরপুর ফলের বাগানের জন্য বিখ্যাত।

পাশ্চাত্য দেশে ফলের বাগানের বহুতর তদ্বির হইয়া থাকে। (১) বৃক্ষাদির উচ্চতা ও প্রসার বুঝিয়া গাছ রোপণ, (২) জমি কোপান ও তাহাতে সবুজ সার অথবা ঘাস পচাইয়া বা ছাগল মেষাদি পশু চরাইয়া বাগানের মাটীর উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করা, (৩) গাছের ডাল পালা ছাঁটা, (৪ কীট পতঙ্গের আক্রমণ ও ছত্রক রোগ নিবারণের জন্য গাছে পিচকারী দ্বারা জল সিঞ্চনের ব্যবস্থা ও গাছে ফল ধরিলে কতক ফল ভাঙ্গিয়া পাতলা করিয়া দেওয়া প্রভৃতি অনেক প্রকারের কৌশল অবলম্বন করা হইয়া থাকে।

উপযুক্ত ব্যবধানে বৃক্ষাদি রোপণ ও জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধির চেষ্টা যদিও বা এদেশে কোন কোন বাগানে আছে কিন্তু শেষোক্ত উপায় গুলির জ্ঞানই বোধ হয় এদেশের লোকের নাই। সেই জন্য কত রাশি রাশি ফল পোকায় নষ্ট করিতেছে। আমা-

দের দেশের মাটী কিছু খারাপ নয়, যদি দেশ কাল বুঝিয়া উপযুক্ত বৃক্ষাদি রোপণ করা যায়, যদি উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত সার প্রদান করা যায়, যদি সুপ্রণালী মত বাগানের কারকিৎ করা যায়, তবে ফল নিশ্চয়ই ভাল হইবে। পাশ্চাত্য দেশে সম্ভ্রান্তলোকের ফলের বাগান অন্যান্য চাষীদের পক্ষে আদর্শ স্বরূপ। বিলাতে প্রদর্শনীর পারিতোষিকের তালিকায় কত সৌখিন লোকের নাম পাইবে। এখানেও সৌখিন লোকের ফলের বাগানের সখ আছে। কিন্তু এখানকার বড় লোকদিগের মধ্যে দুই চারি রকমের ভাল জাতীয় ফল উৎকৃষ্ট উপায়ে উৎপাদনের চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহাদের বাগানে বিভিন্ন শ্রেণীর নানাজাতীয় বৃক্ষের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলির যত্নও খুব—কিন্তু তাহাতে দেশের কি উপকার হইবে। অর্থশালী লোক ফলের ব্যবসায়ের জন্য ফল উৎপাদনের দিকে মন না দিলে সমধিক উন্নতি হওয়া অসম্ভব। অর্থলাভ করা উদ্দেশ্য না হইলেও দেশের ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে উহা করিতে হয়।

বাজারে ফলের চালান।

বাজারে ফল পাঠাইবার সুনিয়মের উপর ফলের ব্যবসায়ের ভাল মন্দ নির্ভর করে। অনেক ভাল ভাল ফল সুনিয়মে বাজারে আনা হয় না বলিয়া খারাপ হইয়া যায় এবং তাহার দর হয় না। ফলের ব্যবসাই হউক বা অন্য ব্যবসাই হউক তাহার উন্নতি, অবনতি পাঁচ দশ লোকের উপর নির্ভর করে। যথা—উৎপাদনকারী, মাল বহনকারী, ব্যবসায়ী, দোকানদার এবং ব্যবহারকারী। এই পাঁচজনে যদি প্রত্যেকে তাহাদের কর্ত্তব্য পালন করেন, তবেই ব্যবসায়ের উন্নতি হয়। উৎপাদনকারী ভাল ফল উৎপাদন করিলে এবং তাঁহার উৎপাদিত ফলে ব্যবহারকারী সন্তুষ্ট হইলে তবে ব্যবসায়ে সকলেরই সুবিধা হয়। পাশ্চাত্য দেশে ফলের ভালমন্দ নির্ব্বাচন করা হয়। ভাল ফল মন্দ ফল বা ছোট ফল বড় ফল এখানকার মত একত্র মিশাইয়া বাজারে বিক্রয়ার্থ আনা হয় না। সেখানে প্রত্যেক ফল উৎপাদনকারী এক জাতীয় ফল গুণানুসারে ১ম, ২য়, ৩য় শ্রেণী বিভাগ করিয়া লয় এবং সকলেই প্রথম শ্রেণীর ফল উৎপাদনের প্রয়াসী। এই সকল কারণে তাঁহারা এত উন্নতি করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ফল পৃথক পৃথক থাক করিলে ক্রেতা বিক্রেতা সকলের পক্ষেও মঙ্গল হয় এবং জিনিষের দরও ঠিক হয়। ফলগুলি উত্তমরূপে ঝুড়িতে সাজাইয়া ভাল করিয়া বাঁধিয়া রেল বা ষ্টীমারে পাঠান উচিত। প্যাক ভাল হইলে রেল বা ষ্টীমার কোম্পানির মাল বহনাবহনের কষ্ট হয় না, কুলী, মজুরগণের নামান উঠানরও অসুবিধা হয় না। অধিকন্তু ব্যবসায়ীর মাল তছরুপ হয় না এবং দোকানদার, খরিদদার আদত ভাল প্যাক দেখিয়া ক্রয় করিতে সঙ্কুচিত হয় না। তার উপর যদি শ্রেণী বিভাগ করা থাকে, তবে দোকানদার ও ক্রেতা, সকলেরই কেনা বেচা সুশৃঙ্খলায় হয়। আমাদের এদেশে কিন্তু মাল বহনাবহনকারী দলের অসাধু ব্যবহারে অনেক সময় বিস্তর লোকসান হয়। (১) রেল বা ষ্টীমার কোম্পানির ভাড়ার হার অধিক, (২) তাঁহারা সময়ে মাল পৌঁছাইয়া দেন না, (৩) অযত্নে মাল নাড়াচাড়া করেন, (৪) মাল পাঠাইবার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক গাড়ী নাই। মাল বহনাবহনের অসুবিধা হেতু ফল ব্যবসায়ীর সমূহ ক্ষতি হয়। আমাদের দেশের ফল ব্যবসায়ীরাও ফলের ব্যবসায়ের অবনতির জন্য দায়ী। তাঁহারা কেবল সস্তায় মাল খোঁজেন। কিন্তু অনেক ব্যবসায়ী

ভাল খুঁজিলেও পান না—কিন্তু সকলেই ভাল খুঁজিলে নিশ্চয়ই ভাল ফল উৎপন্ন হইবে। দোকানদারেরা আর কি করিতে পারে—তাহারা যাহা পাইবে তাহাই দোকানে সাজাইবে। কিন্তু ভাল ফল সাজাইলে, ভালরূপ প্যাক করা ফলের ঝুড়ি সাজাইয়া রাখিলে খরিদ্দার অধিক ঝোঁকে সন্দেহ নাই। শেষ কথা এই যে, ফল ব্যবসায়ের ভাল মন্দের প্রধান কর্ত্তা যাহারা ফল ব্যবহার করেন, তাঁহারা। খরিদ্দার ভাল খুঁজিলে তবে ত বাজারে ভাল জিনিষ আসিবে। যা তা বাজারে বিকাইলে ভাল ফল উৎপন্ন করিবার দরকার কোন কালেই হইবে না। সেই জন্যই বলি যদি সৌখীন লোকে এ কার্য্যে মন দেন এবং বাজারে ভাল ফল আমদানী করিয়া খরিদ্দারকে দেখান, তবে তাঁহারা ভাল খুঁজিতে শিখিবেন। খরিদ্দার তৈয়ারি করাই ব্যবসায়ের মূলমন্ত্র।

পত্রাদি।

আলিগটের ফল।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দেওয়ান, রাঙ্গামাটী, চট্টগ্রাম, লিখিতেছেন:—

আমাদের বাগানে সমতল ভূমিতে একটী আলিগট গাছ আছে। প্রতি বৎসর ফুল হইয়া ঝরিয়া যায়, ফল লাগেনা, এরূপ অনেক বৎসর, গাছও অনেক বড় হইয়াছে। ইহার কি উপায় করিলে প্রতিবৎসর ফল ধরিবে, তাহা মহাশয়ের দ্বারা ব্যবস্থা করাইয়া জানিবার উদ্দেশে মহাশয়ের নিকট লিখিতেছি। অতএব মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক সদুত্তর প্রদান করিলে চিরবাধিত হইব। উক্ত গাছ কলম করা যায় কি না?

[ফুল হইবার কিছু দিন পূর্ব্বে গাছের ডাল পালা বেশ করিয়া ছাঁটিয়া দিয়া ফল হয় কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। অনেক স্থলে সমতল ভূমিতে আলিগটে ভাল ফল হয় না। বিশেষ যত্ন করিলে কলম তৈয়ারি করিতে পারা যায়। কৃঃ সঃ।]

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দত্ত, পরকাইত শাসন, শ্রীহট্ট জানিতে চাহিতেছেন:—

United Provinceএর Mr. Hadi নাকি তাঁহার Sugar Extractionএর process improved করিয়াছেন এইরূপ খবর কাগজে পড়িলাম। বিশেষ বিবরণ পাই নাই। এ বিষয় বিশদরূপে কৃষকে প্রকাশ করিলে বাধিত হইব।

[যুক্তপ্রদেশের কৃষিবিভাগ হইতে মিঃ হাদির শর্করা প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে একটী পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। আপনি Director of Land Records and Agriculture. U. P. Agra and Oudhএর নিকট আবেদন করিলে উক্ত পুস্তিকা পাইবেন। আপনার ২য় প্রশ্নের উত্তর কৃষক ১৩১৫, ফাল্গুন সংখ্যা ২৪৮ পৃষ্ঠায় "নাইট্রোজেন জীবাণুজ সার" নামক প্রবন্ধে পাইবেন। কৃঃ সঃ।]

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাস, ভসুকরা, বর্দ্ধমান।

দুগ্ধ, পনীর, মাংস, মিষ্টান্ন, ফল ইত্যাদি Preserving করিবার প্রণালী বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করা আছে, এরূপ একটী পুস্তকের নাম ও মূল্য ও কোথায় পাওয়া যাইবে লিখিয়া বাধিত করিবেন, এবং air tight করিবার যন্ত্র একটী নিম্ন সংখ্যা কত টাকায় কোথায় পাওয়া যাইতে পারে ইহাও লিখিবেন।

[নিম্নলিখিত দুইখানি পুস্তকে আপনার আবশ্যকীয় সংবাদ পাইতে পারেন ;—E. Bradely and M. Cock—Fruit Bottling 2s. 6p. Canning and Preserving—S. L. Rover 4s. 6p. অর্ডার দিলে পুস্তক সমিতির আফিসেই পাওয়া যাইতে পারে।] কৃঃ সঃ।

প্রাদেশিক কৃষি সংবাদ।

পুষার কৃষি কলেজ।—পুষার কৃষি কলেজের শিক্ষা প্রণালীর বিবরণ ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা নিম্নে উহার মর্ম্মানুবাদ প্রদান করিলাম।

ভারতবর্ষীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে যে সকল ছাত্র উচ্চশ্রেণীর বিজ্ঞান শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছে, তাহারা এবং কৃষি সম্বন্ধে পোষ্ট গ্র্যাজুয়েটরা যাহাতে কৃষি বিষয়ক উচ্চশ্রেণীর শিক্ষালাভ এবং মৌলিক তত্ত্বানুসন্ধান করিতে পারে, পুষার কৃষি কলেজে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

প্রাদেশিক কৃষিকলেজ সমূহের বর্ত্তমান অবস্থায় কৃষিবিষয়ক বিশেষ বিশেষ বিভাগে এবং কৃষি-সংক্রান্ত সাধারণ শ্রমশিল্প সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিয়া প্রদেশ সমূহ এবং দেশীয় রাজ্য সমূহকে কৃষির উন্নতি সাধনে সহায়তা করা পুষার কৃষি কলেজের অন্যতম উদ্দেশ্য। কৃষি কলেজে পূর্ব্বোক্ত বিষয় সমূহে শিক্ষাদানের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অল্প কালের মধ্যে ভারতের অন্যত্র এরূপ শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর নহে। সুতরাং পুষার কৃষি কলেজটী কৃষি সম্বন্ধে আদর্শ বিদ্যালয় হইবে এবং আশা করা যায় যে, এখানে অধিক পরিমাণে ছাত্র শিক্ষালাভার্থ আগমন করিবে। এখানে কার্য্যকরী শিক্ষাও দান করা হইবে। এই শিক্ষালাভ করিবার জন্য বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতা এমন কি ইংরাজি ভাষায় জ্ঞানেরও প্রয়োজন হইবে না। তবে যাহারা সাধারণ শিক্ষা-লাভ করিয়া এখানে আগমন করিবে, তাহাদিগের বিশেষ সুবিধা হইবে।

কৃষিবিদ্যা-শিক্ষার যাহাদিগের একটা সহজাত আগ্রহের অভাব আছে, তাহাদিগকে এই বিভাগে প্রবেশাধিকার দেওয়া হইবে না। যাহারা রীতিমত কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে, কৃষিকার্য্য যাহাদের উপজীবিকা, পৈতৃক বা জাতীয় ব্যবসায়, অথবা যাহারা পুরুষানুক্রমে মালির কার্য্য করিয়া আসিয়াছে, এই বিভাগে তাহাদের আবেদনই সমধিক আদরণীয় হইবে।

এই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিলে ছাত্রগণ গভর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগের নিম্নশ্রেণীর পদসমূহের উপযুক্ত হইতে পারে। যাহারা সরকারী কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক নহে, তাহারা যদি নিজ নিজ ক্ষেত্রে উন্নত প্রণালীর কৃষি অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে পুষার কৃষি কলেজ হইতে লব্ধ শিক্ষায় তাহাদিগের বিশেষ উপকার হইবে। আপাততঃ প্রত্যেক বিষয়ে এক সময়ে ২ জনের অধিক ছাত্রের শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। কিন্তু ছাত্রেরা যাহাতে একই সময়ে একাধিক বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে পারে, তাহার সুন্দর ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ছাত্রগণ পুষা কলেজে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলে তাহাদিগের শরীর সুস্থ ও সবল এবং চরিত্র উত্তম হওয়া আবশ্যক। তদ্ব্যতীত তাহাদিগকে কোন ডাইরেক্টার অব এগ্রিকালচার বা ঐরূপ কোন উপযুক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে অনুরোধ পত্র আনয়ন করিতে হইবে। শিক্ষার্থিগণকে বিনা ব্যয়ে বাসস্থান দেওয়া যাইবে। যাতায়াতের বা ব্যক্তিগত ব্যয় ছাত্রদিগকেই প্রদান করিতে হইবে। এই ব্যয় পুষার মত স্থানে মাসিক ১৫৲ টাকার অধিক নহে, বরং কম হইতে পারে। ছাত্রদিগের কোন পুস্তকের আবশ্যক নাই। যথাসম্ভব শীঘ্র শ্রেণী খোলা হইবে। প্রবেশার্থীরা যেন অবিলম্বে এগ্রিকালচারাল রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউট, পুষা, বেঙ্গল এই ঠিকানায় কলেজের ডাইরেক্টর ও প্রিন্সিপালের নামে আবেদন পত্র প্রেরণ করেন।

যে যে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত শিক্ষা প্রণালী ব্যবস্থিত হইয়াছে তাহার বিবরণ ;—

কৃষি বিভাগ।

(১) গৃহপালিত পশুর সংখ্যা বৃদ্ধি ও পশু পালন। তিন মাসে এই শিক্ষা সমাপ্ত হইবে। এই প্রণালীতে পশু পালন দুগ্ধবতী গো এবং কৃষি-ক্ষেত্রোপযোগী ও ভারবাহী পশুর উন্নতিবিষয়ক সাধারণ ব্যবস্থা সন্নিবিষ্ট আছে। সাধারণ পশু-রোগ পরীক্ষা ও তাহাদিগের চিকিৎসা প্রণালী এবং রোগ নিবারণের উপায় শিক্ষা দেওয়া হইবে। কীটের উপদ্রব হইতে পশুরক্ষা, সংক্রামক বা অন্য প্রকার পীড়া বহনকারী কীট দমনও এই প্রণালীর অন্তর্ভুক্ত। জানুয়ারী ও অক্টোবর মাসে এই বিভাগের শিক্ষা দেওয়া হইবে।

(২) গৃহপালিত আহার্য্য পক্ষী পালন এবং কীটের উপদ্রব হইতে পক্ষীর রক্ষা। অক্টোবর ও জানুয়ারী মাসে শিক্ষা আরম্ভ হইয়া তিন মাসে সমাপ্ত হইবে।

(৩) দুগ্ধ হইতে মাখন ঘৃত প্রভৃতি উৎপাদন। সম্পূর্ণ আধুনিক উন্নত প্রণালীর শিক্ষা প্রদত্ত হইবে এবং ছয়মাসে এই শিক্ষা সমাপ্ত হইবে।

(৪) কৃষিকার্য্যের উপযোগী যন্ত্রাদি। ভারতীয় ও ইউরোপীয় কৃষি যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ ও তাহার ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া হইবে। কলেজে এই শ্রেণীর সকল প্রকার যন্ত্র সংগৃহীত হইয়াছে। অক্টোবর অথবা জানুয়ারী মাসে শিক্ষা আরম্ভ হইবে এবং তিন মাসে শিক্ষা সমাপ্ত হইবে।

অর্থকর উদ্ভিদ।

(৫) ফল উৎপাদন। আটমাসে শিক্ষা সমাপ্ত হইবে। (ক) বাগান পরিচালন, বাগানের উপযোগী স্থান নির্ব্বাচন, ড্রেণ নির্ম্মাণ, জল সেচন, বৃক্ষ রোপণ, ফল উৎপাদক বৃক্ষের চাষ ও সার প্রয়োগ, (খ) পুষ্পোদ্গমকালে বৃক্ষের পরিচর্য্যা, কলম প্রস্তুত, প্রভৃতি বিশেষ উপায়, (গ) উৎপন্ন ফল বাজারে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করিবার সময় পর্য্যন্ত তাহার রক্ষা, প্যাকিং, বাছাই প্রভৃতি, (ঘ) ফল শুষ্ক করা ও রক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদত্ত হইবে। ১লা অক্টোবর শিক্ষা আরম্ভ হইয়া মে মাসে শেষ হইবে।

(৬) গার্হস্থ্য শিল্প স্বরূপ এণ্ডি রেশমের চাষ। অক্টোবর ও জানুয়ারী মাসে শিক্ষা আরব্ধ হইয়া তিন মাসে সমাপ্ত হইবে। গুটি প্রতিপালন ও গুটি হইতে সূত্র প্রস্তুত, পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হইবে। সূত্ররঞ্জন ও বস্ত্র বয়ন শিক্ষা করিতে হইলে আরও তিন মাস সময় লাগিবে।

(৭) লাক্ষার চাষ। ১৫ই মে হইতে ১৫ই জুন অথবা ২০শে সেপ্টেম্বর হইতে ২০শে অক্টোবর পর্য্যন্ত এই বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। তবে লাক্ষা নির্দ্ধারিত সময়ে উৎপন্ন হয় না বলিয়া এই তারিখের কিছু পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হইতে পারে। এই বিষয়ের সম্যক্ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(৮) তুঁতের রেশমের চাষ। কীট পালন, নীরোগ ডিম্ব নির্ব্বাচন, লাটাইয়ে সূত্র জড়ান এবং পরিত্যক্ত গুটির সদ্ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া হইবে। অন্যান্য রেশম-কীট প্রতিপালন সম্বন্ধে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা আছে। এই রেশম হইতে সূত্র প্রস্তুত, সূত্ররঞ্জন ও সাধারণভাবে বস্ত্র বয়ন শিক্ষা করা যাইতে পারে। ছয় মাস হইতে নয় মাসে এই শিক্ষা সমাপ্ত হইতে পারে। ১৫ই জুন তারিখে শিক্ষা আরম্ভ হইবে।

সার-সংগ্রহ।

পাটের সার।

আজকাল ইংলণ্ড ও আমেরিকায় আশ্চর্য্যরূপে কৃষিকার্য্যের উন্নতি হইয়াছে। এক এক খানি জমিতে পূর্ব্ব হইতে প্রায় ত্রিশ গুণ অধিক শস্য উৎপন্ন হইতেছে। ইহার কারণ যে কেবলমাত্র সারের প্রয়োগ তাহা বোধ হয় আর কাহাকেও বলিতে হইবে না। নানাবিধ তেজস্কর সার ব্যবহার করিয়াই ইংলণ্ড ও আমেরিকার কৃষকগণ এত অধিক পরিমাণে শস্য উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

আজকাল আমাদের দেশের কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে পাটই একটী প্রধান কৃষিদ্রব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাট দ্বারা কৃষকের দরিদ্রতা ঘুচিতেছে।

অতএব এই পাটের চাষে যাহাতে কৃষকগণ আরও অধিক পরিমাণে লাভবান হইতে পারে, সেইরূপ চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। এখন দেখা যাক কি প্রণালীতে এবং কোন কোন সার ব্যবহার করিলে অধিক পরিমাণে পাট জন্মান যাইতে পারে।

পাটের জন্য গোময় সারই অতি উত্তম বটে, কিন্তু বঙ্গদেশের নানাস্থানে আমি পর্য্যটন করিয়া দেখিয়াছি, সকল স্থানের কৃষকগণ এই গোময় সার প্রয়োগ করিবার পদ্ধতি ভাল জানে না। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, কৃষকেরা গোশালা হইতে গোবরগুলি সরাইয়া কোন একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে জড় করিয়া রাখিয়া দেয়। অতঃপর প্রয়োজন মত তথা হইতে গোময় লইয়া ক্ষেত্রে ফেলায়। এই স্তূপীকৃত গোময়ের উপর দিয়া সম্বৎসরের ঝড়বৃষ্টি ও রৌদ্র চলিয়া যায়। তাহাতে গোময়ের সারাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইবার পূর্ব্বেই বৃষ্টির জলে ধৌত হইয়া যায় এবং রৌদ্রের উত্তাপে আরও খারাপ হয়। বিশেষতঃ গোময় হইতে গোমূত্র অধিক তেজস্কর সার, কিন্তু ঐ গোমূত্র উপযুক্তভাবে আদৌ ক্ষেত্রে পড়ে না। এমতাবস্থায় কৃষকগণকে গোময় সারের ব্যবহার শিক্ষা দিতে হইবে।

ময়মনসিংহের জামালপুর অঞ্চলের কৃষকেরা যে পদ্ধতিতে গোময় সার ক্ষেত্রে প্রদান করে তাহা মন্দ নহে। জামালপুরের কৃষকেরা খণ্ড খণ্ড চালযুক্ত এক প্রকার গোশালা প্রস্তুত করে এবং মাসে মাসে কেহবা ১০।১৫ দিন পরে এক ক্ষেত্র হইতে অন্য ক্ষেত্রে গোশালা স্থানান্তরিত করিয়া উঠায়। তাহাতে গোময় এবং গোমূত্রের এক রতিও নষ্ট হইতে পারে না, সমস্ত গুলিই ক্ষেত্রে থাকে। অতএব বঙ্গের সমস্ত কৃষকগণেরই এইরূপ খণ্ড চালযুক্ত গোশালা প্রস্তুত করা এবং দশ পনর দিন পরে পরে স্থানান্তরিত করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু এই প্রণালীতে ক্ষেত্রে ঘাস কিছু বেশী হয় বটে, তথাপি ঘাস নিড়াইয়া দিলে ইহাতে অনেক বেশী ফল পাওয়া যায়। গো, মহিষের বিষ্ঠা অপেক্ষা ভেড়া, ছাগল, ঘোড়া প্রভৃতির বিষ্ঠা আরও অধিক তেজস্কর সার।

যে সকল স্থানে এইরূপ গোশালা নির্ম্মাণের উপায় নাই, সেই সকল স্থানে গোশালার অনতিদূরে গর্ত্ত করিয়া গোময় রাখা উচিত। রৌদ্র, বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহার উপর এক খানি চালা ঘর প্রস্তুত করিয়া দেওয়া উচিত। আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে চৌবাচ্চা করিয়া গোময় এবং গোমূত্র সঞ্চয় করা হয়। এইরূপ উপায় অবলম্বন করিলে কোন প্রকারেই সার পদার্থের অপচয় হইতে পারে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি গোময় অপেক্ষা গোমূত্রে অধিক সার সুতরাং গোময় এবং গোমূত্র একত্র গর্ত্ত করিয়া রাখিলে গড়াইয়া যাইতে পারে না। চৌবাচ্চায় রাখিলেতো আর কথাই নাই।

আর একটী সার পাটের জন্য আজকাল নিতান্ত উপযোগী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা "শণ"। যে জমিতে পাটের আবাদ করা হইবে, তাহাতে কার্ত্তিক মাসে ভালরূপ চাষ দিয়া শণের বীজ বপন করিতে হইবে। এক বিঘা জমিতে আধ মণ শণের বীজ বুনিলেই যথেষ্ট হয়। শণ গাছগুলি পৌষ মাসে বড় হইয়া যখন ফুল ধরিয়া সমস্ত ফুল গুলিই প্রস্ফুটিত হইবে, তখন ঐ শণ গাছ সমেত ক্ষেত্রে চাষ এবং মই দিতে হইবে। এমন ভাবে চাষ দেওয়া চাই, যেন সমস্ত গাছগুলিই মাটির সহিত মিশিয়া যায়। তবে এক দিনে তাহা কোন রকমেই মিশাইতে পারা যায় না। অবশ্য সমস্ত মাঘ মাস পর্য্যন্ত ৪।৫ খানি চাষ ও মই দিলেই শণের গাছ গুলি মাটির সহিত মিশিয়া যায়। এইরূপ ভাবে শণ বুনিয়া ক্ষেত্রে সার দিলে, পাটের চাষ করিতে আর গোময় সারের দরকার করে না। ইহাতেও গোময় সারের সমান ফলই পাওয়া যায়। কিন্তু এই শণ সারের বিশেষত্ব এই যে, গোময় সার যে ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, সেই ক্ষেত্রের পাট হইতে এই শণের সারযুক্ত ক্ষেত্রের পাট বেশী পরিষ্কার ও মসৃণ হয়। গোময় সার দ্বারা ক্ষেত্রে অত্যন্ত ঘাস হয়, কিন্তু শণের সার দিলে ক্ষেত্রে ঘাস খুব কম হয়। অতএব শণের সারই পাটের জন্য ব্যবহার করা উচিত। যে ক্ষেত্রে ধান্য বপন করা হইবে, তাহাতেও শণ বপন করিলে গোময় হইতে ভাল ফল পাওয়া যায়। কিন্তু ধান্য ক্ষেত্রের শণ গুলি ফুল ধরিলেই চাষ না

দিয়া যখন ফল ধরিয়া, ফল গুলি পরিপক্ক হইবে, তখন আগামী বৎসর বপন করিবার জন্য বীজের ছড়াগুলি কর্ত্তন করিয়া তৎপর চাষ ও মই দিবে। তাঁহা হইলে বীজের জন্য আর ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবে না। অথচ ধান্যের উপযুক্ত সার ঐ কর্ত্তিত অর্দ্ধাংশ গাছ দ্বারাই হইতে পারিবে। কারণ পাটের চাষে যে পরিমাণ সারের প্রয়োজন, ধান্যের জন্য তাহা হইতে অল্প পরিমাণে সার লাগে। অন্যান্য সার অর্থাৎ সোরা, হাড়ের গুঁড়া, রেড়ির খৈল ইত্যাদিও পাটের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে তাদৃশ ফল পাওয়া যায় না। পাটের জন্য শণ ও গোময় সারই উত্তম।

সৈয়দ মুরুল হোসেন।

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য।

বৃষ্টিজ্ঞান।—সম্প্রতি বৃষ্টিজ্ঞান (Meteorology) সম্বন্ধে বিশেষ বাদানুবাদ চলিতেছে। ভারতবর্ষে বৃষ্টিপাত সম্বন্ধে যে পূর্ব্বাভাষ সরকার হইতে বাহির হয়, বাস্তবিক বৃষ্টিপাতের সহিত তাহার সামঞ্জস্য সময় সময় দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদের পুরাতন হিন্দুশাস্ত্রে বৃষ্টি বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল, তাহা জানিবার জন্য স্বভাবতঃই কৌতূহল জন্মিয়া থাকে। এতদ্‌সম্বন্ধে বহু দিবস পূর্ব্বে কৃষক পত্রিকায় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার জোতিরত্ন লিখিত একটি প্রবন্ধ বাহির হয়। সম্প্রতি আসাম হইতে জনৈক বৃষ্টি-বিজ্ঞানোৎসাহী ব্যক্তি উক্ত প্রবন্ধ অবলম্বনে বৃষ্টিপাত সম্বন্ধীয় অনুসন্ধানে কিরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা আমরা এস্থলে উক্ত পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ঃ—

"সার্দ্ধ দিনদ্বয়ংকৃত্বা পৌষে পৌষা দিনাবুধঃ" ইত্যাদি বৃহৎ পরাশরে উক্ত যে বচন দিয়াছেন, আমি ঐ বচন দ্বারা ১৯০৬ সাল হইতে প্রতি বৎসর পৌষ মাসে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া বায়ুর গতি লিখিয়া রাখিয়া বৃষ্টির তালিকা প্রস্তুত করি। প্রথম বৎসর নিকটস্থ লোকের মধ্যে প্রকাশ করিয়া প্রমাণ করি। ২য় বৎসর আমার দেশের সাপ্তাহিক আসামবন্তি কাগজে প্রকাশ করি। ৩য় বৎসর আমার দেশের Times of Assam নামক ইংরাজি কাগজে প্রকাশ করি এবং পৃথক করিয়াও তালিকা মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করি। এই বৎসরও Times কাগজে প্রকাশ করিয়াছি এবং ইংরাজী ও বাঙ্গালা কেলেণ্ডার সহ এই তালিকা পৃথক প্রকাশ করিয়া অদ্য আপনার চরণে একখানা পাঠাইলাম। এই বৎসর এই তালিকা আসাম ও বাঙ্গালার সর্ব্বত্র এক এক খানা লইয়া প্রমাণ করিতে অনুরোধ করিয়াছি।

গত পৌষ মাসে বায়ুর গতি স্থির করিতে এবং শেষে আমার কাছে ঐ হিসাব পাঠাইতে আসামবাসি কাগজে Publicর কাছে একখানা পত্র প্রকাশ দ্বারা অনুরোধ করিয়াছিলাম। দুঃখের বিষয় এই মহৎকার্য্যে কেবল শ্রীযুক্ত ধীরসিং মৌজাদার নামক একজন ভদ্রলোক একখানা বায়ুর লিষ্ট পাঠাইলেন। এই যে বৃষ্টি তালিকা প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা কেবল স্থির রাখা বায়ুর গতি লইয়া। সেই জন্য এই তালিকা অপেক্ষা বৃষ্টি বেশী হইতে পারে। কিন্তু তালিকার তারিখের এক এক ক্ষেপের মধ্যে, অর্থাৎ প্রত্যেক বারের আরম্ভ তারিখ হইতে শেষ তারিখ পর্য্যন্ত, ইতিমধ্যে দেশ ও ঋতু অনুযায়ী বৃষ্টি হাওয়া প্রায়ই অনেক স্থানে প্রমাণ হইয়াছে।

এই তালিকা প্রকাশ দ্বারা আমার অর্থক্ষতি ব্যতীত অন্য লাভ নাই। কেবল শাস্ত্রের পুরাতন বাক্যের উপর দৃঢ় ভক্তি হইতে এবং যে তারিখ প্রতি বৎসর স্থির হয়, তদ্দ্বারাই লোকে বীজ বপন, ধান্য রোপণ আদি কার্য্যে জল সেচন আদি ব্যয় হইতে রক্ষা হইবার জন্যই এবং ভবিষ্যতে এই কার্য্যে উন্নতির জন্য সকল কষ্ট স্বীকার করিয়াছি।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

কার্ত্তিক—অক্টোবর-নবেম্বর।

আশ্বিন মাস গত হইল, বিলাতী সব্জী বপন করিতে আর বাকী রাখা উচিত নহে। কপি, সালগম, বীট প্রভৃতি ইতিপূর্ব্বেই বপন করা হইয়াছে। সেই সকল চারা এক্ষণে নাড়িয়া নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হইবে। মটর, মূলা এবং নাবী জাতীয় সীম, সালগম, বীট, গাজর, পিঁয়াজ ও শসা প্রভৃতি বীজের বপন কার্য্য আশ্বিন মাসের শেষেই আরম্ভ করা উচিত। নাবী ফসলের এখনও সময় আছে, তাহাদের চাষ চলে। কার্ত্তিকের প্রথমে ঐ সমস্ত বিলাতী বীজ বপন যেন আর বাকী না থাকে। বীজ আলুও এই সময় বসাইতে হইবে। পিঁয়াজ ও পটল চাষের এই সময়। আশ্বিন মাসের প্রথমার্দ্ধ গত হইলেই রবি শস্যের জন্য জমি তৈয়ারি করিতে হইবে এবং আশ্বিন মাস গত হইতে না হইতেই মুসুরী, মুগ, তিল, খেসারি প্রভৃতি রবিশস্যের বীজ বপন করিলে ফল মন্দ হয় না। কিন্তু আকাশের অবস্থার উপর সব নির্ভর করে। যদি বর্ষা শেষ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, তবেই রবি ফসলের জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত, নচেৎ বৃষ্টিতে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। সচরাচর দেখা যায় যে আশ্বিন মাসের শেষেই বর্ষা শেষ হইয়া যায়, সুতরাং বঙ্গদেশে কার্ত্তিক মাসেই উক্ত ফসলের কার্য্য আরম্ভ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

ধনে।—যেমন তেমন জমি একটু নামাল হইলেই যথেষ্ট পরিমাণে ধনে হইতে পারে।

সুল্পাদি।—সুল্প, মেথি, কালজিরা, মৌরী রাঁধুনি, ইত্যাদি এদেশে ভাল ফলে না; কিন্তু উহাদিগের শাক খাইবার জন্য কিছু কিছু বুনিতে পারা যায়।

কার্পাস।—গাছ কার্পাসের দুই চারিটি গাছ, বাগানের এক পাশে দিয়া রাখিতে পারিলে গৃহস্থের অনেক কাজে লাগে।

তরমুজাদি।—তরমুজাদি, বালুকামিশ্রিত পলিমাটিযুক্ত চর জমিতেই ভাল হয়। যে জমিতে ঐ সকল ফসল করিতে হয়, তাহাতে অন্যান্য সারের সঙ্গে আবশ্যক হইলে কিছু বালি মিশাইয়া দিবে। তরমুজ মাটি চাপা দিলে বড় হয়।

উচ্ছে।—৪।৪ হাত অন্তর উচ্ছের মাদা করিতে হয়, নচেৎ পাইট করিতে ও উচ্ছে তুলিতে কষ্ট হইবে। উচ্ছের বীজ একটী মাদায় ৩।৪টার অধিক পুতিবে না।

পটোল।—পটোলের মূলগুলি প্রথমে গোবরের সার মিশ্রিত অল্পজলে ২।৩ দিন ভিজাইয়া রাখিয়া নূতন কল বাহির হইলেই ভূমিতে পুতিবে। পুনঃপুনঃ খুসিয়া ও নিড়াইয়া দেওয়াই পটলক্ষেত্রের প্রধান পাইট।

পলাণ্ডু।—কলসমেত এক একটী পিঁয়াজ আধ হাত অন্তর পুতিয়া দিবে এবং জমি নিতান্ত শুকাইয়া গেলে মধ্যে মধ্যে জল দিয়া আবার মাটির "যো" হইলে খুঁড়িয়া দিবে।

মটরাদি।—শুটি খাইবার জন্য আশ্বিনের শেষে মটর, বরবটি ও ছোলা বুনিতে হয়। ঘাস নিড়াইয়া দেওয়া ভিন্ন ইহাদের বিশেষ পাইট কিছুই করিতে হয় না।

ক্ষেত্রের পাইট।—যে সকল ক্ষেতে আলু, কপি বসান হইয়াছে, তাহাতে জল দিয়া আইল বাঁধিয়া দেওয়া ভিন্ন এ মাসে উহাদিগের আর কোন পাইট নাই।

ফলের বাগান।—এই সময় কোপাইয়া গাছের গোড়া বাঁধিয়া দেওয়া উচিত।

মরসুমী ফুল বীজ।—সর্ব্বপ্রকার মরসুমী ফুল বীজ এই সময় বপন করা কর্ত্তব্য। ইতিপূর্ব্বে এষ্টার, প্যান্সি, দোপাটী, জিনিয়া প্রভৃতি ফুল বীজ কিছু কিছু বপন করা হইয়াছে, এতদিন বৃষ্টি হইবার আশঙ্কা ছিল, কিন্তু কার্ত্তিক মাসে প্রচুর শিশির পাত হইতে আরম্ভ হইলে আর বৃষ্টির আশঙ্কা থাকে না, সুতরাং এখন আর যাবতীয় মরসুমী ফুল বীজ বপনের কালবিলম্ব করা উচিত নহে।

গোলাপের পাইট।—গোলাপ গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দিয়া এই সময় রৌদ্র ও বাতাস খাওয়াইয়া লইতে হইবে। ২।৪ দিন এই রূপ করিয়া পরে ডাল ছাঁটিয়া গোড়ায় নূতন মাটি, গোবরসার প্রভৃতি দিয়া গোড়া বাঁধিয়া দিলে শীতকালে প্রচুর ফুল ফুটে।

REGISTERED No. C 192.



ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসনের মুখপত্র

কার্ত্তিক, ১৩১৬।

কৃষক

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

দশম খণ্ড,—৭ম সংখ্যা।

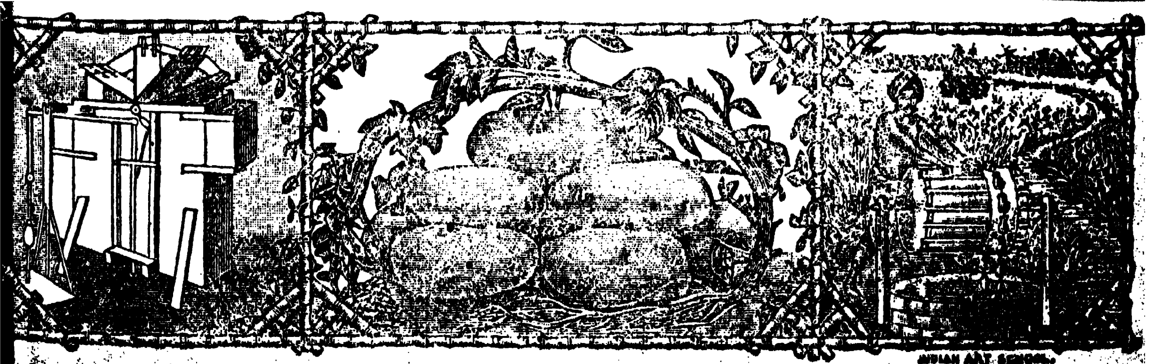


সম্পাদক—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস্।

কার্ত্তিক, ১৩১৬।

কলিকাতা ; ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে
শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা ; ১২৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, দি মিলার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
এস, এইচ, রহমান দ্বারা মুদ্রিত।





কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১০ম খণ্ড। | কার্ত্তিক, ১৩১৬ সাল। | ৭ম সংখ্যা।

তড়কা (Anthrax)

শ্রীকুঞ্জবিহারি দে লিখিত।

সম সংজ্ঞা—চার্ব্বন, তড়কা, পশ্চিমা (বঙ্গদেশ)।

রোগ পরিচয়।—এই ব্যারাম সকল দেশে সমস্ত জন্তুরই হইতে পারে। এই পীড়া মানুষেরও হয়। পশুদিগের মধ্যে গোরুর এই ব্যারাম অধিক মারাত্মক। এই রোগ কাহাকেও একবার আক্রমণ করিলে দ্বিতীয় আক্রমণ প্রায়ই হয় না। কারণ প্রথম আক্রমণে গোরু মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যদিও এই ব্যারামে রোগী প্রায়ই বাঁচেনা কিন্তু গো-বসন্ত অপেক্ষা এই ব্যারাম সচরাচর কম দৃষ্ট হয়। এই রোগ ভয়ানক সংক্রামক। হঠাৎ আক্রমণ, দ্রুত দ্রুত অবস্থার পরিবর্ত্তন ও মৃত্যু ইহার প্রধান প্রধান লক্ষণ। সেবা শুশ্রূষাকালে এই পীড়া মানুষের হইতে পারে।

কারণতত্ত্ব।—এই রোগের বিষ শ্বাস প্রশ্বাস অথবা খাদ্যের সহিত শরীরে প্রবিষ্ট হয়। ঘা থাকিলে তাহাতে বিষ প্রবেশ করিয়া রোগ জন্মাইতে পারে। দূষিত চারণ ভূমি, খাদ্য ও পানীয় রোগোৎপত্তির মুখ্য কারণ। জলাবৃত ভূমিতে চরিয়া অনেক গোরু এক সময়ে রোগগ্রস্ত হয়। আষাঢ় মাস হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত এই রোগ সাধারণতঃ দৃষ্ট হয় কিন্তু বৎসরের যে কোন সময়ে এই রোগ হইতে পারে। এই রোগের অঙ্কুরায়মানাবস্থা কয়েক ঘণ্টা হইতে ৫।৬ দিন পর্য্যন্ত।

লক্ষণ।—এই রোগে রোগী এত হঠাৎ প্রাণত্যাগ করে যে কোন লক্ষণই টের পাওয়া যায় না। রাত্রিতে গৃহস্থ গো-গৃহে গোরু ভাল দেখিয়া আসিল, প্রাতঃকালে গিয়া দেখিল গোরু মরিয়া গিয়াছে। গোরু খাইতেছে কিম্বা চরিতেছে হঠাৎ মাটীতে পড়িয়া গিয়া ২।১ ঘণ্টার মধ্যে প্রাণ-ত্যাগ করিল। মৃত্যুর পরে নাসিকা, মুল ও মল-দ্বার দিয়া রক্ত নিঃসৃত হয়।

এই রোগে যে সকল গোরু ২।১ দিন বাঁচে তাহাদের লক্ষণ নিম্নে বিবৃত হইল। অত্যুগ্র জ্বর ও ভয়ানক উত্তেজিত অবস্থা ইহার প্রথম লক্ষণ। অস্থিরতা, লাথিমারা, গোঁ গোঁ শব্দ করা, দাঁত কিড়মিড় করা ইহার পরবর্ত্তী লক্ষণ। এই সময়ে রোগী ভয়ানক নিস্তেজী হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে পারে। কিন্তু যদি রোগী অধিক সময় বাঁচে তবে রোগী ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে থাকে; শ্বাস-

কৃচ্ছ্র হয়। চক্ষুস্থ ও মুখ গহ্বরস্থ ঝিল্লিবলী লাল দেখায়। কষ্টে পা ফেলিয়া হাঁটে; মাংস পেশীনিচয় কুঞ্চিত ও সম্প্রসারিত হয়। মুখ হইতে লালা ও শ্লেষ্মা নিঃসৃত হয়। রোগী সহজে দুর্ব্বল হয়। পেটবেদনা, উদরাময় ও আমাশয় হয় এবং রোগী যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করে। প্রস্রাব লালবর্ণ হয় ও মলে রক্ত মিশ্রিত থাকে; এই সময়ে রোগী এত দুর্ব্বল থাকে যে শুইয়া থাকিতে ভালবাসে। সময়ে সময়ে রোগী কাঁপিয়া কাঁপিয়া মাটিতে পড়িয়া যায় এবং তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

বাহ্যিক লক্ষণ।—স্থানে স্থানে কঠিন সীমাবদ্ধ স্ফীতি দেখিতে পাইবে। প্রথমে উহাতে অতিশয় বেদনা হয় এবং বর্ত্তুলাকার ধারণ করে। এই স্ফীতি শরীরের যে কোন অংশে হইতে পারে; কিন্তু সচরাচর কণ্ঠে, গলায়, কাঁধে অথবা পেটের উপরিভাগে হয়। পরে স্ফীত স্থান শীতল হয়, উহাতে বেদনা থাকে না এবং উহা পচে। রোগী জ্বরে ভুগিতে থাকে; গিলিতে পারে না; শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট অনুভব করে। শরীরাভ্যন্তরাপেক্ষা বাহিরে এই রোগ প্রকাশ পাইলে তত মারাত্মক হয় না।

ভোগকাল।—কয়েক ঘণ্টা হইতে ৫।৬ দিন পর্য্যন্ত। সচরাচর ২।১ দিন মধ্যে কিম্বা তাহাপেক্ষা অল্প সময়ের মধ্যে রোগীর মৃত্যু ঘটে।

ভাবীফল।—সন্তোষজনক নহে। শতকরা ৮০।৯০ হইতে ১০০ পর্য্যন্ত রোগীর মৃত্যু ঘটে। পীড়া অধিকক্ষণ স্থায়ী হইলে কোন কোন রোগী বাঁচে এবং তাহাদের চিকিৎসা করিবে।

চিকিৎসা।—বলকারক পথ্য যথা ছাতু, ফেন, ভাত ইত্যাদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খাইতে দিবে। রোগীকে আভ্যন্তরিক বিষ দোষনাশক ও উত্তেজক ঔষধ খাওয়াইবে। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে জোলাপ দিয়া বাহ্যে করাইবে। অতি বিরেচক জোলাপ দিবে না। পানীয় জলের সহিত ⁄০ ছটাক লবণ ও ৷১০ কাঁচ্চা সোরা প্রত্যহ পান করিতে দিবে। রোগীকে ৷১০ কাঁচ্চা পরিমাণ তার্পিন তৈল অথবা ৷১০ কাঁচ্চা পরিমাণ কার্ব্বলিক এসিড ⁄১½ সের ফেনের সহিত মিশাইয়া খাওয়াইয়া দিবে ও পরে নিম্নলিখিত আভ্যন্তরিক বিষঘ্ন ও উত্তেজক ঔষধ প্রতি ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইবে।

সোহাগা	...	... ১ তোলা
কর্পূর	...	... ১ তোলা
দেশী মদ	...	... ৵০ পোয়া
কার্ব্বলিক এসিড	...	... ৬০ ফোঁটা
ফেন	...	... ⁄১ সের

রোগীর অবস্থা ক্রমশঃ ভাল হইলে ঔষধ ও ১ ঘণ্টা অন্তর দিতে হইবে।

বাহ্যিক চিকিৎসা।—স্ফীত স্থান উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা পোড়াইয়া দিবে ও পরে উহাতে মিঠা তেল লাগাইবে।

টিকা।—এই রোগের নিবারক টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হইয়াছে। রোগের আবির্ভাব হওয়া মাত্র রাজদ্বারে আবেদন করিবে।

মাংস ও দুগ্ধ।—এই রোগের পীড়িত গোরুর মাংস ও দুগ্ধ মানুষের অভক্ষ্য; খাইলে রোগগ্রস্ত হইবে।

প্রতিবাধাত্মক চিকিৎসা।—সংক্রামক রোগের প্রতিবিধানোপযোগী নিয়ম গুলি সম্যক রূপে পালন করিবে।

কপির কীট রোগ।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু লিখিত।

গত পূর্ব্ব আশ্বিন মাসে আল্‌জিয়ার্স ফুলকপি এবং লেট্‌ড্রামহেড্‌ বাঁধাকপির বীজ আনিয়া গামলায় চারা দেওয়া হয়। যথোপযুক্ত নিয়মে চারা প্রস্তুত করিয়া, ২রা নভেম্বর তারিখে চারাগুলি ক্ষেত্রে রোপণ করা হইয়াছিল। ক্ষেত্রে চৈত্র মাসে পচা পাঁক মাটী বিঘা প্রতি ৬০ গাড়ি ছড়ান ছিল, পরে তাহাতে ১৫।২০ দিন অন্তর "শিবপুর লাঙ্গলে" ৫।৬ বার চাষ দেওয়া হইয়াছিল। পরে জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যভাগে ঐ ক্ষেত্রে পাট বুনা হইয়াছিল। বিঘা প্রতি ৭/০ মণ উৎকৃষ্ট পাট পাওয়া গিয়াছিল। ভাদ্র মাসে পাট কাটিবার পর সমস্ত জমিটা ১ বার উত্তমরূপে কোপান হইয়াছিল। পরে ৬।৭ দিন অন্তর জমিতে "যো" হইলে শিবপুর লাঙ্গল দ্বারা জমি চসা হইত। এইরূপে জমি প্রস্তুত হইলে, সমস্ত জমিতে ২॥০ ফিট্‌ অন্তর দাঁড়া টানা হইয়াছিল। দাঁড়ার পার্শ্ববর্ত্তী জুলিতেও ২॥০ ফিট্‌ অন্তর ১।১টি খোপ খুঁড়িয়া, প্রত্যেক খোপে ১ মুষ্টি পরিমাণ শরিষার খৈল, ১ মুষ্টি শুষ্ক ঘুঁটের গুঁড়া, এবং আন্দাজ ২ তোলা পরিমাণ শুঁট্‌কী মাছের গুঁড়া একত্রে ঐ খোপের মাটীর সহিত উত্তমরূপে মিশাইয়া দিয়াছিলাম। ১০।১৫ দিন পরে যখন ঐ খৈল এবং শুঁটকী মাছ পচিয়া মাটীর সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল তখন প্রত্যেক খোপে কপির চারা রোপণ করা হইয়াছিল (২রা নভেম্বর তারিখে)। পরে আবশ্যক মত জল সেচন করা, কোপান ও দাঁড়া ভাঙ্গিয়া গাছের গোড়ায় মাটী দেওয়া হইয়াছিল। এমতে সর্ব্বশুদ্ধ ৫ বার জল সেচন করা এবং ৪ বার কোপান হইয়াছিল। মোটের উপর ক্ষেত্রে চারা রোপণ করার ঠিক ২ মাস পরেই, সর্ব্ব প্রথমে ফুলকপি ক্ষেত্র হইতে উঠান হয়।

ফুলকপি অতি সুন্দর এবং বৃহৎ আকারের জন্মিয়াছিল, আকারে ফুলের ব্যাস ১ ফুটেরও কিছু উপর বড় হইয়াছিল, ফুলের মাথা অত্যন্ত নিরেট এবং সমান্‌ হইয়াছিল। আস্বাদনে বাজারের কপি অপেক্ষা সুমিষ্ট এবং সদ্গন্ধবিশিষ্ট হইয়াছিল। তখন হাটে বাজারে অন্যান্য কপির খুব আমদানা থাকা সত্ত্বেও ক্রেতাগণ সাগ্রহে এক একটা কপি তিন আনা, সাড়ে তিন আনা দামে ক্রয় করিত এবং ঐ প্রকার কপি প্রস্তুতকারী চাষার নাম কি এবং কোথায় চাষ হইয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া যাইত। অনেকে কুটুম্ববাড়ি তত্ত্ব পাঠাইবার জন্য আমার ক্ষেত্রের কপি কিনিতে আসিত। ২৪-পরগণা, বারাসত এবং বসিরহাট প্রদর্শনীতে উক্ত কপি প্রদর্শন করিয়াছিলাম এবং উক্ত কপির জন্য পুরস্কারও পাইয়াছিলাম।

গত ১৩১৫ সালের ফাল্গুন মাসের নবম খণ্ড ১১শ সংখ্যা কৃষক পত্রিকার ২৫৭ পৃষ্ঠায় জেলা খুলনা, চন্দনপুর গ্রামের জমিদার শ্রীযুত জগৎপ্রসন্ন রায় মহাশয় তাঁহার কপি ক্ষেত্রে যে কীটের উপদ্রব অনুভব করিয়াছিলেন, এবং উক্ত কীটের বিষয় কতকগুলি প্রশ্ন করিয়াছিলেন। কপির চাষে কীটের উপদ্রব সম্বন্ধে বিশেষ আবশ্যকীয় এবং পরীক্ষিত কয়েকটি বিষয় লিখিলাম।

জগৎপ্রসন্ন বাবু লিখিয়াছিলেন যে, ক্ষেত্রে গোময় এবং পাঁক মাটী ছড়াইয়া দিয়া পরে চারা রোপণ করা হইয়াছিল, কিন্তু গাছে ফুল ধরিবার সময় এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পলুপোকার (রেশম

কীট) ন্যায় ক্ষুদ্র কীটে সমস্ত গাছের পাতা ও ভিতরের কোমল অংশ খাইয়া ফেলে, ভিতরের কোমল ডগার পোকাগুলির রং দেখিতে সাদা এবং পাতার পোকায় রং সবুজ।

এই কীট আমার কপিক্ষেত্রেও প্রতিবৎসর দেখা যায়; সুধু আমার ক্ষেত্রে বলি কেন? বোধ করি অনেকেরই ক্ষেত্রে ঐ কীট দেখা যায়। পোকাগুলি ছোট অবস্থায় গাছের শ্বেত রং বিশিষ্ট অতি কোমল অংশে যায়; তখনই উক্ত কীটের রং সাদা থাকে, পরে ঐ কীট একটু বড় হইলেই গাছের সবুজ রং বিশিষ্ট বড় বড় পাতা খায় এবং সেই সময়ই উক্ত কীটের রং সবুজ বর্ণের দেখায়। কিন্তু কীটের স্বাভাবিক গায়ের রং প্রায় সাদা এবং গাত্রাবরণ অতি পাতলা এবং স্বচ্ছ; এ কারণ সবুজ রং বিশিষ্ট পাতা খাইলে ক্রমে কীটের গায়ের রংও ঠিক সবুজ বর্ণের কপি পাতার রংএর ন্যায় হয়। ইহাতে অনুমান করি যে, উক্ত কীটের ভক্ষিত দ্রব্যের রং গায়ে ফুটিয়া বাহির হয়। এমনও দেখিয়াছি যে, সবুজ রংএর অর্থাৎ বড় কীট ধরিয়া রাখিয়া তাহাকে ক্রমাগত ৫।৬ দিন কপির পাতার কোমল শ্বেত রংএর অংশ খাইতে দেওয়াতে উক্ত সবুজ বর্ণের কীটের রং ক্রমে সাদা ফাঁকাশে হইয়া যায়। জগৎপ্রসন্ন বাবু যে যে প্রকারের কীটের উল্লেখ করিয়াছেন, প্রকৃত পক্ষে উহারা বিভিন্ন নহে, একই কীট; লেদা পোকার শাবকগণ মাত্র। জগৎপ্রসন্ন বাবু লিখিয়াছেন যে এক মাছিতা পোকা ছাড়া, অন্য কোন কীটের এত শীঘ্র এ প্রকার বংশ বৃদ্ধি হয় কি না জানি না। যাহা হউক এই কীট যে মাছিতা পোকা নহে ইহা স্থির নিশ্চয়; বিশেষ রূপে দেখিয়াছি যে, উক্ত কীটগণের মাতা সন্ধ্যাকালে কপি ক্ষেত্রে উড়িয়া আসিয়া কপি পাতার নিম্ন পৃষ্ঠে সুজির ন্যায় ক্ষুদ্র শ্বেত বর্ণের অধিক সংখ্যক ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে। উক্ত ডিম্ব গুলি কপি পাতার সহিত বেশ দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হইয়া থাকে। পরে ২।৩ দিনের মধ্যে ডিম্বগুলি ফাটিয়া গুলি সুতার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডের ন্যায় প্রায় ⅛ ইঞ্চ লম্বা শাবক বাহির হয়। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া প্রথমে কপি পাতার শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট অতি কোমল অংশ খাইতে থাকে। পরে একটু বড় হইলেই বড় বড় সবুজ পাতা উদরস্থাৎ করে। সাধারণতঃ ক্ষেত্রস্বামী ইহার পূর্ব্বে তাঁহার ক্ষেত্রে কীটের উপদ্রব সম্বন্ধে কিছু অনুভব করিতে পারেন না। বিশেষতঃ কপি ক্ষেত্রে গিয়া প্রত্যেক গাছের প্রত্যেক পাতা অনুসন্ধান করিয়া কীটের উপদ্রব কোথায় কোন গাছে হইতেছে কি না, তাহা সন্ধান পূর্ব্বক উপদ্রব নিবারণ করিতে চেষ্টা করা অসম্ভব।

কিন্তু ক্ষেত্রের ভিতর প্রবেশ না করিয়া দুর হইতে কোথায় এবং কোন গাছটিতে উক্ত কীটের উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে তাহা জানিবার একটি বিশেষ উপায় এই যে, গাছের পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইবার অনতিপূর্ব্ব হইতে প্রত্যহ দিনের বেলায় ২।৩ বার অন্ততঃ ১০ মিনিট সময় ক্ষেত্রের মধ্যে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবেন (বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে) যে স্থানে স্থানে শ্বেত বর্ণের (ছোট প্রজাপতি) লেদা পোকা উড়িতেছে এবং কখন বা গাছে বসিতেছে। তৎক্ষণাৎ তথায় গিয়া পার্শ্বস্থ ২।১টী গাছ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবেন যে, কোন না কোন পাতায় উক্ত লেদা পোকার শাবকগণ দলবদ্ধ হইয়া অথবা অন্ততঃ একটীও কপি পাতা খাইতেছে। উক্ত লেদা পোকার স্বভাব এই যে, যেখানে তাহারা ডিম্ব প্রসব করে অথবা শাবকগণ থাকে, তৎসন্নিকটে তাহারা প্রায় সর্ব্বক্ষণ থাকে, কেবল মধ্যে মধ্যে এক একবার নিজেরা আহারান্বেষণে বাহির হয়,

কিন্তু আবার অনতিবিলম্বেই আসিয়া শাবকগণ সন্নিকটে উড়িতে থাকে।

এই প্রকার সন্ধান দ্বারা প্রায় সর্ব্বত্রই কৃতকার্য্য হওয়া যায়। আরও দেখিয়াছি যে, শত্রু কীট কর্তৃক আক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে কপি গাছগুলি যখন ফুল হইবার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ গাছগুলির পূর্ণ বৃদ্ধির সময় কালে (উপদ্রব ও ঐ সময় আরম্ভ হইতে দেখা যায়) সন্ধ্যার পরে ক্ষেত্রের মধ্যে ২০।২২ হাত অন্তর লণ্ঠনে করিয়া ১।১টী আলো দিতে হইবে, ঐ লণ্ঠনের নিম্নে কোন পাত্রে বিষাক্ত তরল পদার্থ থাকা আবশ্যক।

আমরা যে প্রকার করিয়াছিলাম নিম্নে তাহা লিখিতেছি :—ক্ষেত্রের মধ্যে ২০।২২ হাত অন্তর ১।১টী মোটা কলা গাছের খণ্ড দীর্ঘে ১ ফুট্ উচ্চ এমন করিয়া কাটিয়া ক্ষেতের মধ্যে মধ্যে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছিলাম। তাহার উপর মাটীর ডিস্ অর্থাৎ থালা যাহা ১ পয়সায় ২ খানা পাওয়া যায়, তাহা রাখিয়াছিলাম। তাহাতে কেরোসিন্ তৈল এবং তৎসহিত ফিনাইল্ মিশ্রিত করিয়া তরল বিষ-পদার্থ ঢালিয়া রাখিয়াছিলাম। তাহার উপর আলো সমেত ছোট লণ্ঠন রাখিতাম, উক্ত তরল বিষ-পদার্থ এমত অল্প পরিমাণ দিতাম যাহাতে লণ্ঠন রাখিলে কেবলমাত্র তাহার ক্ষুদ্র পায়া ৪টী সামান্য ডুবিয়া থাকে। এস্থলে উল্লেখ আবশ্যক যে, আমরা আলোতে এমত পরিমাণ তৈল দিতাম যে, যাহাতে রাত্র ১০টা পর্য্যন্ত জ্বলিতে পারে। রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত জ্বলিলেই আমাদের অভিষ্ট সিদ্ধ হইবার পক্ষে যথেষ্ট উপযোগী হইবে। তাহার বেশী তৈল দিয়া আরো বেশী রাত্রি পর্য্যন্ত আলো জ্বালাইলে অনর্থক তৈল ব্যয় হয় মাত্র, কিন্তু বেশী কিছু উপকার পাওয়া যায় না।

কপি ক্ষেত্রে উল্লিখিত প্রথায় আলো রাখিয়া এই মহোপকার পাওয়া যায় যে, সন্ধ্যার পরে উক্ত লেদাপোকাগুলি যখন কপি ক্ষেত্রে আগমন করিবে তখন যদি তাহারা ক্ষেত্রের মধ্যে আলো দেখিতে পায় তবে তৎক্ষণাৎ তাহারা অতি ব্যস্ততার সহিত এমন কি যেন ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়াও ঐ আলোযুক্ত লণ্ঠনের উপর বসিতে যায়, এবং প্রায়ই ঐ লণ্ঠন নিম্নস্থ তরল বিষে পড়িয়া প্রাণ হারায়। এই উপায়ে সেই দিন ক্ষেত্রে যত লেদাপোকা থাকে সকল গুলি যেন মন্ত্রের ন্যায় আলোক সন্নিধানে আসিয়া বিষে ডুবিয়া মরিয়া যায়। আর রাত্রি ১০ টার বেশী আলো জ্বালিয়া রাখায় লাভ নাই ; তাহার কারণ এই যে, প্রজাপতি জাতি লেদাপোকাদিগের কোমল পক্ষ দুইটী অধিক রাত্রিতে শিশিরে এত ভিজিয়া যায় যে, তাহারা তৎকালে বৃক্ষ পত্রের নিম্ন দেশে ঠিক মৃতপ্রায় হইয়া থাকে এবং অধিকাংশই গাছের গোড়ার দিকে আসিয়া থাকে, এই অবস্থায় তাহারা তৎপর দিন বেশ রৌদ্র না উঠা পর্য্যন্ত থাকে। রৌদ্র উঠিলে তাহাতে পক্ষ দুইটি শুকাইয়া গেলে তখন উড়িয়া যায়। অতএব বেশী রাত্রিতে এমতাবস্থায় তাহারা আর আলোর নিকট উড়িয়া আসিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইয়া থাকে। এই কীটের শত্রু :—

শিশির—সিক্তাবস্থায় যখন প্রাতঃকালে তাহারা কপি গাছের গোড়ার দিকে মৃতাবস্থায় থাকে,

তখন পেচক জাতীয় এক প্রকার পক্ষী দলবদ্ধ হইয়া ক্ষেত্রে গিয়া গাছের ভিতরে ভিতরে মাটীতে বিচরণ করে এবং ঐ লেদাপোকাগুলিকে খাইয়া ফেলে। রাত্রিতে ভেকেও ঐ পোকা অনেক খায়। গিরগিটি, টিকটিকি ও ঐ কীটের বিশেষ শত্রু আর সব প্রধান শত্রু টুনটুনি পক্ষী, ইহারা অতি ক্ষুদ্র জাতীয় পক্ষী এ কারণ গাছের পাতায় বসিলেও পাতা ভাঙ্গিয়া যায় না; একারণ ইহারা পাতায় যে কীটের ডিম থাকে তাহা খায় এবং অতি ক্ষুদ্র কীটের শাবক হইতে বড় বড় কীট পর্য্যন্ত খাইয়া ফেলে।

জগৎপ্রসন্ন বাবু লিখিয়াছেন যে, ফিনাইল সাবান জল প্রভৃতিতে কাজ হয় না, একথা যথার্থ। আবার আরক তেজাল করিয়া দিলে গাছ মরিয়া যায় একথাও সম্পূর্ণ সত্য এবং পরীক্ষিত। যেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলবদ্ধ কীট থাকে তথায় লবণ চূর্ণ ছড়াইয়া দিলে কীটগুলি মরিয়া যায় এবং গাছেরও কোন ক্ষতি হয় না। কপি পাতা হইতে পোকাগুলি বাছিয়া ফেলার যন্ত্রের মধ্যে একটু শক্ত রকমের ব্রাশ দ্বারা অথবা সূক্ষ্ম চিমটা দ্বারা বেশ কাজ হয়।

কপির কীট সম্বন্ধে যাহা লিখিলাম এগুলি আমার নিজ পরীক্ষিত।

কার্পাস চাষ।

পাট বা নালিতা।

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত, এম,আর,এ,সি লিখিত।

৫ম অধ্যায়—পাটের কাণ্ডের স্তরভেদ ও পণ্য আঁস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

৩৪। আঁস ও ঘোলা (Phoem and Xylem).

গাছের গায়ের এই ছাল (cortex) ভাগ নখ দ্বারা চাঁচিয়া ফেলিয়া দিলেই তাহার ভিতরের আঁস চক্রটি (bast fibre) দৃষ্টিগোচর হয়। এই আঁস-চক্রের আঁসগুলি গুচ্ছাকারে অবস্থিত দেখা যায়; এবং জীবিত গাছের গায়ে এই সকল আঁসগুচ্ছ নানাপ্রকার আটাল এবং কাষায় পদার্থ (gums, resins, waxes, pectin bodies) দ্বারা পরস্পর দৃঢ়সংলগ্ন। জীবন্তগাছের এই আঁস চক্রটি পৃথক করিয়া হাতে লইয়া দেখিলে ঠিক চামড়ার মত মনে হয়। ইহার ভিতরের দিক ভাল করিয়া দৃষ্টি করিলে প্রত্যেক পর্ব্বমধ্যে (nodes) এক এক স্থানে ছিদ্র দৃষ্ট হয়। এই সকল ছিদ্রই পত্র ও অঙ্কুরের সমাবেশ স্থান। বাজারের কিনা পাটের ও দিকে দৃষ্টি করিলে এ সকল ছিদ্র দৃষ্ট হয়। এই সকল ছিদ্রের ভিতর দিয়াই কাণ্ড হইতে আঁস ও শিরা সকল বাহির হইয়া পত্রের শিরা (veines) রূপ ধারণ করে। সিদ্ধ করা কাণ্ডের একটি খণ্ডের ঘোলাভাগটি (xylem or wood) মাত্র গ্রহণ করিয়া যদি তাহা সমানে লম্বালম্বি দুই ভাগ করিয়া ভিতরের শাঁসটি ফেলিয়া দিয়া ঘোলাটির প্রতি দৃষ্টি করা যায় তবে ঘোলার গায়ে ও পর্ব্বস্থানে (nodes) ঐরূপ শিরা নির্গমনের ছিদ্র দৃষ্ট হয়।

৩৫। আঁস ও শিরাচক্র (Fibro-Vascular bundle sheath)

আঁসচক্র (Phloem or bast), জননচক্র (cambium) এবং যোলা (xylem or wood) এই তিনটিই একত্রে আঁস-শিরাচক্র (Fibro-vascular bundle) নামে অভিহিত হয়। বস্তুতঃ গাছের সমস্ত স্থায়ী অংশই আঁস দ্বারা গঠিত। এজন্য আঁস উদ্ভিদ্‌দেহের অস্থি স্থানীয় বলা যায়। উদ্ভিদ্‌দেহের যাবতীয় পদার্থই আঁস নির্ম্মিত কোষের ভিতরে অবস্থিত। কলাগাছ কি কচুগাছের কোষগুলি গাছ কাটিলে চক্ষু দ্বারাই দেখা যায় কিন্তু পাট প্রভৃতি গাছের কোষ দেখিতে হইলে ক্ষুর দ্বারা পাতলা করিয়া কাটিয়া অণুবীক্ষণে বসাইয়া দেখিতে হয়। তাহাতে পূর্ব্ব কথিত নানাপ্রকার কোষযুক্ত চক্রগুলিও দেখা যায়। আঁস তিন প্রকার বলা যায় ঃ—সূত্র আঁস (cellulose), (২) কাষ্ঠ আঁস (lignose), এবং (৩) মিশ্র আঁস (ligno-cellulose)। কার্পাসের তুলাই বিশুদ্ধ সূত্র আঁসের (cellulose) দৃষ্টান্তস্থল। বৃক্ষাদির কাষ্ঠ কাষ্ঠ আঁসের দৃষ্টান্ত। পাটের আঁস মিশ্র আঁসের (ligno-cellulose) দৃষ্টান্ত। সূত্র আঁস ($C_{12}H_{20}O_{10}$) সাদা, কোমল অথচ শক্ত, মসৃণ, এবং স্থিতিস্থাপক, এবং ইহার ভিতর দিয়া জল উপরে উঠিতে পারে (অর্থাৎ ইহার capillarity আছে)। কাষ্ঠ-আঁসে অঙ্গারের ভাগ অধিক। ইহা শক্ত হইলেও ভঙ্গ-প্রবণ, এবং কর্কশ। ইহার স্থিতিস্থাপকতা নাই এবং ইহা জল টানিতে অক্ষম। পাট মিশ্র আঁস গঠিত বলিয়া বয়ন কার্য্যের তত উপযোগী নয়। পাটের যোলাটি কাষ্ঠ আঁস গঠিত এবং ইহার ভিতর দিয়া নানাপ্রকার শিরা অথবা রস চলাচলের শিরার (petted, vessels, spiral vessels) আমাদের রক্ত চলাচলের শিরার (artery) ন্যায় গাছের শিকড় হইতে উর্দ্ধদিকে পত্র ও অঙ্কুর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র বিস্তৃত এই সকল শিরা দ্বারা প্রবাহিত হইয়া ভূমিস্থিত রস গাছের পত্র ও অঙ্কুর পর্য্যন্ত আপাদ মস্তক সঞ্চালিত হয়, এবং পত্রাদির সবুজবর্ণ পদার্থ (chlorophyll) যুক্ত অঙ্গ সকল বায়ু ও আলোর যোগে পাকস্থলীর ন্যায় কার্য্য করিয়া সেই রস প্রভৃতিকে ময়দা, (starch) চিনি, তৈল আঁস ইত্যাদি নানাপ্রকার ঔদ্ভিদ পদার্থে পরিণত করে। আবার সেই সকল উৎপন্ন ঔদ্ভিদ-পদার্থ চিনি প্রভৃতির তরল আকারের জনন-চক্র এবং তাহার বহিঃস্থিত আঁস চক্র ও বল্কলের ভিতর দিয়া আবার বিপরীত দিকে শিকড় পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র বিস্তৃত হয় এবং পাট প্রভৃতি গাছের জনন-চক্রের ভিতরের দিকে যোলা এবং বাহিরের দিকে আঁস ও বল্কলে পরিণত হয়, অথবা আলু কচু প্রভৃতিতে ময়দার (starch) আকারে মাটির নীচে এবং ধান গম প্রভৃতিতে ময়দার আকারে ফলের মধ্যে সঞ্চিত হয়।

৩৬। পাটের আঁসের দোষ গুণ।

পাট গাছের আঁসই কৃষকের উপাদেয় শস্য। এই আঁসের দোষ গুণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকা আমাদের কর্ত্তব্য। আমরা সচরাচর যে পাটের আঁস দেখিতে পাই তাহা ৪৫ হাত লম্বা ৭।৮ হাত লম্বা পাটের আঁসই বুঝায়। পাট যত বেশী লম্বা হয় ততই অধিকতর চিক্কণ ও মসৃণ হয়। যে পাটের রং পরিষ্কার সাদা বা ঈষৎ হরিদ্রাভাযুক্ত এবং রেশমের মত উজ্জ্বল ও মসৃণ, কোমল অথচ দৃঢ়, সূক্ষ্ম এবং লম্বা আঁসগুলি সব সমান, সেই পাটই বাজারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত। যে পাটের রং ময়লা, আঁস অসমান, মোটা ও কর্কশ,

এবং অধিক পরিমাণে কাষ্ঠ আঁস (lignose) সংযুক্ত ও ভঙ্গপ্রবণ, অথবা গোড়ার দিকে অধিক পরিমাণে সূত্রাকারে শিকড়গুচ্ছযুক্ত সেই পাটই বাজারে নিকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত। তিসি (flax) ও ভাঙ্গের (hemp) তুলনায় নালিতা পাটে কাষ্ঠ আঁসের ভাগ অধিক এবং সেই কারণে ইহা অধিকতর ভঙ্গপ্রবণ এবং বয়ন কার্য্যের অপেক্ষাকৃত কম উপযোগী। বিলাতে যাহারা বয়ন কার্য্যে নালিতা পাট ব্যবহার করে তাহারা ঐ পাটের গোড়ার সুত্র শিকড়যুক্ত অংশ ছাটিয়া ফেলিয়া বাকি অংশ মাছের তেলে (whale oil) ও জলে * মিশাইয়া তাহাতে ভিজাইয়া রাখিয়া পরে যাঁতার ভিতর দিয়া চালাইয়া অনেকটা নরম করিয়া লয়। পাটের একটি বিশেষ গুণ এই যে ইহা নানাপ্রকার রং গ্রহণ করিতে পারে, এবং এই জন্যই বিলাতে রেশমাদির সহিত ভেজাল দিবার জন্য ইহা অনেক পরিমাণে ব্যবহার হইয়া থাকে। পাটের জল গ্রহণ করিবার শক্তি (Hygroscopicity) অত্যন্ত প্রবল এবং শুষ্ক অবস্থায়ও পাটের মধ্যে প্রায় শতকরা ১০।১১ ভাগ জল থাকে, এবং সিক্ত বায়ুতে পাট রাখিলে তাহাতে প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ পর্য্যন্ত জল পাওয়া যায়। পাটের প্রধান দোষ এই যে ইহা জল লাগিলে সহজেই পচিয়া যায়, কারণ ইহার আঁস মিশ্র সূত্র ও কাষ্ঠ আঁস (ligno-cellulose)। এজন্য রৌদ্রে শুকাইবার সময় সতর্ক থাকিতে হয় যেন বৃষ্টি পড়িয়া তাহা ভিজিয়া না যায়। কার্পাসের তুলনায় পাটের আঁস অনেক নরম এবং সামান্য জল উত্তাপাদির ক্রিয়াতেই পচিয়া নষ্ট হয়। কাষ্ঠ আঁস মিশ্রিত আছে বলিয়াই নালিতা পচাইয়া এত সহজে তাহার আঁস বাহির করা যায়। অর্থনৈতিক সচিবের (Economic Reporter) অধীনে পাটের ভার বহন শক্তির (tension) পরীক্ষা হইয়া দেখা গিয়াছে যে দুই হাত লম্বা এক তোলা ওজনের এক কোষ পাট সচরাচর দেড়মণ পর্য্যন্ত ভার বহন করিতে পারে। কোন কোন স্থলে দুই মণ পর্য্যন্ত ভার বহন করিতে দেখা গিয়াছে। অনেক পূর্ব্বে ডাক্তার রকসবরা তিতা পাট, মিঠা পাট এবং শণ পাটের শুষ্ক এবং আর্দ্র উভয় অবস্থার ভার বহন শক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, তিতা পাট শুষ্ক এবং আর্দ্র উভয় অবস্থায় ১৬৪ পাউণ্ড (৮২ সের), মিঠা পাট শুষ্ক অবস্থায় ১১৩ পাউণ্ড (৫৬½ সের) এবং আর্দ্র অবস্থায় ১২৫ পাউণ্ড (৬২½ সের) পর্য্যন্ত ভার চাপাইলে ছিঁড়িয়া পড়ে। শণ পাট শুষ্ক অবস্থায় ১৫০ পাউণ্ড (৮০ সের) এবং আর্দ্র অবস্থায় ২০৯ পাউণ্ড (১০৪½ সের) পর্য্যন্ত ভার চাপাইলে ছিঁড়িয়া পড়ে। বোধ হয় তিনিও এক তোলা দুই হাত লম্বা পাট লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

৩৭। পাটের আঁসাণু।

আমরা এক কোষ পাট হাতে লইয়া তাহা হইতে একটি মাত্র আঁস পৃথক করিয়া পরীক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়া দেখিতে পাই যে, সচরাচর আমরা যাহাকে একটি মাত্র পাটের আঁস মনে করি, তাহাও একটু সতর্কতার সহিত নখাগ্র দ্বারাই পৃথক পৃথক আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঁসে বিভক্ত করা যায়; যেন একটা আঁসাণু আর একটা আঁসাণুর গায়ে এক প্রকার আটা দ্বারা সংযুক্ত হইয়া একটি বড় আঁসের আকার ধারণ করিয়াছে। চলিত ভাষায় যাহাকে পাটের 'ফেউ' বা 'ফেউয়া' বলা

* Whale oil about 4 or 5 seers is mixed with water about 12 seers for moistening each bale of 5 maunds of jute.

হয়, এগুলিও কতকগুলি আঁসাণুরই সমষ্টি। ব্লীচিং পাউডার-(bleaching powder) যুক্ত জলে পাট কিছুদিন ভিজাইয়া রাখিয়া আমরা দেখিলাম আঁসগুলির গোড়া গলিয়া গিয়া অনেকটা 'ফেউ' বাহির হইয়া পড়িল। ক্ষার জলে এবং অম্ল জলে অনেক কাল সিদ্ধ করিলে * আমাদের নালিতা পাটও কাপাসের তুলার মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঁসাণুতে বিভক্ত হইয়া যায়। এই আঁসাণুর ১০।১২টি পরস্পর সমাবিষ্ট করিলে হয় ত দুই তিন আঙ্গুল মাত্র লম্বা হইবে। অণুবীক্ষণ দ্বারা দৃষ্টি করিলে দেখা যায় এক একটি আঁসাণু ক্ষুদ্র নলের মত, পার্শ্বদ্বয় সরু (spindle-shaped), ভিতর ফাঁপা। জীবিত গাছে এই আঁসাণুগুলি নানাপ্রকার রসপূর্ণ আঁস কোষের (cell) বহিরাবরণরূপে অবস্থিত ছিল, এবং ঐ সকল আঁসকোষের বহিরাবরণ যেন একটার গায় আর একটা যোড়া লাগিয়া আমাদের সুপরিচিত দীর্ঘাকার পাটের আঁসের রূপ ধারণ করিয়াছে।

৩৮। ক্ষার জলে পাটের রং শোধন।

বিলাতের পাট ব্যবসায়ীদের অনুরোধে আমাদের দেশে পাটের আঁস সম্বন্ধে সরকার পক্ষে যাহা কিছু রাসায়নিক পরীক্ষা হইয়াছে, তদ্দ্বারা কৃষকের গ্রহণযোগ্য কোন তথ্য আজ পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হয় নাই। অনুরাগের কার্য্য এবং পয়সার কার্য্য স্বর্গ মর্ত্ত্য তফাৎ। আমাদের দেশের রাসায়নিক পরীক্ষাগুলি যেন সকলই খাপছাড়া, ব্যক্তি বিশেষের খেয়ালের অধীন। একজন রাসায়নিকের হয়ত খেয়াল হইল, আর তিনি দুই একটা পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। বিশেষ কোন সিদ্ধান্তে পঁহুছিতে না পঁহুছিতেই হয়ত তাঁহার অন্য খেয়াল হইল, অথবা তাঁহার পদোন্নতি হইয়া তিনি অন্য কার্য্যে চলিয়া গেলেন। তাঁহার আরব্ধ রাসায়নিক পরীক্ষারও শেষ হইল। তিনি যদি বিলাতের দিকে অগস্ত্য যাত্রা (অবশ্য দিক ভুলিয়া) করেন, তবে ত আর কথাই নাই। জলের মত এদেশের পয়সা খরচ করিয়া তিনি যে অভিজ্ঞতা টুকু লাভ করিলেন, এদেশ তাহার ফল হইতে ষোল আনাই বঞ্চিত হইল। দৃষ্টান্ত স্থলে ডাক্তার ওয়াট (Watt), ডাক্তার বর্কিল (Burkill) বা ডাক্তার প্রেইনের (Prain) নাম করা অসঙ্গত হইবে না। পাটের আঁসের রং পরিষ্কার করিবার জন্য রাসায়নিক উপায় উদ্ভাবনের সূচনা মাত্র হইয়াছিল। অর্থনৈতিক সচিবের অধীনে ক্ষার জল দ্বারা পাটের রং শোধনের কয়টি পরীক্ষা হইয়াছিল:—যথা (১) পচন ক্রিয়া সমাপন হইবামাত্র কতকগুলি পাটের আঁস লইয়া শতকরা ২ ভাগ সোডা সালফেট (sodium sulphate) যুক্ত জলে ১০ মিনিট কাল ভিজাইয়া রাখা হইয়াছিল; (২) কতকগুলি পাট আবার ঐ জলে ৩০ মিনিট কাল ভিজাইয়া রাখা হইয়াছিল। পরে (১) এবং (২) পরীক্ষার পাটের ঐ ক্ষার জল নিঙ্‌ড়াইয়া, ভাল জলে ধুইয়া নিঙ্‌ড়াইয়া রৌদ্রে শুকান হইয়াছিল। (৩) পচন ক্রিয়া সমাপন মাত্র আর কতকগুলি পাট লইয়া শতকরা ২ ভাগ সোডা (sodium carbonate) যুক্ত জলে কিছু কাল ভিজাইয়া পরে ঐ ক্ষার জলে কিছুকাল সিদ্ধ করিয়া ঠাণ্ডা হইলে পর, ঐ ক্ষার জলে নিঙ্‌ড়াইয়া, ভাল জলে ধুইয়া নিঙ্‌ড়াইয়া ঐ পাট রৌদ্রে শুকান হইয়াছিল। (১), (২) এবং (৩)

* Claussen's process :—Steep for 24 hours in a weak solution of caustic soda. Then boil in the same solution for 2 hours. Again steep in a solution containing 5 per cent. of sodium carbonate. Then immerse in water containing $\frac{1}{2}$ per cent. of sulphuric acid. The jute fibre will then be split up into a mass of cotton like wool.

পরীক্ষাতে আধমণ পাটের জন্য ২৫ সের ক্ষার জল ব্যবহার করা হইয়াছিল। (৪) কাষ্ঠ ভস্মযুক্ত জলেও ঐরূপ ৩টি পরীক্ষা করা হইয়াছিল। প্রথম পরীক্ষাতে তেঁতুল কাষ্ঠের ভস্ম, দ্বিতীয় পরীক্ষায় বাবলার (Acacia) ভস্ম এবং তৃতীয় পরীক্ষাতে কলাগাছের ভস্ম ব্যবহার করা হইয়াছিল। ২৫ সের জলে দেড়সের কাষ্ঠভস্ম যোগ করিয়া, তাহাতে পৃথক পৃথক ভাবে পূর্ব্বের মত সদ্য পচান আধমণ পাট ভিজাইয়া পরে ২০ মিনিটকাল সিদ্ধ করা হইয়াছিল, এবং ক্ষার জল নিঙ্ড়াইয়া ভাল জলে ধুইয়া নিঙ্ড়াইয়া ঐ পাট রৌদ্রে শুকান হইয়াছিল। উল্লিখিত পরীক্ষাগুলির কোনটাতেই ভাল ফল পাওয়া যায় নাই। বরং তাহার বিপরীত; কারণ আঁসগুলির রং কতকটা লাল আভাযুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। পাটের রং পরিষ্কার করিবার জন্য এই সকল পরীক্ষার সূচনা ভিন্ন আর কোন বিশেষ চেষ্টা হয় নাই। আমরা শিবপুর কৃষিক্ষেত্রে মোর্ব্বা আঁস (sansviera) এবং বিলাতি কেওয়ার আঁস (agave) লইয়া ব্লিচিং পাউডার (bleaching powder) ব্যবহার দ্বারা রং পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। যদিও তাহাতে রং কতকটা পরিষ্কার হইয়াছিল কিন্তু সেই সঙ্গেই পাটের 'ফেউ' বা আঁস গুলি পৃথক হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। আর একবার পরীক্ষা করিতে গিয়া আমরা সাবান জলে আঁস ধুইয়া তাহার রং বেশ পরিষ্কার সাদা করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। যাহা হউক উল্লিখিত পরীক্ষাগুলির মধ্যে কৃষকের গ্রহণযোগ্য কিছুই নাই।

৩৮। পাটের আঁসের রাসায়নিক বিশ্লেষণ ফল।

অর্থনৈতিক বিভাগের অধীনে একবার পাটের আঁসের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া তাহার ফল প্রকাশিত হইয়াছিল (Agricultural Ledger)। যদিও এক আধটা রাসায়নিক পরীক্ষার ফলের উপর নির্ভর করিয়া কোন সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত, তথাপি যে টুকু হইয়াছে তাহাই আমাদের গ্রহণযোগ্য। "নাই মামা থেকে কাণা মামাও ভাল।" পাট গাছের পাঁচ প্রকার অবস্থার পাট পৃথক পৃথক বাহির করিয়া সেগুলির রাসায়নিক বিশ্লেষণ ফল পরস্পরের সহিত তুলনা করা হইয়াছিল।:—(১) পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত অথচ ফুলের কলি ধরে নাই এই অবস্থায় কাটা গাছের পাট বাহির করিয়া রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে, (ক) তাহাতে জলের ভাগ (moisture) শতকরা ১১·৫৫, (খ) পাংশু বা ধাতব পদার্থ (ash) শতকরা ১·১ ভাগ, (গ) বিশুদ্ধ সূত্র আঁস (cellulose) শতকরা ৭৪ ভাগ। (২) সেইরূপ আবার ফুলের কলি ধরিয়া ফুল ফুটিবার পূর্ব্বে কাটা গাছের পাট পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল, তাহাতে (ক) জলের ভাগ শতকরা ৮·৭৪, (খ) পাংশু বা ধাতব পদার্থ ১·১ ভাগ এবং বিশুদ্ধ সূত্র আঁসের পরিমাণ শতকরা ৭৬·৪ ভাগ। (৩) আবার ফুল ফোটার পর অথচ ফল ধরিবার আগের কাটা

গাছের পাট পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল তাহাতে (ক) জলের ভাগ ১০·৭, (খ) পাংশু বা ধাতব পদার্থের ভাগ ১·৪ এবং (গ) বিশুদ্ধ সূত্র আঁস শতকরা ৭৪·১ ভাগ। (৪) ঐ রূপে আবার ফল ধরিয়া ঐ ফল পাকিবার আগে কাটা গাছের পাট পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল তাহাতে (ক) জলের ভাগ শতকরা ৭৪ ৮। অবশেষে (৫) ফল পাকিলে পর কাটা গাছের আঁস পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল তাহাতে (ক) জলের ভাগ শতকরা ৯·৭২, (খ) ধাতব পদার্থের ভাগ শতকরা ·৯ এবং সূত্র আঁসের ভাগ শতকরা ৭৬·৪।* বিলাতের কলওয়ালাদের পক্ষে পাটের সূত্র আঁসই মূল্যবান্ এবং যে সময়ে কাটিলে পাটের মধ্যে সূত্র আঁসের পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তখন কাটাই তাহাদের পক্ষে লাভজনক। উল্লিখিত পরীক্ষাতে দেখা যায় যে ফল পাকিলে পর কাটিলেই পাটের মধ্যে সূত্র আঁসের পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক থাকে (শতকরা ৭৬·৪ ভাগ)। ইহার পর দেখা যায় কলি হইয়া ফুল ফুটিবার পূর্ব্বে কাটা পাটে সূত্র আঁসের পরিমাণ অধিক (শতকরা ৭৬·২ ভাগ)। তবে আরও ৫।৭ বার এইরূপ পরীক্ষা না হইলে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। তার পর যতদিন সূত্র আঁসের পরিমাণ দুষ্ট পাটের মূল্যের তারতম্য না হয়, ততদিন "আদার বেপারির জাহাজের খবরের" ন্যায় আমাদের কৃষকেরা এ বিষয়ে মনোযোগ না দিলেও ক্ষতি নাই।

* The results of chemical analysis taken from a number of the Agicultural Ledger is shown below :

	Moisture.	Ash. (a)	Loss by hydrolysis (b)	Loss by acid purification. (c)		Cellulose.	Loss by mercersing. (d)	Gain by nitration
1. Cut just before flower buds appear ...	11·55	1·1	5·2	10·5	·8	74	10·2	37 2
2. Cut just after flower buds appear ...	8·74	1·1	8 5	11·0	·47	76·2	10·7	32·1
3. Cut after flowering ...	10·7	1·4	9·7	11 6	·69	74·1	12·0	32·2
4. Cut just after fruit appears	10	1·1	8·9	12·0	2·4	74·8	8·1	33·2
5· Cut when the fruits are quite ripe... ...	9·72	·9	7·3	11·2	1·4	76·4	11·0	36·6

(a)—Treating for 5 minutes with a boiling weak solution (*i.e.* 1 per cent. strength) of caustic alkali

(b)—Treating for 1 hour as above.

(c)—Boiling for 1 hour in a weak solution (*i.e.* 1 per cent. strength) of $H_2 So_4$

(d)—Treating with a cold solution of caustic alkali of 33 per cent. strength.



কার্ত্তিক—১৩১৬।

পক্ষী পালন।

বিশুদ্ধ নিরামিষভোজনের পক্ষপাতিগণ যাহাই বলুন ইহা এপর্য্যন্ত নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হয় নাই যে, উদ্ভিজ্জ্য পদার্থ ভিন্ন মানুষের আর কোন শ্রেণীর আহার্য্য আবশ্যক হয় না, কিম্বা উপযুক্ত পরিমাণ প্রাণীজ দ্রব্য মানব শরীরের পক্ষে অপকারী। পক্ষান্তরে ইহা বরং কতকটা প্রমাণিত হইয়াছে যে, শরীরে শীঘ্র শীঘ্র বলাধান করিতে হইলে দুগ্ধ, মাখম, ঘৃত, ডিম্ব প্রভৃতি আবশ্যক। সুতরাং প্রাণীজ খাদ্য অনাবশ্যক ইহা বলা যায় না। আমাদের এস্থলে আমিষ নিরামিষ ভোজনের গুণাগুণ বিচার উদ্দেশ্য নহে। আমাদের পক্ষে ইহা জানিলেই যথেষ্ট হইল যে সংসারের অধিকাংশ লোকই আমিষ ভোজী এবং তাঁহাদের জন্য প্রত্যহ কত অগণ্য পশু পক্ষী প্রভৃতি নিহিত হইতেছে।

পক্ষী মনুষ্যের অন্যতম খাদ্য। আয়ুর্ব্বেদীয় শাস্ত্রে জাঙ্গল ও বিষ্কির মাংসের মধ্যে মৃগ ও পক্ষী প্রভৃতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্দেশে অবশ্য কুক্কুট মাংস হিন্দুগণের নিষিদ্ধ খাদ্য। কিন্তু হাঁস প্রভৃতি তাহা নহে। হাঁস প্রভৃতি অনায়াসেই হিন্দুদিগের দ্বারা পালিত হইতে পারে। ব্যবসায়ের জন্য পক্ষী পালন এপর্য্যন্ত এতদ্দেশে প্রচলিত হয় নাই। সাধারণতঃ নিম্ন জাতীয় লোকেরা হাঁস অথবা মুরগী পালন করিয়া থাকে এবং তাহাদের আবশ্যক মত পক্ষী রাখিয়া উদ্বৃত্ত পক্ষী সমূহ বিক্রয় করে।

বিগত দুই বৎসর হইতে পূর্ব্ববঙ্গে পক্ষী পালনের উন্নত উপায় প্রবর্ত্তন এবং উৎকৃষ্ট জাতীয় পক্ষী উৎপাদনের জন্য উক্ত স্থানের গভর্ণমেণ্ট সচেষ্ট হইয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গে পক্ষীর ব্যবসায় অনেক দিবস হইতেই রহিয়াছে। হাঁস, মুরগী ও অন্যান্য পক্ষী উক্ত স্থান হইতে অনেক পরিমাণে একদিকে কলিকাতা ও অন্যদিকে ব্রহ্মদেশে রপ্তানি হয়। বিগত বৎসর চট্টগ্রাম বন্দর হইতে চারি লক্ষ টাকার হাঁস, মুরগী ও ডিম্ব চালান যায়; তন্মধ্যে দুই লক্ষ টাকার মাল নোয়াখালি হইতে আইসে এবং ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম প্রত্যেক স্থান হইতে এক লক্ষ টাকার মাল আইসে।

ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালি—এই তিন স্থানই হাঁস, মুরগী প্রভৃতি পালনের প্রধান ক্ষেত্র। আবার এই দুই জেলার মধ্যে নোয়াখালিই এ বিষয়ে অধিক অগ্রসর। এই জেলায় সর্ব্বত্রই মুরগী, হাঁস প্রভৃতির চাষ আছে। প্রত্যেক মুসলমান গৃহস্থের ঘরে ২।৪টি মুরগী থাকে এবং ৪।৫টি গৃহস্থের মধ্যে একটি করিয়া মোরগ থাকে। চৌমোহিনী হাট, কেসের হাট, পাঁচগাছিয়া হাটই প্রধান রপ্তানির ক্ষেত্র; কারণ এই সকল হাটে চট্টগ্রামের মহাজনদিগের লোক থাকে। নোয়াখালি জেলায় সম্প্রতি হাঁসের ব্যবসায় ও উত্তমরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ফেনী, সেনবাগ, বেগমগঞ্জ, রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর ও সুধারাম প্রভৃতি স্থানের বিলে বড় বড় হাঁসের পাল প্রতিপালিত হয়।

নোয়াখালি জেলার মুরগীর মধ্যে নিম্নলিখিত জাতি গুলি অধিকতর উল্লেখযোগ্য:—(১) কলঙ্গ—প্রায় বিশুদ্ধ চট্টগ্রাম জাতীয়, (২) তাম্বুলি—হ্রস্বপদ-বিশিষ্ট, (৩) বর্ণী—গৃহপালিত জঙ্গলী মুরগী, (৪) করকনাথ—কৃষ্ণবর্ণ, (৫) হাবসি—পালক কোঁকড়ান। পায়ে পালকের অভাব, এবং পায়ে যথেষ্ট পরিমাণে পালকের সমাবেশ এই দুইটিই নোয়াখালির মুরগীর সাধারণ লক্ষণ। ১৮ মাস বয়স হইলেই মুরগী এবং তিন বৎসর হইলে মোরগ যথাক্রমে বুড়া হইয়া যায়। এই সময় ইহাদিগকে মারিয়া ফেলা হয় কিম্বা বিক্রয় করা হয়। অপরাপর জেলা অপেক্ষা নোয়াখালিতেই অধিক পরিমাণ খাসি মুরগী পাওয়া যায়। দাম ৸৵০ হইতে ১৷০ আনা। ৫।৬ মাসের সময় এই সমস্ত মুরগীকে খাসি করা হয়। এক একটি গৃহস্থ প্রত্যেক হাটে ২।১টি মুরগী বিক্রয় করে। এইরূপে মাসে তাহাদের ৩৲ ৪৲ টাকা হয় অর্থাৎ বৎসরে ৩৬৲ হইতে ৪৮৲ টাকা হয়। হাঁস পালনে বৎসরে ২৪৲ টাকা হইতে পারে। হাঁস রাখিলে প্রায় ৮।১০টি রাখিতে হয়। হাঁসের ডিমের দাম শতকরা ১৸০ হইতে ২৲ টাকা।

প্রত্যেক হাটে চট্টগ্রামের মহাজনগণের এজেণ্ট থাকে। ইহারা প্রত্যেক ডজনে চারি আনা কমিসন পায়। ফোড়েরাও আবার ঐ হারে কমিসন পায়। হাঁসের ডিমের প্রত্যেক হাজারে কমিসন ৷৷০ আনা। ফেনী এবং চৌমোহিনী এই দুইটি রেলওয়ে ষ্টেসন হইতেই অধিকাংশ মুরগী চালান হয়। চট্টগ্রাম বন্দর হইতে যে সমস্ত হাঁস, মুরগী অথবা ডিম্ব রপ্তানি হয় সে সমস্তই ব্রহ্মদেশে যায়। শুনিতে পাওয়া যায় যে ব্রহ্মদেশে একটা সাধারণ মুরগী ৸৵০ আনা হইতে ১৲ টাকা এবং হাঁসের ডিম ৴১০ হইতে ৴০ আনা মূল্যে বিক্রয় হয়। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, বৎসরে নোয়াখালি জেলা হইতে ২১১০০০ হাঁস ও মুরগী ও ৩০০০ ঝুড়ি ডিম রপ্তানি হয়। চূণ দ্বারা ডিম্ব সংরক্ষিত হয় এবং ১৮৮০ ডিম্ব সংরক্ষণ করিতে ৶০ অথবা ।০ আনার চূণ আবশ্যক হয়।

চট্টগ্রাম জেলার কয়াগ্রামের কতিপয় ব্যবসায়ী রেঙ্গুনে ডিম চালান দেয়। সাতকনিয়া গ্রামেও যথেষ্ট পরিমাণে হাঁস ও মুরগী প্রতিপালিত হয় এবং এই স্থান হইতে অনেক হাঁস, মুরগী রপ্তানি হয়। কিন্তু চট্টগ্রামের বিশেষ জাতীয় মুরগী আনওয়ারা থানায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। এই থানায় ভায়াপাড়া, চাপাতলী, মহাদেবপুর ও কুশরপাড়ায়ই উত্তম মুরগী উৎপাদিত হয়। উক্ত কয়েক গ্রামে দেশী মুরগী একবারেই নাই। চট্টগ্রামের একটি গৃহস্থ ২০টি মুরগী রাখে। উহা হইতে বৎসরে ১০।১৫টি মুরগী পাওয়া যায় এবং এক জোড়া ৩৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় হয়। এই স্থলে প্রায় ৫০০ গৃহস্থের বাস। কিন্তু তাহারাও আবশ্যক মত মুরগী সরবরাহ করিয়া উঠিতে পারে না। এই বংশীয় মুরগীর নাম ইয়েসেন এবং ইহার দুই জাতি:—কলঙ্গ এবং ঘাগস্। বিশুদ্ধ চট্টগ্রাম জাতীয় মুরগীর কানে সাদা দাগ আছে এবং লক্ষণযুক্ত মুরগীর দাম অধিক। লাঙ্গসাম নামক মুরগীর সহিত চট্টগ্রাম মুরগীর পাল দিলে অধিক সংখ্যক ডিম্ব প্রসবের উপযুক্ত মুরগী জন্মিতে পারে। এইরূপ একটি বিশেষ বংশ উৎপাদনের চেষ্টা হইতেছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গভর্ণমেণ্ট হাঁস, মুরগী প্রভৃতির বংশোন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। এই জন্য বিশুদ্ধ লাঙ্গসাম, বিশুদ্ধ চট্টগ্রাম ও লাঙ্গসাম ও বিশুদ্ধ চট্টগ্রাম একত্রে রাখিবার জন্য ব্যবস্থা হইয়াছে। বিশুদ্ধ চট্টগ্রাম ও লাঙ্গসামের সঙ্কর হইতে ডিম্ব পাওয়া

যাইতে পারে। ইহা বলা বাহুল্য যে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গভর্ণমেণ্ট কৃষিকার্য্যে আমাদের বঙ্গ গভর্ণমেণ্ট অপেক্ষা অনেক বিষয়ে অধিক অগ্রসর হইয়াছেন। এই হাঁস, মুরগী প্রভৃতির উন্নতি সাধনের চেষ্টা তাহার অন্যতম প্রমাণ। আমরা আশা করি যে তাঁহাদের এই উদ্যম দেশ মধ্যে একটি লাভজনক ব্যবসায়ের সৃষ্টি করিবে।

পত্রাদি।

নারিকেল গাছের কীট রোগ ও বাঁকু ধান্য।

শ্রীচন্দ্রভূষণ সরকার, কলিকাতা।

দুই প্রকার কীট দ্বারা নারিকেল গাছ আক্রান্ত হয়, ১। Oryctes rhinoceros ইহা সর্ব্বজন পরিচিত "গোবর" পোকা, ২। Rhynchophorus Signaticollis। প্রথম প্রকার পোকাই নারিকেল গাছের কচি পাতা ও কোমল শাঁস খাইয়া ফেলে। একটি মোটা তার ছিদ্রের ভিতর দিয়া চালাইয়া দিলে অনেক সময় লুক্কায়িত পোকাকে মারিয়া ফেলা যায়। ইহার কীড়া গোময়স্তূপে থাকে এবং এই গুলি একবারে ধ্বংস করা উচিত। শেষোক্ত কীট পূর্ব্বাপেক্ষা ছোট ও রক্তাভ ধূসর বর্ণের। যে স্থানে "গোবর" পোকা বৃক্ষে ক্ষত করে সেই স্থানে ইহারা ডিম পাড়ে। এতদ্ভিন্ন নারিকেল ছাড়ানর সময় যে সমস্ত ক্ষত থাকে তাহাতেও ইহারা ডিম্ব প্রসব করে। কীড়া জন্মিয়া ক্রমশঃ গাছের শাঁস খাইতে থাকে এবং অবশেষে নারিকেলের তন্তু বিজড়িত পুত্তলিকা প্রস্তুত করে। এই পুত্তলিকা পতঙ্গ হইয়া অসংখ্য কীট প্রসব করে। প্রতিকার দুই প্রকারে করা যায়। প্রথমতঃ ডিম্ব প্রসব নিবারণ এবং দ্বিতীয়তঃ প্রসূত কীট নষ্ট করণ। ১ম প্রকারের প্রতিকার করিতে হইলে বৃক্ষ গাত্রে ক্ষত স্থানে নেড়াসিজের আঠা, বালি ও আল্‌কাতরার মিশ্রণ কিম্বা একান্ত অভাবে কাদা প্রয়োগ আবশ্যক। ২য় শ্রেণী উপায় সমূহের মধ্যে বিশেষরূপে আক্রান্ত বৃক্ষ নষ্ট করা, তার প্রবেশ করাইয়া পোকা মারিয়া ফেলা কিম্বা কার্ব্বন বাইসলফাইড নামক বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা পোকা মারিয়া ফেলা অন্যতম উপায়। [কৃঃ সঃ।

আঙ্গুর গাছ ছাঁটা ও উহাতে সার প্রয়োগ।

শ্রীনরেন্দ্র নারায়ণ রায়।

কার্ত্তিক মাসের শেষে বৃষ্টি শেষ হইয়া গেলে গাছের নিচে হইতে মাটি তুলিয়া ফেলিবে। ইহার পর এক অথবা দেড় মাস শিকড় অনাবৃত অবস্থায় রাখিতে হইবে। এই সময় গাছের পাতাও ঝরিয়া যাইবে। পাতা ঝরিয়া গেলে আবশ্যক মত ডালপালা ছাঁটিয়া দিতে হইবে। পৌষ মাসের শেষ নাগাত সার দিয়া গাছের নিম্নে ভাল করিয়া মাটি দিতে হইবে। পুরাতন গোবর সার, মনুষ্য মল অথবা মৎস্য সার আঙ্গুর গাছে প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে। নিম্নলিখিত মিশ্র সার বিশেষ ফলপ্রদ :—একটি বড় ও গভীর গর্ত্ত করিয়া তাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে টাট্‌কা গোবর ফেলিতে হইবে। পরে কতক পরিমাণে খৈল জলে ফুটাইয়া গলাইয়া লইতে হইবে। খৈল গলিয়া গেলে উহার সহিত সম পরিমাণ গুড় ও অল্প মাত্রায় চূণ মিশাইয়া পূর্ব্বোক্ত গোবরের সহিত মিশ্রিত করিয়া গর্ত্ত বন্ধ

করিয়া দিতে হইবে। দুই এক মাসের মধ্যে সমস্ত পচিয়া সার হইয়া যাইবে। তখন উহা তুলিয়া নূতন মাটি মিশাইয়া আঙ্গুর গাছে দিতে পারা যায়। [কৃঃ সঃ।

প্রাদেশিক কৃষি সংবাদ।

বঙ্গদেশে নীলের আবাদ ১৯০৯।—বঙ্গদেশে নীলের আবাদ ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। বিহারেই নীলের আবাদ অধিক, কেন না চম্পারণ, মজঃফরপুর, দারবঙ্গ এবং পূর্ণিয়ায় প্রায় ১০,০০০ একরের অধিক পরিমাণ জমিতে নীল চাষ হয়। তদ্ব্যতীত যশোহর ও নদীয়ায় যৎসামান্য চাষ হইয়া থাকে।

প্রতি বৎসরই নীল চাষ কমিতেছে, তাতে আবার এবৎসর জল বায়ু নীল চাষের অনুকূল ছিল না। একেত বৃষ্টির অভাবে ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমে বুনানি সুবিধা মত হইল না, যে মাসে তাহাতে নীলের বিস্তর ক্ষতি হইল; শেষে আগষ্ট মাসে অতিবৃষ্টিতে নীল নষ্ট হইল।

বর্ত্তমান বর্ষে ১০৭,৭০০ একরে নীল চাষ হইয়াছে; বিগত বর্ষ অপেক্ষা ২৮০০০ একর এবং ১৯০৭ সাল অপেক্ষা ৪০,০০০ একর কম।

অনুমান করা যায় যে মজঃফরপুরে ৮৮ অংশ, সারণে ৯৭, চম্পারণ ও দ্বারবঙ্গে ৭২ অংশ ফসল হইবে; কিন্তু পূর্ণিয়ায় কেবল ২২ অংশ মাত্র ফসলের অনুমান করা যায়। সমগ্র প্রদেশে ২০,১৭০ ফ্যাক্টরি মণ নীল উৎপন্ন হইতে পারে। বিগত বর্ষ অপেক্ষা ৬,০০০ মণ কম।

তুলা চাষের বর্ত্তমান অবস্থা; অক্টোবর ১৯০৯।—জলদি জাতীয় তুলার প্রধানতঃ সাঁওতাল পরগণা, মানভূম, সিংভূম, আঙ্গুল, রাঁচি ও সম্বলপুরে আবাদ হইয়া থাকে এবং নাবী জাতীয় উত্তর বিহারে ও সিংভূমে চাষ হয়। আর সারণে প্রায় সমস্ত আবাদী তুলার অর্দ্ধেক পরিমাণ জন্মিয়া থাকে। সেপ্টেম্বর, অক্টোবর মাসে আবহাওয়া তুলা চাষের অনুকূল বলিতে হইবে এবং ক্ষেত্রস্থ ফসলের অবস্থা ভাল। কিন্তু বাঁকুড়ায় এবং সাহাবাদের স্থানে স্থানে অতিবৃষ্টি ও জলপ্লাবনে তুলা চাষের কিছু ক্ষতি করিয়াছে। অদ্যাপিও বাঁকুড়ায়, কটক, বালেশ্বর এবং আঙ্গুলে নাবী তুলার আবাদ আরম্ভ হয় নাই।

অনুমান ৩৪,১১৮ একর পরিমিত জমিতে জলদি তুলার চাষ হইয়াছে। বিগত বর্ষের জলদি তুলা চাষের পরিমাণ ৩১,২৬০ একর। অক্টোবর মাসের শেষ পর্য্যন্ত ২৭,৯৮০ একর পরিমাণ জমিতে নাবী তুলার আবাদ হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হয়; কিন্তু বিগত বর্ষে এমন দিনে এতদপেক্ষা অধিক জমিতে নাবী তুলার আবাদ হইয়াছিল।

তৈল শস্য—তিল ১৯০৯ ১০।—এবৎসর অনুমান ৩২,৯০০ একর পরিমাণ জমিতে তৈল

শস্যের আবাদ করা হইয়াছে। তিল প্রধানতঃ মেদিনীপুর, আঙ্গুল, মানভূম, সিংভূম, যশোহর, সাহাবাদ এবং বর্দ্ধমানে জন্মিয়া থাকে। বর্ত্তমান হিসাবে গয়া, আঙ্গুল এবং সিংভূমের তিলের আবাদী জমির পরিমাণ ধরা হয় নাই; কেন না এই তিনটী স্থানের সঠিক হিসাব অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই। বিগত বর্ষে ৫০,০০০ একর ভূমি তিল চাষে আবদ্ধ ছিল। সাধারণতঃ প্রায় ৬৩,৪০০ একর জমিতে তিল চাষ হয়।

সম্বলপুরে যে চাষ হইয়াছে তাহাতে ষোল আনার উপর ফসল হইবে আশা করা যায়। ২৪-পরগণায় পুরা ষোল আনা; বাকী জেলা গুলির মধ্যে ৪টী জেলায় ৯০ হইতে ৯৯ অংশ এবং অপর ৫টী জেলাতে ৭১ হইতে ৭৭ অংশ ফসল হইবে।

সার-সংগ্রহ।

বিভাগীয় বিবরণ।

রাজকার্য্যের সুবিধার জন্য বুদ্ধিমান বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর কয়েকটি জেলা লইয়া এক একটি বিভাগের (ডিভিসনের) সৃষ্টি করিয়াছেন, এইরূপে কলিকাতা ও ঢাকার ছোটলাট বাহাদুর-দ্বয়ের অধিকৃত রাজ্য মধ্যে অনেক গুলি বিভাগ আছে। প্রত্যেক বিভাগের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, ব্যবসা ইত্যাদি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করিতে আকাঙ্ক্ষা করি; এইরূপ আলোচনায় কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যাদির অবস্থা—অর্থাৎ উন্নতি, বা অধোগতি অনেক পরিমাণে বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীন কালের অবস্থার সহিত বর্ত্তমান কালের অবস্থার তুলনায় এতদ্বিষয়ে অভিজ্ঞতা আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠে। একেবারে সমুদয় বিভাগের বিবরণ প্রদান করা সুকঠিন ও অসম্ভব, সুতরাং আপাততঃ প্রেসিডেন্সী বিভাগ লইয়াই আলোচনা করিব। চব্বিশ পরগণা, যশোহর, খুলনা, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ এই কয়েকটি জেলা লইয়া প্রেসিডেন্সী ডিভিসন। এই পঞ্চ জেলার যে যে বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাদের নাম প্যারা-গ্রাফের প্রথমে উল্লেখ করিয়াছি।

ধান্য ও চাউল।—সুপ্রসিদ্ধ "ষ্টেট্স্-ম্যান পত্রে যশোহর হইতে কোন শিক্ষিত ব্যক্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, ১৩৬ বৎসর পূর্ব্বে সমস্ত যশোহর ও খুলনা অঞ্চলে যে পরিমাণে ধান্য জন্মিত এক্ষণে তাহার সাড়ে তিন আনা রকম কমিয়া গিয়াছে। বাজারে সেকালে ন্যূনাধিক ২৯ প্রকার চাউল বিক্রীত হইত, এখন সতের রকম চাউল পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। গড়ে চাউলর মূল্য পৌনে তিন গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং খড়ের দামও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। অতি সূক্ষ্ম ও সুবাসিত চাউল সেকালে সর্ব্বত্র পাওয়া যাইত; এখন অতি কষ্টে তাহা পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, গাভী ও বলদের সংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস হইয়া গিয়াছে এবং গোজাতীয় পশু কোথাও আর বলবান নাই। গত ২৫৫ বৎসর কাল মধ্যে ন্যূনাধিক ছয়বার প্রবল দুর্ভিক্ষ হইয়া গিয়াছে। কৃষকের অবস্থা স্থানে স্থানে ভাল থাকিলেও সাধারণতঃ হীন। অন্যান্য জেলার কোন স্থানই উন্নত অবস্থা সম্পন্ন নহে।

পাট ও তুলা।—প্রেসিডেন্সী ডিভিসনে পাট ও তুলার অবস্থা সাধারণতঃ মন্দ নহে। চব্বিশ পরগণা জেলায় ১০৬টা কুঠি আছে, তৎপূর্ব্ব বর্ষে

৯৫টার অধিক ছিল না। থলে, চট্, তুলা জাত বহু দ্রব্য, সূতা প্রভৃতি এই সকল কুঠিতে তৈয়ার হইয়া থাকে। বর্ত্তমান ১৯০৮-৯ অব্দে পাটের কল, দেশালাইএর কল ও ইঞ্জিনীয়ারিং প্রভৃতি কার্য্যে ১১টা কল বাড়িয়াছে। তদ্ভিন্ন কাগজের কুঠি ও কলের কার্য্য মন্দ হয় না। ইহাতে অনেক টাকার কাগজ তৈয়ার হয় এবং অনেকের অন্ন সংস্থান হইয়া থাকে। চব্বিশ-পরগণা জেলার অনেক কৃষক ধান্যের চাষ ছাড়িয়া দিয়া পাটের চাষ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে তাহারা অধিকতর লাভ ও সুবিধা দেখিতে পায়। মোটের উপর তুলা ও পাটের অবস্থা মন্দ নহে।

কাগজ।—কাঁকিনাড়া ও টিটাগড় এই দুই কল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বর্ত্তমান বর্ষে এই দুই কলে চল্লিশ লক্ষাধিক রৌপ্য মুদ্রা মূল্যের কাগজ তৈয়ার হইয়াছে। ছিন্ন বস্ত্র, ছিন্ন কাগজ, ঘাস, খড়, পুরাতন পাট, থলে, চট্, পুরাতন দড়ি, ছেঁড়া দরমা, পচা পাতা প্রভৃতি কাগজ প্রস্তুতের উপাদান।

তাঁত।—তাঁতের তৈয়ারী কাপড় প্রেসিডেন্সী ডিভিসনে এক সময়ে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত, এখনও এই ডিভিসনের প্রত্যেক জেলায় হাতের তৈয়ারী কাপড় অনেক পাওয়া যায় এবং ভাল ভাল বস্ত্রও প্রস্তুত হইতে পারে। নবদ্বীপ ও যশোহর জেলায় হিন্দু ও মুসলমান তাঁতী অদ্যাপি বহুসংখ্যক দৃষ্ট হইয়া থাকে। শান্তিপুর ও কুষ্টিয়াতে আজিও ভাল বস্ত্র পাওয়া যায়। আসাম ও পূর্ব্ববঙ্গে, এখান হইতে বহু প্রকারের বহু বস্ত্র রপ্তানী হইয়া থাকে। "মোহিনী মিল" নামে একটি কাপড়ের কল সম্প্রতি এতদঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গড়ে চল্লিশ জন ব্যক্তি ইহাতে খাটিয়া থাকে। তন্তুবায়দিগের অবস্থা কয়েক বৎসর হইতে কিছু উন্নত, কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনে তাঁতীদিগের অবস্থা যতটা উন্নত হওয়া উচিত ছিল ততটা হয় নাই। এই আন্দোলনে বোম্বাইবাসীরা অধিকতর লাভবান হইয়াছেন। কলে কাপড় হইতে আরম্ভ হওয়ায় তাঁতীর আয় যথেষ্ট হয় নাই।

রেশম ও তসর।—মুর্শীদাবাদ জেলার ইহা অন্যতম প্রধান আয়ের উপায়। এই জেলাতেই তসর ও রেশমের প্রধান আড্ডা আছে। ইউরোপীয় পুরুষেরা অনেক বৎসর হইতে রেশমের কুঠি চালাইতেছেন। দেশী ভদ্রলোকদিগেরও সম্পত্তি আছে। লালবাগে যে আড্ডা ছিল তাহা উঠিয়া গিয়াছে। বেঙ্গল সিল্ক কোম্পানী এক প্রকার বন্ধ বলিলেই হয়। মুর্শীদাবাদ জেলা হইতে রেশম ও তসর ভারতবর্ষের বহু প্রদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে, তদ্ভিন্ন ইংলণ্ড, জর্ম্মনী ও অষ্ট্রীয়া দেশেও ইহা প্রেরিত হইয়া থাকে।

চিনি।—যশোহর, খুলনা এবং চব্বিশ পরগণা ও নবদ্বীপ জেলার অনেক অংশে খর্জ্জুরের গুড় প্রস্তুত করিবার অনেক আড্ডা আছে। এই সকল অঞ্চল হইতে অনেক টাকার গুড় নানা স্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে। পরিষ্কৃত চিনি প্রস্তুত করিবার বন্দোবস্তও বহু স্থানে আছে। পরিষ্কৃত চিনি তৈয়ার করিবার উপকরণ সমূহও এখানে যথেষ্ট পাওয়া যায়। সম্প্রতি দুই এক স্থানে বিশুদ্ধ শর্করা তৈয়ার করিবার কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যশোহর জেলার কোটচাঁদপুরগ্রামে ৩।৪টা চিনির কুঠি আছে। বসিরহাটে ৩১টা কুঠিতে প্রায় ৩৭ সহস্র মণ চিনি তৈয়ার হয়। খুলনা জেলায় ১৫৪৭৩ মণ চিনি ইংরাজি ১৯০৮-৯ অব্দে পাওয়া গিয়াছিল। চিনির কারবারের অবস্থা মোটের উপর মন্দ নহে।

পিতল, কাঁসা ইত্যাদি।—মুর্শীদাবাদ জেলা এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। অনেক টাকার ও অনেক প্রকারের বাসন প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। নবদ্বীপ, জীবননগর, ধরমদহ, মাতিয়ারী, মেহেরপুর প্রভৃতি নদীয়া জেলার অনেক স্থান পিতল ও কাঁসার দ্রব্য প্রস্তুত জন্য প্রসিদ্ধ। বাসনের অবস্থ কিছু উন্নত, কিন্তু বিদেশীয় এনামেল বাসন আমাদের দেশের প্রায় সর্ব্বপ্রকার বাসনকে ধ্বংস করিতে বসিয়াছে। "ফুল" নামে আর এক প্রকার দেশীয় ধাতুর বাসন নানা স্থানে প্রস্তুত হয়, তদ্ভিন্ন নব পরিচিত আলুমিনিয়াম্ ধাতুর পাত্র বহু স্থানে প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

তৈল।—দয়ানগরের "শম্ভু মিল" তৈল কলের মধ্যে প্রধান। ইহা মুর্শীদাবাদ জেলায় অবস্থিত। নবদ্বীপ জেলার মহেশগঞ্জের কল মন্দ নহে। সত্বাধিকারী—মিষ্টার বিপ্রদাস পাল চৌধুরী (জমিদার)। কিন্তু সর্ষপ তৈলের মূল্য কোথাও কম নহে, সর্ব্বত্র দুর্ম্মূল্য এবং বিশুদ্ধ সর্ষপ তৈল প্রাপ্ত হওয়ার সুবিধাও অতি কম। এই কারণে রোগের সংখ্যাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে।

নীল, হস্তিদন্ত ও বিবিধ।—নবদ্বীপ জেলায় মহেশগঞ্জ গ্রামে ময়দার কল এবং জুতার ও চামড়ার কুঠি উত্তমরূপ চলিতেছে, কিন্তু ইহাদের কোন বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। রাণাঘাট মহকুমার গাঁগনাপুর গ্রামে ষ্টকীং, মোজা প্রভৃতির কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মুর্শীদাবাদ জেলায় নীলের প্রাচীন কারবার একপ্রকার বন্ধ-প্রায়। যশোহরের মাগুরা মহকুমায় নীলের কারবার কিছু কিছু পরিমাণে এখনও চলে। এই মহকুমায় দুইটী নীলকুঠি আছে। উৎসাহ অভাবে মুর্শীদাবাদ জেলায় হাতীর দাঁতের কাজ আর চলে না, নবাবী আমলে খুব চলিত। বালুচর, জিয়াগঞ্জ প্রভৃতি কয়েক স্থানে লোহার সিন্ধুক, ষ্টিলট্রঙ্ক প্রভৃতির কতকগুলি কারবার ও কুঠি স্থাপিত হইয়াছে, তথায় এই সকল জিনিষ প্রস্তুত হইতেছে। সোরা, লাক্ষা, কাঁচি, সাবান, কাগজ, তামাক, বনাত, কম্বল, প্রভৃতির জন্য প্রেসিডেন্সী বিভাগের কয়েক স্থানে কারখানা আছে। এই বিভাগে লাঙ্গল, গাড়ীর চাকা ও বলদ-শকট উত্তম-রূপে প্রস্তুত হয়। খুলনায় নৌকা তৈয়ার করিবার অনেক আড্ডা আছে। ইট, টালী, মাটীর বাসন প্রায় সর্ব্বত্র প্রস্তুত হইতে দেখা যায়। নাটাগোড়, কাদিহাটী ও গোপালপুর গ্রামের তৈয়ারী তালা খুব মজবুদ ও স্থায়ী। বারাসতের এলাকায় বাদু গ্রামে ও দত্তপুকুরে আরও সুন্দরতর তালা প্রস্তুত হইতে পারে। খড়দহ, পানিহাটী ও সুখচরের বুরুশ (Brush) ভাল; বারাকপুরের এলাকায় সান্দলপুরের কাঁচি অতি সুন্দর। মধ্যম গ্রামের সূঁচ, দমদমার লণ্ঠন, মাদুর, ডায়মণ্ডহারবারের বৃক্ষ-পত্র-নির্ম্মিত খেলনা প্রভৃতি, নদীয়ার পুতুল, খাঁজে গ্রামের বাসন, কালীগঞ্জের হাড়ের জিনিষ এবং সাতক্ষীরার কয়েক প্রকার দ্রব্য বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

শস্য ও অন্যান্য।—তিল, হরিদ্রা ও গোধূমের অবস্থা মন্দ, কারণ গত ষাট বৎসর মধ্যে ইহাদের পরিমাণ প্রায় তিন গুণ কম হইয়া গিয়াছে। সর্ষপ আরও অল্প। মসুর, অরহর, মুগ ও মটর দাইলের অবস্থা মধ্যম। বিরি কলাই বা তেউটী (কাল কলাই) এই বিভাগে সামান্য জন্মে। মূল্য বিশেষ বৃদ্ধি পায় নাই। পোস্ত খুব কম জন্মিয়া থাকে। স্থানে স্থানে লঙ্কা (গাছ মরিচ) যথেষ্ট জন্মে। মৎস্যের পরিমাণ বর্দ্ধিত হইতেছে। ধনে সর্ব্ব স্থানে জন্মে না।

সাধারণ অবস্থা।—বিগত একশত বর্ষ কাল হইতে হিসাব ধরিলে দেখা যায়, প্রেসিডেন্সী বিভাগের নগর সমূহের অবস্থা একটু উন্নত কিন্তু গ্রাম সমূহের অবস্থা অত্যন্ত অবনত। রেলওয়ে, ট্রাম, তারঘর, ডাকঘর, বৈদ্যুতিক আলোক, গ্যাসের আলোক, জাহাজ, মিউনিসিপালিটি প্রভৃতি দর্শন করিয়া অনেকে উন্নতির কথা কহিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে প্রজা সাধারণের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় নাই ; শস্যাদি বা ভোজ্য দ্রব্যাদির মূল্য কমে নাই। প্রজা বা কৃষকের অবস্থা দেখিলে বোধ হয় কবি যাহা গাহিয়াছেন তাহাই সত্য।

"পর দীপমালা নগরে নগরে,
তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে॥"

পূর্ব্বে যেখানে এক টাকায় /৮ সের সর্ষপ তৈল পাওয়া যাইত, এখন সেখানে এক সের তৈলের দাম নয় আনা পয়সা। তাহাও বিশুদ্ধ তৈল নহে। দুগ্ধ, ঘৃত প্রভৃতির তো কথাই নাই। আড়াই টাকা মণের চাউল এখন ৬।৷৹ টাকা বা ৬৷৷৹ আনায় বিক্রীত হয়। এইরূপ সকল দ্রব্যেরই মূল্য বাড়িয়াছে। তদ্ভিন্ন দুর্ভিক্ষ, রোগ, শোক, দ্রব্যের মহার্ঘতা, ম্যালেরিয়া, অন্নকষ্ট, অভাব, অসুবিধা প্রভৃতির তো কথাই নাই। বন্যা ইত্যাদির কথাও স্মরণ রাখা উচিত। সুতরাং প্রজা সাধারণের অবস্থা কিরূপ হইয়াছে তাহা এখন বুঝিয়া লউন। শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

কৃষকগণের অবনতির জন্য দায়ী কে ?

গভর্ণমেণ্ট কৃষিকার্য্যের উন্নতি ও কৃষকদিগের শিক্ষার জন্য বিশেষ কিছু করিতেছেন বলিয়া সাধারণের ধারণা নাই। এদেশের অধিবাসীর মধ্যে শতকরা সত্তর জন লোক কৃষক, অবশিষ্ট অধিকাংশ লোককেও অল্পাধিক পরিমাণে কৃষির উপর নির্ভর করিতে হয় ; কাজেই একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে কৃষিই বঙ্গদেশবাসীর প্রধান অবলম্বন, অতএব কৃষকদিগের উন্নতির উপর বঙ্গবাসীর উন্নতি নির্ভর করিতেছে। দুঃখের বিষয় গভর্ণমেণ্ট ও দেশের হিতাকাঙ্ক্ষী চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ একথাটা বুঝিয়াও যেন বুঝিতেছেন না। আমরা গভর্ণমেণ্টের দোষ ত্রুটি সকল সময় দেখিতে যেরূপ অভ্যস্ত, যদি নিজেদের অবস্থাটা সেই সঙ্গে বিচার করিতে ভুল না করি, তবেই প্রকৃত পক্ষে অনেক কল্যাণকর অনুষ্ঠান করিতে সক্ষম হই। বহু বৎসর হইল এদেশে জমিদার সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু সে সভা জমিদারদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট দরখাস্ত প্রেরণ, প্রস্তাব গ্রহণ ও বর্জ্জন ব্যতীত কৃষকের উন্নতির জন্য কার্য্যকরী কোন পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন কিনা জানি না। গভর্ণমেণ্ট অবশ্য উচ্চ বেতনে কৃষি-বিভাগের জন্য বড় বড় সুদক্ষ সাহেব নিযুক্ত করিতে পারেন, কিন্তু যাহাদের লইয়া দেশ, সেই কৃষকদের সহিত প্রাণে প্রাণে মিশিতে না পারিলে কৃষির উন্নতি কোন কালেই হইবে না। যাহাদের লইয়া দেশ, যাহাদের অক্লান্ত পরিশ্রম-জাত শস্য আমাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতেছে, তাহাদের জন্য শিক্ষাভিমানী স্বদেশী ব্যক্তিবর্গের কি কিছুই করিবার নাই ? আত্ম চেষ্টায় কি না হয় !

কৃষকদিগের ভিতর দুর্ভিক্ষ সাহায্য বিতরণ করিতে যাইয়া জনৈক ভদ্রলোক জানিলেন, বর্ষার জল বাহির হইতে না পারায় সেই পল্লিতে কৃষির বড়ই অসুবিধা হয়, খাল খনন করিয়া জল নিকাসের ব্যবস্থা করিবার জন্য প্রজারা বহু বার লোকাল বোর্ডের দ্বারা খাল খননের জন্য আবেদন করিয়া নিরাশ হইয়া পড়েন। আমাদের বন্ধু সমস্ত কৃষকদিগকে সমবেত করিয়া আত্ম-শক্তির বলে খাল খননের জন্য উৎসাহিত করেন এবং তাঁহারই ফলে খাল খনন হওয়ায় কৃষিকার্য্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

আমরা যে দৃষ্টান্তটির উল্লেখ করিলাম তাহা বিশেষ কিছু অপূর্ব্ব না হইলেও বিরল বটে। শিক্ষিত দেশ-হিতৈষী ব্যক্তিগণ যদি তাঁহাদের নিরক্ষর কৃষক প্রতিবাসীদিগকে এইরূপ কর্ম্মে সাহায্য করেন, তাহাদের দুঃখবিপদে তাহাদের সহায় হ'ন—তাহাদের সহযোগিতা করিতে অগ্রসর হন, তবে কৃষকগণও সরল সহজ ভাবে তাঁহাদের নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া সর্ব্বকর্ম্মে তাঁহাদের অনুগামী হইতে পারে, পক্ষান্তরে দেশে কৃষিরও উন্নতি সম্ভাবিত হয়।

কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে কৃষকদিগের বর্ত্তমান অবস্থার বিচার করা কর্ত্তব্য। দেশের অন্নদাতা কৃষককুল ভীষণ দারিদ্র্যের কবলে পতিত হইয়া রহিয়াছে—দুর্ভিক্ষ অনাহারে সর্ব্বাগ্রে তাহাদেরই প্রাণ যায়। আমরা এ স্থলে দারিদ্র্যের রাজনৈতিক কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না। শিক্ষিত দেশ-হিতৈষীগণ কৃষকদিগের উন্নতি সাধনের জন্য কি করিতে পারেন, তাহা প্রদর্শন করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

কৃষকদের দারিদ্র্যের অবশ্যম্ভাবী ফল কিম্বা চির দারিদ্র্যের কারণ—তাহাদের ঋণ। গভর্ণমেণ্ট এই ঋণ হইতে কৃষকদিগকে মুক্ত করিবার জন্য চেষ্টিত আছেন। কুসীদজীবিদের হাত হইতে কৃষকদিগকে মুক্ত করিবার জন্য শিক্ষিত সম্প্রদায়কে সরল সুদৃঢ় ভাবে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। এই বিষয়ে শিক্ষিত সম্প্রদায় গভর্ণমেণ্টের সহকারিতা করিতে পারেন।

জমিদার বা তাহাদের কর্ম্মচারিগণ কৃষকদের উন্নতির আর এক অন্তরায়। জমিদারদের উপর ক্রমেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রভাব ব্যাপ্ত হইতেছে। জমিদারগণও এক্ষণে অনেকেই শিক্ষা লাভ করিয়াছেন ও দেশের কল্যাণকামী হইয়াছেন। সুতরাং এই ক্ষেত্রেও কার্য্যক্ষেত্র কঠোর হইলেও নিতান্ত প্রতিকূল নহে।

আমরা যে কয়েকটি কার্য্যের কথা বলিলাম কৃষককুলের উন্নতির জন্য ইহা যথেষ্ট নহে, জানি। কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে কৃষকদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যে কয়েকটি দিকে অবিলম্বে কার্য্যের সূচনা করা প্রয়োজন আমরা স্থূলভাবে কেবল তাহারই উল্লেখ করিলাম। প্রথমে এই তিনটি বিষয়ে কার্য্যারম্ভ করিলে অন্যান্য কার্য্যের পথ প্রশস্ত হইবে।

গোরুর খাবার।

বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসের "কৃষক" পত্রিকায় "গো-চর্য্যা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। সেই প্রবন্ধটি অবলম্বনে এবং গোপালন সম্বন্ধে আমার নিজের যতটুকু অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে তাহা হইতে ঐ বিষয় সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা লিখিয়া পাঠাইতেছি ঃ—

গোরু যে ঘরে থাকিবে সে ঘর চোণা গোবরে অপরিষ্কার না থাকে, গোরুর গামলার জাব পচিয়া না থাকে, জাব দিবার সময় গামলা বেশ করিয়া পরিষ্কার করিয়া তাহাতে ছোট ছোট করিয়া বিচালি কাটিয়া খইল ও ভাল জল দিয়া ভাল করিয়া জাব মাখিয়া দিতে হয়। মশা, মাছিতে বেশী কষ্ট না দেয় তজ্জন্য গোয়ালে ঘুঁটের ধোঁয়া বা সাঁজাল দেওয়া—ইত্যাদি, যে সকল গৃহস্থ গোরু পুষিয়া থাকেন এ সকল মোটা কথা তাঁহাদের সকলেরই জানা আছে। তবে অনেক স্থলেই বিশেষতঃ সেখানে চাকর বাকরের উপর গোরুর সেবার ভার দেওয়া আছে অথচ গৃহস্থ নিজে সে দিকে লক্ষ্য করেন না, সেখানে যে গোরুর অপালন হইয়া থাকে ইহা নিশ্চিত।

গোরুর খোরাক খুব বেশী। যে সকল গৃহস্থের গোরুকে মাঠে চরান হয়, তাহাদেরও তুইবেলা তুইটি রীতিমত জাব দেওয়া আবশ্যক। জাবের সঙ্গে জল যেন প্রচুর পরিমাণে থাকে। এক একটা গোরু প্রত্যহ যে দেড়মণ তুইমণ জল খাইয়া থাকে এ কথা অনেক গৃহস্থের জানা না থাকিতে পারে। গোরুকে যে বিচালি কুচাইয়া দেওয়া হয় তাহা যেন খুব ছোট ছোট করিয়া দেওয়া হয় এবং জল প্রচুর পরিমাণে দেওয়া হয়। চাকর চাকরাণীর উপর নির্ভর থাকিলেও গৃহস্থের এদিকে লক্ষ্য রাখা চাই। গোরুকে আমরা প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়াই মনে করি। সুতরাং গোরুর অপালন হইলে গৃহস্থের অকল্যাণ হয়, ইহা সকল হিন্দুর মনেই ধারণা। সেই ধারণা যেখানে গৃহস্থের মনে বদ্ধমূল সেই খানেই গোরুর সুপালন হয়।

ছোলা, দাইল, ভূষি, খুদ, কুঁড়া, খইল—এ সকল গোরুর পক্ষে পুষ্টিকর খাদ্য। এই সকল খাদ্য গোরুকে বেশী পরিমাণে খাওয়াইতে নাই তাহাতে গোরুর পীড়া হয়।

গোরুকে কাঁচা ঘাস খাওয়ান খুবই আবশ্যক। কাঁচা ঘাস না খাইতে পাইলে গোরুর তুগ্ধের উপকারিতা পূর্ণমাত্রায় থাকে না। সুধু গোরু বলিয়া নয়, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি যে সকল পশু চরিয়া খায় তাহাদের সকলের খাদ্য সম্বন্ধেই এই রূপ ব্যবস্থা।

যে সকল গাভী শৈশবকাল হইতে ভাল খাইতে না পায় ও অল্প বয়সে গর্ভিণী হয় তাহাদের প্রায় অধিক তুধ হয় না, কিন্তু রীতিমত খাওয়াইলে দ্বিতীয় বিয়ানে কোন কোন গাভীর তুধ বেশী হয়। যে গাভীকে ভাল করিয়া খাইতে দেয় সে বেশী তুধ পাইয়া থাকে। লোকে কথায় বলে "গাভীর বাঁটে তুধ নহে, গাভীর মুখে তুধ" অতএব তুধ বেশী করিবার প্রধান উপায় গাভীকে অধিক করিয়া খাইতে দেওয়া। খাইতে দিলে যে গাভীর অধিক তুধ হয় ইহা সকলেই জানেন, কিন্তু অতি অল্প লোকই গাভীকে পেট ভরিয়া খাইতে দেয়। কি কি জিনিষ খাওয়াইলে তুধ বাড়ে তাহা অধিকাংশ লোকই জানে না। অধিক তুধ পাইবার আশায় অনেক লোক গাভীকে দাইল ইত্যাদি অধিক পুষ্টিকর দ্রব্য খাওয়াইয়া থাকে, কিন্তু ইহাতে যে অধিক তুধ পাওয়া যায় না তাহা বলা বাহুল্য। তুগ্ধ বৃদ্ধিকারক দ্রব্যের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল যথাঃ কাঁচাঘাস, শুষ্ক তৃণাদি, চাউল ও কলাই সিদ্ধ, সিমুলবীচি সিদ্ধ, খেসারী দাইল সিদ্ধ, তিল ও সরিষার খইল, দাইলের ভূষি, কলার খোড়, লাউ সিদ্ধ, কাঁটা নটে সিদ্ধ, ফেন, আমানি, চাউলের কুঁড়া, গুড়, আকের শিকড়, বাঁশপাতা সিদ্ধ, চাউল ধোয়া জল, লবণ ইত্যাদি।

প্রসবের পর আধ সের সিদ্ধ মাস কলাই, আধ সের ভাতের মাড়, এক পোয়া ইক্ষু গুড়; এক তোলা পিঁপুলের গুঁড়া ও এক ছটাক আদা এক সঙ্গে মিশাইয়া প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় দিন কতক খাওয়াইলে গাভীর তুধ বাড়ে। আধ সের কাঁজির সঙ্গে অল্প খড় মাখিয়া এবং তাহাতে আকের শিকড় চূর্ণ এক ছটাক মাখিয়া খাওয়াইলে গোরুর তুধ বাড়ে। বাঁশের পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া তাহাতে যোয়ান ও গুড় মিশাইয়া খাওয়াইলে গাভীর বেশী তুধ হয়। রেড়ির কচি কচি তুই চারিটা ডগা জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল খাওয়াইয়া দিলে গোরুর বেশী তুধ হয়। রেড়ির সিদ্ধ কচি কচি পাতা ২।৪টা পালানের উপর রাখিয়া কাপড় দিয়া বাধিয়া রাখিলে এবং কিছুক্ষণ পরে খুলিয়া তুধ দোহাইলে অধিক তুধ পাওয়া যায়। প্রসবের ১২।১৪ দিন পর হইতে চাউলের সহিত

লাউ সিদ্ধ করিয়া এবং খেসারী দাইল ভিজাইয়া খাওয়াইলে গোরুর দুধ বেশী হয়। দুধ দোহন করিবার পূর্ব্বে গাভীকে খইল, ভুষি, জল, ফেন ও লবণ খাওয়াইলে বেশী দুধ পাওয়া যায়। প্রতিদিন এক সময়ে এবং একজন লোক দিয়া দুধ দোহান উচিত। দুধ দোহাইবার সময়ে গাভাটিকে বিরক্ত না করিলে বেশী দুধ পাওয়া যাইতে পারে।

জনৈক পত্র প্রেরক।

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য।

কল্পতরু।—কয়েক জন কৃতবিদ্য ব্যক্তির উদ্যোগে "কল্পতরু" নামক একটি নূতন মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইবার প্রস্তাব হইতেছে। ইহাতে সাধারণ সাহিত্য ব্যতীত, সহযোগী সাহিত্য বিজ্ঞান আলোচনা, বিবিধ দেশীয় পত্রিকাদি হইতে সঙ্কলিত মনোরম গল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্য সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ থাকিবে। এইরূপ একটি পত্রিকা বাঙ্গলা সাহিত্যের কলেবর পুষ্টির যে বিশেষ অনুকূল হইবে তাহা বলা বাহুল্য।

নূতন রকমের কলম।—কোন বিলাতি পত্রে প্রকাশ যে, ওষধি জাতীয় (annual) গাছের স্থায়ী জাতীয় (Perennial) কলম করা চলিতে পারে। যেমন টমাটো গাছে মূলজ আলু গাছের ও ওষধি জাতীয় সূর্য্যমুখীর গাছে স্থায়ী মূলজ সূর্য্যমুখী কলম করিয়া দেখা হইয়াছে যে, উক্ত কলম দুইটী হইতে ভূমির উর্দ্ধভাগেই মূল সদৃশ ফল উৎপাদিত হইয়াছে, আর টমাটো ও বৎসর কাল স্থায়ী সূর্য্যমুখীর মূলে নূতন শক্তি সঞ্চারিত হইয়া তাহাদের স্থায়ী শিকড় বাহির হইয়াছে এবং তাহারা স্থায়ী গাছে পরিণত হইয়াছে। বিপরীত পরীক্ষা দ্বারাও অর্থাৎ আলু গাছে টমাটোর কলম করায় প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, এতদ্বারা আলু গাছের উপরে টমাটো ফলিবে এবং মাটির ভিতরে আলু ফলিবে। অবশ্য একটি অপেক্ষা আর একটি অধিক পরিপুষ্ট হইবে। বিষয়টী বিশেষ কৌতুকপ্রদ এবং এখানে সহজে পরীক্ষিত হইতে পারে।

বেরার এবং মধ্যপ্রদেশে খাদ্য শস্য।—এখানকার খাদ্য শস্যের মধ্যে ধান, জোয়ার, গম, ছোলা, তুর, কোদো, কুল্‌টী এবং মসুর। কৃষি বিবরণীতে প্রকাশ যে এখানে এবৎসর ৪.৪১৯,৪০০ টন খাদ্য শস্য উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা বিগত বর্ষ অপেক্ষা শতকরা ৬৯ অংশ পরিমাণে অধিক। অত্রস্থ অধিবাসীগণেরও গবাদির জন্য নানা কারণে লোকসান বাদ দিয়া ধরিলেও ৩,৭১০,০০০ টনের অধিক শস্য আবশ্যক হয় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে তথায় ৭০০,০০০ টন শস্য অধিক জন্মিয়াছে।

ভেজাল সরিষার তৈল।—কলিকাতার বাজারের কথা দূরে থাক সুদূর পল্লীগ্রামেও আজকাল খাঁটি সরিষার তৈল মিলে না। কেহ গুজব তুলিয়াছেন যে ডাক্তারেরা নাকি বলিয়াছেন ভেজাল সরিষার তৈল ব্যবহারেই বেরী বেরী রোগ হইতেছে। গুজব সত্য কি মিথ্যা হউক তাহা দেখিবার দরকার নাই। গুজব ছড়াইয়া পড়িলে যদি অনেকে ভেজাল তৈল ব্যবহারে নিরস্ত হন তবে মঙ্গল হয়। আমরা ভেজাল চাই, আমরা ভেজাল তৈল খাই বলিয়া ত ব্যবসাদারেরা প্রকাশ্য লিখিয়া পড়িয়া "শোরগুজা, মূলা দানা, পোস্ত দানা মিশ্রিত সরিষার তৈল" বেচেন। একটু খাঁটি তৈলে যে কাজ হয় চারি গুণ ভেজাল তৈলে যে তাহার শতাংশের একাংশ কাজ হয় না, অথচ বিষ ভক্ষণ করা হয়। আমরা ভেজাল চাই, তাইত ভেজাল জোটে। কলিকাতা-মিউনিসিপাল হেলথ আফিস সরিষার তৈলওয়ালাদের আর কিছুই করিতে পারেন না, কারণ তাহারা যে লিখিয়া পড়িয়া একাজ করিতেছে। যত জুলুম গোয়ালাদের উপর। বেচারা গোয়ালারা এবার গলায় "খানার জল, ডোবার জল, বাতাসা মিশ্রিত, ময়দা মিশ্রিত, জল মিশান দুগ্ধ" বলিয়া একটা টিকিট ঝুলাইয়া দুধ বেচিলে বোধ হয় অব্যাহতি পাইতে পারে?

ম্যালেরিয়া নাশক বৃক্ষ।—বঙ্গদেশের জলা ভূমিই ম্যালেরিয়ার আকর। ইউক্যালিপ্টাস্ বৃক্ষ (Eucalyptus) জলা ভূমির চারিদিকে রোপণ করিলে উহারা ভূমির আর্দ্রতা নষ্ট করে। ইহার পাতায় এক প্রকার তৈল থাকে। এই তৈল পচন নিবারক ও রোগবীজাণুনাশক। সর্দ্দি, কাশ, স্বরভঙ্গ বা কোন ফুসফুসসংক্রান্ত-রোগে এই তৈল ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই বৃক্ষের নানা জাতি আছে। এই শ্রেণীর বৃক্ষের সকল জাতির কাণ্ড হইতে প্রচুর পরিমাণে আঠা বাহির হয়। ইহার মধ্যে ইউক্যালিপ্টাস গ্লোবিউলাস্ (E. Globulus) এই আঠা নির্গমের জন্য বিখ্যাত। ইহাকে এই জন্য ব্লুগম (Blue Gum) বৃক্ষ বলে। ইউক্যালিপ্টাস্ সিট্রিওডেরার (E. Citriodera) পাতায় লেবুর গন্ধ আছে। একটু হাতে রগড়াইলে লেবুর পাতার গন্ধ বাহির হয়। ইহার এক জাতীয় গাছ সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ এবং বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ গাছ (E. amygdalina)। অষ্ট্রেলিয়া ইহাদের জন্মস্থান। তথায় নানা জাতীয় ইউ-ক্যালিপ্টাস বৃক্ষের বন দেখিতে পাওয়া যায়। সেই বনে ৪০০ ফুট উচ্চ ইউক্যালিপ্টাস প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোনটা উচ্চতায় ৪৮০ ফুট হইয়া থাকে এবং তাহাদের পরিধি ১২০ হইতে ২০০ ফুট পর্য্যন্ত হয়।

ঝড়ে ক্ষতি।—৩১শে আশ্বিনের ভীষণ ঝড় পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের বিস্তর ক্ষতি করিয়াছে। পশ্চিম বঙ্গ অপেক্ষা পূর্ব্ব বঙ্গে ঝড়ের বেগ ও ক্ষতির পরিমাণ অধিক। গোয়ালন্দ ঘাটে অনেকগুলি জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে। নদীর ঘাট হইতে প্রায় হাজার মণ পাট ভাসিয়া গিয়াছে। খুলনা জেলায় ১০৪৫ মণ চাউল বোঝাই নৌকা মারা গিয়াছে। ময়মনসিং হইতে শস্য হানি ও নৌকা ডুবির সংবাদ আসিয়াছে। নানা স্থান হইতে প্রাণ হানির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বহু লোক গৃহ শূন্য হইয়াছে। তবে মন্দের ভাল এই যে, ঝড়ে ক্ষেত্রস্থ ধান্যের বিশেষ কোন ক্ষতি করে নাই।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

অগ্রহায়ণ মাস।

সব্জী বাগান।—বাঁধাকপি, ফুলকপি প্রভৃতির চারা বসান শেষ হইয়া গিয়াছে। সীম, মটর, মূলা প্রভৃতি বোনাও শেষ হইয়াছে। যদি কার্ত্তিকের শেষেও মটর, মূলা, বিলাতি সীম বোনার কার্য্য শেষ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে নাবী জাতীয় উক্ত প্রকারের বীজ এই মাসেও বোনা যাইতে পারে। নাবী আলু অর্থাৎ নৈনিতাল, বোম্বাই প্রভৃতি এই সময় বসান যাইতে পারে। পটল চাষের সময় এখনও যায় নাই। শীত প্রধান দেশে কিম্বা যথায় জমিতে রস অধিক দিন থাকে—যথা উত্তর-আসামে বা হিমালয়ের তরাই প্রদেশে এই মাস পর্য্যন্ত বাঁধাকপি, ফুলকপি বীজ বোনা যায়। নিম্নবঙ্গে কপি চারা ক্ষেত্রে বসাইতে আর বিলম্ব করা উচিত নহে।

দেশী সব্জী।—বেগুন, শাকাদি, তরমুজ, লঙ্কা, ভুঁই শসা, লাউ, কুমড়া, যাহার চৈত্র, বৈশাখ মাসে ফল হইবে তাহা এই সময়ে বসাইতে হয়। বালি আঁশ জমিতে যেখানে অধিক দিন জমিতে রস থাকে তথায় তরমুজ বসাইতে হয়।

ফুলের বাগান।—হলিহক, পিঙ্ক, মিগ্নোনেট, ভার্বিনা, ক্রিসান্থিমম ফ্লক্স, পিটুনিয়া, এষ্টারসম, সুইটপী ও অন্যান্য মরসুমী ফুল বীজ, বসাইতে আর বিলম্ব করা উচিত নহে। অগ্রহায়ণের প্রথমে না বসাইলে শীতের মধ্যে তাহাদের ফুল হওয়া অসম্ভব হইবে। যে সকল মরসুমী ফুলের বীজের চারা তৈয়ারি হইয়াছে, তাহার চারা এক্ষণে নির্দ্দিষ্ট স্থানে রোপণ করিতে হইবে বা টবে বসাইয়া দিতে হইবে

ফলের বাগান।—ফলের বাগানে যে সকল

গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল, কার্ত্তিক মাসে তাহাদের গোড়ায় নূতন মাটি দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, যদি না হইয়া থাকে তবে এ মাসে উক্ত কার্য্য আর ফেলিয়া রাখা হইবে না। পাঁক-মাটি চূর্ণ করিয়া তাহাতে পুরাতন গোবর সার মিশাইয়া গাছের গোড়ায় দিলে অধিক ফুল ফল প্রসব করে।

কৃষি-ক্ষেত্রে।—মুগ, মসুর, গম, যই, যব, ছোলা প্রভৃতির আবাদ যদি কার্ত্তিক মাসের মধ্যে শেষ হইয়া না থাকে, তবে এমাসের প্রথমেই শেষ করা কর্ত্তব্য। একেবারে না হওয়া অপেক্ষা বিলম্বে হওয়া বরং ভাল, তাহাতে ষোল আনা না হউক কতকপরিমাণে হইবেই। পশুখাদ্যের মধ্যে মাঙ্গোল্ড বীটের আবাদ এখনও করা যাইতে পারে। কার্পাস ও বেগুন গাছের গোড়ায় ও নব রোপিত বৃক্ষের নিম্নে আইল বান্ধিয়া দেওয়া এ মাসেও চলিতে পারে। যব, যই, মুগ, কলাই, মটর এই সকল রবি শস্যের বীজ বপন এবং পরে গমের বীজ বপন; আলু ও বিলাতি সব্জীর বীজ লাগান এ মাসেও চলিতে পারে; কপির চারা নাড়িয়া ক্ষেত্রে বসান হইয়াছে, তাহাদের তদ্বির করাই এখন কার্য্য। তরমুজ ও খরমুজের বীজ বপন; মূলা, বীট, কুমড়া, লাউ, শসা, ধনে, পেঁয়াজ ও বরবটীর বীজ বপন করা হইয়াছে, ঐ সকল ক্ষেত্রে কোদালির দ্বারা ইহাদের গোড়া আল্‌গা করিয়া দেওয়া; আলুর ক্ষেত্রে জল দেওয়া এই মাসে আরম্ভ হইতে পারে; বিলাতি সব্জীর ভাঁটিতে জল সিঞ্চন, প্রাতে বেলা ৯টার সময় উহাদের আবরণ দিয়া সন্ধ্যার সময় আবরণ উঠাইয়া লওয়া; বার্ত্তাকু, কার্পাস ও লঙ্কা চয়ন ও বিক্রয়; কচু, সাদা ও রাঙ্গা আলু উঠান ও বিক্রয়; ইক্ষুর ক্ষেত্রে জল সেচন ও কোপান এই সময়ের কার্য্য।

গোলাপের পাইট।—কার্ত্তিক মাসে যদি গোলাপের গাছ ছাঁটা না হইয়া থাকে, তবে এ মাসে আর বাকি রাখা উচিত নহে। বঙ্গদেশে বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনার সময় কাটিয়াছে। কালী পূজার পর ঐ কার্য্য করিলে ভাল হয়, উত্তর পশ্চিম ও পার্ব্বত্য প্রদেশে অনেক আগে ঐ কার্য্য সমাধা করা যাইতে পারে। গোলাপের ডাল, "ডাল কাটা" কাঁচি দ্বারা কাটিলে ভাল হয়। ডাল ছাঁটিবার সময় ডাল চিরিয়া না যায় এইটী লক্ষ্য রাখিতে হইবে। হাইব্রিড গোলাপের ডাল বড় হয়, সেইগুলি গোড়া ঘেঁসিয়া কাটিতে হয়। টী-গোলাপ খুব ঘেঁসিয়া ছাঁটিতে হয় না। মারসাল নীল প্রভৃতি লতানিয়া গোলাপের ডাল ছাঁটিবার বিশেষ আবশ্যক হয় না, তবে নিতান্ত পুরান ডাল বা শুষ্কপ্রায় ডাল কিছু কিছু বাদ দিতে হয়। ডাল ছাঁটার সঙ্গে সঙ্গে গোড়া খুঁড়িয়া আবশ্যক মত ৪ হইতে ১০ দিন রৌদ্র খাওয়াইয়া সার দিতে হয় জমি নিরস থাকিলে তরল সার, জমি সরস থাকিলে গুঁড়া সার ব্যবহার করা বিধেয়। গামলায় গোময়, সরিষার খৈল, গোমূত্র ও অল্প পরিমাণে এঁটেল মাটি একত্র পচাইয়া সেই সার জলে গুলিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। সার জল নাতি তরল নাতি ঘন হইবে। গুঁড়া সার সরিষার খৈল এক ভাগ,

গোময় সার এক ভাগ, পোড়া মাটী এক ভাগ এবং এঁটেল মাটি দুই ভাগ একত্র করিয়া মিশাইয়া ব্যবহার করিতে হয়। গাছ বুঝিয়া প্রত্যেক গাছে সিকি পাউণ্ড হইতে এক পাউণ্ড পর্য্যন্ত এ সার দিতে হয়। ঐ মিশ্র সারে একটু ভুসা মিশাইলে মন্দ হয় না, ভুসা কলিকাতার বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। প্রতি ২০ পাউণ্ড মিশ্র সারে এক পেকেট ভুসা যথেষ্ট, ভুসা দিলে গোলাপের রঙ্গ বেশ ভাল হয়।

...RED No. C 193

কৃষক

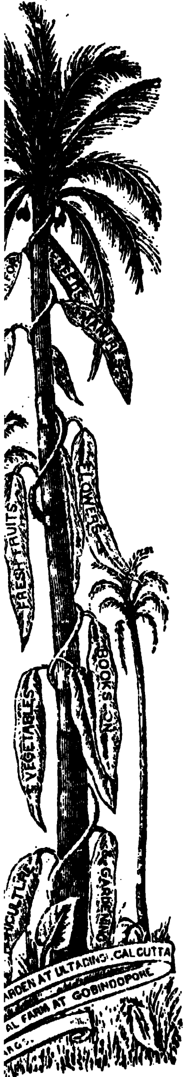
ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসনের মুখপত্র

অগ্রহায়ণ, ১৩১৬।

REGISTERED No. C. 194

কৃষক।

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।



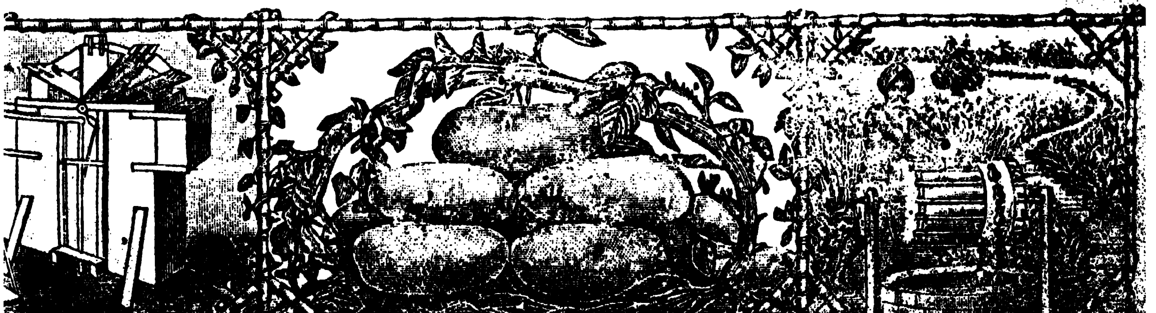
দশম খণ্ড,—৮ম সংখ্যা।

সম্পাদক—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস্।

অগ্রহায়ণ, ১৩১৬।

কলিকাতা ; ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন
শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা ; ১৯৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, দি মিলার প্রিণ্টিং ওয়াকস্ হইতে
এস, এইচ, রহমান দ্বারা মুদ্রিত।



কৃষক।

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১০ম খণ্ড। | অগ্রহায়ণ, ১৩১৬ সাল। | ৮ম সংখ্যা।

পশু চিকিৎসা।

শ্রীকুঞ্জবিহারি দে লিখিত।

রাজযক্ষ্মা।

এই পীড়া গোরুর প্রায়ই হয়। ইহা বিশেষ বিষজনিত ও সংক্রামক ধর্ম্মাক্রান্ত। মনুষ্যেরও এই রোগ হয়।

কারণতত্ত্ব।—এই পীড়া "ব্যাসিলাস্ টুবর কিউলোসিস্" নামক অনুদেহী নিচয় হইতে হইয়া থাকে। শ্বাস প্রশ্বাস সংযোগে ও খাদ্যবস্তুসহ এই রোগের বিষ শরীরে প্রবেশ করে। এই রোগের বিষ ফুস্ফুস্ মধ্যে প্রবেশ করিয়া ক্ষয়রোগ জন্মায়। মস্তিষ্ক, প্লুরা, পেরিটনিয়াম (অন্ত্র ও পাকস্থলী ইত্যাদির আবরক), মেসেণ্টারিকাগ্লাণ্ড (অন্ত্রে এই সকল গ্লাণ্ড অবস্থিতি আছে), অস্থি ও অন্যান্য যন্ত্র-নিচয়ে এই রোগের বিষ প্রবেশ করে। যে সকল গাভী অধিক দুধ দেয় তাহাদের এই রোগ প্রায়ই হয়। গাভীর এই পীড়া থাকিলে বাছুরেরও এই রোগ হইতে পারে। নানাবিধ ক্ষয়কারী পীড়া নিচয় এই রোগের মুখ্য কারণ। যে সকল গাভীর বক্ষঃস্থল অপ্রশস্ত তাহাদেরও এই রোগ অধিক হয়।

সম সংজ্ঞা—যক্ষা, রাজ যক্ষা, যক্ষাকাশ।

রোগ পরিচয়।—ইহা একটী প্রাচীন স্বভাবাপন্ন ক্ষয় রোগ। এই রোগে ফুস্ফুসে ঢেলা-পানা পদার্থ নিচয় উদ্ভূত হয় ও স্থানে স্থানে উত্তেজনা বশতঃ ধীরে ধীরে প্রদাহ জন্মায়।

রোগ লক্ষণ।—কাশি—জোরে কাশিতে পারে না এবং এক প্রকার মৃদুভাবাপন্ন ঘর ঘর শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। গাভী সাঙ্কর্য্যের জন্য অস্থিরতা প্রকাশ করে কিন্তু এই রোগে পীড়াগ্রস্ত গাভী প্রায়ই বন্ধ্যা হয়। এই রোগে চর্ম্ম শুষ্ক থাকে; রোম সমূহ খাড়া হয় ও অল্প অল্প জ্বর থাকে। নাসিকা ও চক্ষুস্থ ঝিল্লিবলী ঈষৎ কৃষ্ণাভ দৃষ্ট হয়। শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট অনুভব করে। পার্শ্ব বেদনা থাকে। কোমরে ও পাঁজরায় টিপিলে বেদনা অনুভব করে। রোগী ক্রমশঃই দুর্ব্বল হইতে থাকে। এই সময়ে রোগী অত্যন্ত কষ্টের সহিত কাশিয়া থাকে ও একবার কাশিতে অনেক সময় লাগে। শ্বাস কৃচ্ছ্র; আহারে অনিচ্ছা, গায়ে চর্ম্ম লাগিয়া থাকে; গায়ে আঁঠালু নামক পোকা

দেখিতে পাওয়া যায়। কাশি গলা ভাঙ্গার ন্যায় শ্রুত হয় ও রোগী কাশিতে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করে। গয়ার উঠে; কোন কোন রোগীর রক্ত উঠা দেখিতে পাওয়া যায়। উদরাময় হয় ও রক্তহীনতা হেতু ভয়ানক দুর্ব্বল হইয়া রোগী প্রাণ ত্যাগ করে।

গর্ভবতী গাভীর গর্ভপাত হয়। এই রোগে গাভীর দুগ্ধ ঈষৎ নীলাভ, পাতলা ও দুর্গন্ধযুক্ত হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যে টক্ হইয়া যায়।

চিকিৎসা।—এই রোগে রোগী প্রায়ই বাঁচে না। অধিক পুষ্টিকর দ্রব্য খাওয়াইতে পারিলে রোগীকে অনেক দিন পর্য্যন্ত বাঁচান যায়। উপসর্গানুযায়ী রোগীর চিকিৎসা করিবে। সংক্রামক রোগ নিবারক নিয়মাবলী সম্যকরূপে পালন করিবে।

খুলনা জেলায় পানের চাষ।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখিত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

যে পান ক্ষেত্রে জন্মে ও বহুল পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া ব্যবসায়ের পণ্য রূপে নির্ব্বাচিত হইয়া আসিতেছে ও যদ্দ্বারা দেশের অভাব বিমোচন হয়, এবং চাষ করিতে হইলে যে জাতীয় পানের অবস্থাভিজ্ঞ হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য, এইবার আমরা তাহারই উল্লেখ করিব। গাছ পান প্রভৃতিতে গৃহস্থের উপকার সাধন হয় বটে কিন্তু সাধারণের অভাব পূরণ হয় না। এই কৃষি আরম্ভ করিতে হইলে বালি দো-আঁস প্রথম শ্রেণীর উদ্বাস্ত একখণ্ড জমি বাছিয়া লইয়া, কোদালি দ্বারা উহার অর্দ্ধ ফুট বা চারি ইঞ্চ মাটি কাটিয়া স্থানন্তরিত করিয়া, ৪ ফিট অন্তর ছয় সাত ইঞ্চ পরিসর ও ভূমির সম দীর্ঘ এক একটা লম্বা "পিলি" সূত্র পাতন দ্বারা, সুদীর্ঘ সরল রেখায় স্থান খুঁড়িয়া তন্মধ্যস্থ মাটি পাইট করিয়া ধুলিতে পরিণত করিতে হইবে। ফাল্গুনে পান রোপণের ইচ্ছা থাকিলে কার্ত্তিক হইতে, আর আষাঢ়ে রোপণেচ্ছু হইলে মাঘ মাসের প্রথম হইতেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। উপরের মৃত্তিকা কাটিয়া স্থানান্তরিত করার প্রয়োজন এই যে, সমূলে তৃণ সমূহ বিদূরিত ও ভূপৃষ্ঠের কঠিন মৃত্তিকাসহ খোলা ও কঙ্করও দূরীভূত হইয়া কোমল অমিশ্র পরিপাটী মৃত্তিকা বাহির হইবে। তৎপরেও যে পিলি কাটা ও খনিত হইবে সে মাটি হইতেও কঠিন কাষ্ঠ কঙ্করাদি বাছিয়া ফেলিতে হইবে; পরে ফাল্গুন বা আষাঢ়ে চারা সংগ্রহ করিয়া সুস্থ,

সরল, রোগ সম্পর্ক শূন্য চারা বাছিয়া লইয়া, ছয় সাত ইঞ্চ অন্তর এক এক স্থানে দুই দুইটি চারা এক এক গর্ত্তে পিলির দক্ষিণ পার্শ্বে রাখিয়া, ঠিক উহারই সম সূত্রে বাম পার্শ্বে অপর গর্ত্তে আর দুইটি রাখিবে। এইরূপ সুশৃঙ্খলা অনুসারে চারা রোপণ করিয়া তাহার মূলদেশের মৃত্তিকা অঙ্গুলি দ্বারা সজোরে চাপিয়া দিবে ; এমন চাপিয়া দিবে যে চারার মূলদেশের মৃত্তিকায় কিছু মাত্র রন্ধ্র রহিয়া না যায় ; পরে অবিলম্বে জল সেচন করিয়া চারার মূলদেশে বায়ু প্রবেশের পথও বন্ধ করা আবশ্যক। যদি স্বভাবজ চারার একান্ত অভাব ঘটে, তাহা হইলে পানের পুরাতন লতা খণ্ড খণ্ড করিয়া রোপণ করিলেও চলিতে পারে। পুরাতন লতা খণ্ডের উভয় প্রান্তের শিকড় ভাঙ্গিয়া না যায় সেদিকে সযত্ন দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ঐরূপ লতাকে মৃত্তিকা মধ্যে শায়িত ভাবে রাখিয়া তাহার উপর অল্প অল্প মাটি চূর্ণ চাপা দিলেও সত্বর চারা বাহির হয়, সে চারাকে বারুইগণ "খাশি চারা" নামে প্রখ্যাত করে। সে যাহা হউক, স্বভাব জন্মা চারাই হউক আর কৃত্রিম উপায়ে লতার কচের প্রস্তুত খাশি চারাই হউক, উহা রোপণের পরে মধ্যে মধ্যে জল সিঞ্চন আবশ্যক ; এজন্য আষাঢ় মাসেই রোপণ শ্রমলাঘবের শ্রেষ্ঠ উপায়, কিন্তু তাহার বিশেষ দোষ এই যে বৎসরান্তে পুনরায় আষাঢ় আগত না হইলে ফললাভের অর্থাৎ পর্ণ-চয়নের কোন সম্ভাবনাই ঘটে না ; কিন্তু ফাল্গুন রোপিত চারায় যদিও জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত জল সিঞ্চন জন্য শ্রম ও ব্যয় বাহুল্য ঘটে বটে, তথাপি আষাঢ়, শ্রাবণের বর্ষা সমাগমে লতা পত্রপুঞ্জে সুশোভিত হইয়া উঠে ও অনতিদীর্ঘ ঐ সময়ের মধ্যেই বিস্তর নূতন পান চয়ন সম্ভবপর হয়। আবার পূর্ব্ববর্ত্তী আষাঢ়ে যে চারা রোপিত হইয়াছিল তাহাতে যদিও ফাল্গুন মাস হইতে নব নব পত্রোদ্গম আরম্ভ হয়, তথাপি আষাঢ়ের পূর্ব্বে উহা আহরণের উপযোগী ও গাছগুলি রীতিমত পরিপুষ্ট হইয়া উঠে না। নূতন পানকে পানের ব্যবসায়ীগণ নয়াইল পান বা নৈচে-পান কহে।

পানের চারা রোপিত হওয়ার পরে বর্ষাকালে যখন গাছ লাগিয়া যাইয়া নব নব পত্র ও শিকড় বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ হইবে, সেই সময়ে সরিষার খইলের অতি সূক্ষ্ম চূর্ণ একটা পাত্রে বাম হস্তে ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলির অগ্রভাগে ধৃত করিয়া অল্প অল্প গুঁড়া ঐ পিলির মধ্যে ও পাতলা ভাবে চারার মূলে ছড়াইয়া দিতে হইবে। কপি প্রভৃতির ন্যায় চারার মূলে অধিক খইলের গুঁড়া দিলে চারা খইলের তেজে নিশ্চয়ই দুর্ব্বল ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে ; সুতরাং অল্প অল্প গুঁড়া কেবল মাত্র বর্ষা ঋতুতে (অন্য ঋতুতে নহে) অঙ্গুলিতে ধরিয়া ছড়াইতে হইবে। খইলের গুঁড়া কেবল মাত্র বর্ষা কয় মাস দিতে হইবে এবং পোনর কুড়ি দিবসান্তে এক একবার খইল দিয়া সমস্ত বর্ষা ঋতুতে ছয় সাত বার মাত্র প্রয়োগ আবশ্যক। তাহাতে প্রতি বৎসর প্রতি বিঘায় দশ মণ পরিমাণ খইল লাগিবে (অত্যধিক খইল প্রয়োগে পানেও কাল দাগ হইয়া পচিয়া যাইবে) এবং তাহাতেই পর্য্যাপ্ত সার দেওয়া হইবে। প্রথম বৎসরে এইরূপ পাইট করিয়া পর বৎসরে বর্ষার পূর্ব্বে কঙ্করাদি বিহীন পরিষ্কার বেলে দো-আঁস মাটির তৃণ, কাষ্ঠ, খোলা ও তৃণের মূল অংশ পরিবর্জ্জনান্তে, বিশুদ্ধ অমিশ্র পরিষ্কার সুকোমল মাটি আনিয়া চারার পিলিতে ও উভয় পিলির মধ্যের অবসর স্থানে নূতন মাটি দিবে। এস্থলে বলা আবশ্যক যে পর্ণ লতার মূলদেশে অবস্থিত স্থান অপেক্ষা ফাঁকা চারি ফিট স্থানই মাটি দিয়া অধিক

উচ্চ করিয়া ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি বর্দ্ধিত করিতে হইবে এবং যতকাল বরজ কার্য্যকরী ও জীবিত থাকিবে, ততকাল প্রতি বৎসরই নূতন মৃত্তিকা এবং খইল চূর্ণ প্রয়োগ করিতে হইবে।

বসন্ত ঋতুর সমাগম অর্থাৎ শীতান্ত হইয়া গেলেই অন্যান্য লতা বল্লরীর ন্যায় পর্ণ লতার ও পত্রোদ্গম আরম্ভ হইবে। অবস্থানুসারে ফাল্গুন মাস হইতেই পত্র জন্মিবার সময় আমরা নির্দ্দেশ করিলেও প্রকৃত পক্ষে মাঘ মাস হইতেই তাহার সূচনা হয়। পান ক্ষেত্রের চতুঃস্পার্শে খেজুর, তাল প্রভৃতি জাতীয় বৃক্ষের পত্র অথবা নল কি বংশ শাখা (কঞ্চি) দিয়া, অর্দ্ধ হস্ত কি একফুট অন্তর স্থূল বংশ অথবা অন্য সরল কাষ্ঠ খণ্ড অথবা লৌহ দণ্ড ভূগর্ভে নিহিত করিয়া উত্তমরূপে ঘিরিয়া ফেলিবে। বেড়া এরূপ ভাবে দেওয়া চাই যে গো, ছাগ প্রভৃতি পশুর দৌরাত্ম হইতে ক্ষেত্র রক্ষা হইবে অথচ প্রবল ঝটিকা ও প্রবহমান বায়ুর প্রকোপও নিবারণ হইবে। প্রবল বায়ু পানের লতা স্পর্শ করিলেই ভূলুন্ঠিত ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে, এজন্য ক্ষেত্রে যথেষ্ট বায়ু প্রবেশের পথও রাখিতে হইবে আবার বাতাস জোরে না লাগে তজ্জন্য তাহার পথ রুদ্ধও করিতে হইবে। চতুঃসীমা এইরূপে ঘিরিয়া উর্দ্ধ দেশেও ছায়া মণ্ডপ বা বিতান নির্ম্মাণ করিতে হইবে। ছায়া মণ্ডপ নির্ম্মাণ প্রণালীও স্বতন্ত্র; ইহার চতুস্পার্শ্বে যদিও স্থূল ভারসহ খুঁটী দিতে হইবে বটে কিন্তু মধ্যে ঐরূপ খুঁটী দেওয়া চলিবে না, মধ্যে খুঁটীর পরিবর্ত্তে বাঁশ চারিফাল করিয়া বাকারী করিয়া, সেই বাকারীর অগ্রভাগের অর্দ্ধ হস্ত নিম্নে রজ্জুবেষ্টনে আবদ্ধ করিয়া, ঐ বাকারীর মূলদেশে পূর্ব্ব রোপিত লতাদ্বয়ের অতি নিকটে ত্রিপদীর পায়ার ন্যায় চারিটি ঝাড়ের মূলে চারিখানি বাকারী পুঁতিয়া দিবে। এইরূপ করার অভিপ্রায় এই যে এক ঝাড়ে রোপিত চারাদ্বয়ের একটির অবলম্বন যষ্টির কার্য্য ও ছায়া মণ্ডপের স্তম্ভ বা খুঁটির কার্য্য একাধারে ঐ এক বাকারীতেই সুসম্পন্ন হইবে। আরও অধিক লাভের বিষয় এই যে চতুস্পদির আকারে বাকারী বসানয় উহার চারি পদে চারি ঝাড়ের চারিটি চারার আশ্রয় বা অবলম্বন উহা দ্বারাই সুসম্পন্ন হইল। ঐ চারি ঝাড়ে আর চারিটি চারা যাহা অবশিষ্ট রহিল, তাহাদিগের উর্দ্ধে উত্থিত হওয়ার জন্য আর চারিটি নল তৃণ ঝাড়ের সন্নিকটে এক একটি চারার অবলম্বন দণ্ড বা স্তম্ভরূপে নিহিত করিবে; সম্ভবতঃ কঞ্চি দ্বারাও ঐ কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে। উপরে যে নলের কথা বলা হইল ঐ নল ও খড়ি এবং অস্থি নামক গুল্ম দ্বারা ক্ষেত্রের চারি পার্শ্বের বেড়া (বৃতি) ও অতি সুন্দররূপে সুসম্পন্ন হইতে পারে। সে যাহা হউক বাকারীর যে চতুস্পদির কথা বলা হইল ঐরূপ চতুস্পদি এরূপ ভাবে সমস্ত ক্ষেত্রে বসাইবে যে, সমুদয় ঝাড়ের এক একটি চারা উহার এক এক স্বতন্ত্র বাকারীকে আশ্রয় প্রাপ্ত হয়। এইরূপে বাকারী বসাইয়া তাহার মস্তকের বদ্ধ রজ্জুর উপর লম্বা সরল সুদীর্ঘ বাঁশের পাইড় দিয়া, তদুপরি বাঁশের চটা (বাকারী) ঘন, ঘন বাঁধিয়া দিয়া তাহার উপর কেশে (কাশ তৃণ) বিছাইয়া দিবে। কাশ তৃণ এরূপ ভাবে বিস্তৃত করিতে হইবে যে উহার পরস্পরের বিচ্ছেদ অবকাশ দিয়া ক্ষেত্রে অল্প অল্প রৌদ্র প্রবেশ করিতে পারে অথচ রৌদ্রাধিক্য না হয়। ক্ষেত্রের উপরিভাগে যে মঞ্চ বা ছায়া মণ্ডপ করিতে হইবে তাহা পাঁচ ছয় হস্ত পরিমিত উচ্চ হওয়া আবশ্যক, উহার মধ্যে সর্ব্বদা ক্ষেত্রপাল সহজে ও বিনা বাধায় গমনাগমন করিতে পারে। এরূপ ভাবে মঞ্চ নির্ম্মাণ সুযুক্তি সঙ্গত চিরাচরিত

প্রথা। মঞ্চ নিম্ন হইলে কোন মতে কার্য্য চলিবে না, তাহাতে প্রথম বাধা ক্ষেত্রপালের গমনাগমনের ব্যাঘাত ; দ্বিতীয় বাধা লতা আশানুরূপ বর্দ্ধিত হইতে না হইতেই তাহার পরিবর্দ্ধনে বাধা পড়িবে ; কারণ অপর লতার ন্যায় পর্ণ লতাকে স্বেচ্ছানুরূপ ও স্বাভাবিকরূপে বিবর্দ্ধিত হইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। লতাটি উর্দ্ধভাগের মঞ্চ পর্য্যন্ত স্বেচ্ছানুরূপ বাড়িতে দিবে, উহার অগ্রভাগ মঞ্চ স্পর্শ করিলেই লতার অগ্রদেশে বিবেচনা মত পত্র রাখিয়া উহার মূল ও মধ্যভাগ হইতে পত্র সমূহ এক একটি করিয়া বৃন্ত মূল ছেদন করিয়া লইয়া, ধীর ও কোমল হস্তে নিষ্পত্র লতাটিকে তাহার আশ্রয় দণ্ড হইতে নিম্নে পাতিত করিয়া, দাঁড়া বা আইলের উপর পার্শ্বাপার্শ্বি ভাবে গোল চক্রাকারে সর্প কুণ্ডলীর ন্যায় কুণ্ডলী পাকাইয়া সাজাইয়া রাখিবে, ও বিতস্তি পরিমাণ অথবা তাহারও অধিক লতার সর্ব্বাগ্রভাগ পত্রপুঞ্জ-সহ অতি সন্তর্পণে পূর্ব্ব স্থাপিত পুরাতন, অথবা পুরাতন দণ্ড ভগ্ন বা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে তৎপরিবর্ত্তে নূতন দণ্ড স্থাপন করিয়া, ঐ আশ্রয় দণ্ড গাত্রে লতার অগ্রভাগ সংযোজিত ও সংবদ্ধ করিয়া দণ্ডের মূলদেশে ও সন্নিকটে মৃত্তিকার উপর লতার যে অংশ সরল ভাবে ভূপৃষ্ঠে পতিত রহিবে, তদুপরি পুনরায় পূর্ব্ববৎ বিশুদ্ধ দো-আঁস চূর্ণ মৃত্তিকা স্থাপন পূর্ব্বক উভয় হস্তে সজোরে চাপিয়া দিয়া জলসেকে মৃৎরন্ধ্র বিনষ্ট ও লতার রস সঞ্চার করিয়া দিবে। লতা ও পত্রেও অল্প অল্প জলের ছিটা দিবে, লতার মূলে আলগা মাটির উপর জল সেচন কালে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে যে, মৃত্তিকা ধৌত হইয়া লতা বাহির হইয়া না পড়ে বা জলের পতন বেগে মাটির চাপ ভাঙ্গিয়া কিছু মাত্র মাটিও সরিয়া না যায়। এইরূপে যথা ক্রমে লতাটি স্থাপিত হইলে ঐ নূতন প্রদত্ত মৃত্তিকা মধ্যে শিকড় বাহির করিয়া গাছ পুনর্ব্বার নূতনত্ব প্রাপ্ত হইবে। যদিও নূতন চারা বসানর ন্যায় সমুদয় পাইট পুনঃপুনঃ করিতে হইবে, কিন্তু লতার অগ্রভাগকে পুরাতন লতা হইতে কর্ত্তন বা বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবে না। বিচ্ছিন্ন করিলে চারা বাঁচিতে পারে বটে কিন্তু নূতন বরজের ন্যায় ঐ চারা বিবর্দ্ধিত ও সতেজ হইতে বহু বিলম্ব ঘটিবে। লতা কুণ্ডলীকৃত করণ কার্য্য বৎসরে দুইবার অর্থাৎ আষাঢ় ও ফাল্গুনে করিতে হইবে, কিন্তু তাহাতে ক্ষেত্রস্বামীর অর্থাগমের কিছুমাত্র ক্ষতি বা সঙ্কোচ ঘটিবে না, কারণ যখন বরজের একাংশের পাইট চলিতে থাকিবে তখন অপরাংশের পত্র চয়ন সম্পূর্ণ আয়ত্ব রহিবে। বরজের কার্য্যে লাঙ্গলের চাষ অসম্ভব ও অনাবশ্যক। বারুইকে সকল সময় তীক্ষ্ণ দৃষ্টির ও সুবুদ্ধির সহিত বরোজ পর্য্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান নিরত থাকিতে হইবে যে কোন স্থানে একটি মাত্রও তৃণ অঙ্কুরিত বা উপচিত হইতে না পারে। অধিকন্তু পর্ণ উত্তোলন, লতা মূলে জল সেচন, বায়ু তাড়িত ভূপতিত লতার উদ্ধার সাধন ও তাহাকে যথাস্থানে স্থাপন, চূর্ণ খইল প্রক্ষেপ. চারার মূল শিথিল ও মৃত্তিকার অভাব হইলে তাহার পূরণ, অপ্রয়োজনীয় নূতন চারা উত্থিত হইলে তাহার সংহার সাধন, এবং খোলা ইষ্টক, কঙ্কর, অস্থি ও কাষ্ঠ খণ্ড ক্ষেত্র হইতে অপসারিত করণ তাহার নিত্য ব্রত। এতদ্ব্যতীত সময় সময় নিড়ানী দ্বারা চারার মূল দেশের মৃত্তিকা খনন করিয়া শিথিল করিয়া দেওয়াও প্রয়োজন। উপরি উক্ত রূপে সযত্নে সার প্রদান ও পাইট রাখিতে পারিলে এক একটি বরজ বিশ ত্রিশ বৎসরেরও অধিক কাল স্থায়ী হইয়া, বরজ স্বামীর আয়ের পথ পরিষ্কৃত রাখিয়া ক্রমেই তাহাকে ধনবান ও ক্রমে লক্ষপতিতে উন্নীত করিবে।

একটি এক বিঘার বরজ করিতে হইলে প্রথম বর্ষে প্রায় একশত মুদ্রা ব্যয়ের সম্ভব কিন্তু বর্ষাকালের মধ্যেই সার্দ্ধ দ্বিশত মুদ্রা যে আয় হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অল্প ভূমি অপেক্ষা অধিক ভূমির কৃষির ব্যয় পরিমাণে অল্প লাগিবে এবং প্রথম বৎসরের পরে কএক বৎসর অতি অল্প মাত্র ব্যয় ও প্রভুত পরিমাণে লাভ হইবে। পরে যে বৎসর পুরাতন মঞ্চ কি বৃতির ধ্বংশ সাধন ও নূতন নির্ম্মাণ করিতে হইবে সে বৎসর কিছু ব্যয়াধিক্য হইলেও প্রথম বৎসরের ন্যায় অত্যধিক ব্যয় বাহুল্য আর কোন বৎসরই করিতে হইবে না। পানের চাষ করিতে হইলে দুই এক বিঘা ক্ষেত্র করা কর্ত্তব্য নহে, অনুন দশ বিঘা জমিতে ক্ষেত্র স্থাপন করা কর্ত্তব্য। আর কেবল পানের চাষ বলিয়াই নহে, কৃষি সম্বন্ধে সাধারণ নিয়মই এই যে বিবিধ শ্রেণীর জমিতে নানাবিধ শস্য ও বিভিন্ন প্রকারের ফলমূল বিস্তৃত রূপেই করা আবশ্যক তদ্ভিন্ন কখনই কৃষি কল্যাণপ্রদ হয় না। পানের বরজের স্থান বিশেষে চই, চুপ্‌ড়ি আলু, সাঁক আলু, পুঁই ডাঁটা, ওল, মানকচু, উচ্ছে, পটল ও সুপারি বৃক্ষ ও রোপিত হইয়া তাহার বিক্রয় লব্ধ অর্থেও ক্ষেত্রস্বামীর কিঞ্চিৎ আয় হইয়া থাকে। বরোজের পটল অতি উপাদেয় ও খুব বড় বড় হয়। আমরা উপরে যে আয় ব্যয়ের তালিকা প্রদান করিয়াছি উহা অবশ্য পূর্ব্বেকার হিসাবে স্বাভাবিক পানের বাজারের পাইকারের নিকট বিক্রয় লব্ধ অর্থের। যাহারা স্বহস্তে বাজারে, হাটে, খুচরা খরিদদারকে বিক্রয় করে তাহারা আরও কিছু অধিক লাভ প্রাপ্ত হয়। আর বিগত বৎসর হইতে যে রূপ চারি পাঁচটা পান পয়সায় বিক্রয় হইতেছে যদি এইরূপ দর স্থায়ী হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক ক্ষেত্রস্বামী ও ব্যবসায়ী অবিলম্বে যে ধনবান হইয়া উঠিবে তাহা অতি নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। আরও এস্থলে একথা বলা আবশ্যক যে ভবিষ্যতে যদিও পানের বাজার সস্তা হয় তাহা হইলেও কখনই সেই পূর্ব্বকালীন দর এক পণ দেড় পণ পান পয়সায় বিক্রয় হইবে না। ক্রয় বিক্রয়ের বাজারের একটা সাধারণ সর্ব্বকালীন ও সর্ব্বজনীন নিয়ম এই যে দ্রব্য সামগ্রী একবার মহার্ঘ ও দুর্ম্মূল্য হইয়া যদি শেষে পুনরায় সস্তা ও মুল্য হ্রাস হয় তাহা হইলেও পূর্ব্বকালের সেই দর আর কখনই ফিরিয়া আইসে না।

অন্যান্য কৃষির ন্যায় এই কৃষিতেও বাধা বিঘ্ন কিছু কিছু যে আছে তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। পর্ণ লতা গ্রীষ্মকালে অধিক রৌদ্র জন্য খরায়, বর্ষাকালে মূলে জল বসিয়া ত্বরায় মরিয়া যায়, তৃণ ভোজী গো, মেষ, ছাগাদি পশুতেও অনিষ্ট সাধন করে, শৃগাল, কুক্কুর বরোজ মধ্যে প্রবেশাধিকার পাইলে লতা ছিন্ন, পত্র ভগ্ন করিয়া অনিষ্ট সাধনে অক্ষম নহে; সজারু, কাটবিড়ালি ও যশোহর এবং খুলনার সন্নিকটবর্ত্তী গ্রামের বরোজ সমূহে লাপা নামক এক শ্রেণীর ক্ষুদ্র পশু এবং ইঁদুরেও পর্ণ ক্ষেত্রের অতিশয় ক্ষতি করে, আর উচ্চিংড়ে, ঘুরঘুরেও, সময় সময়, ক্বচিৎ পঙ্গপাল ক্ষেত্রে উৎপাতিত হইয়াও ক্ষেত্রের অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে। লাভ, ক্ষতি, উৎপন্ন, অজন্মা অবশ্য সকল ব্যবসায়েই আছে কিন্তু একথা আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে উৎকৃষ্ট পদ্ধতি এবং উপায় বিধান করিয়া যদি বিভিন্ন প্রকৃতির নানাবিধ শস্য বপন ও রোপণ করা যায় তাহা হইলে মোটের মাথায় লাভ আছে।

সাবাই ঘাস।

সাবাই ঘাস পার্ব্বত্য স্থানেই জন্মিয়া থাকে, সমতল ক্ষেত্রে বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। ঢালু পাহাড়ের উপরেই, যেখানে অন্যান্য শস্যের চাষ একেবারে অসম্ভব, এ সাবাই ঘাস সেইরূপ স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে এবং সতেজে জন্মে। যে সমতল ক্ষেত্রে বর্ষার জল জমে, সেখানে আদৌ এই ঘাস জন্মিতে পারে না। উচ্চ অথচ খোলা জায়গায় ইহা স্বচ্ছন্দে বর্দ্ধিত হয়। ছায়াযুক্ত স্থানে ইহার তেমন বৃদ্ধি হয় না। আর এক কথা, ইহা খুব বেশী বৃষ্টি সহ্য করিতে পারে না। যে বৎসর অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হয়, সে বৎসর ইহার তেমন তেজ হয় না, অধিকন্তু ইহার তন্তুগুলি অত্যন্ত নরম হইয়া পড়ে সুতরাং কার্য্যের উপযোগী হয় না। অন্যান্য অনেক প্রকার ঘাসের ন্যায় ইহারও একটি পালকের ন্যায় শীষ হয়। এই শীষগুলি বীজে পরিপূর্ণ থাকে। বীজগুলি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং লোমশ। অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও লোমশ হওয়ায় মৃদু বাতাসেই বীজগুলি শীষ হইতে বিযুক্ত হইয়া ক্ষেত্রের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। সাবাই ঘাস প্রধানতঃ দুই কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। প্রথমতঃ ইহা দ্বারা কাগজ প্রস্তুত হয়; দ্বিতীয়তঃ দড়ি প্রস্তুত হয়। কিন্তু ইহার দড়ি অন্যান্য দড়ির ন্যায় শক্ত নহে। তবে এই সুবিধা যে অন্যান্য দড়ি অপেক্ষা ইহার দাম অনেক সস্তা।

নেপাল প্রদেশেই উৎকৃষ্ট সাবাই ঘাস জন্মে। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় যে সাঁওতাল পরগণার রাজমহল মহকুমার অন্তর্গত স্থানে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে এই ঘাস জন্মিয়া থাকে। এই অঞ্চলের ঘাস সমস্তই সাহেবগঞ্জ ষ্টেসনে আনা হয় এবং তথা হইতে অন্যান্য স্থানে প্রেরিত হয়। সাঁওতাল পরগণায় ৬০ হইতে ৭৫ হাজার বিঘা ব্যাপিয়া ইহার আবাদ হয়। ইহার আবাদের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হয় না। অতি অল্প আয়াসেই ইহার আবাদ হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে পার্ব্বত্য প্রদেশেই ইহা যথেষ্ট পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। নিম্নলিখিত রূপে ইহার আবাদ হইয়া থাকে। প্রথমতঃ পাহাড়ের উপরিস্থিত সমস্ত গাছ পালা ও আগাছা বর্ষার পূর্ব্বে কাটিয়া ফেলিতে হয়, তৎপরে অবশিষ্ট জঙ্গল পুড়াইয়া সমস্ত স্থান পরিষ্কার করিতে হয়। তদনন্তর বর্ষাকালে বীজ ছড়াইয়া দিতে হয়। ইহাতে লাঙ্গল প্রভৃতি দিবার কোনই প্রয়োজন হয় না। জ্যৈষ্ঠ হইতে শ্রাবণ মাসের মধ্যে বীজ বপন করিতে হয়। একবার শ্রাবণ মাসে এবং পুনরায় আশ্বিন মাসে নিড়ান দেওয়া আবশ্যক। চারাগুলি ১॥ ফুট ব্যবধান থাকাই ভাল। তজ্জন্য যে স্থানে অত্যন্ত অধিক চারা জন্মে, সেখান হইতে কতকগুলি উঠাইয়া যেখানে কম জন্মে, সেখানে বসাইয়া দেওয়া উচিত। প্রথম বৎসরে ঘাস গুলি ১ ফুট বা ১॥ ফুট মাত্র উচ্চ হয়। প্রথম বৎসরের ঘাস দড়ি কিম্বা কাগজ প্রস্তুতের পক্ষে অনুপযোগী;

এজন্য প্রথম বৎসরের ঘাস কাটা হয় না। দ্বিতীয় বৎসরেও দুইবার নিড়ান দিতে হয়। এই সময়ে ঘাস গুলি আন্দাজ তিন ফুট উচ্চ হয়; এই বৎসরেও ঘাস গুলি যথেষ্ট শক্ত হয় না। সুতরাং এই সময়েও না কাটাই ভাল। তৃতীয় বৎসরে ঘাস গুলি পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়, ৬।৭ ফুট উচ্চ হয় এবং কার্য্যোপযোগী হয়। এই সময় হইতে প্রতি বৎসর একবার নিড়ান দিলেই চলে। জ্যৈষ্ঠ হইতে শ্রাবণ মাসের মধ্যে এরূপ ভাবে একবার নিড়ান দেওয়া আবশ্যক যেন ক্ষেত্রে সাবাই ঘাস ব্যতীত অন্য কোন আগাছা না থাকে।

প্রতি বৎসর একবার মাত্র ঘাস গুলি কাটিয়া লইতে হয়। ক্ষেত্র অনুসারে কার্ত্তিক হইতে পৌষ মাসের মধ্যে কাটিতে হয়। পুনরায় যখন বর্ষা আসে, ঘাস গুলি বাড়িতে থাকে এবং ২।৩ মাসের মধ্যে ৬।৭ ফুট উচ্চ হইয়া পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এইরূপে প্রতি বৎসর একবার করিয়া বিনা আয়াসে (কেবল মাত্র একবার নিড়ানি দ্বারা) ফসল পাওয়া যায়। পশুরা এই ঘাস খাইতে বড় ভাল বাসে, সুতরাং পশুরা যাহাতে ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে না পারে, সে বিষয়ে একটু সাবধান হইতে হইবে। যে ক্ষেত্রে একবার বীজ ছড়ান হয়, সে ক্ষেত্রে বরাবরই ঘাস জন্মিতে থাকে কিন্তু দেখা যায় যে প্রথম ১৫।১৬ বৎসর ফসল বেশ ভাল হয়, তৎপরে ক্রমশঃ কমিতে থাকে। এবং যখন দেখা যায় যে ফসল আর আশানুযায়ী হইতেছে না অর্থাৎ লাভজনক নহে তখন ক্ষেত্রটীকে পরিত্যাগ করিতে হয়। কিছু কাল এই ক্ষেত্র পতিত থাকিলে ইহা জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া যায় এবং যখন দেখা যায় যে সাবাই ঘাস নির্ম্মূল হইয়াছে তখন আবার পূর্ব্বোক্ত উপায়ে ক্ষেত্রটীকে পরিষ্কার করিয়া ফেলিলে ইহা পুনরায় বীজ বপনের উপযোগী হয়। কোন কোন কৃষি বিদ্যাবিদ্ বলেন যে সাধারণতঃ বৎসরে এই ঘাসের দুইবার ফসল হয়। বর্ষাকালের প্রথমে একবার কাটিয়া লইতে হয় এবং দ্বিতীয় বার বর্ষা-কালের শেষ ভাগে কটিতে হয়। তাঁহারা আরও বলেন যে সমতল ভূমিতেও ইহা জন্মে।

পৃথক পৃথক ক্ষেত্র অনুসারে ফসলের তারতম্য হইয়া থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতি বিঘায় ২০।২৫ মণ ঘাস উৎপাদন করে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ২।৩ মণ মাত্র জন্মায়। দেখিতে পাওয়া যায় যে গড়ে প্রতি বিঘায় আন্দাজ ১৫ মণ ঘাস জন্মে।

সাবাই ঘাস পার্ব্বত্য প্রদেশেই জন্মে। কিন্তু পাহাড়ীরা ইহার আবাদ বা ব্যবসা সম্বন্ধে কিছুই জানে না। সাধারণতঃ পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দুস্থানীরা পাহাড়ীদের নিকট হইতে ক্ষেত্র সকল জমা লয়। প্রতি বিঘায় ক্ষেত্র অনুসারে ৪৲ হইতে ৮৲ টাকা পর্য্যন্ত বাৎসরিক খাজনা দিতে হয়। প্রতি বিঘায় গড়ে ৫৲ টাকা খাজনা ধরা যাইতে পারে। এই সকল হিন্দুস্থানীদিগকে মহাজন কহে। পাছে জমির উপর এই সকল মহাজনদিগের কোন স্বত্ব জন্মায়, এই জন্য পাহাড়ীরা প্রতি বৎসর মহাজন-দিগের নিকট হইতে নূতন করিয়া জমাই খাজনা আদায় করে এবং যতদিন না খাজনা আদায় হয়

ততদিন কোন মহাজনকে ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে দেয় না।

মহাজনেরা ঘাস কাটা হইলে সাহেবগঞ্জে চালান দেয় এবং ব্যবসায়ীরা ক্রয় করিয়া তথা হইতে কাগজের বা দড়ির কলে পাঠাইয়া দেয়। ব্যবসায়ীদের গভর্ণমেণ্টকে প্রতি মণে এক আনা কর দিতে হয়।

গড়ে প্রতি বিঘায় খুব কম করিয়া ১৫ মণ ফসল ধরিয়া নিম্ন তালিকায় মহাজনের খরচ ও লাভের হিসাব দেওয়া হইল।

প্রতি বিঘায় খাজনা	৫৲ টাকা
নিড়ানি খরচ	৷৹ আনা
কাটার খরচ	১৲ টাকা
মোট বাঁধা ও সাহেবগঞ্জে চালান দেওয়ার খরচ	১৷৹ টাকা
	৮৲ টাকা
১৫ মণ ঘাসের দাম ৸৹ হিঃ	১১৷৹ টাকা
প্রতি বিঘায় লাভ	৩৷৹ টাকা

ব্যবসায়ীরা প্রতি মণ ৸৹ হিসাবে ক্রয় করে, এবং সাধারণতঃ ১৷৹ হিসাবে বিক্রয় করে। কিন্তু গাঁট বাঁধিবার খরচ, রেলের ভাড়া ও গভর্ণমেণ্টের কর ইত্যাদিতে প্রায় প্রতি মণে ।৴৹ আনা খরচ হয়। প্রতি মণে ইহাদের অন্ততঃ ৵৹ আনা লাভ থাকে।

কার্পাস চাষ।

শিবপুর কলেজ হইতে উচ্চশ্রেণীর কৃষি-পরীক্ষোত্তীর্ণ
বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের কর্ম্মচারী
শ্রীনিবারণ চন্দ্র চৌধুরী প্রণীত।

তুলা চাষ সম্বন্ধে এই পুস্তকখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। দাম ৸৹ বার আনা। কৃষক অফিসে পাওয়া যায়।



অগ্রহায়ণ—১৩১৬।

পরজীবি ও ক্ষীতজীবি উদ্ভিদ্।

মনুষ্য সমাজের ন্যায় নিম্নপ্রাণী সমাজে ও উদ্ভিদ্ সমাজে পরজীবিকার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ফলতঃ যেখানেই অধিক সংখ্যক প্রাণীর সমাবেশ সেখানেই দুই চারিটী প্রাণী স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জন না করিয়া অপরের উপার্জ্জিত দ্রব্যের উপর ভাগ বসাইতে চায়। উদ্ভিদ্ জগতে দুই শ্রেণীর পরাশ্রয়ী বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। কোন জাতীয় উদ্ভিদ্ অপরের কাণ্ডে মূল প্রবেশ করাইয়া উহার রস শোষণ করিয়া নিজের শরীর পুষ্টি করে। ইহারা প্রকৃত পরজীবি (Parasite)। আবার কয়েক জাতীয় গাছ জীবিত উদ্ভিদের অপকার করে না কিন্তু মৃত ও গলিত উদ্ভিদ্ হইতে রস শোষণ করে। ইহাদিগকে ক্ষীত-(গলিত) জীবি বলা যায় (Saprophyte)। প্রকৃত পরজীবি বৃক্ষেরও পরজীবিকার তারতম্য আছে। কোন পরজীবির আদৌ পাতা প্রভৃতি হয় না। ইহারা কেবল পুষ্প ও ফল প্রসব করিয়া নিজেদের বংশ রক্ষা করে। অন্য পরজীবির যথেষ্ট পরিমাণে পত্র পুষ্প হয় এবং তাহারা আংশিক রূপে নিজ নিজ শরীর রক্ষা করিতে পারে। উদ্ভিদ্ জগতে এইরূপ

অর্দ্ধ-পরজীবি, পূর্ণ-পরজীবি ও ক্ষীতজীবি বৃক্ষ অনেক রহিয়াছে।

অধিকাংশ পরজীবি উদ্ভিদের প্রধান লক্ষণ পত্রহরিতের (Chlorophyll) অভাব। এই শ্রেণীর উদ্ভিদ্ অঙ্গারক পদার্থ পরিশোষণে একবারেই অক্ষম এবং তজ্জন্য ইহাদিগকে জীবিত অথবা মৃত উদ্ভিদের উপর নির্ভর করিতে হয়। কোন জীবিত উদ্ভিদের রস আকর্ষণ করিতে হইলে পরজীবি উদ্ভিদ্ উহার সূক্ষ্ম মূলানু সমূহ আশ্রয়দায়ী বৃক্ষের ত্বকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া দেয়, কিম্বা একপ্রকার চক্রাকার উপাধান প্রস্তুত করিয়া তাহার অভ্যন্তর দিয়া আশ্রয়দায়ী বৃক্ষের ভিতর মূল চালাইয়া দেয়।

আমাদের দেশের হরিদ্রাবর্ণ আলগুসী লতা অনেকের নিকট সুপরিচিত। বেড়ার ধারে অথবা বাগানের অন্য কোন গাছের উপর আলগুসী লতার স্বর্ণবর্ণ সূত্রবৎ কাণ্ড সমূহ পরিব্যাপ্ত হইয়া যাইতে অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। ইহা একবারেই পত্রবিহীন, সুতরাং পূর্ণ-পরজীবি। এই পরজীবির বৃক্ষ বিশেষকে আক্রমণ করিবার উপায় বিশেষরূপে পর্য্যাবেক্ষণযোগ্য। আলগুসী লতার বীজ একবারেই দল (Cotyledon) শূন্য, কেবল জড়িত সূত্র সমষ্টির ন্যায়। ইহা স্বীয় মূলের স্থূল ভাগ মৃত্তিকায় প্রবেশ করাইয়া দিয়া অঙ্কুরিত হয় এবং মূলানু সমূহ দ্বারা জল পরিশোষণ করে। অঙ্কুরিত হইবার পর ইহার সূত্রবৎ কাণ্ড আশ্রয়দায়ী বৃক্ষের অন্বেষণে ক্রমাগত চক্রগতিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। উক্তরূপ বৃক্ষ পাইলেই ইহা উপাধান প্রস্তুত করিয়া আশ্রয়দায়ী বৃক্ষের সহিত সংলগ্ন হইয়া যায় এবং এই সময় হইতে সংযুক্ত অংশের নিম্ন ভাগ শুকাইয়া যায়। ইহাই আলগুসী লতার পরজীবি জীবনের প্রারম্ভ।

যদি কোন ক্রমে আলগুসী লতা আশ্রয়দায়ী বৃক্ষের সাক্ষাৎ লাভ না করিতে পারে, তাহা হইলে ইহা মৃত্তিকার উপর লতাইয়া যায় এবং যেমন ইহার অগ্রভাগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তেমনই পশ্চাৎভাগ শুকাইয়া যায়। এইরূপে কালক্রমে আশ্রয় বিহনে ইহা মরিয়া যায়। আলগুসী লতার আরও একটি বিশেষ লক্ষণ আছে। ইহা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে ইহার আবর্ত্তন (Spirals) সমূহ আলগা হয় এবং মন্দগতিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে আবর্ত্তন দৃঢ় হয়। কেবল শেষোক্ত প্রকার আবর্ত্তন হইতেই শোষণ যন্ত্র (haustorium) উৎপাদিত হয়। আলগুসীর কাণ্ডের ত্বকের উপরিভাগস্থ কোষ সমূহ (epidermal cells) আকর্ষণীর কার্য্য করে এবং এই সমুদয় আকর্ষণী আশ্রয়দায়ী বৃক্ষ সংলগ্ন হইলেই তাহাদের ভিতর দিয়া আশ্রয়দায়ী ও আশ্রিত বৃক্ষদ্বয়ের দেহের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। আকর্ষণী (Sucker) প্রধানতঃ আবর্ত্তন সমূহের চাপেই আশ্রয়দায়ী তরুর তন্তুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এতদ্ভিন্ন আকর্ষণী সমূহ কিয়ৎ পরিমাণে আশ্রয়দায়ী তরুর তন্তু দ্রব করিয়া প্রবেশ পথ প্রস্তুত করে এবং তন্নিম্নস্থ অংশ হইতে মূল দ্বারা আনীত উদ্ভিদ রস সংগ্রহ করে।

পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে যদিও স্বভাবতঃ আলগুসী লতার পত্রহরিৎ উৎপন্ন হয় না তথাপি অবস্থা বিশেষে উহা উৎপন্ন করা যাইতে পারে। একটি ডালের আকর্ষণীর দিক কাটিয়া দিলে আশ্রয়দায়ী তরু হইতে রস সংগ্রহ করিতে না পারিয়া আলগুসী লতা পত্রহরিৎ উৎপাদন করিতে আরম্ভ করে। আবার যদি আশ্রয়দায়ী বৃক্ষ দুর্ব্বল হয় কিম্বা নেড়াসিজের মত অল্পরসবিশিষ্ট হয় তাহা হইলেও আলগুসীতে পত্রহরিৎ জন্মাইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে কতকগুলি পরজীবি পত্রহরিৎ উৎপাদন করে এবং কতকগুলি তাহা করে না। আলগুসী প্রথম শ্রেণীর এবং মান্দা দ্বিতীয় শ্রেণীর। মান্দা লোরান্থাসিই (Loranthaceae) নামক প্রাকৃতিক বর্গের অন্তর্গত। ছোট ও বড় মান্দা সকলের নিকট পরিচিত। আম, জাম প্রভৃতি গাছে মান্দা জন্মিয়া গাছ মারিয়া ফেলিতে অনেকেই দেখিয়াছেন। মান্দার পত্র ও পুষ্প দেখিতে মনোহর। যে স্থানে মান্দা আশ্রয় গ্রহণ করে তাহার উপরিভাগের ডাল ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া মরিয়া যায়। লোরান্থাসিই বর্গের অপর একটি গন (Genus) ভিস্কাম (Viscum)। পূর্ব্ববঙ্গে বিশেষতঃ শ্রীহট্ট অঞ্চলে আম্র বৃক্ষে ভিস্কাম জাতীয় পরগাছা যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

উদ্ভিদ্‌শাস্ত্রে বলে যে সমস্ত পরজীবি বৃক্ষই পূর্ব্বে স্বাধীনজীবি ছিল। সুতরাং পরজীবিকা একটা উপার্জ্জিত গুণ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে সাধারণতঃ ঝুমকালতা স্বাধীনজীবি লতা। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে ঝুমকালতার মূল অপর বৃক্ষের অত্যন্ত নিকটে থাকায় শেষোক্ত বৃক্ষের মূলের সহিত সংলগ্ন হইয়া গিয়াছে এবং এইরূপ সংযোগের পর হইতেই ঝুমকালতা পরজীবি হইয়া পড়িয়াছে।

পত্রহরিৎবিশিষ্ট গাছের একটি গুণ এই যে উহারা বায়ুমণ্ডল হইতে পত্রহরিতের সাহায্যে অঙ্গারাম্ল বাষ্প শোষণ করিতে পারে। এই ক্রিয়া দ্বারা অঙ্গার উদ্ভিদের মধ্যে থাকিয়া গিয়া তন্তু প্রস্তুতের সহায়তা করে এবং অক্সিজেন বাহির হইয়া যায়। পত্রহরিৎবিশিষ্ট পরজীবিও যে এই প্রকারে আহার্য্য সংগ্রহ করিবে, তাহা আশা করা যায়। কিন্তু পরজীবিকা অবলম্বন করিয়া কতকগুলি পরজীবির এত অধঃপতন হইয়াছে যে উহা পত্রহরিৎ ও উজ্জ্বল সূর্য্যালোক উভয়ের বর্ত্তমানতা সত্ত্বেও পূর্ব্বোক্ত উপায়ে অক্সিজেন ত্যাগ করিতে পারে না। ইহার কারণ এই যে ত্যক্ত অক্সিজেনের পরিমাণ এত কম যে উহা আবার শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ায় ব্যয় হইয়া যায় এবং কিছুই উদ্বৃত্ত থাকে না। পরজীবির পত্র, পুষ্প ও ফল সকল স্থলেই এইরূপ অধঃপতনের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

পরজীবির ন্যায় ক্ষীতজীবি উদ্ভিদেরও সাধারণ উদ্ভিদের সহিত অনেক বৈসাদৃশ্য আছে। উদ্ভিদ্ জগতে প্রায় ১৬০ প্রকারের গাছ ক্ষীতজীবি আছে। তন্মধ্যে প্রায় ১২০টি উষ্ণদেশবাসী। অনেক উদ্ভিদ্‌বিৎ মনে করেন যে উষ্ণ দেশের নিবিড় আলোক-শূন্য অরণ্যে ইহাদের উৎপত্তি। এইরূপ বনে সূর্য্যালোক বড় একটা প্রবেশ করিতে পারে না, অথচ বিশাল বৃক্ষ সমূহের পাদদেশে অর্দ্ধগলিত অথবা গলিত উদ্ভিজ্জ পদার্থের সমধিক প্রাচুর্য্য। ক্ষীণতর উদ্ভিদ্ সেই জন্য সূর্য্যালোক দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জনের আশা ত্যাগ করিয়া গলিত উদ্ভিজ্জ পদার্থের দ্বারা জীবন ধারণের উপযুক্ত করিয়া নিজদের শরীরকে গড়িয়া তুলে।

অনেকে এরূপও অনুমান করেন যে পরজীবি অবস্থা বিশেষে নিজেদের স্বভাব পরিবর্ত্তন করিয়া ক্ষীতজীবিতে পরিণত হইয়াছে। উভয় অনুমান সত্য হইলেও ইহা কল্পনা করা অসঙ্গত নহে যে সাধারণ স্বাধীনজীবি উদ্ভিদ্ বিশেষ কারণে ক্ষীত-জীবি হইয়াছে। বস্তুতঃ গ্রামাটোফাইলাম (Gramatopyllum) নামক সমঙ্গা (Fern) জাতীয় উদ্ভিদে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। গলিত উদ্ভিজ্জ পদার্থের সন্নিধানে গ্রামাটোফাইলাম স্বীয় বায়ব্য মূলে শোষক তন্তু (absorbent hair) উৎপাদন করিয়াছে।

পরজীবি ও ক্ষীতজীবি উদ্ভিদ্ সমূহের আলোচনা প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক। প্রাণী এবং উদ্ভিদ্ জগতে কখন কখন দেখিতে পাওয়া যায় যে দুইটি বিভিন্ন জাতীয় গাছ অথবা প্রাণী একত্র বাস করিতেছে। প্রাণী জগতে কাঁকড়া ও স্পঞ্জের সহিত এইরূপ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। স্পঞ্জ নিজে আহারান্বেষণে নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে না অথচ কাঁকড়া নানাস্থানে বিচরণ করে। ইহাই স্পঞ্জের সুবিধা। পক্ষান্তরে কাঁকড়ার শত্রু অনেক ; তাহার পৃষ্টদেশে স্পঞ্জ জন্মাইলে তাহাকে কাঁকড়ার পরিবর্ত্তে স্পঞ্জ বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং কাঁকড়া অনেক সময়ে শত্রু হস্ত হইতে এই উপায়ে রক্ষা পায়। উদ্ভিদ জগতে শিম্বী জাতীয় (Leguminosecae) এবং রাস্না জাতীয় (Orchidaceae) উদ্ভিদের সহিত বিভিন্ন জাতীয় ছত্রকের (Fungus) সম্বন্ধ এইরূপ। এইরূপ স্থানে ছত্রক নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে ও অপর প্রকারে আশ্রয়দায়ী বৃক্ষের উপকার করে এবং পক্ষান্তরে ইহা আশ্রয়দায়ী বৃক্ষ হইতে কিয়ৎ পরিমাণে উদ্ভিদ রস প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

পরজীবি ও ক্ষীতজীবি উদ্ভিদের সহিত সাধারণ কৃষকের এই সম্বন্ধ যে উভয় প্রকার উদ্ভিদ্ হইতেই অধিকাংশ সময় ক্ষতিই হইয়া থাকে। অধিকাংশ জাতীয় ছত্রক ক্ষীতজীবি ; ছত্রক রোগে ফসল প্রভৃতির যে কত অনিষ্ট হয় তাহা বলা যায় না। পরজীবিও যে বৃক্ষাদির পক্ষে কত অনিষ্টকর তাহাও বান্দা ও আলগুসী লতা হইতে বুঝিতে পারা যায়। একস্থানে একটি পরজীবি জন্মিলে শীঘ্রই উহা নিকটবর্ত্তী স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। উহাদের বীজ এরূপ আঠাবিশিষ্ট অথবা অন্য কোন প্রকার বিশেষ কৌশলযুক্ত যে উহা যে স্থানে পতিত হয় সে স্থান হইতে সহজে অপসৃত হয় না। সুতরাং ফুল না হইবার পূর্ব্বেই পরজীবিকে নষ্ট করা উচিত। অনেক সময়ে যে স্থানে আগাছা জন্মিয়াছে সেই স্থান হইলে ডাল কাটিয়া ফেলা আবশ্যক হয়। আগাছা অধিক দিবস স্থায়ী হইলেই ডাল কাটা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। ক্ষীতজীবির আক্রমণ নিবারণ করিতে হইলে বৃক্ষ গাত্রে কোন স্থানে ক্ষত থাকিতে দেওয়া আদৌ উচিত নহে। কারণ উক্ত রূপ ক্ষত স্থানেই ইহারা জন্মিয়া থাকে। অপরাপর নিবারণের উপায় সাধারণ ছত্রক রোগ চিকিৎসার ন্যায়।

পত্রাদি।

গোলাপের কীট।

কলিকাতার জনৈক সংবাদদাতা আমাদিগকে কয়েকটি গোলাপের কীড়ার নমুনা পাঠাইয়াছেন। এই জাতীর কীড়ার বর্ণ হরিদ্রাভ, মস্তক কাল। ইহারা গাছের প্রায় সমস্ত পত্রাংশ খাইয়া ফেলে এবং পাতার মধ্য-শিরা ও ডাঁটাগুলি কেবল বাকি থাকে। ইহা Saw Fly জাতীয়। পূর্ণবয়সপ্রাপ্ত কীট উহার শরীর প্রান্তস্থিত একপ্রকার ধারাল যন্ত্র দ্বারা বৃক্ষ গাত্রে গর্ত্ত প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ডিম্ব প্রসব করে। কীড়া ১০।১৫ দিনেই বড় হয় এবং তাহার পর গুটি বাঁধে। গুটি হইতে বাহির হইতে ৪।৫ দিবস লাগে। সাবানের অথবা তামাকের

জল কিম্বা কেরোসিন মিশ্রণ প্রয়োগই এই জাতীয় পোকা নিবারণের প্রকৃষ্ট উপায়। এক বালতি জলে ১ মুঠা ঝুল বেশ করিয়া মিশ্রিত করিয়া লইয়া উক্ত জল প্রয়োগেও উপকার হইতে পারে। কেরোসিন ও সাবান মিশ্রণ প্রস্তুত করিবার সহজ উপায় এই—আন্দাজ /৫ সের জলে অর্দ্ধ সের আন্দাজ কাপড় ধোয়া সাবান গলাইতে হইবে। ফুটন্ত জলে সাবান নিক্ষেপ করাই ভাল। পরে উক্ত জল নামাইয়া এক বড় বোতল কেরোসিন ক্রমশঃ ক্রমশঃ বিশেষ রূপে নাড়িয়া উহাতে মিশাইতে হইবে। শীতল হইলেই উক্ত মিশ্রণ বোতলে পুরিয়া রাখা আবশ্যক। প্রয়োগ করিবার সময় এক বোতল মিশ্রণে তিন বোতল জল সংযোগ করিতে হইবে। কৃঃ সঃ।

বিগত ভাদ্র সংখ্যার কৃষকে বীরভূম জেলায় অবস্থিত কৃষি ক্ষেত্রের উপযুক্ত জমি সম্বন্ধে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল অনেকেই সেই জমির বিস্তৃত বিবরণ জানিতে চাহিয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগের জ্ঞাতার্থ প্রত্যেককে স্বতন্ত্র ভাবে পত্র না লিখিয়া এস্থলে জমি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিলাম। এতদ্ভিন্ন অপর কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে তাঁহারা জমির অধিকারীর নিকট হইতে সংবাদ পাইতে পারেন।—(১) জমিগুলির মধ্যে প্রায় বিশ বিঘা আবাদ যোগ্য। এই বিশ বিঘা জমিতে ভালরূপ চাষ দিলে এখন হইতেই প্রথম শ্রেণীর ধানি জমিতে পরিণত হইতে পারে। অবশিষ্ট সমস্ত জমিই কর্ষণ যোগ্য। ক্রমশঃ তাহাকে ধানি জমি অথবা অন্য কোন ফসল উৎপাদন উপযোগী করা যাইতে পারিবে। জমিগুলির নিচে একটি ক্ষুদ্র নদী আছে, অল্প ব্যয়ে তাহাতে বার মাস জল রাখিবার বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। জমির উর্দ্ধভাগে অর্দ্ধখনিত অবস্থায় যে বাঁধ আছে অল্প ব্যয়েই তাহাতে বার মাস জল রাখিবার উপায় করা যাইতে পারে। (২) ।৵০ আনা হার জমাতে বিঘা প্রতি ১০৲ টাকা ও ॥০ আনা হার জমাতে বিঘা প্রতি ৭॥০ টাকা সেলামি দিতে হইবে। (৩) জমির ¼ মাইল মধ্যে লোকালয় আছে। (৪) কথিত জমিতে কিম্বা তাহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে কোন প্রকার জন্তুর উপদ্রব নাই। (৫) লুপ লাইন মল্লারপুর ষ্টেসন হইতে চারি মাইল দূরে জমি অবস্থিত; উক্ত ষ্টেসন হইতে যাতায়াতের জন্য গরুর গাড়ী, পাল্কী প্রভৃতি পাওয়া যায়। (৬) জমি হইতে রামপুরহাট ৮ মাইল এবং জমি উক্ত সবডিবিসনের অন্তর্গত মাসড় গ্রামের প্রান্তভাগে অবস্থিত। (৭) সাধারণতঃ উক্ত অঞ্চলে হাজা শুকা হয় না। (৮) চাষ আবাদের উপযোগী বৃষ্টি এ অঞ্চলে প্রতি বৎসরই হইয়া থাকে। (৯) জমি সমতল। (১০) জমি হইতে ৪।৫ মাইল দূরে ২।৩ স্থানে হাট ও গঞ্জ আছে। (১১) গোময় এবং পুরাতন পুকুরের পাঁক এস্থলে সাররূপে ব্যবহৃত হয়, এবং ঐ সার এস্থলে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। এখানে গোময় সার টাকায় ৪০।৫০ মণ (৫৮॥৵০ ওজনের) পাওয়া যায়। (১২) জমির সমস্ত খবর শ্রীতমোরীশ চট্টোপাধ্যায়, মুলুটী গ্রাম, মুলুটী পোষ্ট, সাঁওতাল পরগণা এই ঠিকানায় পত্র লিখিলে পাওয়া যাইবে।

প্রাদেশিক কৃষি সংবাদ।

পাঞ্জাবে গোধুম।—অনেক দিন হইতে, এমন কি ১৮৮২ সাল হইতে চাষীরা পাঞ্জাবে সাদা নরম গম

উৎপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। কারণ তৎকালে বিদেশী বণিকগণ সাদা গমেরই অধিক আদর করিতেন এবং ইহাই বিদেশে অধিক রপ্তানি হইত। লাল শক্ত গম অপেক্ষা সাদা নরম গমের দরও অধিক ছিল। কিন্তু গত বৎসর পুষা হইতে গম সম্বন্ধে যে পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে পূর্ব্বোক্ত সংস্কার ভুল বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। এখন দেখা যাইতেছে সাদা নরম গম অপেক্ষা লাল শক্ত গমের ময়দায় বড় এবং সুন্দর রুটী প্রস্তুত হয়। ইংরাজ কলওয়ালারা এখন এই লাল শক্ত গম অধিক পছন্দ করিতেছেন। সুতরাং তাঁহারা যেটী পছন্দ করিবেন সেইটিই অধিক মাত্রায় এখান হইতে রপ্তানি হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার দরও চড়িবে। আবার পাঞ্জাবের মাটিও এই লাল শক্ত গম উৎপাদনের অনুকূল। এখানকার চাষীরা এতদিন ভ্রমে পড়িয়া অত্যন্ত যত্নসহকারে নরম গম উৎপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছিল। যাহা হউক শক্ত গমের আদর বাড়িয়াছে সত্য, তথাপি নরম গমের রপ্তানি একেবারে উঠিয়া যায় নাই। বিলাতের অনেক মিল এখনও সাদা নরম গম লইতেছেন, সেটা কিন্তু অনেকটা অভ্যাস বশতঃ। অবশেষে বোধ হয় সকলেই অধিকতর কার্য্যোপযোগী বলিয়া শক্ত গমই লইতে বাধ্য হইবেন।

বঙ্গে অগ্রহায়ণ মাসের শেষ পর্য্যন্ত শস্যের অবস্থা।—অগ্রহায়ণ মাসে প্রায় কোথাও বৃষ্টি হয় নাই। কেবল মাত্র দার্জিলিঙ্গে দুই এক পসলা বৃষ্টি হইয়াছে। রবি শস্যের বীজ বোনা শেষ হইয়া আসিল। হৈমন্তিক ধান্য কর্ত্তন চলিতেছে। বেহারে আখ মাড়াই ইতিপূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়াছে, এখনও চলিতেছে। বালেশ্বর, পুরী ও পালামৌয়ে আখ মাড়াই আরম্ভ হইয়াছে। শস্যের অবস্থা সর্ব্বত্রই ভাল। ১৫টী জেলায় চাউলের দাম কমিয়াছে, অন্য ১৭টী জেলায় প্রায় সমান।

বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, যশোহর, গয়া, রাঁচি, পালামৌ, মানভূম, ত্রিহুত, ভাগলপুর ও উড়িষ্যা হইতে গবাদি পশুর রোগের খবর আসিতেছে। সর্ব্বত্র কিন্তু পশুখাদ্য এবং জল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে রহিয়াছে।

বঙ্গদেশে নাবী জাতীয় তিলের চাষ।—বঙ্গদেশের মধ্যে সম্বলপুরে অধিক পরিমাণে নাবী জাতীয় তিলের আবাদ হইয়া থাকে। বাৎসরিক উৎপন্ন তিলের প্রায় অর্দ্ধেক পরিমাণ এইখানেই উৎপন্ন হয়। এবৎসরের আবহাওয়া তিল চাষের অনুকূল; কেবল নিম্ন বঙ্গে ভাদ্র মাসের ঝড় জলে তিলের কিছু ক্ষতি হইয়াছে। সিংভূম, ভাগলপুর এবং খুলনায় সামান্য পরিমাণে নাবী তিলের আবাদ হইয়া থাকে। বর্ত্তমান বর্ষে তিল চাষের জমি পরিমাণেও অধিক, বর্ত্তমান বর্ষে ১৫৮,৫০০ একর জমিতে আবাদ হইয়াছে এবং বিগত বর্ষে ১৪৭,০০০ একর জমিতে তিলের আবাদ হইয়াছিল। যদি এইরূপ অনুকূল আবহাওয়া থাকে পনর আনা ফসল হইবে, বিগত বর্ষে দশ আনা ফসল হইয়াছিল।

সার-সংগ্রহ।

শিল্প-বিজ্ঞান-শিক্ষা।

বোম্বাইয়ের পরলোকগত পার্শী ধনকুবের জেমসেটজী নাউসারেঞ্জী তাতা দেশের উন্নতি চিন্তায়

অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতবাসীর শিল্প-বিজ্ঞান-শিক্ষার ব্যায়ানুকুল্যের নিমিত্ত, আপন বিপুল সম্পত্তি দান করিয়া যান। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তাতা প্রস্তাব করেন.—শিল্প-বিজ্ঞান-শিক্ষা দানের শুভ উদ্দেশ্য সাধন জন্য তিনি আপনার ৩২ লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি দান করিবেন, এবং দানকৃত সম্পত্তির বার্ষিক আয় ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকায় বর্ষে বর্ষে ভারতে শিল্প-বিজ্ঞান-শিক্ষার পথ প্রশস্ত করা হইবে। বাঙ্গালোরের নিকট তাতা যে ভূমিখণ্ড দান করিয়াছেন, এক্ষণে তাহার উপর তাতার প্রস্তাবিত 'ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউট অব সায়ান্স' অর্থাৎ বিজ্ঞানশিক্ষার বিদ্যালয়ের অট্টালিকা নির্ম্মাণ আরম্ভ হইবে। কয় বৎসরে তাতার প্রদত্ত টাকার যে সুদ জমিয়াছে, তাহার মধ্যে পাঁচ লক্ষ টাকায় বিদ্যালয়ের জন্য অট্টালিকা প্রস্তুত হইবে, এবং আড়াই লক্ষ টাকায় আসবাবাদির ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া যে টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহা মহীশূর গভর্ণমেণ্টের প্রদত্ত বার্ষিক সাহায্য ৫০ সহস্র টাকা, এবং ভারত গভর্ণমেণ্ট ও বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের সাহায্যের টাকা, কমিটির নির্দ্ধারণ-ক্রমে বিদ্যালয়ের আনুসঙ্গিক ব্যাপারে ব্যয়িত হইবে। এই শিল্প-বিজ্ঞানশিক্ষার ভাণ্ডারে আপাততঃ যে টাকা জমিয়াছে, গভর্ণমেণ্ট তাহারও একটা হিসাব দিয়াছেন। তাহাতে জানা যায়, গৃহ নির্ম্মাণের জন্য ভারত-গভর্ণমেণ্টের নিকট জমিয়াছিল—৫ লক্ষ টাকা, আসবাবাদির জন্য মহীশূর গভর্ণমেণ্টের প্রদত্ত বার্ষিক সাহায্যে জমিয়াছে—২॥০ লক্ষ টাকা, এবং মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্টের প্রতিশ্রুত সাহায্যে জমিয়াছে—১॥০ লক্ষ টাকা,—এই ৯ লক্ষ টাকা তো এখন ব্যয়ের জন্যই মজুত আছে। এতদ্ব্যতীত, তাতার প্রদত্ত অর্থের গত দুই বৎসরের সুদেও চারি লক্ষ টাকা জমিয়াছে। অধিকন্তু তাতার পুত্রগণ ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে আরও যে অর্দ্ধ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন, তাহার সুদে এখন হইতে প্রতি বৎসর তাতার টাকা হইতেই ২ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা আয় হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাতার টাকায় যে বিদ্যালয় হইবে প্রস্তাব হইয়াছে, বিজ্ঞান-সূত্র ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান শিক্ষা দানের জন্য আপাততঃ তাহাতে ছয়টি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইবে। বিলাতের রয়াল সোসাইটীর মনোনয়ন ক্রমে সেই বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ নির্ব্বাচিত হইবেন। অধ্যাপকগণ বিজ্ঞান-সূত্র এবং ব্যবহারিক বিজ্ঞান উভয়েরই শিক্ষাদান করিবেন। বিদ্যালয়ের কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহের জন্য আপাততঃ নিম্নলিখিত কর্ম্মকর্ত্তৃগণ মনোনীত হইয়াছেন। পেট্রণ বা প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন,—ভারতের বড়লাট বাহাদুর ; সহকারী পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন,—প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃগণ, অর্থাৎ বোম্বাই ও মান্দ্রাজের গবর্ণর প্রভৃতি,—মেম্বর বা সদস্যের মধ্যে স্থান পাইয়াছেন,—তাতার পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ, ভারত গভর্ণমেণ্টের ও মহীশূর গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষগণ, শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টরগণ ইত্যাদি। নিয়ম হইয়াছে,—সদস্য হইতে হইলে এককালে ২ লক্ষ বা পাঁচ বৎসর কাল বার্ষিক ১৫ হাজার টাকা প্রদান করিতে হইবে। প্রচার এই যে গভর্ণমেণ্ট এই বিদ্যালয়ের কোনও কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না। ভারতবাসীরা স্বাধীনভাবে শিল্পবিজ্ঞান শিক্ষায় সমর্থ হয়,—ইহাই প্রধানতঃ এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য।

তামাকের জমি।

উচ্চ বেলে মাটিতে তামাক ভাল হয়। বালির অংশ যত অধিক হয় ততই তামাক উত্তম হয় এবং উৎকৃষ্ট রং হয়। আঁটালের পরিমাণ অধিক

হইলে তামাকে ভালরূপ ফোস্কা পড়ে না এবং বিবর্ণ হয়। বালি অধিক থাকা বশতঃ এই সমস্ত জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরতা শক্তি কম; এই কারণ কৃষকেরা ইহাতে সম্বৎসর সার দিয়া কেবলমাত্র তামাক আবাদ করিয়া থাকে, প্রতিদিন যে কিছু গোবর সঞ্চয় করিতে পারে উহার অধিকাংশই এই জমিতে দিয়া থাকে, এতদ্ব্যতীত গৃহাদির আবর্জ্জনা ও ছাই দিয়া থাকে। মঘেরা ও এ দেশীয় লোকেরা চট্‌কা তামাকের অধিক আদর করে; এইরূপ চট্‌কা (ফোস্কা পড়া) তামাকের জন্য যথেষ্ট সারের আবশ্যক, কাজেই কৃষকেরা তামাকের উৎকৃষ্টতা সাধনের জন্য কেবল সারের জন্যই ব্যস্ত থাকে। একটু ভাবিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে বর্ষাকালে ও তদ্‌প্রারম্ভে যে সমস্ত সার জমিতে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে উহার কতক অংশ অতিবৃষ্টিতে ধুইয়া নিম্ন ভূমিতে চলিয়া যায়, কতক অংশ মুথা, কাঁটা খুঁড়া প্রভৃতি আগাছা বৃদ্ধি করিয়াও নষ্ট হয়, এই সমস্ত আগাছা জমির প্রধান শত্রু; ইহাদের শিকড় ও বীজ জমির মধ্যে এরূপ ভাবে প্রবেশ করে যে উহার নিড়ানি করিতে অনেক খরচ বাড়ে, এতদ-ব্যতীত প্রাকৃতিক অন্যান্য কারণ বশতঃ ও এইরূপ সারের অনেক অপচয় হইয়া থাকে। জমিতে আইল বাঁধা থাকিলেও অধিকাংশ সার আইলের নিকট চলিয়া যাইতে পারে এবং সমগ্র জমিতে সারের সামঞ্জস্য থাকে না। ইহাতে ফসলের ও তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায় কৃষকেরা প্রতিদিন স্কন্ধে বহিয়া সার জমিতে প্রয়োগ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহারা এই সমস্ত বিষয় বিশেষ ভাবিয়া দেখে না; অনেক সময় একটী কৃষক কেবল উচ্চ ভূমিতে সার দিতে থাকে, কিন্তু অপর কৃষকের নিম্ন ভূমিতে ফসল ভাল হইয়া থাকে। রঙ্গপুর জেলায় বিস্তর তামাকের জমি আছে এই সমস্ত জমিতে কৃষকদের অধিকাংশ সার চলিয়া যায় কাজেই যাহারা তামাক আবাদ করে তাহাদের অপরাপর জমিতে সেরূপ সার প্রয়োগের সম্ভাবনা নাই। ইহারা সার সংগ্রহ করিতে বড়ই ব্যস্ত ঘাটে, মাঠে, হাটে টুকরি করিয়া কৃষক বালকেরা ছুটাছুটি করিয়া গোবর সংগ্রহ করিয়া থাকে। ইহাও দেখা গিয়াছে যে কোনও কোনও কৃষক গ্রামের সন্নিকটবর্ত্তী বিল হইতে দল ঘাস বহন করিয়া থাকে। ইহারা বেশ জানে যে কাঁচা গাছ গুল্ম লতা পচিলে জমির সার হয়। কৃষকেরা উৎকৃষ্ট তামাক পাইবার আশায় এই জমিতে আশু ধান্য কিম্বা পাটের চাষ প্রায়ই করে না; ইহাতে তাহাদের বিঘা প্রতি ২৫৲।৩০৲ টাকার অপচয় হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা বেশ বুঝা যাইবে যে তামাকের জমির উৎকর্ষ সাধন করিতে ইহারা অনায়াসে এই লাভ উপেক্ষা করিয়া থাকে। কিন্তু ইহারা যদি কাঁচা সারের আবাদ জানিত তবে সামান্য ব্যয় করিয়া যে জমির উৎকর্ষ সাধন করিত তাহার কিয়ৎ পরিমাণে সন্দেহ নাই। তামাকের জমিতে কাঁচা গাছের সারের আবাদ করিলে প্রজাদের বিশেষ উপকার সাধিত হইতে পারে। এক রঙ্গপুর জেলায় ৫৯০০০০ বিঘা জমিতে তামাকের আবাদ আছে, প্রতি বিঘায় কাঁচা সারের আবাদ এবং অল্প পরিমাণ গোবরের সার প্রয়োগ করিলে বিঘা প্রতি যদি অন্ততঃ পক্ষে ২৲ টাকা লাভ হয়, তবে প্রতি বৎসর বহু টাকার এই জেলায় লাভ হইতে পারে। কাঁচা গাছের সারের আবাদ করিতে বিঘা প্রতি ১৲ টাকা খরচ পড়িবে। কৃষকেরা ঘাস, আশু ধান্য ও পাট আবাদ না করিয়া থাকিলে পারে তবে এই অতিরিক্ত ১৲ টাকা ব্যয় করিয়া দ্বিগুণ লাভ করিবার সম্ভাবনা থাকিলে কেন করিবে না; এ যাবৎ তাহারা এই সারের মর্ম্ম জানিত না, কি জমিদার ও শিক্ষিত

লোকেরা এই সম্বন্ধে একটু দৃষ্টি রাখিয়া বীজ সরবরাহ করিলে এ দেশের লোকের যথেষ্ট উপকার হওয়ার সম্ভাবনা। এ বৎসর বুড়িরহাটে গভর্ণমেণ্ট কৃষিপরীক্ষা ক্ষেত্রে প্রায় ৪০/ বিঘা জমিতে বিলাতি বরবটি (রংপুরের বোজফল) ও ৩০/ বিঘা জমিতে ধঞ্চার কাঁচা গাছের সার আবাদ করা হইয়াছে। বহু কৃষকেরা ইহার আবাদ দেখিয়াছে; ইহাদের মূলে একপ্রকার সূক্ষ্ম গণ্ড হইয়া থাকে উহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐ গণ্ডের মধ্যে এক প্রকার আনুবীক্ষণিক উদ্ভিদণু বায়ুমণ্ডল হইতে যবক্ষারজান গ্রহণ করিয়া প্রধান বৃক্ষশস্য প্রস্তুত করিয়া থাকে। গোবরে জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে; এই উদ্ভিদণু ও তদ্রূপ একটি সার সরবরাহ করিয়া থাকে। অনেক সময় গোবর যথেষ্ট পরিমাণ পাওয়া যায় না; খৈল কিম্বা সোরা খরিদ করিয়া ব্যবহার করিতে অর্থব্যয়ের আবশ্যক, কিন্তু এই কাঁচা গাছের সার ব্যবহারে সেই রূপ কোনও খরচ দরকার হয় না। তামাক কাটিবার পর জমিতে ২।১ খানা চাষ দিয়া বিঘা প্রতি ৪।৫ সের বীজ ছিটাইয়া বুনিয়া দুইবার মই দিয়া রাখিতে হয়, ইহাতে নিড়ানি করার বড় আবশ্যক নাই। তৎপরে শ্রাবণ মাসে জমিতে চারবার মই দিয়া গাছ ডাল মাড়িয়া চাষ দিয়া রাখিলে জমিতে পচিয়া বেশ সার হইবে। ইহাতে কিয়ৎ পরিমাণ গোবর দিলেই অতি উৎকৃষ্ট ফসল জন্মিবে সন্দেহ নাই। এই ক্ষেত্রে গরু বাঁধিয়া খাওয়াইলে যে মূত্র গোবর পাড়বে উহাতেও বিশেষ ফল পাওয়া যাইতে পারে; আবার গো, মহিষাদির ঘাসের ও কার্য্য হইতে পারে। কাঁচা গাছের সার আবাদ করিলে দেখিতে পাইবে যে ঐ গাছে আবৃত থাকা বশতঃ যাবতীয় আগাছা মরিয়া গিয়াছে, জমি বর্ষাজল বসিয়া যাওয়ায় সরস হইয়াছে এবং গাছ পচিয়া মৃত্তিকা সতেজ ও সহজে চাষের উপযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং পতিত জমি অপেক্ষা এই জমির চাষ ও নিড়ানি খরচ অনেক কম পড়িবে। এই বৎসর সরকারী বাগানের চাষ দেখিয়া অনেক কৃষক বিস্মিত হইয়াছে। অনেকেই আগামী বৎসর ইহার আবাদ করিবে বলিতেছে। অল্প কয়েকটী কৃষক আবাদওকরিয়াছে। এদেশে কৃষি শিক্ষার অভাব বশতঃ এইরূপ একটী প্রধান সারের অবহেলা হইতেছে; ইহাতে কৃষকদের বিস্তর ক্ষতি হইয়া থাকে। আমেরিকায় এই কাঁচা গাছের সারের বিশেষরূপ ব্যবহার দ্বারা কৃষি-বিভাগের যুগান্তর উপস্থিত করা হইয়াছে। সেখানে এমন কি মৃত্তিকার মধ্যে কেবল উদ্ভিদ অণুর টিকা দিয়াও জমির উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে। এই প্রথা এ পর্য্যন্ত এদেশে প্রচলিত হয় নাই। ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে পূর্ব্বোক্ত বিভিন্ন জমিতে অল্পাধিক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে। উৎকৃষ্ট জমিতে এক কাঁচ্চা পরিমাণ মৃত্তিকায় সহস্রাধিক লক্ষ উদ্ভিদ অণু থাকিতে পারে। অপর পক্ষে নিকৃষ্ট জমিতে এক সহস্রের কমও থাকিতে পারে। যে জমিতে ইহার যত আধিক্য থাকিবে সেই জমিতে তত অধিক সার হইবে। কাজেই নিকৃষ্ট জমিতে একবার এই উদ্ভিদাণু প্রবেশ করাইয়া দিলে এবং জমি উপযুক্ত রূপ সরস ও আলগা থাকিলে এই অণু ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং জমির উৎকর্ষ সাধন করিতে থাকে। ১৯০৬ সালে রঙ্গপুর কৃষি পরীক্ষা ক্ষেত্রে টিকা দেওয়া বরবটী এক ক্ষেত্রে ও অপর এক ক্ষেত্রে শুধু বরবটি আবাদ করা হইয়াছিল। কিন্তু ঐ জমির উর্ব্বরতা অধিক থাকায় বিশেষ বিভিন্ন ফল পাওয়া যায় নাই। যাহা হউক এদেশে বর্ত্তমান অবস্থায় কাঁচা গাছের সার আবাদ করিলে চলিতে পারে এই জন্য বরবটী, ধঞ্চা, শণ প্রভৃতি

ও এতদব্যতীত যে কোনও শুঁটিপ্রদ শস্য আবাদ করিলেও চলে কিন্তু ফল ততদূর ভাল হইবে না। অনেক কৃষক বলিয়া থাকে এইরূপ বরবটী আবাদ করিয়া মারিয়া ফেলিতে তাহাদের কষ্ট বিবেচনা হয়। ইহার ফসল বিক্রয় করিলে বেশ লাভ হইতে পারে। ভাবিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে এ যাবৎ তাহাদের ক্ষেত্রে এইরূপ কোন শস্যের আবাদ হইত না তাহাদের জমি পতিত থাকিত। তবে তাহাদের ইহার চাষ করিতে বিঘা প্রতি ১৲ টাকা খরচ হইবার সম্ভব। কিন্তু এই সারের মূল্য কত টাকা হইতে পারে?—১/ বিঘা জমিতে ১/ মণ খৈল দিতে গেলেও অন্ততঃ ৩৲ আবশ্যক হয়। অনেকে আবার বলিয়া থাকে তামাকের জমিতে বরবটী আবাদ করিলে বর্ষা কালে তাহাদের গরু চরাইবার স্থান থাকে না। বুড়িরহাট কৃষি পরীক্ষা ক্ষেত্রে এ বৎসর দেব ধানের আবাদ করা গিয়াছে। অনেক কৃষক ইহা দেখিয়া আবাদ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে। যাহার দুই বিঘা জমিতে তামাক হয়, তাহার /২ কাঠা জমিতে এই দেব ধানের আবাদ করিলে এই সমগ্র জমির যে দূর্ব্বাঘাস হইত, তদধিক কাঁচা ঘাস জন্মিবে এবং এই ঘাস খাইয়া তাহার গরুর অবস্থার উন্নতি হইবে। যাহাদের ঘাসের জমির অভাব তাহারা এই ঘাস অল্প পরিমাণে আবাদ করিয়া যাবদীয় অন্য জমিতে কাঁচা গাছের সার আবাদ করিলে বিশেষ ফল লাভ করিবে সন্দেহ নাই। যাহাতে এই সার ও ঘাসের আবাদ এদেশে প্রচলিত হয়, তৎপ্রতি স্বদেশানুরাগী ব্যক্তিগণ একটু কটাক্ষপাত করিলে দেশের বিশেষ উপকার হইতে পারে; কল্পনা অপেক্ষা কার্য্য দেশের অধিকতর হিতকর।

—শ্রীযামিনীকুমার বিশ্বাস বি, এ, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, বুড়িরহাট, গভর্ণমেণ্ট ফারম, রঙ্গপুর।

কৃষি সম্বন্ধে কয়টি কথা।

কৃষিপ্রধান দেশে সর্ব্বত্র স্থানে স্থানে বন থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে বন জঙ্গলের নিকটবর্ত্তী ভূমিই সরস থাকে ও সেখানে বায়ুর উত্তাপ অনেক কম হয় এবং সে বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ যথেষ্ট থাকে। বন কাটিয়া ফেলিলে বায়ুর তাপ বৃদ্ধি হয়; তাহাতে বাষ্পের পরিমাণ কমিয়া যায়, কাজেই সে স্থানের মৃত্তিকা শীঘ্রই শুষ্ক হইয়া উঠে। একারণ কৃষিশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের প্রধান উপদেশ এই যে, যে স্থানে বন নাই সেখানে নূতন করিয়া আগে বন তৈয়ার কর। অপেক্ষাকৃত কম উর্ব্বর যে সকল জমি আজ কাল চাষের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার কিছু অংশে বন উৎপাদন কর, তাহা হইলে অপর অংশ উর্ব্বর হইয়া উঠিবে। ডাক্তার ভোয়েলকার (Voelkar) ভারতের কৃষি আলোচনা উপলক্ষে বলিয়াছেন ভারতবর্ষে বন রাখিয়া দিলে বায়ুর তাপ কম থাকিবে, এবং বৃষ্টি হইতে যে জল পাওয়া যাইবে তাহা শীঘ্র শুকাইয়া না গিয়া কিছু কাল ধরিয়া জমিতে সঞ্চিত থাকিবে।

খৈল, ছাই, হাড়চূর্ণ, চূণ এই চারিটীই শস্যের প্রধান খাদ্য। এই চারিটীর কোন্‌টীতে তোমার শস্যের অধিক উপকার হইবে সহজে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারা যায়। মনে কর তুমি পাট গাছে এই সারের পরীক্ষা করিবে, সমান চাষ দিয়া সমান আকারের ছয়টী জায়গা তৈয়ার কর, প্রথম অংশে বিনা সারে পাট চাষ কর, দ্বিতীয় অংশে ওজন করিয়া অল্প পরিমাণ খৈল, অল্প পরিমাণ ছাই এবং অল্প পরিমাণ হাড় চূর্ণ ও চুণ দাও। তৃতীয় অংশে খৈল বাদে বাকি তিনটী দাও, চতুর্থ অংশে ছাই বাদে বাকি তিনটী দাও, পঞ্চম অংশে হাড়

চূর্ণ বাদে বাকি তিনটী দাও, ষষ্ঠ অংশে চুণ বাদে বাকি তিনটী দাও, বীজ জল সেচন সম পরিমাণে সমষ্টিতে করিবে। শেষে যে অংশে ফসল ভাল হইবে দেখিবে, সেই অংশে প্রদত্ত সারই তোমার শস্যের অধিকতর উপযোগী জানিবে।

একরূপ শস্য মাটীর উপর দিয়া শিকড় ছড়াইয়া খাদ্য সংগ্রহ করে যেমন মুগ, কলাই প্রভৃতি। কোন কোন শস্য মাটীর চার পাঁচ ইঞ্চি নীচে হইতে রস টানিয়া লয় যেমন ধান, অড়হর, তিল, তিসি প্রভৃতি। এক জাতীয় শস্য এক সময়ে ফলাইলে, হয় তাহা মাটীর উপরের সার সমস্ত খাইতে পায় নীচের সার পূর্ণ মাত্রায় থাকিয়া যায়, নয় নীচের সার সবটুকু টানিয়া লয় উপরের সার পূর্ণ অব্যয়িত থাকিয়া যায়। এরূপে কৃষকের বহু পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয়ের সার অনেক পরিমাণে অপব্যয় হইয়া থাকে। এজন্য যখনই কোন শস্য চাষে উদ্যোগী হইবে, তখনই আগে চিন্তা করা প্রয়োজন, ঐ শস্যের মূল মাটীর নীচের খাদ্য টানিয়া লইলে উপরের খাদ্য খাইবার জন্য তাহার সঙ্গে আর কোন্ শস্য দেওয়া যাইতে পারে, বা উপরের খাদ্য খাওয়ার উপযোগী শস্য হইলে নীচের খাদ্য খাওয়ার জন্য তাহার সঙ্গে আর কি শস্য দেওয়া যাইতে পারে। মোট কথা—নিম্নগামী মূল ও উর্দ্ধস্থায়ী মূল শস্য এক সঙ্গে চাষ করিলে অনেক সারের অপব্যয় নিবারিত হয়।

শ্রীগিরীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। ইটা, মহাসহস্র।

তুলার চাষ।

কার্পাস অর্থাৎ তুলার চাষ বিশেষ লাভজনক। দুঃখের বিষয়, এ অঞ্চলে এই চাষের রেওয়াজ না থাকায় কেহই হস্তক্ষেপ করে না। কিন্তু যদি কেহ একবার অন্ততঃ এক বিঘা জমিতে তুলার চাষ করেন, তবে ইহা কিরূপ লাভজনক, তাহা বিশেষরূপে বুঝিতে পারিবেন। এই চাষে একবার প্রবৃত্ত হইলে আর কখনই ইহা পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইবে না; ইহা বিশেষ লাভজনক। আমাদের পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আমরা এই চাষের প্রক্রিয়া নিম্নে প্রকাশিত করিলাম।

কার্পাসের চাষের জন্য উদ্ভিজ্জ-পদার্থযুক্ত দোয়াঁস ও বেলেদোয়াঁস জমিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। জমিতে বালির ভাগ বেশী থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। কার্পাসের চাষে অনেক সময় জল সেচিয়া দেওয়ার দরকার বলিয়া জমি জলাশয়ের নিকটবর্ত্তী হইলেই ভাল হয়; যেন প্রয়োজনমতে জল সেচিয়া দেওয়া যাইতে পারে। যে সকল জমিতে বর্ষার জল দাঁড়াইবার সম্ভব তথায় কার্পাসের চাষ হয় না; কারণ, গোড়ায় জল দাঁড়াইলে কার্পাসের গাছ নষ্ট হইয়া যায়।

ফাল্গুন মাস হইতেই জমিতে চাষ দিতে আরম্ভ করা উচিত। ২।১ বার চাষের পর জমিতে সার ছিটাইয়া মই দিয়া পুনরায় চাষ দিতে থাকিবে। জমি নিতান্ত এঁটেল হইলে উপযুক্ত পরিমাণ ছাই বা পচা পাতার গুঁড়া ইত্যাদি উদ্ভিজ্জ সার মিশাইয়া জমির প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া আবশ্যক। কার্পাসের জমিতে প্রায় ১০।১২ খানা চাষের দরকার হয়; কেন না, কার্পাসের জমি বেশ গভীররূপে কর্ষিত ও দস্তুরমত চূর্ণীকৃত হওয়া দরকার।

কার্পাসের বীজ প্রথমতঃ হাপোরে বুনিয়া চারা করিয়া তৎপরে ক্ষেত্রে লাগাইতে হয়। হাপোরের জমি ছায়াবিশিষ্ট স্থানে হইলে ভাল হয়। জমি বেশ গভীররূপে কর্ষণ করিয়া ও ধূলীবৎ চূর্ণীকৃত করিয়া জ্যৈষ্ঠের শেষে বা আষাঢ়ের প্রথমে বীজ ফেলিতে হয়। বীজ ছিটাইয়া বোনা অপেক্ষা

চারি অঙ্গুলি ব্যবধানে এক একটি করিয়া বুনিয়া যাওয়াই প্রশস্ত। বীজ বুনিবার পূর্ব্বে ১২ ঘণ্টা কাল গোবরের জলে ভিজাইয়া লইয়া বুনিলে শীঘ্র অঙ্কুরিত হয় এবং গাছগুলি বলিষ্ঠ ও পুষ্ট হইয়া থাকে। বীজ বুনিবার পরে উহার উপরে নাড়া অথবা খড় দ্বারা ঢাকিয়া দিয়া তদুপরি একদিন অন্তর একদিন জল সেচিয়া দিবে। ৫।৬ দিনের মধ্যেই বীজগুলি অঙ্কুরিত হইয়া উঠে।

দস্তরমত বর্ষা আরম্ভ হইলে চারাগুলি হাপোর হইতে উঠাইয়া লইয়া ক্ষেত্রে লাগাইতে হয়। ক্ষেত্রে ২॥ হাত, ৩ হাত অন্তর এক একটি আইল বাঁধিয়া প্রত্যেক আইলের উপরে তৎপরিমাণ ব্যবধানে এক একটি চারা লাগাইয়া যাইবে; সন্ধ্যাকালই চারা লাগাইবার প্রশস্ত সময়।

বর্ষার সময় অন্যরূপে জলসিঞ্চন দরকার করে না; বৃষ্টিই যথেষ্ট। মাটি টানিয়া উঠিলে মাসে একবার করিয়া কোঁদালি দ্বারা অথবা হস্তের সাহায্যে লাইনের মধ্যে লাঙ্গল চালাইয়া জমি আল্‌গা করিয়া দিবে। অন্য ঋতুতে ক্ষেত্রের অবস্থা বুঝিয়া ২০।২৫ দিন অন্তর একবার জল সিঞ্চন করিবে এবং ২।৩ দিন পরে যখন রস টানিয়া মাটি শুকাইয়া উঠিবে, তখন উহা কোদাল অথবা লাঙ্গলের সাহায্যে আল্‌গা করিয়া দিবে।

ছাই, পচাপাতা, অস্থিচুর্ণ, পচাগোবর, রেড়ির খৈল ইত্যাদি কার্পাসের চাষের উৎকৃষ্ট সার। অস্থিচুর্ণ, ব্যবহারে তুলার চাষে বিশেষ ফল পাওয়া যায় কারণ, যদিও উহা গলিয়া উদ্ভিদের ব্যবহারোপযোগী অবস্থায় পরিণত হইতে অনেক সময় লাগে, তথাপি তাহাতে কার্পাসের কোন ক্ষতি নাই; যেহেতু কার্পাস একবার লাগাইলে ৩।৪ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে ও ফল দেয়।

কার্পাসের গাছগুলি দেড় হাত আন্দাজ উঁচু হইলে উহার মাথা ভাঙ্গিয়া দেওয়া উচিত; নতুবা অতি শীঘ্র ফুল হয় এবং তাহাতে ফলন খুব কম হয়। ফুল সাধারণতঃ আশ্বিন মাস হইতেই ধরিতে আরম্ভ করে। এই ফুলই ক্রমে ফলে পরিণত হয়। ফলগুলি যখন ফাটিয়া যায় তখনই বুঝিতে হইবে যে তুলা উঠাইবার সময় হইয়াছে। সাধারণতঃ পৌষ মাস হইতেই তুলা পাকিতে আরম্ভ করে। প্রাতঃকালে রৌদ্রে তুলার গায়ের শিশির শুকাইয়া গেলে উহা সংগ্রহ করিতে হয়; ভিজা থাকিতে উঠাইতে নাই; কারণ, উহাতে ময়লা লাগিয়া তুলা খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ফল উঠাইয়া পরিষ্কার ঝুড়িতে রাখিবে; কখনও মাটিতে বা কোনরূপ অপরিষ্কার ঝুড়ি অথবা কাপড়ে রাখিবে না।

ফলগুলি সমস্ত সংগৃহীত হইলে উপরের খোলা ফেলিয়া দিয়া বীজ হইতে চরকা কলের সাহায্যে তুলা ছাড়াইয়া লইতে হয়।

ভালরূপে চাষ করিতে পারিলে বিঘা প্রতি দুই মণ, আড়াই মণ তুলা পাওয়া যায়। প্রথম বৎসরের ফসল উঠাইয়া লইয়া মাঘ মাসে জমি উত্তমরূপে কোপাইয়া দিবে; তৎপরে গাছ ছাঁটিয়া দিয়া গোড়া খুঁড়িয়া সার প্রয়োগ করিয়া ক্ষেত্রে জল সেচিয়া দিবে। এইরূপ করিলে গাছগুলি শীঘ্রই পুনরায় হৃষ্ট-পুষ্ট হইয়া নূতন ভাব ধারণ করিবে ও সময়মত ফুল, ফল প্রদান করিবে।

বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের বহুদর্শী ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র চৌধুরী লিখিয়াছেন,—বঙ্গদেশে বুড়ী কার্পাসের চাষ বেশ লাভজনক হইবে। এই জাতীয় কার্পাস ইতিপূর্ব্বে সিংভূম জেলায় অল্পপরিমাণে জন্মিত। ভালরূপে জন্মিলে এক বিঘায় বীজ বাদে এক মণ তুলা উৎপন্ন হয়। এক বিঘায় খরচ ১০৲ টাকা বাদ দিয়া ২০৲ টাকা থাকিতে পারে। যে সব উচ্চ ভূমিতে, পাট, ধান বা কোন

প্রকার রবিশস্য হয় না, তাহাতে কার্পাস বেশ আবাদ হইতে পারে। গরু বা ছাগলে ইহার পাতা খায় না, ঘেরা বেড়াও তত প্রয়োজন হয় না জ্যৈষ্ঠ মাসে বারিপাত হইলেই কার্পাস আবাদের উপযুক্ত সময়। কৃষিবিভাগ এই কার্পাসের চাষ প্রবর্ত্তন করিতে বিশেষ যত্ন করিতেছেন। দেশের জমিদারদিগেরও এ বিষয়ে দৃষ্টি থাকা উচিত।

মাদুর কাঠির চাষ ও মাদুর।

মূলা, সরিষা প্রভৃতি রবিশস্য জন্মিবার পর চৈত্র, বৈশাখ মাসে ক্ষেত্রকে এক কি দেড় ফিট গভীর করিয়া উত্তমরূপে কোপাইয়া ফেলিতে হয়। তদনন্তর কিছুদিন সেই কোপান ক্ষেত্র বাতাস পাইলে তাহাতে পুষ্করিণীর পুরাতন পাঁক ছড়াইয়া দিতে হয়। এই পাঁকই উহার পক্ষে উৎকৃষ্ট সার। মাদুর ক্ষেত্র, চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী জমি হইতে অপেক্ষাকৃত একটু নিচু হইলেই ভাল হয়। দোয়াঁসযুক্ত বালুকাময় কিম্বা এঁটেল মাটীই মাদুর চাষের পক্ষে প্রশস্ত। ছায়াপূর্ণ স্থলে কিম্বা পুষ্করিণীর পাড়ের নিম্নদিকেও উহা ভালরূপ জন্মিয়া থাকে।

মাদুর-চারা রোপণ করিবার পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত কোপান ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে এমন ভাবে আল বাঁধিতে হয়, যেন বৃষ্টি হইতে উহার জল কোন দিকে বাহির হইতে না পারিয়া ঐ ক্ষেত্রেই কয়েক দিবস জমিয়া থাকিতে পারে।

প্রথমতঃ বৃষ্টি আরম্ভ হইলে জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় মাসে ঐ কোপান ক্ষেত্রে হলুদ কিম্বা কচু পটীর মত এক একটা পটী প্রস্তুত করিয়া তাহাতে পুরাতন গাছের মূল হইতে বহির্গত ছোট ছোট চারা সকল আনিয়া রোপণ করিতে হয়। রোপণের পর যদি বৃষ্টি হয় কিম্বা ক্ষেত্রে রস থাকে, তাহা হইলে আর জল দিবার আবশ্যক করে না। ৮।১ মাসের মধ্যে ঐ রোপিত চারাগুলি কথঞ্চিৎ বড় হইলে যদি উহার মধ্যে ঘাস জন্মিয়া থাকে, তবে সেগুলিকে পরিষ্কার করিয়া দিয়া ঐ পটীর মৃত্তিকার দ্বারা গাছের গোড়াগুলি পূরণ করিয়া দিতে হয়। অতঃপর আর বিশেষ কিছু যত্ন করিতে হয় না।

আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসের মধ্যে ঐ গাছগুলি ৪।৫ হাত লম্বা হইয়া কাটিবার উপযুক্ত হইলে তখন ঐ গুলিকে কাটিয়া ফেলিতে হয়। তারপর পুনরায় ঐ ক্ষেত্রের আগাছাদি পরিষ্কার করিয়া অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে একবার পাঁক মিশ্রিত জল সেচিয়া দিলে কার্ত্তিকে ঐ পুরাতন গাছের চতুর্দ্দিক হইতে বহুপরিমাণে চারা জন্মিয়া থাকে। ঐ চারাগুলি বড় হইলে মাঘ মাসের মধ্যে ক্ষেত্রে একবার তরল পাঁক সেচিয়া দিতে হয়। ঐ পাঁকই বিশেষ সারের কার্য্য করে, তখন চারাগুলি খুব তেজাল ও মোটা হইয়া চৈত্র মাসের মধ্যে পুনরায় কাটিবার উপযুক্ত হয়। তখন ঐ গুলিকে কাটিয়া ক্ষেত্র কোপাইতে হয় এবং মূলগুলিকে কোন ছায়াযুক্ত সমতল স্থানে লাগাইয়া চারার জন্য রাখিয়া দিতে হয়। তারপর পুনরায় নূতন করিয়া ঐ ক্ষেত্রে পাঁক সার দিয়া চারা লাগাইতে হয়; কিন্তু একই ক্ষেত্রে একাদিক্রমে প্রতি বৎসর উহার চাষ করিলে কাঠি উত্তমরূপে জন্মে না। এজন্য দুই বৎসর অন্তর এক একটী ক্ষেত্র পরিবর্ত্তন করিয়া উহার চারা রোপণ করিলে খুব ভাল হয়।

মাদুর বয়ন।

ঐ মাদুর-কাঠিগুলি কাটিবার পর অগ্রে বড় ছোট পৃথক পৃথক বাছিয়া মোটা সরু অনুসারে সেগুলিকে লম্বা দিকে দুই চারি অথবা ততোধিক খণ্ডে চিরিয়া ফেলিবে এবং কাঠিগুলিকে প্রস্থের দিকে মাঝামাঝি দুই খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিতে

হয়। তারপর সেগুলিকে একদিন রৌদ্রে রাখিবার পর ২।১ দিন জলে ফেলিয়া এবং জল হইতে উঠাইবার পর পুনরায় রৌদ্রে শুকাইয়া ঐ কাঠির দ্বারা মাদুর বুনিতে হয়। মছলন্দ বুনিবার কাঠিগুলিকে সুন্দরভাবে খুব সরু সরু করিয়া চিরিতে হয়। খুব মোটা ও লম্বা কাঠিগুলি মছলন্দ বুনিবার পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট।

মছলন্দ বুনিতে সুতার দরকার হয়। পাটের দড়ির দ্বারা মাদুর বুনা হইয়া থাকে। এই মাদুর ও মছলন্দী বুনিবার জন্য একটা এক কি দেড় ফিট চওড়া ও ৫।৬ হাত লম্বা কাষ্ঠ নির্ম্মিত হাতার প্রয়োজন। হাতাটীতে লম্বালম্বি ভাবে কাছাকাছি দুইটি করিয়া দুই সারিতে অনেকগুলি ছিদ্র থাকে। প্রথমে কাপড় বুনিবার টানার ন্যায় মাদুর বা মছলন্দের দীর্ঘ বিস্তারের মাপে দড়ি বা সুতার টানা করিতে হয়। টানায় দুই মাথায় দুইখানি কাষ্ঠের দ্বারা ঐ টানার দড়িগুলি আবদ্ধ থাকে ও পূর্ব্বোক্ত হাতাটির ছিদ্রের মধ্য দিয়া টানার দড়িগুলি থাকে। ঠিক কাপড় বুনিবার ন্যায় এক একটি কাঠি ঐ টানার মধ্য দিয়া চালাইয়া দুই এক ইঞ্চি বুনা হইলে ঐ হাতা দ্বারা সেগুলিকে একত্র বেশ করিয়া ঠেসিয়া দিতে হয়। ঐ প্রকার বয়ন কার্য্য শেষ হইলে তৎপরে উহার উভয় দিকের মাথাগুলি দড়ির মধ্যে দিয়া মুড়িয়া বাঁধিয়া বেশীর ভাগ সমান করিয়া কাটিয়া দিতে হয়।

চাষের লাভালাভ।

ইহার চাষে অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না। বৎসরের মধ্যে গড়ে দুই মাসের বেশি পরিশ্রম করিতে হয় কিনা সন্দেহ। প্রতি বিঘা জমিতে প্রত্যেক বৎসর প্রতিবারে ৫০্।৬০্ টাকা করিয়া দুইবারে শতাধিক টাকার উপর কাঠি জন্মিয়া থাকে; এই কাঠি হইতে প্রায় ২।৩ শত টাকার মাদুর ও মছলন্দ প্রস্তুত হইতে পারে। সর্ব্বপ্রকার খরচাদি বাদে প্রতি বিঘায় চাষ ও মাদুর বয়নে খুব কম প্রায় শতাধিক টাকা লাভ হইয়া থাকে। মেদিনীপুর জেলার নানাস্থানের গৃহস্থবাড়ীর মেয়েরা অতি পরিপাটীরূপে মাদুর ও মছলন্দী বুনিয়া বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। এমন কি ইহাদের প্রস্তুত এক একখানি মছলন্দ ৮্।১০্ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে।

উদ্ধৃত।

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য।

ভারতীয় তুলার রপ্তানি।—এ বৎসর ভারতীয় তুলার রপ্তানি সম্ভবতঃ খুব বাড়িবে। এবার আমেরিকায় খুব কম তুলা জন্মিয়াছে। নিম্ন নীল উপত্যকায় বোল পোকায় তুলার আবাদ বিশেষরূপ নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। সেই জন্য আমেরিকায় তুলার এত টান। যাহা হউক মিশর হইতে প্রায় ৫০০০০ টন তুলা তথায় রপ্তানি হইবে; তথাপি আশা করা যায় যে ভারতবর্ষ হইতে আমেরিকার মিলে নিশ্চয় তুলা রপ্তানি হইবে।

আফগানিস্থানের খনিজ সম্পত্তি।—আফগানিস্থানের খনিতত্ত্বের সন্ধান লইবার জন্য আমীর, ইংলণ্ড হইতে খনিতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার ওয়াল্টার সেস্ সাহেবকে কাবুলে আনিয়াছেন। তিনি এখন আফগানিস্থানে খনিতত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত আছেন। আগামী জানুয়ারির পূর্ব্বে তাঁহার কার্য্য শেষ হইবার সম্ভাবনা। আমাদের সহিত ইঁহার আকরঘটিত

বহু প্রসঙ্গের আলোচনা হইয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ আফগান রাজ্যে এইবার শীঘ্র আকরের কার্য্য আরম্ভ হইবে। আফগান রাজ্যে সকল দিকেই এখন উন্নতির লক্ষণ।

মুগার চাষ।—প্রায় দশ বৎসর আগে লতা তন্ত্র ও নানা জাতীয় গুল্মাদির আঁস লইয়া বহু পরীক্ষা হইয়াছিল। সেই সময় মুগার আঁস বেশ কর্ম্মপোযোগী বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। এমন কি ইউরোপ ও আমেরিকার বাজারে মুগার আঁস ৩০ হইতে ৪০ পাউণ্ড দরে প্রতি টন বিক্রয় হইতে থাকে। এগেভ সিস্‌লানা (Agave sisalana) জাতীয় মুগারই সাধারণতঃ আঁস বাহির করা হইত। মুগার এই রূপ আদর দেখিয়া আসামে দুইটী মুগার ক্ষেত্র স্থাপিত হইল। তন্মধ্যে দাউরাচেরা ক্ষেত্রটী পুরাতন ও সাতগাঁও চা বাগানের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রটী অপেক্ষাকৃত নূতন। এই দুই জায়গায় কেবল এগেভ সিস্‌লানা জাতীয় মুগারই চাষ হয়, কেননা ইহার আঁস ভাল ও মূল্যও অধিক; ইহার অপর নাম সিসাল হেম্প (Sisal Hemp)। সম্প্রতি মধ্য প্রদেশের জেল কর্ত্তৃপক্ষের এই দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে। তিনি মনে করেন যে কয়েদিদিগের দ্বারা বাজে কাজ না করাইয়া মুগা হইতে ম্যাটিং বোনা ও অন্যান্য কাজ করাইলে সমধিক লাভ হইবার সম্ভাবনা। এমন কি আঁস তৈয়ারি করাইয়া বাজারে বিক্রয় করিলেও লাভ আছে। তিনি সেই জন্য বন-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষকে মুগা সরবরাহের সুবিধা করিবার কোন বন্দোবস্ত করিতে অনুরোধ করেন। কথাটা তাঁহারও কাণে লাগিয়াছে তিনি তাঁহার অধীনস্থ অরণ্যাধ্যক্ষদিগকে মুগা চাষের কিছু কিছু সুব্যবস্থা করিতে বলিয়াছেন। ফলে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হওয়া খুব সম্ভব। কারণ জঙ্গলে পতিত জায়গার অভাব নাই এবং নানা জাতীয় মুগা অরণ্যে বিরল নহে। অরণ্যাধ্যক্ষগণ দেয়াশালাইয়ের কাটি বা বাক্স, চায়ের বাক্স বা অন্য কোন রূপ খুঁটিনাটি কার্য্যে বিরক্তি বোধ না করিলে মুগা চাষে সহজেই মন দিতে পারিবেন এরূপ আশা করা অসঙ্গত নহে; কিন্তু বনে একটা অসুবিধা আছে। এখানে মুগার সুবিস্তৃত ক্ষেত্র রচনা করা সম্ভব হইবে না, কারণ কর্ত্তৃপক্ষ ত মুগার জন্য আর শাল, সেগুনের বন কাটিয়া মাঠ প্রস্তুত করিতে পারেন না। সেই জন্য মধ্য-প্রদেশে যে সকল কালমাটির ক্ষেত্রে তুলা চাষ হয় তাহাতে মুগা চাষের কল্পনা হইতেছে। মুগা চাষে ইতস্ততঃ করিবার কোন কারণ নাই। ইহার চাষ সহজ, ইহার আঁস বিশেষ আবশ্যক সুতরাং ইহা বিক্রয় করিবার ভাবনা নাই এবং তাহাতে লাভও যথেষ্ট। গভর্ণমেণ্ট রক্ষিত অরণ্যের নিকটে যে সমুদয় গ্রাম আছে তাহার অধিবাসীগণের মধ্যে বেকার লোকদিগকে যদি মুগা চাষে লওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ সকল বেকার লোকে বনের গাছ পালা ভাঙ্গিয়া, কাষ্ঠাদি চুরি প্রভৃতি অত্যাচার না করিয়া একটা সহজ কাজে প্রবৃত্ত হইতে পারে; উপরন্তু বনবিভাগেরও তাহাতে পরোক্ষে কিছু লাভ আছে এবং এই সকল লোকেরও একরূপ রোজকারের উপায় হয়।

মুগাচাষ লাভজনক, কিন্তু ইহাতে লাভ করিতে গেলে একটী বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া চলা উচিত। মুগার ক্ষেত্রটী রেল ষ্টেসনের নিকট হওয়া আবশ্যক, তাহা না হইলে মুগার পাতা বহান খরচ অনেক পড়িয়া যায়। আঁস বাহির করিবার কারখানা ষ্টেসনের সন্নিকট হওয়া আবশ্যক। সরকারি বনবিভাগ হইতে যদি ইহার চাষ হয় এবং সেই পাতা জেলে চালান হয়, তাহা হইলে

আমাদের বলিবার কিছুই নাই; কিন্তু যদি গভর্ণমেণ্ট ইহার ক্ষেত্র রচনা ও কারখানা স্থাপন করিয়া সাধারণ লোকের মত ব্যবসায়ে মন দেন তবে, সাধারণ লোকের মধ্যে যাহারা ইহার ব্যবসায়ে টাকা খাটাইতে চান, তাহাদের গভর্ণমেণ্ট প্রতিযোগিতায় একটা বিষম অন্তরায় উপস্থিত হইবে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে অনেক জাতীয় মৃগা আছে, তাহার মধ্যে অনেক গুলিই ভাল, মধ্য প্রদেশে ধুসর রঙ্গের এক প্রকার মৃগা হয় উহা প্রায় হেম্পের তুল্য, আরও অনেক ভাল মৃগা আছে, তথাপি দেখা যায় যে সিসাল হেম্পই যেন মৃগার মধ্যে উৎকৃষ্টতম।

ভেজাল আইন।—তৈল, ঘৃত, দুগ্ধ ও অন্যান্য খাদ্যাদিতে ভেজাল চালাইবার জন্য দেশের কি পর্য্যন্ত অনিষ্ট সাধিত হইতেছে তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে অনেক আলোচনা করিয়াছি। আমাদের দেশের লোক পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। তখন দুধে জল দেওয়া এক মহাপাপ বলিয়া বিবেচিত হইত। এখন আর সে ভাব নাই একজনের দেখাদেখি পাঁচজনে মজিতেছে। ইংলণ্ডে ভেজাল রোধের জন্য আইন আছে। আমাদের দেশের লোক তখন আত্মসাবধান হইতে ভুলিয়াছে তখন এখানেও আইন আবশ্যক। সেই কারণে মিউনিসিপালিটির স্বাস্থ্য বিভাগীয় স্পেশাল কমিটির এক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত জে, এল, মিত্র "ভেজাল রোধের আইন" তৈয়ারির জন্য প্রস্তাব করিয়াছেন। ইংলণ্ডের আইনের মত একটা খসড়া প্রস্তুত করিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট অনুমোদনের জন্য পাঠান হইবে। আমাদের নিজের দোষেই এই আইনের আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

পৌষ—ডিসেম্বর মাস।

সব্জী বাগান।—বিলাতী শাক-সব্জী বীজবপন-কার্য্য গত মাসেই শেষ হইয়া গিয়াছে। কোন কোন উদ্যানপালক এমাসেও পারস্লী (Parsley) বপন করিয়া সফলকাম হইয়াছেন। কেবল বীজ বোনা কেন, কপি প্রভৃতি চারা নাড়িয়া ক্ষেত্রে বসান হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে তাহাদের গোড়ায় মাটি দেওয়া ও আবশ্যক মত জল দিবার জন্য মালিকের সতর্ক থাকিতে হইবে। সালগম, গাজর, বীট, ওলকপি প্রভৃতি মূলজ ফসল যদি ঘন হইয়া থাকে, তবে কতকগুলি তুলিয়া ফেলিয়া ক্ষেত্র পাতলা করিয়া দিতে হইবে। আগে বসান জলদি জাতীয় কপির গোড়া খুঁড়িয়া দিতে হইবে। ইহাতে কপি বড় হয়।

কৃষি-ক্ষেত্র।—আলুর গাছে মাটি দিয়া গোড়া আর একবার বাঁধিয়া দিতে হইবে। পাটনাই আলুর ফসল প্রায় তৈয়ারি হইয়া গিয়াছে। এই সময় কিন্তু ফসল কোদালি দ্বারা উঠাইয়া না ফেলিয়া যতদিন গাছ বাঁচিয়া থাকে ততদিন অপেক্ষা করা ভাল। ইতিমধ্যে নিড়ানি দ্বারা খুঁড়িয়া কতক পরিমাণ আলু তুলিয়া লওয়া যাইতে পারে। যে ঝাড় হইতে আলু তুলিবে তাহাতে মটরের মত আলু গুলি রাখিয়া বাকি গুলি তুলিয়া লওয়া যাইতে পারে। আলু তুলিয়া পরে গোড়া বাঁধিয়া দিবে। ইহাতে গাছ গুলি পুনরায় সতেজে বাড়িতে থাকে। আলু ক্ষেত্রে এমাসে দুই একবার আবশ্যক মত জল দেওয়া আবশ্যক। মটর, মসুর, মুগ প্রভৃতি ক্ষেত্রের বিশেষ কোন পাইট নাই। টেঁপারি ক্ষেতেও জল দেওয়া এই সময় আবশ্যক।

তরমুজ, খরমুজ, চৈতে বেগুন, চৈতে শশা, লাউ, কুমড়া ও উচ্ছে চাষের এই উপযুক্ত সময়।

REGISTERED No. C. 192.



ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসনের মুখপত্র

পৌষ, ১৩১৬।

কৃষক

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

দশম খণ্ড,—৯ম সংখ্যা।

সম্পাদক—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস্।

পৌষ, ১৩১৬।

কলিকাতা : ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে
শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা ; ১২৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, দি মিলার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
এস, এইচ, রহমান দ্বারা মুদ্রিত।





কৃষক।

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিকপত্র।

১০ম খণ্ড। | পৌষ, ১৩১৬ সাল। | ৯ম সংখ্যা।

তড়কা ও বাদলা (Black qurter)

শ্রীকুঞ্জবিহারি দে লিখিত।

সমসংজ্ঞা—বাদলা, বাদলাম্ ঝাং (বঙ্গদেশ)।

রোগ পরিচয়।—এই রোগ অতি সংক্রামক। অত্যুগ্র জ্বর, দ্রুত দ্রুত অবস্থার পরিবর্ত্তন ও চর্ম্মে সীমাবদ্ধ বায়ুপূর্ণ স্ফীতি ইহার প্রধান লক্ষণ। তড়কা রোগের সহিত এই ব্যারামের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। এই রোগ সাধারণতঃ ছোট ছোট বাছুরের হয়। ৩ মাস হইতে ৪।৫ বৎসর বয়স্ক গোরুদিগের এই ব্যারাম হইতে পারে কিন্তু ৬ মাস হইতে ৩ বৎসর বয়স্ক গোরুর এই ব্যারাম অধিক হয়। ৩ মাসের পূর্ব্বে ও ৫ বৎসরের পরে এই ব্যারাম গোরুর প্রায়ই হয় না। এই রোগের দ্বিতীয় আক্রমণ প্রায়ই হয় না। মানুষের এই ব্যারাম হয় না।

কারণতত্ত্ব।—শরীরে ঘা থাকিলে, দাঁত উঠিবার কালে মুখে কোন প্রকার ঘা হইলে কিম্বা আঘাতাদি পাইলে এই রোগের বিষ শরীরে প্রবেশ করিয়া রোগ উৎপাদন করে। জলাবৃত ভূমিই এই রোগের উৎপত্তি স্থান। যাহারা গৃহে থাকে তাহাদের এই ব্যারাম প্রায়ই হয় না। নিম্ন প্রান্তরস্থ জলাবৃত ভূমিতে চরিয়া গোরু এই রোগগ্রস্ত হয়। আষাঢ় মাস হইতে কার্ত্তিক মাসের যে কোন সময়ে এই রোগ হইতে পারে। স্থূলকায় বাছুরের এই রোগ অধিক হয়।

অঙ্কুরায়মান অবস্থা।—১ দিন হইতে ৫ দিন কিন্তু সচরাচর ২ দিন কাল পর্য্যন্ত হয়।

লক্ষণ।—এই রোগের লক্ষণ "স্থানীয় ও সাধারণ" দুই ভাগে বিভাগ করা যায়।

স্থানীয় লক্ষণ।—প্রথমে স্থানীয় লক্ষণ দৃষ্ট হয়। সহসা রোগোৎপত্তি কালে রোগী খোঁড়াইতে থাকে; অধিক মাংস পেশীময় কোমল স্থান সহসা ফুলিয়া যায়। প্রথমে ফুলা অতি অল্প থাকে এবং ইহা গরম বোধ হয় ও তাহাতে বেদনা থাকে। এই সময়ে অনেকে মনে করেন যে সামান্য আঘাত পাইয়া স্থানটী ফুলিয়াছে, কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ফুলা অতিশয় বৃহদাকার ধারণ করে। স্ফীত স্থান এই সময়ে বেদনা বিহীন ও শীতল হয়; হাত দিয়া টিপ দিলে এক প্রকার কড়কড় শব্দ হয় এবং স্ফীত স্থানটী বায়ু পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। স্ফীত স্থানটী কাটিলে দেখিতে পাইবে যে স্থানটী পচিয়া গিয়াছে

ও তাহাতে কাল রং বিশিষ্ট ফেনাময় তরল পদার্থ বিদ্যমান আছে। জঙ্ঘার উপরি ভাগে, গলায়, কাঁধে, কুঁচকিতে, পিঠে, বুকের নিম্নাংশে মুখে বা কণ্ঠে স্ফীতি হয়। সময়ে সময়ে এক স্থানে স্ফীতি দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু সাধারণতঃ কতিপয় স্থান ফুলিয়া যায় এবং এই সমস্ত স্ফীত একত্র হইয়া অতি বৃহদাকার ধারণ করে। কোন কোন রোগীর হাঁটুর উপরিস্থ কোনও স্থানে স্ফীতি হয় এবং ক্রমশঃ স্ফীতি উর্দ্ধদিকে বিস্তৃত হয়। কোন কোন রোগীতে বাহ্যিক লক্ষণ প্রকাশ না হইয়া সাধারণ লক্ষণ প্রথমে প্রকাশ পায়।

আভ্যন্তরিক বা সাধারণ লক্ষণ।—অত্যুগজ্বর, কোষ্ঠবদ্ধতা, নিস্তেজতা, দুর্ব্বলতা, ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস, শ্বাসকৃচ্ছ্র, রক্তবর্ণ প্রস্রাব ইত্যাদি লক্ষণ প্রথমে দৃষ্ট হয়। পরে রোগী যন্ত্রনায় গোঁ গোঁ শব্দ করে; শুইয়া থাকিতে ভাল বাসে: রক্ত মল নির্গত হয়; পেট ফাঁপিয়া যায় ও যন্ত্রনায় রোগী ছট্ ফট্ করিতে থাকে। অবশেষে অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে।

লক্ষণ।—এই রোগে রোগী প্রায়ই বাঁচে না। যে সকল গোরু বাঁচে, তাহাদের স্ফীত স্থান গুলি আপনি আপনি ফাটিয়া গিয়া দুষিত পচনশীল পদার্থ নিঃসৃত হয় এবং স্ফীত স্থানে গভীর গর্ত্তাকৃতি হয়। ঘা ক্রমশঃ শুকাইয়া যায়। পূর্ব্বে যে সকল লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে ঐ সকল লক্ষণ প্রায় রোগীতে দৃষ্ট হয়, কিন্তু কোন কোন রোগীতে বাহ্যিক লক্ষণ প্রকাশ পায় না এবং এই সময়ে রোগ নির্ণয় অতি কঠিন ব্যাপার। যে সকল গোরুর বাহ্যিক লক্ষণ প্রকাশ না হইয়া আভ্যন্তরিক লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহাদের লক্ষণ গুলি নিম্নে দেওয়া গেল:—

রোগী কাঁপিতে থাকে; জাওর কাটে না; দুর্ব্বল হয়। শূল বেদনা হয় ও পেট ফাঁপিয়া মরিয়া যায়। এই রোগ পাকস্থলী বা উদরের পীড়ার সহিত ভ্রম হইতে পারে। রোগের ভোগ কাল ১ দিন হইতে ৩ দিন পর্য্যন্ত।

এই রোগের ভাবী ফল সন্তোষজনক নহে। ৩ বৎসর বয়সের নিম্নে বাছুরগুলি প্রায় বাঁচে না। অধিক বয়স্ক গোরুগুলি বাঁচিতে দেখা যায়। শতকরা ৭০।৮০টী রোগীর মৃত্যু ঘটে।

চিকিৎসা।—রোগীকে বলকারক পথ্য খাইতে দিবে। প্রথমে জোলাপ দিয়া পেটের মল বাহির করাইবে। পানীয় জলের সহিত লবণ ও সোরা প্রত্যহ পান করিতে দিবে। এই রোগ এত শীঘ্র বৃদ্ধি পায় যে চিকিৎসা করিবার অবসর থাকে না, সুতরাং রোগ আবির্ভাব হওয়া মাত্র রোগীকে চিকিৎসা করাইবে।

নিম্নলিখিত উত্তেজক ও আভ্যন্তরিক বিষ নাশকারক ঔষধ ১ ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইতে হয়।

কার্ব্বলিক এসিড	১ ড্রাম (৬০ ফোঁটা)
তার্পিন তৈল	৪ ড্রাম অর্থাৎ ৫ এক কাঁচ্চা
দেশী মদ	১ আউন্স বা অর্দ্ধ ছটাক
ফেন	৵৷৹ সের

একবারের ঔষধ।

রোগী একটু সারিলে উক্ত ঔষধ ২ কি ৩ ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইয়া দিবে।

বাহ্যিক চিকিৎসা।—উত্তপ্ত লৌহ দিয়া স্ফীত স্থান পোড়াইয়া দিবে। অথবা স্ফীত স্থানটী ৩।৪ ফালা করিয়া কাটিয়া কার্ব্বলিক এসিড দিয়া পোড়াইয়া দিবে। কয়েক দিন পরে স্ফীত স্থানে গরম নিমপাতার জল দিয়া ধৌত করিয়া কার্ব্বলিক তৈল প্রয়োগ করিবে। পরে ফোলা হইলে উপরোক্ত নিয়ম অবলম্বন করিবে তদ্ভিন্ন ফোলা স্থানের উপরিভাগে শক্ত করিয়া পটী বাঁধিয়া দিবে।

সংক্রামক রোগের প্রতিবিধানোপযোগী নিয়মাবলী সম্যকরূপে পালন করিবে। রোগের আবির্ভাব হওয়ামাত্র রাজদ্বারে আবেদন করিবে।

হরিদ্রার চাষ।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখিত।

বিগত ১৩১৫ সালের চৈত্র ৯ম খণ্ড ১২শ সংখ্যা কৃষকে মালদহ জেলার কুশীদাবাসী বাবু গুরুচরণ রক্ষিত মহাশয় হরিদ্রার চাষ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রচার করিয়াছেন, উহা দক্ষিণ বঙ্গভূমিবাসীগণের (আমাদিগের) নিকট বিসদৃশ বোধ হওয়ায় প্রথমতঃ প্রতিবাদ প্রেরণেই অভিলাষী হই; কিন্তু স্থির ও গাঢ়ভাবে সমালোচনায় ইহা মনে হয় যে, উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গে ভূমির প্রকৃতি ও জল বায়ুর দোষ গুণের পার্থক্যের প্রশ্নের সমাধানে আমরা সক্ষম নহি, সুতরাং কৃষি প্রণালীর স্বাতন্ত্রতা অবশ্যম্ভাবী বিধায় প্রতিবাদ নিতান্তই অশোভন, এ অবস্থায় দক্ষিণ বঙ্গের চিরপ্রচলিত কৃষি পদ্ধতি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ আকারে প্রচার করিলে, কৃষি বিদ্যাভিজ্ঞ সূক্ষ্মদর্শীর চক্ষে উভয় প্রবন্ধের এবং স্থান ভেদে (দেশ ভেদে) কৃষিকার্য্যের তারতম্য ও উৎকর্ষ অপকর্ষ প্রতিফলিত হইয়া দোষ গুণের মীমাংসা হইবে। অতঃপর আমাদিগের এই দক্ষিণ বঙ্গের নদীয়া, যশোহর, খুলনা, চব্বিশ পরগণা, হাবড়া ও হুগলী প্রভৃতি জেলায় হরিদ্রা চাষের যেরূপ আবহমানকাল প্রচলিত প্রথা কৃষককুলের সুপরিচিত তাহাই নিম্নে লিপিবদ্ধ করা গেল। এস্থলে এ কথা বলা আবশ্যক যে আমাদিগের এই খুলনা জেলার কপোতাক্ষী, বেত্রবতী ও যমুনা, যশোহরের ভৈরব, ২৪ পরগণায় যমুনা ও ইচ্ছামতী ও আরও অসংখ্য নদ, নদী, সৈকতের শীকতাধিক্য দোয়াঁস পতিত ভূমির লতা, গুল্ম অপসারিত করিয়া বৎসর বৎসর বহুল পরিমাণে লঙ্কা ও হরিদ্রার চাষ হইয়া থাকে।

নদ, নদীর পুলিন প্রদেশ ভিন্ন পল্লী মধ্যবর্ত্তী উপবন নিচয়ে এবং বাস্ত ও উদ্বাস্ত অর্থাৎ জলঝাড়া উচ্চ ভূমিতেও হরিদ্রার যে পরিমাণ চাষ হয় তাহাও অল্প নহে, সুতরাং এ অঞ্চলের কৃষকবর্গকেও অনভিজ্ঞ বলিবার কোন হেতু অনুভূত হয় না। সে যাহা হউক এইক্ষণে কৃষি প্রণালী বলা যাউক।

হরিদ্রা চাষের জন্য লবণজল সংস্পর্শ পরিশূন্য উচ্চ বেলে এবং দোয়াঁস বালুকাধিক্য পলিমাটি যুক্ত ক্ষেত্রই প্রশস্ত। আটাল মাটি বা লবণজল সম্পর্ক সংযুক্ত ভূমি কেবল হরিদ্রা বলিয়াই নহে, সর্ব্ববিধ মূলজ লতা গুল্মের পক্ষেই পরিত্যজ্য। নির্ব্বাচিত ভূমি বহুকালের অন্ততঃ দুই চারি বর্ষের পতিত বন্য লতাগুল্ম পরিব্যাপ্ত ক্ষেত্র হইলেই ভাল হয়। ঐ ক্ষেত্র কার্ত্তিক মাসে একবার কোদালি দ্বারা বড় বড় চাপ উল্টাইয়া কোপাইয়া (পুরাতন পুষ্করিণীর পাঁক পচা মাটি ছড়াইয়া দিলে ভাল হয়) রাখিবে, পরে মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষের শুভ দিনে হাল পুণ্যাহ করিয়া, সপ্তাহ বা পক্ষান্তে উপর্য্যুপরি দুই দুই চাষ ও একই দিবসে দুই দুই প্রস্থ মই দিয়া মৃত্তিকা চূর্ণ ও (হুড়া), তৃণ ও তৃণ মূলাদি বাছিয়া জমি পরিষ্কার ও পাইট করিতে থাকিবে। ফাল্গুন, চৈত্রে বৃষ্টি হইলেই ঐ সিক্ত ভূমিতে যেমন জো হইয়া গলন * বাহির হইবে, অমনি প্রয়োজন মত দুই তিনবার লাঙ্গল দিয়া অবিচ্ছেদ রেখা পাতে ভূমির কর্ষণ করিবে, এবং প্রতি দুই তিন চাষের পরেই একবার ভূমি বাছাই ও তৃণাদি দূরীভূত করিয়া, পরে একবার দীর্ঘে ও একবার প্রস্থে মই দিবে; ভূমি কর্ষণের ও মই দিবার সাধারণ নিয়মই এই যে একবার দীর্ঘে ও একবার প্রস্থে কার্য্য করিতে হইবে। যাহা হউক এইরূপে দুই তিন বার কর্ষণের পরে দুই দুই বার মই চালনা কার্য্যকে এক এক প্রস্থ বা এক এক ক্ষেপ ধরিয়া লইয়া, অন্ততঃ তাহার তিন প্রস্থ বা ক্ষেপ কর্ষণ সমাধা হইলে, প্রায়ই ক্ষেত্রের গলন বিরলও কর্ষণের সমকালের বাছাইতে আবর্জ্জনা দূরীভূত হইয়া মৃত্তিকার কাঠিন্য অপসারিত হইয়া সুকোমল ও সুচূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে; চাষ সমাধা বিবেচিত হইলেও দুই চারি দিন অপেক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে যে তখনও গলন বাহির হয় কি না; ফলে গলন একান্তাভাবের সম্ভাবনা কোন কালেই নাই, তথাপি ন্যূনাধিক অঙ্কুরিত দুর্ব্বা, মুথা বর্দ্ধনশীল তৃণাঙ্কুরের সংখ্যা ও পরিমাণ বিরল ও হীনতা পরিলক্ষিত হইলেই, শেষ চাষ সমাধা ও মই দ্বারা ভূমি সমতল এবং লাঙ্গলের কর্ষণ রেখা সমুদয় বিলীন করিয়া লইয়া, তিন ফিট বা দুই হস্ত অন্তর স্থান নির্ণয়ান্তর একজনে লাঙ্গল ধরিবে এবং অপরে উহা টানিয়া লইয়া যাইবে; এইরূপে সমুদয় ক্ষেত্রে সমসূত্রে রেখাপাত সমাধা হইলে ঐ খাতের মধ্যগত স্থান সমূহ, উভয় হস্তে মৃত্তিকা চালনা করিয়া পিলি করিয়া লইবে, এইরূপে চাষের কার্য্য সমাধা করিয়া পূর্ব্ব বৎসরের উত্তোলিত হরিদ্রার মূল বা গেঁইড় সমূহ, যাহা হরিদ্রা সুপক্ক হইলে কোদালী সাহায্যে অক্ষত ও কীটাদি পরিশূন্য বিশুদ্ধ ও সুপুষ্ট পরীক্ষান্তে সুশীতল গৃহ মধ্যে সুরক্ষিত অবস্থায় রক্ষিত ছিল, পুনরায় আর একবার উহা পরীক্ষা করিয়া বীজ করার জন্য নির্ব্বাচন করিয়া লইয়া, ঝুড়ি অথবা ধামায় পূর্ণ করিয়া ক্ষেত্রে আনয়ন করিয়া পিলির মধ্যে এক হস্ত অন্তর রোপণ করিবে। রোপণ কালে পূর্ব্ব বর্ষে মূলের যে অংশ উপরে ছিল এবৎসরও সেই দিকটা উপরে রাখিবে। হরিদ্রার মূলের অভাব হইলে তৎসংলগ্ন

---

* গলন বাহির হওয়া মানে, অনীপ্সিত অপ্রয়োজনীয় স্বভাবজ তৃণাঙ্কুরাদি উদ্গত হওয়াকে কহে।

স্থূল ও সুপুষ্ট নির্দ্দোষ মুখিও বীজার্থে ব্যবহার হইয়া থাকে কিন্তু মুখিতে প্রথম বর্ষে হরিদ্রা ভাল জন্মে না। হরিদ্রার পিলি যে পূর্ব্ব পশ্চিম ভাবে লম্বা করিতে হইবেই এরূপ কোন সুনিশ্চিত ব্যবস্থা কৃষকগণের মধ্যে প্রচলিত নাই, জমির অবস্থানুসারে পূর্ব্ব পশ্চিম বা উত্তর দক্ষিণ অথবা কোণাকুণী রোপণান্তে পিলি সমূহ পচা বিচালি ও খড় দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে। পিলির খাত মধ্যস্থ মৃত্তিকা গুলি অপচয় বা স্থানান্তরিত করা হইবে না। উহা হরিদ্রা রোপিত পিলির উভয় পার্শ্বে সমভাবে আইল (আলবাল) রূপে প্রথমতঃ রক্ষিত হয়। উহাতে লাভ এই হয় যে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠের স্থূল ধারা বৃষ্টিপাতে উক্ত আইলদ্বয়ের আলগা মাটি আপনাপনি জল বেগে বিধৌত হইয়া, পিলি মধ্যে নিপাতিত ও সাররূপে ব্যবহৃত হইয়া বীজ হইতে অঙ্কুরিত কোমল চারা অধিক সতেজ হইয়া উঠে। ফলে বৃষ্টি হউক আর না হউক হরিদ্রা বীজ রোপণের পনর কুড়ি দিনের মধ্যে যে সময়ে ক্ষেত্রে পুনরায় অঙ্কুরও তৃণাদি গজাইয়া মৃত্তিকার উপরে বর্দ্ধিত হইয়া উঠে, তখন ক্ষেত্রে নিড়ানি দিয়া ঐ সমস্ত তৃণের মূলোৎপাটন পূর্ব্বক আবর্জ্জনা সমূহ পরিষ্কার ও আইলের মৃত্তিকা বিবেচনা মত অল্পে অল্পে পিলি গর্ভে নিক্ষেপ করিয়া চারার গোড়া ঢাকিয়া দিবে; এইরূপ দুই তিন বারের পরে যখন চারা সমূহ বড় হইয়া উঠিবে, তখন পূর্ব্বস্থিত আইলের অধিকৃত ভূমি মুড়া কোদালি দ্বারা কাটিয়া সেই সমস্ত মাটি চারার গোড়ায় দিবে। ইহাতে ফল এই হইবে যে আইলের ভূমিতে খাত হইয়া জল প্রণালী হইবে, এবং চারার গোড়ার মৃত্তিকা উচ্চ আইলে পরিণত হইয়া চারায় জল বসিয়া চারা মরিয়া যাইবে না। বীজ রোপণ কালে ক্ষেত্রের যে দিক্‌টা একটু নিম্ন পরিলক্ষিত হইবে সেই দিকে লম্বা লম্বি করিয়া পিলি খনন করিবে। ইহাতে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে ভূমি অসমতল হইলেও হরিদ্রা ক্ষেত্রের জন্য নির্ব্বাচিত হইতে পারে। ফল কথা এই যে যতদূর সম্ভব ক্ষেত্রে ভূমিকে পূর্ব্বে সমতল করিয়া পরে তাহাকে কর্ষণ করিতে হইবে। মূলজ উদ্ভিদের সাধারণ নিয়মই এই যে উহা সুগভীর রূপে কোদালি বা লাঙ্গল দ্বারা কর্ষণ ও মৃত্তিকা উত্তমরূপে চূর্ণ করিতে হইবে। বালুকা মিশ্রিত মৃত্তিকা সত্বর চূর্ণ হইয়া যায় এবং অপেক্ষাকৃত অধিক দিন ধুলিকণা পরস্পরে বিচ্ছিন্ন ভাবে রহিয়া যায়, এজন্য দোয়াঁস মৃত্তিকাই অধিক উপযোগী, আটালো মৃত্তিকা মূলজ লতাগুল্মের আদৌ উপযোগী নহে সুতরাং হরিদ্রা ক্ষেত্রেরও নহে।

হরিদ্রা বীজ রোপণের পরে আইল বাঁধা, ভূমি নিড়ান ও ক্ষেত্রের জল নিকাশ ব্যতীত মধ্যসময়ে আর কোন পাইট নাই বলিলেই হয়, এইরূপে বর্ষা ও শরৎ ঋতুর অবসানে শীত ঋতুর শেষ ভাগে অথবা বসন্তের প্রথমে যখন বুঝিবে যে; মূলের বর্দ্ধন শীলতা পরিসমাপ্তি হইয়া গিয়া দুই একটি পত্র শুষ্ক হইতে আরব্ধ ও অবশিষ্ট পত্র পুঞ্জ পীতবর্ণ ধারণ করিয়াছে, তখন ক্ষেত্রস্থ এক এক ঝাড় একত্র সমবেত করিয়া মোচড়াইয়া পত্রের নিম্নাংশ বা ডাঁটাগুলি পাকাইয়া পাকাইয়া দিয়া ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত ক্ষেত্রের মৃত্তিকা গর্ভেই রাখিয়া দিবে, পরে ফাল্গুনের শেষে যখন পাতা ও ডাঁটা সমস্ত বিশুষ্ক পরিলক্ষিত হইবে, তখন একটু সাবধানে কোদালি দ্বারা মূল সমূহ উত্তোলন এবং গাছ হইতে হরিদ্রা পৃথক করিয়া লইয়া, পুষ্করিণী বা নদীর জলে উত্তমরূপে প্রক্ষালনান্তে ময়লা মৃত্তিকা সমূহ উত্তমরূপে বিদূরীত ও গাত্রের জল রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া, পুনরায় গোময় মিশ্রিত জলে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির তাপে সিদ্ধ করিয়া, সচ্ছিদ্র বেত্র বা বংশ বিনির্ম্মিত

ঝুড়িতে ফেলিয়া জল সরাইয়া দিয়া, পাতির বা কাটির মাদুর, খেজুর পাতায় বয়ন করা বেদে চেটা অথবা ঐরূপ কোন আস্তরণ আস্তীর্ণ করিয়া, বা পরিষ্কার গোময় লিপ্ত উঠানে অথবা পাকা সানের মেঝেয় হরিদ্রা ছড়াইয়া দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে; এবং তিন চারি ঘণ্টা অন্তর ঐ রৌদ্রে দেওয়া হরিদ্রা একটা বস্তার মধ্যে পুরিয়া সজোরে দলন করিবে এবং পুনরায় রৌদ্রে দিবে, এইরূপ পুনঃপুনঃ বস্তা বা চটের মধ্যস্থ হরিদ্রাকে নিস্পিষ্ট ও ঘর্ষণ করিয়া রৌদ্রে দিতে থাকিলে, তিন চারি বা ততোধিক দিবসের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপে যেমন হরিদ্রা মধ্যস্থ জল সমূহ শুষ্ক হইয়া নিরস কঠিন কাষ্ঠের ন্যায় রস শূন্য ও কাঠিন্য প্রাপ্ত হইবে, তেমনই চট দ্বারা ঘর্ষণে নিস্পিষ্ট হইয়া বাহিরের আকৃতি সুগোল ও মধ্যের প্রয়োজনীয় অংশ দানা বাঁধিবে, অধিকন্তু উপরের খোসা শিকড় প্রভৃতি দূরীকৃত হইয়া হরিদ্রার গাত্র মসৃণ হইবে। এস্থলে বলা আবশ্যক যে দলন কম হইলে হরিদ্রা গোল না হইয়া চ্যাপ্টা হইয়া খারাপ হইয়া যাইবে। সিদ্ধ করার সময়েও জল অন্ততঃ দুই তিনবার উতলাইয়া উঠা আবশ্যক। হরিদ্রার চাষ একটি বিশেষ লাভজনক ব্যবসায়। বর্ত্তমানবর্ষেই কৃষকগণ সাড়ে ছয় টাকা, সাত টাকা হরিদ্রার মণ বিক্রয় করিয়া স্বীয় স্বীয় সংসার যাত্রার যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছে। ইহার আর একটা অতিরিক্ত লাভ এই যে একবার ক্ষেত্র হইতে কাঁচা মাল গৃহে আনিয়া পৌঁছাইয়া দিতে পারিলেই পুরুষগণ কার্য্য হইতে অবসর প্রাপ্ত হয়, সিদ্ধ শুকনা ও ডলাই মলাই এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কার্য্য কৃষক রমণীগণই সম্পন্ন করিয়া থাকেন, সুতরাং পল্লীবাসিনী ভদ্র মহিলাগণের ন্যায় তাঁহাদিগকে সন্তানপালন নভেল, নাটক পাঠ, গল্প গুজব ও মঙ্গল চণ্ডীর ব্রত লইয়া আলস্যে সময় অতিবাহিত করিতে হয় না। কৃষক সীমন্তিনীগণের সময় মাঘ, ফাল্গুনে যেমন ধান্যের তদ্বিরে অতিবাহিত হয় চৈত্র, বৈশাখের অসহ্য রৌদ্রে সেই রূপ হরিদ্রা সিদ্ধ শুষ্ক করিতেই দিন ফুরাইয়া যায়। অমনি সঙ্গে সঙ্গে বৈশাখ শেষ ও জ্যৈষ্ঠের দুর্ব্বিসহ তপন তাপে মধ্যাহ্ণ ও সায়াহ্ণে আমচুর ও আমসত্ব শুষ্ক করিতেই দেহ পাত করিতে হয়। আবার আষাঢ়, শ্রাবণেই কি তাঁহাদিগের আলস্য পরতন্ত্র হইয়া বসিয়া থাকিবার উপায় আছে, সে সময়েও তাঁহাদিগকে স্বামী, পুত্রের ধান্য চাষের সাহায্যে বীজ ধান্য ঝাড়াই বাছাই ও কলা (ধান্যের অঙ্কুর) ছাড়াইতেই সময় অতিবাহিত করিতে হয়। হায় দুর্ভাগ্যবতী কৃষক রমণি! তোমরাই বঙ্গের মা লক্ষ্মী। ভদ্র মহিলাগণ যদ্যপি তাঁহাদিগের অনুরূপ পরিশ্রমী হইতেন, তাহা হইলে সংসারের কত কল্যাণ হইত!

হরিদ্রা কৃষির কথা আমাদিগের বলা শেষ হইয়াছে এক্ষণে বীজ রক্ষাদি দুই একটি অবান্তর কথা বলিয়াই প্রবন্ধ শেষ করিব। যে সময়ে ক্ষেত্র হইতে কোদালি সাহায্যে মৃত্তিকা খনন করিয়া হরিদ্রা উত্তোলন করা হইবে, সেই সময়ে পালসি বা মুখিগুলি ভাঙ্গিয়া লইয়া মূল কাণ্ড

সংলগ্ন মূলগুলি বাছিয়া বীজের জন্য স্বতন্ত্র ভাবে অন্ধকার গৃহের কোণে গোলার নিম্নে বা অন্য কোন সুশীতল স্থানে এক মাস, দেড় মাস সযত্নে রক্ষা করিতে হইবে। পরে নব বর্ষের বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইলেই ঐ সকল বীজ বাহির করিয়া আলোক ও বাতাসে রাখিতে হইবে, এবং উপযুক্ত সময়ে পূর্ব্ব কথিত রূপে ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হইবে। মূলগুলি একত্র করিয়া যদি উহা প্রয়োজনাপেক্ষা স্বল্প বিবেচিত হয় তাহা হইলে সতেজ স্থূল মুখিও বীজের জন্য ব্যবহার হইতে পারে, তাহাতে দোষ এই ঘটে একে হরিদ্রা অংশ কম হইয়া যায়, দ্বিতীয়তঃ মুখির বীজে ঝাড় বড় না হওয়ায় উৎপন্ন হরিদ্রাংশ পর বৎসর কম পড়ে, এজন্য মুথা বা হরিদ্রার মূল ভাগই বীজের জন্য ব্যবহার করাই প্রকৃষ্ট পন্থা। এস্থলে বলা আবশ্যক যে প্রতি বিঘায় হরিদ্রা বিশ মণ উৎপন্ন হইতে পারে আর প্রতি মণ পাঁচ টাকা দরে বিক্রয় হইলেও প্রতি বিঘায় একশত মুদ্রা প্রাপ্তিপক্ষে কোন সন্দেহ নাই।

মৎস্য সংখ্যার বৃদ্ধির উপায়।

দিন দিন মৎস্যের অভাব নিবন্ধন এতদ্দেশে অনেক কাল হইতেই মৎস্যের পোনা (fry-fish) পুকুরে ছাড়িয়া বৃদ্ধি করিবার একটি উপায় চলিয়া আসিতেছে। মৎস্য ব্যবসায়ী জেলেগণ বর্ষাকালে দামোদর, গঙ্গা কিম্বা অন্যান্য বড় বড় নদী হইতে মৎস্যের পোনা ধরিয়া থাকে। এই উপায় অবলম্বন করিলে অল্প ব্যয়ে যে অনেক মৎস্য জন্মান যাইতে পারে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। যাহা হউক, মৎস্য সংখ্যার বৃদ্ধির বিষয় লিখিবার পূর্ব্বে, জেলেগণ নদীতে কোন্ সময়ে কি উপায়ে নানা জাতীয় মৎস্যের ডিম্বাদি সংগ্রহ করিয়া থাকে, এ বিষয় আমরা যতদূর অবগত হইয়াছি তাহাই প্রথমতঃ উল্লেখ করা গেল।

বঙ্গদেশের বড় বড় নদী, খাল, বিল ও পুকুরে মনুষ্যের খাদ্যোপযোগী যত জাতীয় মৎস্য দৃষ্ট হয়, তাহা সমস্তই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যে সকল মৎস্য সমুদ্র কিম্বা বড় বড় গভীর নদীতে বাস করে, কেবল বর্ষা ঋতুতে ডিম্ব প্রসব করিবার সময়ে অথবা আহারীয় দ্রব্যের জন্য সময়ে সময়ে অপ্রশস্ত নদী ও খালে যাতায়াত করে, ঐ সকল মৎস্যকে স্থানপরিবর্ত্তনশীল (Migratory) এবং যে সমুদয় মৎস্য নদী, খাল, বিল ও পুষ্করিণীতে সদা সর্ব্বদা বাস করে, ডিম্ব প্রসব বা আহার্য্য বস্তু সংগ্রহ করিবার জন্য কখন স্থানান্তরে যায় না, তাহাদিগকে স্থান অপরিবর্ত্তনশীল (Non-migratory) মৎস্য কহে। ইলিশ, ভোলা ও খরশুলা জাতীয় মৎস্য প্রথম শ্রেণী, এবং রোহিত, মিরগাল, কাত্‌লা, কৈ, মাগুর প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। রোহিত, মিরগাল, কাত্‌লা এই জাতীয় মৎস্য গুলিকে

আপাততঃ স্থানপরিবর্ত্তনশীল মৎস্য বলিয়া অনুমিত হইলেও ইহারা এই শ্রেণীর অন্তর্গত নহে। উপরি উক্ত মৎস্য সমূহের ডিম্বাণু কি পোনা সাধারণতঃ আমরা নদী, খাল ইত্যাদি স্রোত জল হইতে প্রাপ্ত হই, সুতরাং ঐ সকল মৎস্যকে স্থানপরিবর্ত্তনশীল বা সামুদ্রিক মৎস্য বলিয়া ভ্রম হইবার খুব সম্ভাবনা, বাস্তবিক ইহারা স্থানপরিবর্ত্তনশীল মৎস্য নহে।

অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন ইলিশ মৎস্য শীত ঋতুতে বড়ই দুষ্প্রাপ্য। মাঘ মাসের শেষে পাওয়া গেলেও ইহার আকার নিতান্ত ক্ষুদ্র। ইলিশ মৎস্য অপ্রশস্ত ও অগভীর নদীতে বাস করিতে পারে না, এই জন্য শীত ঋতুতে গঙ্গা, পদ্মা প্রভৃতি নদীর জল কমিয়া যায় বলিয়া এই সকল নদীতে বড় একটা বেশী দেখা যায় না। বর্ষা ঋতুতে পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথির সময়ে জলের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহারা সমুদ্র কিম্বা বড় বড় গভীর নদী হইতে দলে দলে পদ্মা, গঙ্গা ও অন্যান্য নদীতে আসিয়া থাকে, এই সময়ে মৎস্যব্যবসায়ী ধীবরগণ অল্প আয়াসেই এই সুস্বাদু মৎস্য ধরিতে সক্ষম হয়। বর্ষা ঋতুতে 'যে সকল ইলিশ' মৎস্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার অধিকাংশেই ডিম্ব থাকে সুতরাং উহারা যে স্ত্রী জাতীয়া তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই, ইহাতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ইলিশ মৎস্য সাধারণতঃ এই ঋতুতে জলের বৃদ্ধি প্রযুক্ত ডিম্ব প্রসব করিবার জন্য ছোট ছোট নদীতে আসিয়া থাকে। একটি প্রবাদ আছে যে, ইলিশ মৎস্য কখনই স্রোতের অনুকূলে যাতায়াত করে না, জোয়ারের সময়ে নদীর নিম্নদিকে এবং ভাটার সময়ে উপরের দিকে যাতায়াত করে। যে সকল নদীর স্রোত অত্যন্ত প্রবল, সেই সকল নদীর মৎস্য অধিক বৃদ্ধি হইয়া থাকে ও খাইতে সুস্বাদু হয়। শারীরিক অঙ্গ চালনাতে যে শরীরের বল ও আকার বৃদ্ধি হয় ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম।

পূর্ব্বোক্ত স্থানপরিবর্ত্তনশীল ও স্থানঅপরির্ত্তনশীল মৎস্যে ডিম্বাণুর সংখ্যার মধ্যেও অনেক প্রভেদ দেখা যায়। প্রথম শ্রেণীর মৎস্যের ডিম্বাণু শেষোক্ত শ্রেণীর মৎস্যের ডিম্বাণু হইতে সংখ্যায় অত্যন্ত অধিক। একটি ইলিশ জাতীয় মৎস্যের ডিম্বাণুর সংখ্যা গণনা করায়, ডিম্বাণু সকল সংখ্যায় ১০,২৩,৬৪৫ দশ লক্ষ তেইশ হাজার ছয় শত পঁয়তাল্লিশটি হইয়াছিল। এবং একটি স্থানঅপরিবর্ত্তনশীল শাল জাতীয় (গজাল) মৎস্যের ডিম্বাণু গণনা করায় ৪,৭০০ চারি হাজার সাত শতটির অধিক দৃষ্ট হয় নাই *। এত প্রভেদ হওয়ার কারণ কি তাহা কিছুই স্থির করিতে পারা যায় না, স্থান পরিবর্ত্তনশীল মৎস্যের ডিম্বাণু স্রোত জলে অধিক পরিমাণে ধ্বংশ হইবার সম্ভাবনা বলিয়া ইহাদিগের ডিম্বাণু সংখ্যায় এত বেশী হয়। স্থান অপরিবর্ত্তনশীল মৎস্যের মধ্যে আবার দুইটী দল দেখা যায় যথা,— এক পত্নীক (*Monogamous*) ও বহু পত্নীক (*Polygamous*) শোল, শাল, লেটা, চ্যাঙ্গ এই জাতীয় মৎস্যগুলি প্রথমে দলের, এবং রোহিত. মিরগাল, কাতলা, কৈ প্রভৃতি দ্বিতীয় দলের অন্তর্গত। পাঠকবর্গের মধ্যে হয়ত অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন,

* * * * * * "Apparently the migratory species produce the largest number of eggs probably as a compensation for the increased chances of their destruction. Thus, in a migratory herring the shad, *Clupea Palasa* (Ilsah) there were computed to be 10,23.645 eggs, * * * * *. Amongst the non-migratory species, we likewise observe a differnce : * * * *. Thsu a monogamous Ophiocephalas had only 4,700 eggs. * *"

Statistical Account of Bengal.
Vol. XX. Page, 12.
By W. W. Hunter.

শোল কি শাল মৎস্য প্রায় সর্ব্বদাই জোড় বান্ধিয়া চলে, ইহার একটি পুং জাতীয় ও অপরটি স্ত্রী জাতীয়া। ডিম্ব প্রসবের পর, কিম্বা ডিম্বাণু ফুটিলে মৎস্য দম্পতী উভয়েই স্বীয় সন্তানদিগকে অন্যান্য হিংস্র জাতীয় মৎস্যের গ্রাস এবং দৈবের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সদা সর্ব্বদাই ইহাদিগের সঙ্গে থাকে।

স্থান অপরিবর্ত্তনশীল মৎস্যের মধ্যে কৈ ও লেটা এই দুই জাতীয় মৎস্যের একটু বিশেষত্ব দেখা যায়। ইহারা জল ব্যতীত অনায়াসে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। এতদ্দেশে এমন অনেক পুকুর আছে, যাহাতে ফাল্গুন, চৈত্র মাসে একেবারেই জল থাকে না, এমন কি রৌদ্রের প্রখর তেজে পুকুরের তলা পর্য্যন্ত ফাটিয়া যায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহারা অনায়াসে ঐ ফাটলের মধ্যে থাকিয়া জীবন ধারণ করিতে সক্ষম হয়। শুধু যে ইহারা আপনাকে বাঁচাইয়া রাখে তাহা নহে, সময়ানুযায়ী ডিম্ব পর্য্যন্ত প্রসব করিয়া থাকে বৎসরের প্রথমে যখন বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হয়, সেই সময়ে দুই এক পস্‌লা বৃষ্টি হইলে, নূতন জল প্রাপ্ত হইয়া ইহারা পূর্ব্বোক্ত ফাটল হইতে উঠিতে আরম্ভ করে এবং ডিম্বাণু ফুটিতে থাকে *। পূর্ব্ববঙ্গে এই সকল মৎস্যকে উজান্‌সে বা উঠন্তি মৎস্য বলে। অনেকে বলিয়া থাকেন যে ইহারা মেঘের গর্জ্জন শুনিয়া পুকুর কি খাল, বিল হইতে জমিতে উঠিয়া থাকে। বাস্তবিক বর্ষা ঋতুতে অনেক সময়ে জল পরিপূর্ণ নালা বা পুকুর হইতে ঐ সকল মৎস্য উঠিতে দেখা গিয়াছে এবং অনেকে এই সময়ে প্রচুর পরিমাণে মৎস্য ধরিয়া থাকে। ইহার যে প্রকৃত কারণ কি আমরা এতাবৎ তাহা স্থির করিতে পারি নাই। বোধ হয় নূতন জল প্রচুর পরিমাণে পাইবার জন্য উঠিয়া থাকে। আমরা দুই একটী শুষ্ক পুকুর পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, সামান্য জল পাইলেই ইহারা ফাটল হইতে উঠিতে আরম্ভ করে। ব্রহ্মদেশের অনেক মৎস্যব্যবসায়ী শুষ্ক পুকুরে জল ঢালিয়া এই জাতীয় মৎস্য সময়ে সময়ে ধরিয়া থাকে। কৈ ও মাগুর মৎস্যের বড়ই কঠোর জীবন, ইহাদিগের শরীরের অর্দ্ধেক কর্ত্তন করিলেও অনেক ক্ষণ বাঁচিয়া থাকে।

সামন্ ও ট্রাউট্ জাতীয় মৎস্য গুলির ডিম্ব উৎপন্নের বিষয় শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। স্ত্রী জাতীয়া মৎস্য সমূহ পুং জাতীয় মৎস্যের সংসর্গ ব্যতীত অনায়াসে ডিম্ব উৎপন্ন করিয়া থাকে, ইহা যে কি রকমে সাধিত হয় তাহা একমাত্র ভগবানই জানেন। ডিম্বাণু সমষ্টি যখন পরিপক্কাবস্থায় পরিণত হয়, তখন ইহারা মৃত্তিকার মধ্যে এক রকম গর্ত্ত প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে ডিম্বাণু প্রসব করে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ইহাদিগের ডিম্বাণু সকল বহির্গত হইবার সময়ে পুংজাতীয় মৎস্যগুলি তথায় অপেক্ষা করিতে থাকে এবং প্রসব ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরেই ইহারা দুগ্ধের ন্যায় এক রকম রস পূর্ব্বোক্ত ডিম্বাণু সকলের উপর বমন করিয়া থাকে, এই অত্যাশ্চর্য্য ক্রিয়া দ্বারা ডিম্বাণু সকলের জীবনী শক্তির সঞ্চার হয়।

* "Long before the commencement of Pisciculture as a science, Aristotle, and subsequently Mr. Yarrel, Sir J. Emerson Tennet had observed that the impregnated ova of the fish of one rainy season are left unhatched in the mud through the dry season, and from their low state of organisation as ova, the vitality is preserved till the recurrence and contact of the rain and oxygen in the next wet season, when vivification takes place from their joint influence."

The Rod in India, page. 273.
by
H. S. Thomas. F. L. S., F. Z. S.

অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা শুক্রবীজ (*Spermatozoa*) অনায়াসে দর্শন করা যাইতে পারে। ডিম্বাণু সকল গর্ভে থাকার অবস্থায় কিম্বা প্রসবের কিছৎ পূর্ব্বে এক রকম রস দ্বারা একে অন্যের সহিত দৃঢ়রূপে সংযুক্ত থাকে, যদি কোন রকমে শিথিল হয়, তবে পুংজাতীয় মৎস্যের পরিত্যক্ত রস দ্বারা এতদূর দৃঢ়ীভূত হয় যে, মৃত্তিকা কিম্বা প্রস্তর হইতে স্রোতের প্রাবল্য প্রযুক্ত কি অন্য কোন কারণে ইহারা কখনই ভাসিয়া যাইতে পারে না। অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখা গিয়াছে, ডিম্বাণু সমষ্টি এমন সুকৌশলে সুন্দররূপে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া থাকে যে কোন প্রকারেই ইহারা স্থানান্তরিত হইতে পারে না। উল্লিখিত উপায়ে এই শ্রেণীস্থ পুং ও স্ত্রী জাতীয় মৎস্যগুলি ধরিয়া সম্ভবতঃ মৎস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। স্ত্রী জাতীয় মৎস্যগুলি যখন *পরিপক্কাবস্থায় পরিণত হয়, তখন একটি জলপাত্রে রাখিয়া উদরে সামান্য চাপ দিলেই ডিম্ব-রস বা ডিম্বাণু বহির্গত হয়, তৎপরে পুং জাতীয় মৎস্যের পূর্ব্বোক্ত দুগ্ধবৎ রস কোন কৌশলে বাহির করিয়া মিশ্রিত করিয়া ইহাদিগের সহিত তা দিলে প্রচুর পরিমাণে মৎস্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে ইহারা যখন মৎস্যের আকারে পরিণত হয়, গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে, এক একটীতে মনুষ্যের খাদ্যোপযোগী সহস্র সহস্র মৎস্য জন্মিয়া থাকে। এই সুকৌশলে অনায়াসে মৎস্য জন্মান যাইতে পারে। *

(ক্রমশঃ।)

---

* *Vide, The Rod in India, Chapter XXI, page, 269.*



পৌষ—১৩১৬।

লাহোরে শিল্প-সমিতি।

গত ১৫ই পৌষ বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্নে লাহোর ব্রাডলা হলে শিল্প সমিতির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। দ্বারবঙ্গের মহারাজ বাহাদুর এই সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাঞ্জাবের ছোট লাট সার লুই ডেন সমিতির কার্য্যাবলী দেখিবার জন্য সভাক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন লাহোর বিভাগের কমিসনার কর্ণেল পার্সন, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য, ভারত গভর্ণমেণ্টের বাণিজ্য বিভাগের ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত নিয়ল পেটন এবং সার শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই সমিতিতে যোগদান করিয়াছিলেন।

সভারম্ভে অভ্যর্থনা কমিটীর সভাপতি লালা শ্রীযুক্ত হরকিষণ লাল মহাশয় একটি সুন্দর হৃদয়-গ্রাহী বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, ভবিষ্যতে শিল্প-সমিতির সহিতই শিল্প-প্রদর্শনী খোলা হইবে, কংগ্রেসের সহিত উহার সম্বন্ধ রাখিবার প্রয়োজন নাই। বড় দিনের সময় শিল্প-সমিতির বৈঠক না বসাইয়া চৈত্রমাসে গুড্‌ফ্রাইডের ছুটীর সময় সমিতি বসাইলে ভাল হয়; তাহা হইলে শিল্পোন্নতি বিষয়ে সাধারণে অধিকতর মনোযোগী হইয়া

আলোচনার অবসর পাইবেন। রাজনীতি, শিল্প-কলা ও ধর্ম্মের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ইনি বলেন, রাজনৈতিক ব্যাপার ক্ষণস্থায়ী ও সময়োচিত মাত্র। একবার রাজনৈতিক অধিকার লাভ করিতে পারিলে রাজনীতি আর মনুষ্য জীবনের আদর্শ থাকিতে পারে না। ভারতবাসীর মনে বহুকাল ধরিয়া ধর্ম্মভাব প্রবল ছিল। কিন্তু এখন যুগ পরিবর্ত্তনে সে ভাবেরও কিছু পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। বাবরের সময় হইতে এই পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত, রামমোহন রায়ের অভ্যুদয়ে উহা একটু বিশেষরূপে প্রকট হইয়াছে। কিন্তু শিল্পকলা মানবের চিরন্তন চিন্তার বিষয়। জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ বলিয়া থাকেন যে ভারতের ক্রমশঃ আর্থিক অবস্থা অবনত হইতেছে। শাসকগণ বলিয়া থাকেন যে ভারতের আর্থিক অবস্থা ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে। তিনি বলেন পূর্ব্বকালে জমি, অর্থ এবং পরিশ্রমক্ষম লোক সংগ্রহ হইলেই অর্থাগমের উপায় হইত। এখন সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিদ্বন্দীতার দিনে, এই তিনটির সহিত নিপুণতা, বিজ্ঞানে অভিজ্ঞতা এবং বিষয় বিশেষে উপযুক্ত শিক্ষার সংযোগ আবশ্যক হইয়াছে। তথাপিও দেখা যায় যে চাষ কিম্বা ব্যবসায় আমরা যাহা কিছু করি না, তাহা সুসম্পন্ন করিতে গেলে সরকারি সাহায্যেরও আবশ্যক। কি পাশ্চাত্য, কি প্রতীচ্য যে দেশ কিছু না কিছু উন্নতি করিয়াছে, সেই সকল দেশের রাজ সরকারের অর্থ সামর্থ দেশের আর্থিক উন্নতিকল্পে ব্যয়িত হয়। ইহার পর বক্তা উভয় মতের সমালোচনা করিয়া বলেন যে, গভর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গীন শিল্পোন্নতি সম্ভবে না। অন্যান্য দেশ আর্থিক উন্নতি বিধানের জন্য বার আনা সময়, আর ধর্ম্ম ও রাজনীতিক ব্যাপারে সিকি সময় ব্যয়িত করেন। ভারতে গভর্ণমেণ্ট যদি প্রজার সহিত একযোগে শিল্পোন্নতি বিধানে যত্নশীল হন, তাহা হইলেই ভারতের দুঃখ ঘুচিতে পারে ও উন্নতির পথ পরিস্কৃত হয়।

ইহার পর দ্বারবঙ্গেশ্বর বাহাদুর সভাপতি পদে নির্ব্বাচিত হইলে তিনি একটি অনতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। মহারাজ বাহাদুর বলেন যে, কৃষিই আমাদের প্রধান শ্রমশিল্প। বৈজ্ঞানিক প্রথায় যাহাতে কৃষির উন্নতি হয়, তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। কৃষিবিষয়ে সুশিক্ষা দিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের বিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করা আবশ্যক। মৎস্যের বাণিজ্য সম্বন্ধে এতদিন সাধারণের কোন দৃষ্টি ছিল না। এই বাণিজ্যে অর্থাগম হওয়া নিতান্ত কাল্পনিক ব্যাপার নহে। মৎস্যের ব্যবসা অর্থে শুধু খাদ্যের জন্য মৎস্য সংগ্রহ বুঝা উচিত নহে। মৎস্যের তৈল ও মাছের ছাল ও হাড় হইতে নানা প্রকার দ্রব্যাধার এই ব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট। ভারতের মৎস্য ব্যবসায় এত দিন নদী, খাল, বিলে মৎস্য সংগ্রহে আবদ্ধ ছিল, কিন্তু এক্ষণে জালযুক্ত বাষ্পীয়-জাহাজ দ্বারা সমুদ্র উপকূলে সামুদ্রিক মৎস্য সংগ্রহের উপায় হইতে পারে।

ভারতে কয়লার ব্যবসায় সবেমাত্র আরম্ভ হইতেছে বলিলেই হয়। সমগ্র ভূগর্ভ হইতে যত কয়লা উত্থিত হয়, ভারতের উত্তোলিত কয়লার পরিমাণ তাহার শতাংশের একাংশমাত্র। কিন্তু ভারতে অফুরন্ত কয়লা সঞ্চিত আছে। কয়লার সঙ্গে সঙ্গে লৌহ, মাঙ্গানিজ, ধাতব তৈল প্রভৃতি প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। আমাদের দেশের যুবকগণ যদি খনিজ বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া ভারতের খনিজ সম্পত্তির উদ্ধার সাধনে যত্নবান হন, তাহা হইলে সকলদিকে মঙ্গল হয়।

কাপড়ের ব্যবসা সম্বন্ধে তিনি বলেন যে,

আমাদের দেশে ১৮৮০ সালে ৪৮০০টি মাত্র তাঁত ছিল। ১৮৯০ সালে তাঁতের সংখ্যা ৭৯৬৪ হয়, ১৯০১ সালে ২১৩১৮টি হয় এবং বর্ত্তমান সময়ে তাঁতের সংখ্যা ৩০৮২৪টির কম হইবে না। তাঁতের সংখ্যার আরও সমধিক বৃদ্ধি হওয়া আবশ্যক এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনাও যথেষ্ট। এখনও ভারত হইতে প্রতি বৎসর প্রায় ভারতে উৎপন্ন অর্দ্ধেক পাট বিদেশে রপ্তানি হয়। গঙ্গার ধারে প্রায় ৪০টি পাটের কল আছে, প্রায় সকলগুলিই ইউরোপীয় মহাজনদিগের টাকায় এবং ইউরোপীয় কর্ম্মচারীগণের দ্বারা পরিচালিত। এদেশের টাকায়, এদেশের লোকের দ্বারা এইরূপ কল কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইলেই ভাল হয়। লতাগুল্মাদির ত্বক বা আঁসজাত তন্তু বাঙ্গালার অনেকটা নিজ সম্পত্তি সুতরাং তন্তু-শিল্পে বাঙ্গালার প্রাধান্য স্থাপিত হওয়া বিচিত্র নহে।

ইহা ভিন্ন তসর, গরদের ব্যবসা, রসায়ন শিক্ষা, তড়িদ্বিজ্ঞান, শর্করার ব্যবসায়, সমবেত সাহায্য-মণ্ডলী প্রভৃতি স্বদেশী শিল্প ব্যবসায়ের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়া বলেন যে, জাতীয় উন্নতি বিধান করিতে হইলে শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি সাধন একান্ত আবশ্যক।

দ্বারবঙ্গের মহারাজের বক্তৃতা শেষ হইলে পাঞ্জাবের ছোটলাট বাহাদুর একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন,—পাঞ্জাবে সেচের খাল বৃদ্ধি হওয়াতে, অনেক জমিতে চাষ হইয়াছে,—কৃষিজাত শস্যাদিও যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অধিকাংশ কাঁচামালই বিদেশে রপ্তানি হইতেছে। দেশে ঐ সকল কাঁচামাল হইতে যাহাতে শিল্পজপণ্য প্রস্তুত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। ইহার পর পাঞ্জাব পল্লী-সমাজের কথার আলোচনা করিয়া ছোটলাট বাহাদুর তাঁহার বক্তৃতার উপসংহার করেন।

এই শিল্প-সমিতিতে সর্ব্বসমেত ৭টী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল।

(১) প্রথম অধিবেশনের সভাপতি ৺ রমেশ-চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ।

(২) গভর্ণমেণ্টের সকল বিভাগেই ভারতজাত দ্রব্য ব্যবহার করিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন বলিয়া ভারত সচিবকে ধন্যবাদ প্রদান।

(৩) ভারতের বিভিন্ন স্থানে নানাবিধ শিল্প-বিদ্যালয়ের স্থাপন ও পুরাতন শিল্প-বিদ্যালয়ের উন্নতিসাধন-কল্পে গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ।

(৪) ব্যবহারিক শিল্প সম্বন্ধে উচ্চ শিক্ষা প্রদান করিবার ব্যবস্থাকল্পে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ।

(৫) কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ।

(৬) কলজাত কাপড়ের উপর নির্দ্ধারিত শুল্ক অন্যায়মূলক সুতরাং উহা রহিত করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ।

(৭) ভারতের সর্ব্বত্র একপ্রকার ওজন প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ।

এই সভায় ৩৩টি সন্দর্ভ পঠিত হয়। সভাতে স্থির হয় যে সমিতির বার্ষিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থ দুই হাজার টাকার প্রয়োজন। চাঁদা তুলিয়া ঐ টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে। এই জন্য দ্বারবঙ্গেশ্বর ৫ শত, দেওয়ান অমরনাথ ১০০, ও লালা হরকিষণ ১৫০৲ টাকা দিয়াছেন। সভাস্থলেই প্রায় ২ হাজার টাকা উঠিয়াছে।

ভারতের চাষ আবাদ।

ভারতবর্ষের চাষ-আবাদ সম্বন্ধে বৎসর বৎসর গভর্ণমেণ্ট এক একটা হিসাব-নিকাশ প্রকাশ করেন। তাহাতে কোন বৎসর কত জমি আবাদ হয়, কোন বৎসর কোন শস্য কিরূপ পরিমাণে উৎপন্ন হয়, স্থূলভাবে তাহার একটা পরিচয় পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষের পরিমাণ-ফল ১৭ লক্ষ ৭৫ হাজার ৭০২ বর্গ মাইল। বলা বাহুল্য, দেশীয় নৃপতিগণের শাসনাধীন স্বাধীন রাজ্যসমূহও এই হিসাবের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু চাষ-আবাদ সংক্রান্ত গভর্ণমেণ্টের যে হিসাব-নিকাশ প্রকাশ হয়, তাহাতে দেশীয় রাজ্যসমূহের এবং বেলুচিস্থান প্রভৃতি কয়েকটী প্রদেশের হিসাব ধরা হয় না। সে সকল বাদ দিয়া, মোটের উপর ৯ লক্ষ ৬১ হাজার ৪৫৭ বর্গ মাইল জমি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের কৃষি-বিবরণীর হিসাবের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণনা করা হয়। ঐ পরিমাণ জমিতে ৬১ কোটী ৫৩ লক্ষ ৩২ হাজার ৭৫৫ একর অর্থাৎ প্রায় ১৮২ কোটী বিঘা। উহার মধ্যে আবার ৮ কোটী ২২ লক্ষ ৮২ হাজার ৫৭৯ একর অর্থাৎ প্রায় ২৫ কোটী বিঘা জমি বনজঙ্গল-পূর্ণ, সুতরাং চাষ-আবাদের অনুপযুক্ত। তারপর আরও ১৫ কোটী ৩৫ লক্ষ ২৬ হাজার ৬২৫ একর অর্থাৎ ৪৬ কোটী বিঘা জমি নগর-গ্রাম, বাড়ী-ঘর, পথ ঘাট প্রভৃতিতে আবদ্ধ। এখন বাকী প্রায় ৩৭ কোটী ৯৫ লক্ষ ২৩ হাজার ৫৫১ একর অর্থাৎ প্রায় ১১৩ কোটী বিঘা জমিই চাষ-আবাদের উপযোগী। কিন্তু ঐ পরিমাণ জমিতেও সর্ব্বদা চাষ-আবাদ হয় না। উহার মধ্যে অনেক জমি সময় সময় পতিত রহিয়া যায়। এই হিসাবে গত বৎসর (১৯০৮-০৯ খৃষ্টাব্দে) ২১ কোটী ৮ লক্ষ ৮৩ হাজার ৫১১ একর অর্থাৎ প্রায় ৬৫ কোটী বিঘা জমিতে চাষ-আবাদ হইয়াছিল। অবশিষ্ট জমির মধ্যে ৫ কোটী ৫৩ লক্ষ ৫১ হাজার ৭২৬ একর অর্থাৎ প্রায় ১৬ কোটী বিঘা জমি জলা বলিয়া পরিত্যক্ত হয় এবং ১১ কোটী ৩২ লক্ষ ৮৮ হাজার ৩৪৪ একর অর্থাৎ প্রায় ৩৪ কোটী বিঘা জমি বিবিধ কারণে চাষের অনুপযুক্ত বলিয়া পতিত ছিল।

পৃথিবীর যে কোনও দেশের সহিত তুলনা করা যাউক না কেন, পতিত জমিসমূহ বাদ দিয়াও ভারতে চাষের উপযোগী যে জমি পাওয়া যায়, ভারতের লোক-সংখ্যার অনুপাতে তাহা যথেষ্ট। ব্রিটিশ ভারতের লোক-সংখ্যা মোটামুটি ২৯ কোটি ৪০ লক্ষ। সেই পরিমাণ লোকের অন্নসংস্থানের পক্ষে উহার অধিক জমির কখনই আবশ্যকতা নাই। সম্প্রতি আমেরিকার যে সকল পর্য্যটক পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া ভারতে আসিয়া উপনীত হন, এ কথা তাঁহারা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের কথায় প্রকাশ,—পৃথিবীর মধ্যে কৃষি-উপযোগী কোনও দেশে এক বর্গ মাইল জমিতে যত লোক বাস করে, ভারতে সেই অনুপাতে অনেক অল্প-সংখ্যক লোকের বসতি। সর্ব্বত্রই সামান্য একটু আবাদী জমি লইয়া অধিক সংখ্যক লোক জীবন-সংগ্রামে বিব্রত রহিয়াছে, কিন্তু ভারতে ভারতবাসীর অন্ন সঙ্কুলানের জন্য প্রচুর জমি পড়িয়া আছে। ফলতঃ আবাদী জমির পরিমাণ-সম্বন্ধে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত। তৎসম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এদিকে আবার ভারতে উৎপন্ন দ্রব্যেরও পরিমাণ অল্প নহে। এক বৎসরেরই একটা হিসাব

দেখিলে বুঝা যায় এক বৎসরে ভারতে কোন দ্রব্য কি পরিমাণ উৎপন্ন হয়।

চাউল—৫৯ ক্রোটী ৯০ লক্ষ 'হন্দর'। ৫৬ সেরে হন্দর ধরিলে হিসাব দাঁড়ায় প্রায় ৮৩ কোটী ৮৬ লক্ষ মণ।

গম—৭৫ লক্ষ টন। ২৭।০ মণে টন ধরিলে দাঁড়ায় ২০ কোটী ৪৩ লক্ষ ৭৫ হাজার মণ।

তারপর, মসিনা ৩ লক্ষ ৮৯ হাজার টন; রাই-সরিষা ৯ লক্ষ ৮৮ হাজার টন; তিল ৭ লক্ষ ৭৪ হাজার টন; নীল ৩৭ হাজার হন্দর; চিনি ১৮ লক্ষ ৪১ হাজার টন; বাদাম ৪ লক্ষ ৪২ হাজার টন; তুলা ৪২ লক্ষ ৫০ হাজার গাঁট; পাট ৬৩ লক্ষ ১০ হাজার গাঁট ইত্যাদি।

যে দেশে এত প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়, সে দেশেও দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই আছে। ভারতে কৃষি-বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে; দিন দিনই কৃষির পরিমাণ বৃদ্ধিও পাইতেছে। অথচ অন্নকষ্টেরও বৃদ্ধি বৈ কমি নাই! গভর্ণমেণ্ট শীঘ্রই ইহার কারণ অনুসন্ধানে ব্রতী হইবেন ইহাই আমাদের একমাত্র আশা। সে অনুসন্ধান ফলে আসল কারণ প্রকাশ হয়, ইহাই তো আকাঙ্ক্ষা। কারণ যে দেশে জমিদার ও প্রজা উভয়েই আত্মোন্নতি কল্পে উদাসীন সে দেশে উপায়ান্তর কি আছে!

পত্রাদি।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়, চন্দনপুর।

খাঁটি সরিষার তৈল।

সরিষার তৈল বাঙ্গালীর যেরূপ প্রিয় সেরূপ আর কোন জাতির নহে। মান্দ্রাজীগণ আমাদের সরিষার তৈলের ন্যায় নারিকেল ও তিল তৈল রন্ধনে ও গার্হস্থ্য কার্য্যে আদর করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন। সরিষা দুই প্রকার ছোট ও বড়। বড় গুলিকে সচরাচর রাই কহিয়া থাকে, আর ছোট গুলিকে দেশী সরিষা বলে। খুলনা, যশোহর, নদীয়া, চব্বিশ পরগণা প্রভৃতি অঞ্চলে রাইয়ের চলন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ দেশে দেশী সরিষা বাটার সুক্ত ও আলু বেগুনের ঝোল অতি উপাদেয় হয়। বিদেশী যিনি একবার এই সুমিষ্ট ব্যঞ্জনের স্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন তিনি জীবনে ইহা ভুলিতে পারিবেন না, মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে রাইয়ের চলনটা বেশী কিন্তু তরকারীতে সরিষা বাটা প্রায় ব্যবহার হয় না। কেহ কেহ রাই বাটা দিয়া ব্যঞ্জন প্রস্তুত করেন বলিয়া তাহার আস্বাদ, বিস্বাদ ও তিক্ত হয়। সরিষা বাটার তরকারী রাঁধিতে হইলে সরু বা দেশী সরিষা বাটা দিয়া রন্ধন করিতে হয় তাহা হইলে ব্যঞ্জনের স্বাদ অতি চমৎকার হইয়া থাকে। সরু সরিষার খাঁটি তৈল যেমন সুমিষ্ট, সুগন্ধী, আবার তেমনি মুখপ্রিয়। এই তৈল ব্যঞ্জনে বা ভাতে পোড়ায় পড়িলে তাহার আস্বাদন অতীব মধুর হয় এমন কি চির-অরুচিরও রুচি আসে। কিন্তু দুঃখের বিষয় খাঁটি সরিষার তৈল বাজারে আর মিলে না, মিলিলেও ক্রেতা তাহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে না পারায় খরিদ করিতে পারে না। সেবার আমার এক কলিকাতার বন্ধু ঔষধে ব্যবহার করিবার জন্য আমার নিকট খাঁটি সরিষার তৈল চাহিয়া পাঠান। খাঁটি সরিষার তৈল বলিলে রাইয়ের তৈল বুঝায় না, দেশী সরিষার তৈলকেই খাঁটি সরিষার তৈল সাধারণতঃ কহিয়া থাকে এবং এই তৈলই অনেক ঔষধ পত্রে ব্যবহৃত হয়।

আমার নিজ আবাদের সরিষা ঝাড়াইয়া পুনরায় তাহা কুলার দ্বারা পরিষ্কার করিয়া কাঁচি বার তের

সের সরিষা নিজের লোক দ্বারা কলু বাড়ি হইতে পিষিয়া আনিলাম, প্রায় পাকি তিন সের আন্দাজ তৈল হইল। আমি সেই তৈল বন্ধুর ঔষধের জন্য কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলাম কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার কবিরাজ মহাশয় পরীক্ষা করিয়া সেই তৈল নাকচ করিয়া দিলেন, কারণ তৈলে ঝাঁঝ নাই, নাকের কাছে লইয়া গেলে নাক জ্বালা করে না, চক্ষে জল আসে না। রঙও নাকি পরিষ্কার হয় নাই।

এবারও অনেক দিন রাঁচিতে ছিলাম সেখানেও দেখিলাম রাঁচি প্রবাসী বাঙ্গালী বাবুদিগের এইরূপ ধারণা। অনেকে জেলের খাঁটি সরিষার তৈল পরিত্যাগ করিয়া অধিক হলুদ রঙের ঝাঁঝওয়ালা ভেজাল তৈল খাঁটি বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন। নিজেদের লোক দিয়া নিজে ভাল সরিষা খরিদ করিয়া কলুদিগের সহিত পৃথক বন্দোবস্ত না করিলে কখনও খাঁটি তৈল পাওয়া যায় না, কলুগণ তৈল অধিক ও ঝাঁঝাল করিবার জন্য প্রায়ই ঘানিতে নানা জিনিষ ভেজাল দিয়া থাকে।

সকলের জানা উচিত যে সরিষার সহিত সুয়ার গুঁজা মিশাল থাকিলে তৈলের রঙ বেশী হলুদে হয় এবং তৈলও বেশ ঝাঁঝাল হয়, আবার সরিষার হিসাব অনুসারে তৈলও অনেক পরিমাণে বাড়িয়া যায়। পশ্চিম দেশেই সুয়ারগুঁজার আবাদ বেশী, কঙ্করাবৃত কঠিন মৃত্তিকায় সামান্য চাষে অপর্য্যাপ্ত ফসল উৎপন্ন হয়। সরিষার সঙ্গেই সুয়ার গুঁজা বপন করিয়া থাকে। গাছগুলি দেখিতে অবিকল মসিনা গাছের ন্যায়, আপাং, বা চিড়চিড়ার ফুলের মতন ছোট ছোট ফুল হয়, গাঁদা ফুলের গোড়ায় যেমন কাল কাল লম্বা বীজ থাকে সুয়ার গুঁজারও ফুলের গোড়ায় ঠিক সেই রূপ বীজ হয়। ফুল শুষ্ক হইলে তাহাতে বাড়ি দিলেই গাঁদার বীজের ন্যায় বীজ বাহির হইয়া পড়ে তাহাই সুয়ার গুঁজা। সাঁওতাল পরগণা ও ছোট নাগপুর অঞ্চলে সাঁওতাল ও পাহাড়ীগণই বেশীর ভাগে সুয়ার গুঁজার আবাদ করিয়া থাকে।

সুয়ার গুঁজা বাদে, লঙ্কা ঝাল, মূলার বীজ ও সজিনার ছাল মিশাইলে তৈলের খুব ঝাঁঝ হয় এবং রঙও দেখিতে ভাল লাগে। এই সমস্ত ভেজাল তৈল যেমন মনুষ্যের পক্ষে অপকারি, ইহার খৈলও গরুর পক্ষে তেমনি অপকারি। বেশী দিন লঙ্কা ও সজিনার ছালযুক্ত ভেজাল খৈল বলদকে খাইতে দিলে রক্ত ভেদ হইয়া বলদ মারা পড়ে, আজকাল অনেক স্থানে বলদের এইরূপ ব্যায়রাম হইতে দেখা যায়। গৃহস্থের ঘরে উৎপন্ন কড়া পাকের গাওয়া ঘিয়ের রঙ যেরূপ, দেশী সরিষার খাঁটি তৈলের বর্ণও অবিকল সেই রূপ।

খাঁটি সরিষার তৈলে অধিক ঝাঁঝ থাকে না, দেখিতে ঢলঢলে পাতলা এবং ঘ্রাণে কেমন এক প্রকার মিষ্ট গন্ধ পাওয়া যায়। খাঁটি সরিষার তৈল সাদা বোতলে ভরিয়া রাখিলে অনেক সময়ে গলা গাওয়া ঘি বলিয়া ভ্রম হয়। যদি খাঁটি তৈল খরিদ করিতে চাও ত এইরূপ তৈল খরিদ করিও। অতিরিক্ত পয়সা দিয়া দোকানদারের প্রলোভনে ভুলিয়া তীব্র ঝাঁঝওয়ালা রঙদার ভেজাল তৈল কিনিয়া অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান সন্ততিগণকে জনমের মতন ব্যাধিগ্রস্থ করিয়া তুলিও না।

যদি অজীর্ণ মুক্ত হইতে চাও তবে বাজারের ভাল দোকানে গিয়া এই ভাবে পরীক্ষা করিয়া খাঁটি সরিষার তৈল কিনিও, চাকর বাকরের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিও না। যে ব্যায়রামের ঔষধ হোমিওপ্যাথিতে নাই, হাইড্রোপ্যাথিতে নাই, এলাপ্যাথিতে নাই, কবিরাজিতে নাই অথচ তাহা তোমারই নিকটে আছে!! তবে তাহা কার্য্যে

পরিণত করিতে এত পরাঙ্মুখ কেন? এত লজ্জাই বা কেন? খাঁটি ঘৃত অনেক দূর হইতে ভেজাল হইয়া আসিতেছে তাহা সামান্য চেষ্টায় নিবারণ হয় না, কিন্তু একটু সামান্য চেষ্টা করিলে ত খাঁটি সরিষার তৈল যখন তখন সংগ্রহ করা যাইতে পারে। তবে তাহতেও এত উদাসীন কেন?

গোলাপ গাছ ছাঁটা।

গোলাপ গাছ ছাঁটিবার এ সময় নহে। "কৃষকে" মাসিক কার্য্য বিবরণীতে গোলাপ গাছ ছাঁটার সময় নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তথাপি অনেক গ্রাহক এই গোলাপ গাছ বসাইবার ঐ তত্ত্ব লইতেছেন। গোলাপ গাছ ছাঁটিবার সময় বর্ষার শেষে, শিশির পড়িতে আরম্ভ হইলে। কারণ গোলাপ গাছ ছাঁটিয়া গোড়া খুঁড়িয়া তাহার শিকড় গুলিতে রৌদ্র ও হাওয়া লাগাইতে হয়। ১০ হইতে ১৫ দিন পর্য্যন্ত গোড়া খোলা থাকে, এই সময় বৃষ্টি হইলে পাতা বাহির হইয়া পড়ে ও ফুল ফুটিবার ব্যাঘাত ঘটে। সুতরাং এই কার্য্য কার্ত্তিকের শেষে অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে হওয়া উচিত। অনেক সুচতুর মালী যে সময় ফুল অবশ্যক তাহা বুঝিয়া কিছু অগ্র পশ্চাত করিয়া গাছ ছাঁটে। সুবিধামত সময় বুঝিয়া গাছ ছাঁটিলেই আবশ্যক অনুযায়ী ফুল পাওয়া যাইবে। তাহারা চলিত কথায় বলে যে "কাঁচির ফুল"। তাহারা জানে যে কোন বিঘ্ন না ঘটিলে গাছ ছাঁটার ৬সপ্তাহের পরই গাছে ফুল ধরিবে। গাছ ছাঁটারও তারতম্য আছে। টী কিম্বা হাইব্রিড টী অধিক ছাঁটিতে হয় না। তাহাদের কিছু কিছু পুরাতন ডাল ও শুষ্ক শাখা প্রশাখা বাদ দিলেই চলে। হাইব্রিড, পার্পেচুয়াল ও বুরবন জাতীয় গোলাপ গুলি খুব বড় ও তেজাল হয়, এই গুলির জমি হইতে গাছের অবস্থা বুঝিয়া ১ হইতে ২ ফুট রাখিয়া ছাঁটিয়া দিতে হয়। আবার লতানিয়া গোলাপ গুলি অধিক ছাঁটিবার আবশ্যক হয়। তাহাদের শুষ্ক প্রায় ডাল পালাগুলি বাদ দিলেই চলে। ছাঁটিবার সময় ভাল কাঁচি ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ডাল চিরিয়া বা থেঁতো হইয়া গেলে গাছ মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

কেরোলিনা ধান্য।

ইহা প্রায় সাদা পাটনাই ধান্যের মত। এই সম্বন্ধে "কৃষকে" আলোচনা হইয়াছে। অনেকের বিশ্বাস যে পাটনাই ধান্যই সেই আমেরিকার আমদানী কেরোলিনা ধান্য। যাহা হউক নূতন আমদানী কেরোলিনা ধান্যের সহিত আমাদের দেশী পাটনাই ধান্যের কিঞ্চিৎ পার্থক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ফল সংরক্ষণ।

এতদঞ্চলে আম, পিয়ারা, কুল, লেবু, টেঁপারি প্রভৃতি বিবিধ জাতীর ফল প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। সুবিধামত ফল সংরক্ষণ করিতে পারিলে সুধু এদেশে সমস্ত বৎসর ব্যবহার কেন সংরক্ষিত ফল বিদেশে রপ্তানি হইয়া একটা ভালরূপ ব্যবসা চলিতে পারে। আপনার ন্যায় অনেকে ফল সংরক্ষণ বিদ্যা শিখিতে চান, ঐ সম্বন্ধে পুস্তকাদি এদেশে বড় পাওয়া যায় না। আমরা ফল সংরক্ষণ সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি আনাইবার চেষ্টা করিতেছি। অনেকে যন্ত্রাদিও খুঁজিতেছেন। কিন্তু পৃথক পৃথক এরূপ ছোট ছোট কারবার না খুলিয়া সমবেত চেষ্টাতে, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর একটি কারখানা খুলিলে বোধ করি সকল দিকে ভাল হয়।

প্রাদেশিক কৃষি সংবাদ।

বঙ্গে তুলা চাষের অবস্থা।—ডিসেম্বর ১৯০৯ পর্য্যন্ত।--জলদী জাতীয় তুলার পক্ষে আবহাওয়া সর্ব্বত্র অনুকূল দেখা যাইতেছে; বিশেষ সাঁওতাল পরগণায় জলদী তুলার অবস্থা খুব ভাল। কিন্তু নাবী তুলার তাদৃশ সুবিধা হয় নাই। নাবী তুলা চাষের সারণ একটি প্রধান কেন্দ্র। সেখানেও মজঃফরপুরে অতিবৃষ্টিতে নাবী তুলার ক্ষতি হইয়াছে। দারবঙ্গ ও সিংভূমেও সমধিক পরিমাণে নাবী তুলার আবাদ হয়। এই দুইটী জেলায় তুলার অবস্থা ভালই বলিতে হইবে।

বর্ত্তমান বর্ষে জলদী তুলার জমির পরিমাণ অনুমান ৩৩,১১০ একর। বিগত বর্ষে উক্ত তুলার আবাদী জমির পরিমাণ ৩১,২৩০ একর ছিল। যেরূপ অনুমান করা যায় তাহাতে বোধ হয় নাবী তুলার চাষ বিগত বর্ষ অপেক্ষা অনেক কম হইবে। বিগত বর্ষের নাবী তুলার আবাদের পরিমাণ ৩২,৮৬৯ একর। এবৎসর এখনও পর্য্যন্ত নাবী তুলার পরিমাণ ২৮,৩৭৭ একর। এখনও কিন্তু নাবী তুলার বুনানী চলিতেছে, এমন কি কটকে এখন নাবী তুলার চাষ আরম্ভই হয় নাই।

বর্ত্তমান বর্ষে বিগত বর্ষ অপেক্ষা জলদী তুলা পরিমাণে অধিক জন্মিয়াছে। এবৎসরের উৎপন্ন তুলার পরিমাণ ৭,১৪৫ বেল। বিগত বর্ষের পরিমাণ ৪,৬৫৮ বেল মাত্র। সুবৃষ্টির জন্যই পরিমাণ এত বাড়িয়াছে। এবৎসর নাবী তুলা ৭,৪৭০ বেল জন্মাইবে বলিয়া অনুমান করা যায়। ইহা ব্যতীত দেশীয় রাজ্যের তুলা আছে। তাহাতেও উৎপন্ন তুলার পরিমাণ শতকরা ৫ ভাগ বাড়িয়া যাইবে এবং অনুমান হয় যে জলদী তুলা ৭,৫০২ বেল এবং নাবী তুলা ৭,৮৪৪ বেল দাঁড়াইবে।

বঙ্গে হৈমন্তিক ধান্য।—১৯০৯।—বিগত বর্ষ অপেক্ষা এ বৎসর হৈমন্তিক ধান্যের আবাদী জমির পরিমাণ অধিক। ১৯০৮ সালে হৈমন্তিক ধান্যের আবাদী জমির পরিমাণ ১৭,৯০৯,৫০০ একর; ১৯০৯ সালে ২১,২৩৫,১০০ একর। সুবর্ষণই এইরূপ আবাদী জমি বৃদ্ধির কারণ। ফসল সর্ব্বত্রই ভালরূপ জন্মিয়াছে। কোন কোন জেলায় ষোল আনার উপর ফসল জন্মিয়াছে;

মজঃফরপুর	...	শতকরা	১১৪ ভাগ
পাটনা, মানভূম	...	,,	১১০ ,,
মুঙ্গের	...	,,	১০৮ ,,
সাঁওতাল পরগণা		,,	১০৬ ,,
ভাগলপুর, সম্বলপুর, রাঁচি		,,	১০৫ ,,

২৪ পরগণায় ষোল আনার কম হইবে না। অপর আটটি জেলায় পনর আনা, এবং অন্য আর আটটিতে চৌদ্দ আনা, বাকী ৫টি জেলাতে বার আনা ফসল জন্মিয়াছে বলিয়া অনুমান করা যায়। কেবলমাত্র যশোহরে তাদৃশ ভাল ফসল হয় নাই তথাপিও দশ আনা রকম ফসল জন্মিয়াছে।

বঙ্গে নীলের আবাদ।—১৯০৯।—নদীয়া ও যশোহরে নীলের আবাদ আছে, কিন্তু নীল চাষের প্রধান কেন্দ্র বিহারে। বিহারের চম্পারণ, মজঃফরপুর এবং দারবঙ্গেই অধিক মাত্রায় নীলের আবাদ।

কিন্তু নীলের আবাদ ক্রমশই কমিতেছে।

১৯০৯	১০৭,৪০০ একর।
১৯০৮	১৩৫,৩০০ ,,
১৯০৭	১৪৬,৮০০ ,,

বিগত বর্ষে নীলের ফসলও তাদৃশ ভাল হয় নাই। চম্পারণে এগার আনা, মজঃফরপুরে বার আনা এবং

দারবঙ্গে দশ আনা মাত্র ফসল জন্মিয়াছে। অন্যান্য স্থানে আরও কম। উৎপন্ন নীলের পরিমাণ ১৭,০০৭ ফ্যাক্টরি মণ। তৎপূর্ব্ব বর্ষে ২৬,৩৩১ ফ্যাক্টরি মণ নীল উৎপন্ন হইয়াছিল। মেঃ মোরাণ কোম্পানির অনুমান ১৯০৯ সালে ১৬০০ বাজার মণ এবং ১৯০৮ সালে ২৫০০০ বাজার মণ নীল উৎপন্ন হইয়াছে।

বঙ্গে ভাদুই শস্য ১৯০৯।—জুন মাসে বৃষ্টির অভাবে, তার উপর ভাদ্র মাসে জলপ্লাবনে, মেদিনীপুর, হুগলী, হাওড়া, সাহাবাদ, সারণ, চম্পারণ, মুঙ্গের, ভাগলপুর, দারজিলিং এবং কটকে ভাদুই শস্যের বিশেষ হানি হইয়াছে। উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরে ভাল ফসলই পাওয়া গিয়াছে। অন্যান্য জেলার ফসল মোটের উপর মন্দ জন্মায় নাই। গত পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ভাদুই ফসলের জমির পরিমাণ কিঞ্চিৎ অধিক ৯,৫৯৬,০০০ একর মাত্র।

হিসাব নিকাশ করিয়া যতদূর বুঝা যায় তাহাতে ৩৪,৭৯৫,১০০ হন্দর আশু ধান্যের চাউল পাওয়া যাইবে। বিগত বর্ষে ২১,৯২৩,১০০ হন্দর মাত্র চাউল পাওয়া গিয়াছিল।

আসামে তুলার কাপড়।—যে স্থানটিকে কেবল আসাম বলিয়া কথিত হয়, তথাকার অধিবাসীরা বস্ত্রবয়ন কার্য্যে এখনও ব্যাপৃত আছে। কেবল মহিলা দ্বারা এই কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে, এবং প্রত্যেক গৃহস্থের আবশ্যকীয় বস্ত্রাদি সেই বাটীর মহিলাগণ কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়া থাকে। তবে অনেক স্থলে নিজেদের প্রয়োজন ব্যতিরেকে উদ্বৃত্ত বস্ত্রনিচয় বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। আসামী বালিকারা বয়ন কার্য্য ব্যতীত শিক্ষার মধ্যে অধুনা প্রধান স্থান অধিকার করিতে পারে এমন, কিছুই নাই। বিবাহের সময়ে যে বালিকা এই বিদ্যায় যত অগ্রগামিনী তাহার আদর তত অধিক। ভদ্রঘরে এবং বড়মানুষদিগের ভিতরে গৃহজাত বস্ত্রের অপেক্ষা যদিও বিদেশী বস্ত্রের ব্যবহার অধিক মাত্রায় চলিয়া থাকে, তথাপি ইঁহাদের মহিলারা সূক্ষ্ম বস্ত্র বয়ন এবং সূচিদ্বারা সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে, রেশমী ও সল্‌মার কার্য্যে বিলক্ষণ পটুতা লাভ করিয়া থাকেন। সুর্ম্মা উপত্যকা প্রদেশে বয়ন কার্য্য কখনও সকল গৃহস্থেরা করিত না। সেখানে বয়ন ব্যবসায়ী তন্তুবায় সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল, তাহারাই সকলের বস্ত্র যোগাইত। কিন্তু পরে তাহারা ক্রমশঃ জাতিব্যবসা পরিহার পূর্ব্বক চাষবাসে মনঃসংযোগ করায় এখন সেখানে বিদেশ হইতে আনীত বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করিতে হয়। কিন্তু সাধারণতঃ পার্ব্বত্য প্রদেশের লোকেরা এখনও স্ব স্ব গৃহজাত বস্ত্রে অঙ্গ আবরণ করিয়া থাকে। যদিও বস্ত্রগুলি মোটা ও খাটো, তথাপি তাহারা জঙ্গলের কোন প্রকার গাছ গাছড়া হইতে সেইগুলিকে লাল কিংবা নীল ও অন্য কোন প্রকার রং করিয়া পরিধান করিয়া থাকে।

আসামে রেশম ব্যবসায়।—আসাম রেশমের ব্যবসায়ে বিখ্যাত। আজকাল আসামী রেশমের ব্যবহার ও আদর যথেষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, আসামের উপত্যকা প্রদেশে রেশমগুটিপোকার রীতিমত করিয়া চাষ হইয়া থাকে। চারি প্রকারের পোকা সচরাচর পোষা হয়। তাহার মধ্যে পাটপোকা একপ্রকার সাদা লালাদ্বারা সাদা সূক্ষ্ম রেশম প্রদান করে। এই পাটপোকা দুই জাতীয়, ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ। তাহার পর আসামের এণ্ডী ও মুগা রেশমের নাম বোধ করি সকলেই শুনিয়া থাকিবেন, আর অধিকাংশ লোকে তাহা দেখিয়াও থাকিবেন। এই দুই প্রকার

রেশমের কাপড়ের যেমন সুন্দর গঙ্গাজলের মত বর্ণ, সেই প্রকার আবার চাকচিক্য। উভয় প্রকার বস্ত্রই খুব দৃঢ় ও অনেক দিন স্থায়ী হয়। সাহেবরা এই মুগা ও এণ্ডী কাপড়ের যথেষ্ট আদর করিয়া থাকেন। চাঁপাগাছের ডালে যে গুটি পুষ্ট হয় তাহা হইতে অপেক্ষাকৃত শ্বেত-রেশম প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভ্যারেণ্ডা বৃক্ষের ডালে এণ্ডীর গুটি পরিপুষ্ট হয় বলিয়া এই রেশমের এণ্ডী বা এড়ি নাম হইয়াছে। পাট রেশমের ন্যায় সাদা সুন্দর রেশম প্রায়ই পাওয়া যায় না, যদিও বা অতি কষ্টে পাওয়া যায় তাহার মত সুন্দর ও মূল্যবান পদার্থ আর নাই। তবে মুগা রেশম খুব অধিক পরিমাণে উত্তর ও মধ্য আসামের মহিলাবৃন্দ সকলেই ব্যবহার করিয়া থাকেন। খাসি, গারো এবং অন্যান্য পার্ব্বত্য অধিবাসীকুলও ইহার ব্যবহার করিয়া থাকে। এণ্ডীর বর্ণ অপেক্ষাকৃত শ্বেত এবং ইহার কাপড় দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। আসামের গ্রামবাসীরা এই রেশমী বস্ত্র শীতকালে গাত্রে পরিধান করে। এই এণ্ডী ও মুগার ব্যবসায় কোন বৃহৎ কারখানা হিসাব করিয়া চালিত হয় নাই। প্রতি গ্রামবাসীই কিছু কিছু গুটির চাষ করিয়া থাকে এবং তাহাদের বাটীর স্ত্রীলোকগণ তাহা হইতে বস্ত্রবয়ন করিয়া গ্রামের বাজারে বিক্রয় করিয়া ফেলে। উত্তর আসামে রেশমের ব্যবসা তত অধিক পরিমাণে নাই, তবে পশ্চিম অঞ্চলের লোকে ভুটিয়া এবং মাড়োয়ারীদিগকে রেশম বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া জমির খাজনা দিয়া থাকে। মণিপুর এবং খাসিয়া প্রদেশে রেশমের ব্যবসায়ের উন্নতি করিবার জন্য খুব চেষ্টা চলিতেছে।

সার-সংগ্রহ।

একটি আয়কর বৃক্ষ।

যশোহর জেলার কপোতাক্ষী নদীতটে মিরজা নগর নামে একখানি গ্রাম আছে। প্রতাপাদিত্য বিজয়ের পরে সাহাজাদা জাহাঙ্গিরসা উক্ত গ্রামে একজন কাজী বা মিরজা সাহেবের আদালত স্থাপনা করেন। মিরজার অবস্থিতি জন্যই গ্রাম বা নগরের নাম মিরজা নগর রক্ষিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ের সাহেবগঞ্জ, কটেলগঞ্জ প্রভৃতির নামও ঐরূপ; যাহা হউক এইক্ষণে সে মিরজা না থাকিলেও সেই মিরজা নগর নামটা বিস্মৃতির অতল জলে ডুবিয়া যায় নাই। মিরজাগণের সৌভাগ্য সূর্য্য যে সময়ে মধ্য গগনালম্বি হইয়াছিল, সেই দিনে নানা দিক্ দেশ হইতে বিবিধ শ্রেণীর শিল্পীগণ ঐ স্থানের চারি পার্শ্বের বিভিন্ন গ্রামে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে, তন্মধ্যে বস্ত্রশিল্পীর বংশধরগণ ও কাষ্ঠ শিল্পীর নিম্নতম বংশীয় কতকগুলি লোক অদ্যাপি তথায় বর্ত্তমান থাকিয়া, কোন রূপে স্বীয় বংশানুক্রমিক ব্যবসা কথঞ্চিৎ বজায় রাখিয়া কষ্টে সংসার ধর্ম্মে ও অধস্তন পুরুষদিগকে স্বীয় ব্যবসায়ে সুশিক্ষিত করিয়া দিন যাপন করিতেছে। ঐ মিরজা নগরের অনতিদূরে সাতবেড়িয়া নামে একখানি গ্রাম আছে। গ্রামী খানিতে অনেক গুলি নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানের বাস, কিন্তু দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলাম যে ঐ সকল অধিবাসীগণ হিন্দু ও মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকলেই একমাত্র কাষ্ঠ কারুকার্য্যে নিরত, আবার সকলেই কাষ্ঠের কার্য্য করিলেও কেহই অন্যবিধ কার্য্যে নিযুক্ত হয় না; সকলেই একমাত্র পালকি গঠন ও বিক্রয় দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করে। যে ব্যক্তি অতি

দরিদ্র সে কোন উপায়ে পাঁচটী টাকা সংস্থান করিতে পারিলেই হয় নিজে না হয় অপরের সাহায্যে একখানি পালকি গঠন করিবেই করিবে। পালকিও এখানে অতি ক্ষুদ্রায়তন—৩॥০ সাড়ে তিন ফিট হইতে বৃহৎ সাত ফিট সাড়ে সাত ফিট পর্য্যন্ত দীর্ঘ ও তদনুরূপ প্রস্থাদির পাওয়া যায়, এবং সময় সময় এক একটা কারখানায় চারিশত সাড়ে চারিশত পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ সুগঠিত প্রস্তুত পালকি বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে। আমাদিগের বিশ্বাস যে কেবল মাত্র কলিকাতা সহরের আবশ্যকীয় পালকি-সমূহ শিবপুরে নির্ম্মিত হয়, তদ্ভিন্ন বঙ্গদেশের বোধ হয় অধিকাংশ পালকিই এইস্থান হইতে সরবরাহ হইয়া থাকে। তথাপি আমরা বলিতে বাধ্য যে বাঙ্গালীর চির প্রচলিত প্রথা অনুসারে ইহারা এরূপ স্থিতিশীল, যে কোন কার্য্যই ইহারা নুতন গ্রহণে সম্মত নহে, পুরুষানুক্রমে যেমন চলিয়া আসিতেছে সেই রূপই চালাইবে, শতমুদ্রা লাভ হইলেও কোন নূতন উৎকৃষ্টতর পদ্ধতি অবলম্বন করিবে না। বর্ত্তমান দিনে কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের গাড়ি, পালকি, বোট প্রভৃতিতে নানাবিধ উজ্জ্বল উজ্জ্বল সুদৃশ্য রমণীয় রং দেওয়া প্রচলিত হইলেও ইহারা কখনই তাহা শিক্ষা করিবে না, অথবা ঐ সকল রং লেপন করিয়া স্বীয় বাণিজ্য দ্রব্যের উৎকর্ষ্য সাধন এবং মূল্য বৃদ্ধির দিকে যাইবে না, ছাদ সম্বন্ধেও সেই একই কথা। ইহারা কাষ্ঠের ছাদ গঠন করিয়া দিবে এই পর্য্যন্ত, তদুপরি জল রৌদ্র নিবারণ জন্য যে ক্যাম্বিসের উপর রং ঢাল করা আবরণ গাড়ি পালকির উপর আঁটিয়া দেওয়ার নিয়ম ইংরাজের প্রথম আমল হইতে প্রচলিত হইয়াছে, ইহারা অদ্যাপি তাহা গ্রহণ করে নাই বা করিতেও সম্মত নহে, সেই যে বাদসাহী আমল হইতে গাবের আটা ও কালি মিশ্রিত করিয়া অতি কদাকার কুৎসিত কৃষ্ণবর্ণ রং লেপন করিয়া অতি সুগঠিত দ্রব্যনিচয়কে বিলাসী ধনবানদিগের অস্পৃশ্য করিয়া ফেলিবে, কিছুতেই তাহার অন্যথা ঘটিবে না। আমরা এরূপ বিস্তর দেখিতে পাই যে, যে পালকি খানা রং না দিয়া অথবা অতি কদর্য্য কাল রং দিয়া মাত্র কুড়ি টাকায় বিক্রয় করিয়া ফেলিল, আর পাঁচটি টাকা ব্যয় করিয়া ঐ পালকিতে উজ্জ্বল বিলাতী রং দ্বারা বার্ণিস করিয়া ও তক্তার ছাদের উপর সাদা রং যুক্ত ক্যাম্বিস আঁটিয়া দিলে, একজন ধনি ব্যক্তি অনায়াসে পঞ্চাশ টাকা মুল্যে সুলভ জ্ঞানে হাস্যমুখে ক্রয় করিয়া লইত, কিন্তু দুর্ভাগ্য যে আমরা ব্যবসায় কার্য্যের সৌষ্ঠব সম্পাদন একেবারেই বুঝি না।

কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে গাড়ি, পালকি-সমূহ সেগুণ কাষ্ঠে গঠন করা হয় কিন্তু ইহারা সেগুণের তক্তা স্পর্শও করে না। যশোহর, বরিশাল প্রভৃতি জেলা সমূহে পুঁয়ের গাছ নামক এক প্রকার বৃক্ষ জন্মে, তাহার তক্তা অতি উজ্জ্বল রক্তবর্ণ এবং ওজনে হালকা ও ভারসহক্ষম মন্দ নহে। সেগুণ তক্তার ন্যায় সহজে পালিশও হয় এবং অল্প দিন মধ্যেই ইহার কাঠ বেশ সারবান হয়। ঐ কারণে পুঁয়ের তক্তা দ্বারাই পালকির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গঠিত হয়, কেবল মাত্র চাল বা ছাদটা কদম্বের তক্তা দিয়া গঠন করে। কদম্বের কাষ্ঠ অতিশয় লঘু এবং চামড়ি হয়, এজন্য উহাই পালকির ছাতের অধিক উপযোগী, তদ্ভিন্ন অল্প মূল্যের পালকিতে সিমুল প্রভৃতির কাষ্ঠও ব্যবহার করে। পূর্ব্ব কথিত পুঁয়ের কাষ্ঠ আমাদিগের সহরবাসী মিস্ত্রীদিগের নিতান্ত অপরিচিত। উহার রং এমন সুন্দর ও পালিস এমন সহজে ও উত্তম রূপে হয়, যে সহসা ব্যবসায়ীর চক্ষে উহা মেহগিনি কাষ্ঠ বলিয়া ভ্রম হয়। সাতবেড়ের পালকির মহাজনেরা আপনাপন পণ্য সম্ভার অখণ্ড বঙ্গের বহু দূর দুরান্তরে নানা স্থানে

মেলার বাজারে প্রেরণ করিয়া বিক্রয় ও বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করে। কিন্তু উহাদিগের দ্বারা নূতন কিছুই আশা করা যায় না, এজন্যযদি কোন ধনী ব্যবসায়ী কলিকাতা হইতে দুই চারিজন রং রাজ বা রং মিস্ত্রী আমদানী করিয়া, ঐ সকল অসম্পূর্ণ পালকি ক্রয় করিয়া তাহাতে বার্ণিস করিয়া ক্যাম্বিসের ছাদ বা ছাউনী করিয়া আভ্যন্তরীক বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে একটি অঙ্গহীন ব্যবসায় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়া যথেষ্ট অর্থাগমের পথ সুগম হয়। বর্ত্তমান সময়ে যদিও মফঃস্বলের ধনী ও জমিদারগণ ঐ রূপ অর্দ্ধ সম্পাদিত পালকি স্বল্প মুল্যে ক্রয় করিতে পারেন বটে, কিন্তু তৎপরে কলিকাতা হইতে কারিগর ও রং মিস্ত্রী আনাইয়া স্বস্থানে বসিয়া এক এক খানি পালকির অঙ্গসৌষ্ঠব ও রং লেপনে সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিতে বহু অর্থ ও সময় ব্যয় করিতে হয়। এই পালকির কারখানা সাতবেড়ে গ্রাম, কলিকাতা হইতেও বহু দূরে নহে, ইহা বি, সি, রেলের ধারে ঝিকরগাছা ষ্টেসন হইতে অতি নিকটে। আর একটি কথাও এই যে, যে পুঁয়ের তক্তা দ্বারা পালকি নির্ম্মিত হয় সাধারণ কৃষকের ধারণা যে কৃষকের বাটিতে এই গাছ জন্মে না। কেবল মাত্র ভদ্র লোকের বাটিতে ও বাগানে ইহার গাছ আপনা আপনি জন্মে। এজন্য আমরা কৃষি-শিল্পের মর্ম্মজ্ঞ যশোহরবাসী ধনী মহোদয়গণকে অনুরোধ করি যে, যদি তাঁহারা বিদেশী সেগুণ, মেহগির চাষ না করিয়া স্বদেশী স্বভাব জন্মা পুঁয়ের (Timber) কাষ্ঠের দুই চারি বিঘা বাগানে আবাদ করিয়া একবার সাধারণ লোককে বুঝাইয়া দেন যে ইহা একটী বিশেষ লাভজনক কৃষি, তাহা হইলে দেশের প্রভূত উপকার সাধন হইতে পারে এবং বহু পতিত জঙ্গল জমিতে ইহার আবাদ হইতে পারে। বিদেশী সওদাগরগণ একবার ইহার কাষ্ঠের চাকচিক্যশালীতা দর্শন এবং ভারসহক্ষম ও লঘুতা অনুভব করিলে সহজেই এই কাষ্ঠ ক্রয়ে আকৃষ্ট হইতে পারে। আর বিদেশে রপ্তানীর উপযোগী কাষ্ঠ জন্মান ও সংগ্রহ হইলে দেশেরও একটা নূতন অর্থাগমের পথ উন্মুক্ত হইতে পারে। সেগুণ, মেহগনির চাষ অপেক্ষা ইহার চাষ বিশেষ লাভের তাহার কারণ যে, সেগুণ প্রভৃতির বৃক্ষ ৭০। ৮০ বৎসরের কমে ব্যবহার যোগ্য হয় না, কিন্তু পুঁয়ের গাছ বিশ, পঁচিশ বৎসরেই তক্তার উপযোগী সারে পরিণত হয়; অতঃপর এমন একটা লাভজনক অথচ অনায়াসলব্ধ সুলভ স্বদেশী বন্য বৃক্ষের চাষে কেহ অগ্রবর্ত্তী হইবেন কি? আমরা ভারতীয় কৃষি সমিতির কর্তৃপক্ষকেও যশোহর অঞ্চল হইতে দুই চারিটি পুঁয়ের গাছ আনাইয়া সমিতির উদ্যানে রোপণ করিতে অনুরোধ করি। আমরাও আমাদিগের ক্ষুদ্রতম বাগানে এই অজ্ঞাত, অপরীক্ষিত, অনাদরে বর্দ্ধিত, স্বভাবজাত বন্য বৃক্ষের দুই একটি চারা রোপণ করিতে অভিলাষ করিয়াছি। যদি কোন মহানুভব ব্যক্তি অথবা প্রবন্ধ লেখকের পরিচিত বন্ধু বান্ধব ইহার দুই দশটি বীজ ডাকে প্রেরণ করেন, তাহা হইলে নিম্ন স্বাক্ষরকারী ধন্যবাদের সহিত উহার সমুদয় ব্যয় দিয়া গ্রহণ করিতে সম্মত আছেন।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কালীগঞ্জ

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য।

কৃষি-সমাচার।—পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম কৃষি-বিভাগ হইতে আমরা এই পুস্তক খানি প্রাপ্ত হইয়াছি। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম কৃষি-বিভাগের বাৎসরিক বিবরণী ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

ইহাতে কার্পাস, আলু, আখ, ধান্য, পাট, গম সম্বন্ধে উন্নত কৃষি পদ্ধতির প্রচলন বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশীয় কৃষি-ক্ষেত্র গুলির সংক্ষিপ্ত কার্য্য বিবরণী, রেশম কীট সম্বন্ধে আলোচনা, স্থানীয় গো চিকিৎসার বিবরণী ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সারের কথা, কাসাবা, চিনা বাদাম, গিনিঘাস চাষের কথা, শস্য নষ্টকারী পোকা ও তাহার প্রতিকারের বিষয়ও উল্লেখ আছে; ফল কথা ইহাতে কৃষকের জানিবার ও শিখিবার অনেক বিষয় আছে। এতাবৎকাল কৃষি-বিভাগ সকলের বিবরণী সমূহ সাধারণতঃ ইংরাজি ভাষায় লিখিত হইয়া প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। তাহাতে সময়ে সময়ে নূতন ও উন্নত প্রণালীর চাষের পদ্ধতি সকল আলোচিত হইলেও ঐ সকল বিষয় অতি কম সংখ্যক কৃষকের গোচরে আসিয়া থাকে। সেই অভাব মোচনার্থ পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম কৃষি-বিভাগ তাঁহাদের বাৎসরিক কৃষি-বিবরণী পুস্তকাকারে বাঙ্গালা ভাষায় ছাপাইয়াছেন, এবং প্রতি বৎসর এই রূপ একখানি কৃষি-সমাচার বাহির হইবে বলিয়া আশা দিয়াছেন। পুস্তক খানি যথা সম্ভব সরল ভাষায় লেখা হইয়াছে। পুস্তক খানি বঙ্গীয় সাধারণ কৃষকগণের জন্য অভিপ্রেত, সুতরাং যিনি ইহাতে দুরূহ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আলোচনা খুঁজিবেন তাঁহার উদ্দেশ্য হয়ত সিদ্ধ হইবে না, কিন্তু চাষার অনেক উপকারে আসিবে। উক্ত কৃষি-বভাগের সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রায় ভূপাল চন্দ্র বসু বাহাদুর ইহার প্রণেতা। যোগ্য হস্তেই পুস্তক প্রণয়নের ভার অর্পিত হইয়াছে ইহা নিশ্চিত। পুস্তক খানির দাম ৵০ আনা মাত্র। ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন, ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীটে অনুসন্ধান করিলে পাইবেন।

—

সিন্ধুপ্রদেশে শিল্পোন্নতি।—সিন্ধুদেশের পশমী গালিচা ও র‍্যাগ্ বিলক্ষণ সস্তা এবং দীর্ঘকালস্থায়ী। দেশের সর্ব্বত্রই তাহা ব্যবহৃত হয়। এই দেশের জেলে এক প্রকার টিকসই মেটে বাসন প্রস্তুত হয়, উহা পরিষ্কার এবং উত্তম। বিভিন্ন দেশের কাপড় আমদানী হইয়া এখানকার তাঁতের কাপড় এক প্রকার উঠিয়া যাইতে বসিয়াছিল। কিন্তু দেশের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায় নব নব তাঁতের আমদানী করিয়া দেশের পুরাতন বাণিজ্যের পসার বৃদ্ধি করিতেছেন। ইহা দেশের পক্ষে কম মঙ্গলের বিষয় নহে। এইস্থানে তুলার বীজ পৃথক করণের কল অনেক হইয়াছে; কিন্তু তুলার সুতার কল একটিও নাই। এইস্থানে প্রতি বৎসর অত্যধিক পরিমাণে তুলা উৎপন্ন হইয়া নানাস্থানে চলিয়া যাইতেছে। কল না থাকায় সুতা প্রস্তুত হইতে পারিতেছে না। সুতরাং এই স্থানের তন্তুবায়-গণকে সুতা ক্রয় করিয়া কাপড় প্রস্তুত করিতে হয়, তাহাতে খরচ অধিক পড়িয়া যায়। ইহাতে ধুতির মূল্য বৃদ্ধি হয়। এখানে তাতার একটি কাপড়ের কল আছে। তাতার কলের রেশমী "লুঙ্গী", বিখ্যাত।

এইস্থানে এক সময়ে রেশমী ও স্বর্ণ জরির কার্য্য (যাহাকে সিন্ধুভাষায় "জারজ্জ" কহে) জগত-বিখ্যাত ছিল। বঙ্গদেশের সওদাগর ও নাবিক-গণ এই সকল দ্রব্যাদি বিভিন্ন দেশে লইয়া গিয়া বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিত। কিন্তু বিগত কয়েক বৎসর মান্দ্রাজ হইতে সুলভ বস্ত্র আমদানী হইয়া এই বহু মূল্যবান শিল্প ক্রমশঃ নষ্ট হইতে বসিয়াছে।

—

সিন্ধুদেশস্থিত হায়দ্রাবাদ চর্ম্মের কার্য্যের প্রধান কেন্দ্রস্থল। রাসায়নিক কার্য্যের উন্নতিকল্পে তথাকার অনেকেই বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। লোকের আগ্রহও বিলক্ষণ আছে। পূর্ব্বে মরো ও নউসারো ও

ফেরোজ তালুকে সাধারণ সাবান প্রস্তুত হইত। অধুনা দুইটি সাবানের ফ্যাক্টরী স্থাপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি শিকারপুরে ও অপরটি হায়দ্রাবাদে। এই স্থানদ্বয়ে যে সকল সাবান প্রস্তুত হইতেছে, তাহার কাটতি অসাধারণ। ইহা বুঝিয়াই উহার গুণাবলী স্থির করিতে হইবে। ইহাতে উক্ত ফ্যাক্টরীওয়ালাগণ নবোৎসাহে কার্য্য করিতেছেন।

মিউনিসিপাল গোশালা।—ইতিপূর্ব্বে একটা জল্পনা চলিতেছিল যে, খাঁটি দুগ্ধের অভাব বিমোচনার্থ কলিকাতা মিউনিসিপালিটি গভর্ণমেণ্টের অনুমোদনে একটি আদর্শ গোশালা বসাইবেন। জল্পনা বোধ হয় কার্য্যে পরিণত হইবে। মিউনিসিপালিটি এতদুদ্দেশে বাগবাজার ষ্ট্রীটে (৭২।৩ এবং ৭২।৪ নং) ও হরলাল মিত্রের লেনে (৬।১, ৬।২নং এবং ৬।৩নং) এক বিঘা আঠার কাঠা জমি লইয়াছেন। মিউনিসিপালিটি কিরূপভাবে দুধ সরবরাহ করিবেন তাহার এখন স্থির হয় নাই।

খাল বিস্তার।—অনাবৃষ্টিনিবন্ধন অনেক প্রদেশে শস্যোৎপাদনের বিঘ্ন ঘটে। তাই 'ক্যানাল' বা খাল কাটিয়া স্থানে স্থানে জমিতে জল সেচনের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। আবার অতিবৃষ্টি হেতু স্থানে স্থানে অতিরিক্ত জল সঞ্চিত হইয়া শস্যহানি হয়। খাল কাটিয়া সেই অতিরিক্ত জল বাহির করিয়া দিয়া শস্য রক্ষা করিতে হয়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ১৫ লক্ষ একর জমিতে খালের সাহায্যে জল সেচনের ব্যবস্থা ছিল। এক একর জমির পরিমাণ ৩ বিঘা আধ কাঠা মাত্র। সুতরাং তখন অতি অল্প জমিতেই খালের জলের সাহায্য মিলিত। ১৯০৯ সালের হিসাবে দেখা যায় যে বর্ত্তমান বর্ষে প্রায় ২ কোটী ২২ লক্ষ ২৫হাজার একর জমিতে জল সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত জল নিকাসের জন্য নানাস্থানে খাল খনন করা হইয়াছে। এই পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া গভর্ণমেণ্ট প্রায় ৪৫ কোটী টাকা খাল খননে ব্যয় করিয়াছেন। ইহাতে যে কেবল প্রজাগণ লাভবান হইয়াছে তাহা নহে গভর্ণমেণ্টও বিশেষ লাভবান হইয়াছেন। খাল কাটায় যে টাকা ব্যয় হইয়াছে, খাল সংক্রান্ত রাজস্ব আদায়ে সেই টাকার উপর শতকরা আট টাকা মুনফা আদায় হইতেছে। যেরূপ ভাবে চারিদিকে খাল কাটা হইতেছে তাহাতে গভর্ণমেণ্ট আশা করেন যে, আগামী ২০ বৎসরের মধ্যে দেশের কৃষিকার্য্যের বিশেষ সুবিধাই হইবে। গভর্ণমেণ্টেরও তাতে অলাভ নাই। এই সময়ের মধ্যে পশ্চিমে সিন্ধুনদ এবং পূর্ব্বে যমুনা এতদন্তর্গত পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশের জলাভাবে পতিত বিস্তৃত ভূমিখণ্ড অভিনব শস্য শ্যামলা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে পারে।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

মাঘ মাস।

সব্জীক্ষেত্র।—বিলাতী সব্জী প্রায় শেষ হইতে চলিল। যে গুলি এখন ক্ষেত্রে আছে, তাহাতে মধ্যে মধ্যে জল দেওয়া ছাড়া আর অন্য কোন বিশেষ পাট নাই।

কপি প্রভৃতি উঠাইয়া লইয়া সেই ক্ষেত্রে চৈতে বেগুন ও দেশী লঙ্কা লাগান উচিত।

ভুঁয়ে শসা, করলা, খরমুজ, ঝিঙ্গা প্রভৃতি দেশী সব্জীর জন্য জমি তৈয়ারী করিয়া ক্রমশঃ তাহার আবাদ করা উচিত। তরমুজ মাঘ মাস হইতে বপন করা উচিত। ফাল্গুন মাসেও বপন করা চলে।

ফলের বাগান।—আম, লিচু, লকেট, পীচ এবং অন্যান্য ফল গাছের ফুল ধরিতে আরম্ভ হইয়াছে। ফল গাছে এখন মধ্যে মধ্যে জল সেচন করিলে ফল বেশী পরিমাণে ধরিবে ও ফল ঝরিয়া যাইবে না। আনারসের গাছের এই সময় গোড়া বাঁধিয়া দেওয়া

উচিত। গোবর ও ছাই মাটি আনারসের পক্ষে প্রকৃষ্ট সার। আঙ্গুর গাছের গোড়া খুঁড়িয়া ইতি-পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। যদি না হইয়া থাকে, তবে আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে।

ফলের বাগানের অনতিদুরে তৃণ, কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিয়া তাহাতে আগুন দিয়া মুকুলিত বৃক্ষে ধোঁয়া দিবার ব্যবস্থা করিলে ফলে পোকা লাগার সম্ভাবনা কম হয় এবং ফল ঝরা নিবারণ হয়। পশ্চিমাঞ্চলে আম বাগানে এই প্রথা অবলম্বন করা হইয়া থাকে। গাছে অগ্নির উত্তাপ যেন না লাগে কিন্তু ধোঁয়া অব্যাহত ভাবে লাগিতে পায় এরূপ বুঝিয়া অগ্নিকুণ্ড রচনা করিবে।

বর্ষাকালে যে সকল স্থানে বড় বড় গাছ পুতিবে, সেই সকল স্থান প্রায় দুই হাত গভীর করিয়া গর্ত্ত করিবে এবং সেই গর্ত্ত খোঁড়া মাটিগুলি কিছু দিন সেই গর্ত্তের ধারে ফেলিয়া রাখিবে। পরে সেই মাটি দ্বারা ও তাহার সঙ্গে কতক সারমাটি মিশাইয়া সেই গর্ত্ত ভরাট করিবে। উপরের মাটি নিচে এবং নিচের মাটি উপরে করিয়া খোঁড়া মাটি দ্বারা গর্ত্ত ভরাট করিবে।

পুরান ডালের কুল ও পিয়ারা ছোট হয় ও তাহাতে পোকা ধরে, সেই জন্য পুরান ডাল প্রতি বৎসর ছাঁটা উচিত।

কৃষিক্ষেত্র।—সম্বৎসরের চাষ এই মাসেই আরম্ভ হইয়া থাকে। এই মাসে জল হইলেই জমিতে চাষ দিবে। যে সকল জমিতে বর্ষাকালের ফসল করিবে, তাহাতে এই মাসে সার দিবে। আলু ও কপির জন্য পলি মাটি দিয়া জমি তৈয়ারী করিয়া রাখিবে। এই মাস হইতেই ইক্ষু কাটিতে আরম্ভ করে। মুলার অগ্রভাগ কাটিয়া মাটিতে পুতিয়া দিলে তাহা হইতে উত্তম বীজ জন্মে। ফুল ধরিবার আগে মুলার আগার দিকে চারি অঙ্গুলি রাখিয়া তাহার মধ্যে খোল করিবে এবং ঐ খোলে জল দিয়া নিচের দিকে মুখ রাখিয়া টাঙ্গাইবে। প্রতিদিন ঐ খোল পুরিয়া জল দিবে। ক্রমে উহার শীষ বাঁকিয়া উপরের দিকে উঠিবে এই উপায়ে উত্তম বীজ উৎপন্ন হইবে। এই মাসের প্রথম পনের দিনের পর, হলুদ ও আদা তুলিতে আরম্ভ করিবে। হলুদের ও আদার মুখী বীজের জন্য শীতল স্থানে রাখিয়া দিবে। হলুদ, গোবর মিশ্রিত জলে অল্প সিদ্ধ করিয়া শুকাইতে দিবে। একবার উৎলাইয়া উঠিলেই নামাইয়া ফেলিবে। আধ শুক্না হইলে হলুদগুলি রোজ একবার ডলিয়া দিবে। ডলিলে হলুদ গোল, শক্ত ও পরিষ্কার হয়। চীনা বাদাম এই মাসে উঠাইবে।

ফুলের বাগান।—ফুলের বাগানের শোভা এখন অতুলনীয়। মরসুমী ফুল সমস্ত ফুটিয়াছে। গোলাপ এখন প্রচুর ফুটিতেছে। গোলাপ ক্ষেতে এখন যেন জলের অভাব না হয়। গোলাপের কলম বাঁধা শেষ হইয়াছে। বেল, মল্লিকা, যুথিকা ইত্যাদির ডালের অগ্রভাগ ও পুরাতন ডালগুলি ছাঁটিয়া দিবে।

শীতপ্রধান পার্ব্বত্যপ্রদেশে এখন এষ্টার, হার্টিজ, লর্কস্পর, পিঙ্কস্. ফ্লাক্স্, ডেজি, পিটুনিয়া প্রভৃতি মরসুমী ফুলবীজ বপন করিতে হইবে এবং শীতকালের সব্জী যথা,—গাজর, সালগম, লেটুস্, বাঁধা-কপি, ফুলকপি, মূলাবীজ প্রভৃতি এই সময় বপন করিতে হইবে।

এই মাসের শেষে বেল, জুঁই, মল্লিকা প্রভৃতি ফুল গাছের গোড়া কোপাইয়া জল সেচন করিতে হইবে। কারণ এখন হইতে উক্ত ফুল গাছ গুলির তদ্বির না করিয়া জল্দি ফুল ফুটাইতে না পারিলে ফুলে পয়সা হইবে না। ব্যবসার কথা ছাড়িয়া দিলেও বসন্তের হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুল না ফুটিলে ফুলের আদর বাড়ে না।

কৃষক

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসনের মুখপত্র

মাঘ, ১৩১৬।

REGISTERED No C. 192.

কৃষক।

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।



দশম খণ্ড,—১০ম সংখ্যা।

সম্পাদক—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস্।

মাঘ, ১৩১৬।

কলিকাতা ; ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েশন হইতে
শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা ; ১৯৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, দি মিলার প্রিণ্টিং ওয়াকস্ হইতে
এস, এইচ, রহমান দ্বারা মুদ্রিত।



কৃষক।

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিকপত্র।

১০ম খণ্ড। | মাঘ, ১৩১৬ সাল। | ১০ম সংখ্যা।

পাট চাষের খরচ।

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত, এম, আর, এ, সি লিখিত।

আয় ব্যয় সম্বন্ধে কৃষকের অজ্ঞানতা এবং সাধারণের অনুদারতা।

অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী ভিন্ন আমাদের দেশের অপর সকল লোকেরই আয় ব্যয় সম্বন্ধে জ্ঞান অতিশয় শোচনীয়। কোন কোন শিক্ষিত ভদ্রলোকও হিসাব করা বা আয় ব্যয়ের মিল রাখিয়া খরচ করাকে হয়ত নীচতাই মনে করেন। যাহা হউক, আয় ব্যয় জ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের কৃষকশ্রেণীর অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়। একজন সাধারণ পাট চাষাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে পাট করিয়া বিঘা প্রতি তাহার কত লাভ হয়, তিনি প্রায় সর্ব্বদাই এই উত্তর পাইবেন যে সে তাহা ঠিক করিয়া দেখে নাই। অথবা "সমুদ্র যার শয্যা শিশিরে কি ভয়" —যাহার আয়ের দ্বারা কখনও ব্যয় সঙ্কুলান হয় না তাহার আবার আয় ব্যয়ের হিসাব করিয়া কি হইবে। পাট চাষীদের মধ্যে যাহাদের কথঞ্চিৎ কারবার জ্ঞান আছে—তাহারা হয়ত একটু ভাবিয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিবে যে পাট চাষে গড়ে বিঘা প্রতি তাহার আনুমানিক ১০৲ টাকা লাভ হয়। আমরা অনেক কৃষককে জিজ্ঞাসা করিয়া এরূপ উত্তর পাইয়াছি। আবার সেই হিসাবি কৃষককে জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি বা তোমার পরিবারের লোক পাটের চাষে পরিশ্রম করিয়া থাক কি?" উত্তর "নিশ্চয়"। "তাহাদের পারিশ্রমিক বেতন ধরিয়া হিসাব করিয়াছ ত"? "না, তাত কখনও হিসাবে ধরি না।" "তুমি যে মজুরদের খাইতে দেও,—তাহার খোরাকি খরচ হিসাবে ধরিয়াছ কি?" "না, তাহাও ত কখনও ধরি না।" "তুমি যে গরু দিয়া চাষ করিয়াছিলে, সেই গরুর সেই কয়দিনের খোরাকি খরচ হিসাবে ধরিয়াছ কি?" "না, তাহাও ত কখনও ধরি না।" "এগুলি ধরিয়া হিসাব করিয়া বল দেখি তোমার পাটের বিঘা প্রতি কত লাভ থাকে?" "এ সব ধরিলে লাভ একেবারেই থাকে না।" তবে যে তুমি পূর্ব্বে বলিলে বিঘা প্রতি তোমার দশ টাকা লাভ থাকে সে কথার অর্থ কি?" "নগদ যে টাকাটা দেই এবং বিক্রি করিয়া নগদ যে টাকাটা পাই, শুধু তাহা ধরিয়াই বলিয়াছি দশ টাকা লাভ থাকে।" "তুমি মহাজনকে যে সুদ দেও, অথবা তোমার

পাটের ক্ষেত একজন গরু দিয়া খাওয়াইয়া ফেলিলে কি অন্য অনিষ্ট করিলে যে সকল মোকদ্দমা করিতে হয় সেই সকল খরচ ধরিয়া বল দেখি তোমার পাটের চাষে লাভ কি ক্ষতি?" "অত্যন্ত ক্ষতি।" "তবে তুমি এরূপ ক্ষতিকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হও কেন?" "প্রবৃত্ত না হইয়া করি কি? খাটিয়া অন্ততঃ মজুরিটাও ত পাই। ইহা ভিন্ন খাটিয়া খাইবারও ত উপায়ান্তর নাই।" আমাদের চাষা শ্রেণীর হিসাব বিষয়ে অজ্ঞানতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমাদের বাল্যকালের একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। এই চাষা শ্রেণীর একজন চাকরকে আমাদের কর্ত্তা তিনটী পয়সা দিয়া এক সের দুধ আনিবার জন্য বাজারে পাঠাইয়াছিলেন। সে বেচারি বাজারে গিয়া দেখে দুধের সের আড়াই পয়সা। সে নিরুপায়. কি করে, মলিন মুখে খালি ঘটি হাতে বাসায় ফিরিয়া আসিল। কর্ত্তা যখন বিরক্ত হইয়া দুধ না আসার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন সে কাঁপিতে কাঁপিতে উত্তর করিল "কর্ত্তা, দুধের সের বাজারে আড়াই পয়সা, আপনি আমাকে দিয়াছেন মাত্র তিন পয়সা, আমি কি করিয়া দুধ আনি?" সাঁওতাল পরগণায় থাকিবার কালে আমরা সাঁওতাল বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া জানিয়াছিলাম যে তখন সাঁওতাল চাষারা মহাজনের গোলা হইতে ধান ধার করিয়া সেই ধান দশ বিশ'বার পরিশোধ করিলে পরেও মহাজনের খাতাপত্রে সেই ধানের দেনা বাড়িত ছাড়া কমিত না। দেশেও আমরা অনেক চাষার আর্ত্তনাদ শুনিয়াছি—সত্য মিথ্যা জানি না যে একবার ১০৲ দশ টাকা ধার করিলে বার বার সে দশ টাকা পরিশোধ করিয়াও তাহার সে দেনা কমে না; অথবা মালিকের খাজনা সন সন প্রদান করিয়াও তাহার বকেয়া বাকীর শেষ হয় না। মহাজন কি মালিকের হিসাবের ব্যূহের ভিতরে একবার প্রবেশ করিলে, সে ব্যূহ ভেদ করিয়া বাহির হওয়া—কৃষকের অসাধ্য। যাহারা হিসাব করিতে এতদূর অক্ষম, তাহাদের আয় ব্যয় বা লাভ ক্ষতি সম্বন্ধে প্রকৃত কথা জানিতে হইলে বিশেষ সহৃদয়তা এবং উদারতার সহিত প্রশ্ন করিয়া যতদূর সম্ভব প্রকৃত অবস্থা জানিতে হয়। তাহা না করিলে, চাষার পেটের কথা পেটেই থাকিয়া যাইবে; প্রকৃত অবস্থা অপ্রকাশিত থাকিবে। সেরূপ সহৃদয়তা এবং উদারতা কাহার নিকটে আশা করা যায়? অল্প বেতনের কর্ম্মচারী সরকারিই হউক, জমিদারের বা তালুকদারেরই হউক—জানে যে মালিকের লাভ দেখাইতে পারিলেই সে পদোন্নতি আশা করিতে পারে। কৃষকের লাভ হয় না, একথা যে সত্য তাহা কল্পনা করিতেও তাহার প্রবৃত্তি হইবে না; কারণ তাহা হইলে তাহার পক্ষে মালিকের আয় বৃদ্ধি করা দুষ্কর হইয়া পড়ে। তদ্ভিন্ন মালিকই বল, উকিল মোক্তারই বল বা সওদাগর মহাজনই বল—সাক্ষাৎ বা গৌণভাবে—আমরা সকলেই সেই কৃষকের পরিশ্রমের ফলের উপরে ভাগ বসাইয়া জীবনধারণ করিতেছি। কেহ বা জোঁকবৃত্তি অবলম্বন করিয়া তিল তিল করিয়া চাষারই রক্ত শোষণ করিয়া প্রাণধারণ করিতেছি। সেই চাষার লাভ হয় না এ কথা ভাবিতে গেলেও আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িবে, মানুষ মাত্রেরই বিবেকে বাধিবে। এই সকল নানা কারণে পাটের চাষে লাভ হয় না, এ কথা সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়া আমাদের সকলেরই স্বার্থের বিরোধী। ইহার উপরে আবার বহুকালের সংস্কারবদ্ধ পরশ্রী-কাতরতা। নিতান্ত ১৫৲ কি ২০৲ টাকা বেতনেরও আমাদের একজন ভদ্র শ্রেণীর কলম ব্যবসায়ী কর্ম্মচারীর একটি চাকর ভিন্ন চলেনা—সে চাকর

চাষা শ্রেণী হইতেই আমরা পাইয়া থাকি। চাষ কার্য্যে লাভ না হইলেই আমাদের চাকর পাইবার পক্ষে সুবিধা। চাষে লাভ হইলে চাষা সমান কি আমাদের অপেক্ষা বড় হইয়া পড়ে। আর সে আমাদিগকে তাহার পূর্ব্বপুরুষদিগের মত বিনয়ের সহিত অভিবাদন করিতে চায় না, সে আমাদের অনেকের চক্ষুশূল হইয়া পড়ে। এস্থলে বৃহদারণ্যক উপনিষদের একটা কথার উল্লেখ করিতেছি। "সংসারে যেমন বহু গবাশ্বাদি পশু একজন লোকের ভোগ্যবস্তু হয়, সেইরূপে এক এক জন মানুষ বহু পশুস্থানীয় হইয়া দেবতাদিগেরও ভোগ্যবস্তু হইয়া থাকে। বহু পশু থাকা সত্ত্বেও যেমন একটী গো কি অশ্ব অপহৃত হইলে আমাদের কষ্ট হয় অনেক-গুলি অপহৃত হইলে ত কথাই নাই—সেইরূপ দেবতাদিগেরও ইহা প্রীতিকর হয় না যে মানুষেরা ব্রহ্মাত্মজ্ঞান লাভ করিয়া দেবগণের দাসত্ব হইতে মুক্ত হয়।"* আমাদের দেবতাগণেরই যখন এই অবস্থা তাহাদের অপেক্ষাও অধিক মাত্রায় উদারতা প্রদর্শন আমাদের পক্ষে কিরূপে সম্ভব হইবে? কৃষক শ্রেণী শূদ্র চণ্ডালাদি আমাদের মৌরূষি গবাশ্বাদিস্থানীয় ভোগ্যবস্তু।† ইহারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া আমাদের সমকক্ষ হইবে ইহা কি করিয়া সহ্য করা যায়? বিদেশীয় বণিকদের ত দূরের কথা। তাহাদের অনুদারতাও আমাদের গরীব পাটের চাষার উন্নতি পথের অন্তরায়। এই শোন, বিদেশী পাটের বণিক আর্ত্তনাদ‡ করিতেছে; "পাট চাষ সম্বন্ধে প্রধান কথা এই যে ইহা সম্পূর্ণই চাষার ইচ্ছাধীন। কার্য্যতঃ চাষা জমির মালিক এবং বাজারের টান দৃষ্টে সে পাট চাষের হ্রাসবৃদ্ধি করিয়া থাকে এবং লাভটা নিজের হাতেই রাখে।" আহা! কি গুরুতর অপরাধ! তাহার নিজের পরিশ্রম-জনিত লাভটা তোমাকে আমাকে বিলাইয়া না দিয়া নিজেই গ্রহণ করে! যাহা হউক, কথাটা যদি সত্য হইত আমরা বলিতাম 'তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক'। অপরাধের উপরে অপরাধ! বাজারের টান বুঝিয়া সে পাট চাষের হ্রাস বৃদ্ধি করে। বাজারে উপযুক্ত মূল্যে বিক্রি না হইতে পারে এই পরিমাণ পাট চাষ করিয়া চাষা কেন ক্ষতিগ্রস্ত হয় না! রাশি রাশি পাট কেন তাহার ঘরে খরিদদারের অভাবে নষ্ট হইয়া যায় না! বিদেশীয় সওদাগরের এ অভিযোগও যদি সত্য হইত—আমরা প্রসন্ন মনে স্বস্তি উচ্চারণ করিতাম। আমাদের দেশে পাটের আগামী সনের আমদানী (Supply) সম্বন্ধে পূর্ব্বাভাস (Forecast) দিয়া বিদেশীয় পাটের বণিকদের সাহায্যকল্পে আমাদের সহৃদয় গবর্ণমেণ্ট যে পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন, যদি বিদেশের বাজারে আগামী সনের পাটের প্রয়োজনীয়তা (Demand) সম্বন্ধে সেইরূপ পূর্ব্বাভাস (Forecast) দিয়া আমাদের চাষাদের সাহায্যের জন্য তাহার শতাংশের একাংশও অর্থ এবং পরিশ্রম ব্যয় করিতেন—এবং পাটের চাষারা বাজারে আগামী সনে পাটের দর কত হইতে পারে অথবা

* যথা হবৈ বহবঃ পশবো মনুষ্যং ভুঞ্জ্যুরেবমেকৈকঃ পুরুষো দেবান্ ভুনক্ত্যেকস্মিন্নেব পশাবাদীয় মানে ই প্রিয়ং ভবতি কিমু বহুষু।" তস্মাদেষাং তন্ন প্রিয়ং যদেতন্মনুষ্যা বিদ্যুঃ ॥
১০।৪ব্রাহ্মণং। বৃহদারণ্যক ॥

† শূদ্রন্তু কারয়েদ্দাস্যং ক্রীতমক্রীতমেববা। দাস্যায়ৈব হি সৃষ্টো হসৌ ব্রাহ্মণস্য স্বয়ম্ভুব। ॥৪১৩॥ ন স্বামিনা, নিসৃষ্টোঽপি শূদ্রো দাস্যাদ্ বিমুচ্যতে। নিসর্গজং হি তত্তস্য, কস্তস্মাৎ তদপোহতি ॥৪১৪। মনু অ ৮॥ শক্তেনাপি হি শূদ্রেণ ন কার্য্যো ধন সঞ্চয়ঃ। শূদ্রোহি ধনমাসাদ্য ব্রাহ্মণানেব বাধতে ॥১২৯। অ ১০॥ মনু

‡ "The chief characteristic of the cultivation (of Jute) is that it remains entirely under the control of the cultivator. Practically a peasant proprietor, he increases or decreases his cultivation according to the state of the market, and keeps the profit in his own hands." India p. 749 Encyclopœdia Brittannica. Vol. XII.

কি পরিমাণে পাট বিদেশের বাজারে দরকার হওয়ার সম্ভব তাহা অণুমাত্রও বুঝিতে পারিত, তবে আর চাষাদের পাটের চাষ বর্ত্তমান অন্ধকারে ঝম্প প্রদানের অবস্থায় থাকিত না। এইজন্য আমাদের বাঙ্গালদেশের কথায় বলে "হৈলে নাল্যা—না হৈলে হাল্যা"। যাহা হউক এই সকল নানা কারণে পাটের চাষার ব্যয় বা লাভ ক্ষতির হিসাব বিষয়ে বিশেষ সহৃদয়তা এবং উদারতার পরিচয় পাওয়ার আশা কম।

পাট চাষের দৈনিক মজুরী।

পাট চাষের খরচ কত পড়ে? একটী একটী করিয়া আমরা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিব। একথা বলা বাহুল্য যে দেশ কাল অনুসারে খরচের অনেক তারতম্য হয়। পাটপ্রধান পূর্ব্ববঙ্গকেই পাটের খরচ সম্বন্ধে আদর্শ করা কর্ত্তব্য। পাট চাষের প্রথম খরচ মজুর মুনিস বা কুলির বেতন। সচরাচর দেখা যায় যাহারা পাট চাষের খরচ হিসাব করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, তাহারা যদৃচ্ছাক্রমে কেহ তিন আনা, কেহ চারি আনা, কেহ বা নিতান্ত কৃপাপরবশ হইয়া পাঁচ আনা পর্য্যন্ত দৈনিক মজুর খরচ ধরিয়া পাট চাষের লাভ দেখাইয়া থাকেন। একথা মনে রাখা কর্ত্তব্য যে আমেরিকা প্রভৃতি সভ্য দেশেও পাট চাষ আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু উপযুক্ত মজুরের অভাবে তথাকার লোক পাটের আঁস প্রস্তুত করিতে পারিতেছে না। পাটের মজুরী তত সহজ মজুরী নয়। পাট সম্বন্ধে বাঙ্গালার বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের বর্ত্তমান প্রাধান্য আমাদের মজুরদের শ্রেষ্ঠতার উপরেই বিশেষ ভাবে নির্ভর করে। সকল শ্রেণীর মজুর দিয়া পাটের কার্য্য চলে না। অর্দ্ধভুক্ত পশ্চিমা বা উড়িয়া কুলির দ্বারা পাটের মজুরী চলিবে না। অর্দ্ধভুক্ত মজুরের পেটের ক্ষুধা তাহার হস্ত পদ সঞ্চালনের শিথিলতাতেই প্রকাশ হইয়া পড়ে। হাত ত্রস্ত কার্য্য করিতে চায় না, পা ত্রস্ত চলিতে চায় না, পাছে মা ধরিত্রীর গায়ে চোট্ লাগে। সর্ব্বাঙ্গ নিস্তেজ নির্ব্বীর্য্য। জলে নামিতে বা বৃষ্টিতে ভিজিয়া কার্য্য করিতে মন উঠে না। বিনা বেতনে পাইলেও এরূপ লোক দ্বারা পাটের চাষ চলিতে পারে না। পাটের চারাগাছ যখন আধ হাতেরও কম উচ্চ, তখন হয়ত সারা দিন রাত্রি বৃষ্টি হইয়া রাত দুইটার সময় ক্ষেতে জল জমিয়া চারাগাছগুলি ডুবিয়া গিয়াছে—হয়তঃ দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে জল বাহির করিয়া না দিলে ক্ষেত মারা যাইবে। অর্দ্ধভুক্ত নিরুদ্যম কুলি হয়ত তাহার খবরও লইবে না। যায় যাবে গৃহস্থের—তার নাকের ডাক কেন সেইজন্য বন্ধ হইবে। হয়ত গৃহস্থ ভয়ে শয্যা ছাড়িয়া মধ্য রাত্রে সেই অর্দ্ধভুক্ত কুলিকে ডাকিতেছে, অনেক ডাক হাঁকের পর হয় ত কুলি তাহার নাকের ডাক বন্ধ করিয়া অর্দ্ধ নিদ্রিত অবস্থায় উত্তর করিল "হাম ক্যা করে" এবং আবার পাশ ফিরিয়া শুইল। এদিকে হয় ত হাজা লাগিয়া পাটের দফা শেষ। আবার জলে নামিয়া সারাদিন জলে থাকিয়াই পাটের আঁস ছাড়াইতে হয়। অনেক স্থলেই ডুব দিয়া পাট কাটিতে হয়। অর্দ্ধভুক্ত উড়িয়া কি বেহারী কুলি দ্বারা এ সকল কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে না। ইংরেজদের সম্বন্ধে একটী প্রচলিত কথা আছে। "যদি একজন ইংরাজের মনে স্থান পাইতে চাও তবে তাহার মুখের ভিতর দিয়া প্রবেশ কর" * অর্থাৎ তাহার ভাল খাবার বন্দোবস্ত কর। মানুষ মাত্রেরই সম্বন্ধে একথা কথঞ্চিৎ ঠিক কিন্তু আমাদের পূর্ব্ববঙ্গের মজুর সম্বন্ধে একথা অত্যন্ত ঠিক। তুমি না জানিতে পার কিন্তু পাটের গৃহস্থ বেশ জানে যে

* "The way to an Englishman's heart is through his mouth."

মজুরের পেটে ভাত না থাকিলে তাহার দ্বারা উপযুক্ত মত পাটের কার্য্য চলে না এবং জানে বলিয়া অধিকাংশ স্থলেই সে বাড়ীতে যত্নের সহিত আপনার মজুরদিগকে কার্য্যের সময় খাওয়াইয়া থাকে।

চুক্তিদ্বারা পাট চাষ করাইলে খরচ অনেক কম হয় কিন্তু "সস্তায় পস্তায়" একথা পাটের বেলায় যতদূর সত্য এমন আর কিছুতেই নয়। যে করাইয়াছে সেই জানে যে চুক্তির মজুর ঠিক্ সময় মত মিলে না—আবার মিলিলেও উপরভাসা কার্য্য করিয়া হিসাব মত পয়সাটি লইয়া চলিয়া যায়। কয়েক মাস পরে, ফসল উঠিলে পর গৃহস্থ উৎপন্ন আঁসের পরিমাণ দেখিয়া চুক্তির কার্য্যের নিষ্ফলতা উপলব্ধি করিয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া আপনার কপালকে ধিক্কার দিবেন। আমাদের পরিচিত কোন কলেজের অধ্যাপকের বেতন বৃদ্ধি লইয়া কথা হইতেছিল—তখন তিনি বলিয়া ছিলেন, "।০ চারি আনার চণ্ডীও জানি, ✓০ চারি পয়সার চণ্ডীও জানি"। আমাদের মজুরদেরও ঠিক এই কথা—তারা ৸০ বার আনা রোজের মজুরিও জানে, ।০ চারি আনা রোজের মজুরিও জানে। বেতন যেরূপ দিবে কার্য্যও সেই অনুপাতেই পাইবে। আমাদের যত কৃষি-পরীক্ষা ক্ষেত্র দেখিতেছ, তাহাদের কোনটাই লাভ সম্বন্ধে পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইতেছে না এমন কি পরীক্ষা দিতেও সাহসী হইতেছে না। সর্ব্বত্রই ক্ষতি দিয়া বৈজ্ঞানিক কৃষিপরীক্ষা সকল চলিতেছে। তাহাদের পক্ষে চুক্তির কার্য্য করাইয়া খরচ কম দেখান সহজ—কারণ যে ক্ষতিটা হয় তাহা তাহাদের কাহারও গায় লাগে না। "লাগে কড়ি দিবে গৌরীসেন"। পূর্ব্ব বঙ্গের যে সকল অংশ পাটের জন্য বিখ্যাত—সে সকল স্থানে পাটের কৃষকেরা প্রচলিত দর দৃষ্টে পাটের খন্দে বিশেষতঃ জো লাগিলে মজুরদিগকে গড়ে দৈনিক ॥০ আট আনা হইতে ১৲ এক টাকা পর্য্যন্ত হারে বেতন দিয়া থাকে। তাহার উপরে আবার দুইবেলা বেশ এক এক পেট ভরিয়া খাইতে দেয়; একবার প্রাতে ৮টা কি ৯টার সময়, আবার মধ্যাহ্নে ১—২টার সময়। এইরূপে দৈনিক বেতনের উপরেও আবার খোরাকির জন্য কৃষককে প্রত্যেক মজুরের উপরে তিন চারি আনা রোজ খরচ করিতে হয়। গৃহস্থ হয় ত আপনার গোলার চাউল খরচ করে বলিয়া তাঁহা হিসাবেই ধরে না। কিন্তু তুমি আমি যাহারা কিনিয়া খাই, তাহারা পাটের চাষ করাইতে গেলে এই খোরাকি খরচটাও বেশ একটু গায়ে লাগিত। কৃষক জানে যে চুক্তিতে কার্য্য করাইলে হয়ত তাহার অর্দ্ধেক খরচেই চলিত, কিন্তু আমাদের আদর্শ কৃষি ক্ষেত্রাদির মত তাহারও লাভ ক্ষতির দিকে অন্ধ হইলে চলিবে না। চৈত্র হইতে ভাদ্র সাধারণ ভাবে এই ছয় মাস পাটের খন্দ ধরা যায়। এই খন্দ মধ্যে যখনই কার্য্যের 'জো' বা 'জুকা' লাগিয়া উঠে, তখন নিতান্ত কম পক্ষেও গৃহস্থকে প্রতি মজুরের উপরে গড়ে ৸০ বার আনা রোজ খরচ করিতে হয়। 'জো' না লাগিলে হয়ত খন্দের মধ্যেও মজুরের হার অনেক কম থাকে। পাটের মজুরি আদালতের পেয়াদাগিরি কি পুলিসের কনষ্টেবলি নয়, এমন কি সবজি চাষের মালিগিরিও নয়। কোন প্রকার উপরি আয়ের আশা নাই, পাটও খাদ্য শস্য নয়।

পাটের খন্দে গড়ে ৸০ বার আনা মজুরের রোজ কেহ বেশী মনে করিবেন না। একবার ভাবিয়া দেখুন একটা লোকের অতি সামান্য রকমে খাইতে কত লাগে। জেলে * দেশীয় কয়েদির জন্যও

*See Jail Rules Sections 872, 879 and 880. The daily ration for laboring convicts is given as

স্থলভেদে ৶০ আনা হইতে ।৶০ আনা পর্য্যন্ত রোজ খোরাকি ধরা হয়। যদি পাটের চাষে কৃতকার্য্য হইতে ইচ্ছা কর, সর্ব্বাগ্রে মজুর ও গরুগুলিকে পূর্ণ মাত্রায় খাইতে দেও। দেখিবে কার্য্যের বেলা তোমার মজুরের হাত পা ত্রস্ত চলিতেছে; কার্য্যটীও পাকাপোক্ত হইতেছে। অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া গৃহস্থের যাহাতে ক্ষতি না হয় মজুরেরা সেইরূপ কার্য্য করিতেছে। অতিবৃষ্টি হইলে সময় বুঝিয়া গৃহস্থের জানিবার পূর্ব্বেই হয়ত নালা কাটিয়া জল সরিবার উপায় করিয়া রাখিয়াছে, অথবা প্রয়োজন হইলে রাত্রিতে ভিজিয়া মালিকের কার্য্য সাধন করিতেছে। এরূপ না হইলে পাটের চাষ অসম্ভব। কৃষক তোমার কৃপা চায় না। তোমার কৃপা তোমারই থাকুক। কৃষক নিজে, তাহার মজুর এবং তাহার গরু পেট ভরিয়া খাইবার দাবি করিতেছে। একজন সুস্থ কর্ম্মী কৃষক, কি তাহার মজুরকে পূর্ণ মাত্রায় পরিশ্রমের উপযোগী করিয়া পেট ভরিয়া খাওয়াইতে হইলে তিন বেলায় তাহার দৈনিক পৌনে দুই সের কি দুইসের চাউলের প্রয়োজন। /১৫ সাত পয়সা কি ৶০ দুই আনা সের হিসাবে তাহারই দাম ৵০ তিন আনা কি ।০ চারি আনা। তাহার উপকরণ ডাইল ছয় ছটাক বা তাহার পরিবর্ত্তে মৎস্যাদি। ডাইলের সের সাড়ে তিন আনা কি চারি আনা হিসাবে কম পক্ষে প্রায় /০ এক আনা। তদ্ভিন্ন নুন, তেল, কাঠ, মসলা প্রভৃতিতেও /০ এক আনা লাগিবে।

Rice 11 chtks, Dal 3 chtks, vegetables 3 chts, oil $\frac{1}{2}$ chtk, salt $\frac{5}{16}$ chtk, condiment $\frac{1}{8}$ chtk, tamarind (edible part) $\frac{1}{8}$ chtk, and firewood $\frac{1}{2}$ seer. Also meat (excluding bones) or fish (excluding scales, fins, etc.) 2 chtks 4 times a week in case of loss of weight and some dahi occasionally. The average daily cost would come to about 5 annas.

এইরূপে দেখা যায় যে একজন পাটের মজুরের দৈনিক খোরাকি খরচই ।/০ পাঁচ আনার কমে হয় না। ইহার সহিত উল্লিখিত জেলের কয়েদিদের খাদ্য তালিকার তুলনা করিলে দেখিতে পাইবে যে বেশি ধরা হয় নাই। সকল দিন কর্ম্ম মিলে না। কখনও বা শরীর কাতর থাকে। কাপড় এবং শীত বস্ত্রেরও প্রয়োজন। নিতান্ত দিগম্বর হইলে চলে না। হয়ত ঘরে স্ত্রী আছে, দু একটী শিশু আছে, হয়ত বৃদ্ধা জননীও আছেন। সারাবৎসরে পাটের খন্দ এবং ধানের খন্দই মজুরদের রোজগারের সময়। এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া বলিতে পার না যে ৸০ বার আনা রোজ তাহার পক্ষে বেশী ধরা হইয়াছে। তোমার খানসামা কি বাসার চাকরটীর কথা ভাবিয়া দেখ। তাহার উপরে মাসে তোমার কত পড়ে? ৬৲ ছয় টাকা বেতন, তার উপরে তিন বেলা খোরাক, তাও তোমার নিজের খাওয়ারই মতন। খোরাকি খরচ মাসিক ৭৲ সাত কি ৮৲ আট টাকার কম পড়িবে না, তদ্ভিন্ন বাজারের উপরি রোজগারও হয়ত দুই চারি টাকা পড়ে। প্রায় মাসিক ১৫৲।২০৲ টাকা বান্ধা বেতন। বেকার বসিয়া থাকিতে হয় না। পাটের মজুর অপেক্ষা তোমার খানসামাজির কর্ম্ম কত হালকা। যদি তুমি বেতন কম দিয়া কঠিন শাসন এবং তত্ত্বাবধান দ্বারা পাটের চাষ চালাইতে আশা কর তবে তুমি নিতান্ত ভ্রমান্ধ। এই সকল নানাদিক আলোচনা করিয়া আমরা ৸০ আনা রোজ হিসাবে পাটের মজুরী ধরিতে বাধ্য হইলাম।

হালের খরচ।

পাট চাষের দ্বিতীয় খরচ হালের খরচ। মজুর সম্বন্ধে যে কথা হাল সম্বন্ধেও প্রায় সেই কথা। যাহারা ভালরূপে পাটের চাষ করে তাহারা নিজের

হাল গরু দিয়াই চাষ করে। হাল গরু ভাড়া করিয়া চাষ করা যায় বটে কিন্তু পাটের খন্দে জো লাগিলে ঠিক সময়মত হাল গরু ভাড়া পাওয়াই অসম্ভব। তদ্ভিন্ন ভাড়া করা হাল গরু দ্বারা কার্য্যও সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না এবং ঠিক সময় মত কার্য্যটী না হওয়াতে হয়ত একবারের কার্য্য দুই-বার করিতে হয় এবং খরচ দ্বিগুণ লাগিয়া যায়। হাল সম্বন্ধে হয়ত অনেকে জানেন না একটা হাল চালাইতে কয়টা গরু লাগে। এ সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রের ব্যবস্থা * অতিশয় সমীচীন। তাহা এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে। "ধার্ম্মিক লোক আট গরুতে এক হাল চালাইবেন—সাধারণতঃ লোকে ছয়টী গরুতে এক হাল চালাইয়া থাকে—নিষ্ঠুর লোকেরা চারিটী গরুতে এক হাল চালায়—আর গো ঘাতকেরা দুই গরুতেই এক হাল চালায়। —এক প্রহর পর্য্যন্ত হইলে দুই গরুতে হাল চালাইবে। দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত হইলে চার গরুতে হাল চালাইবে। তিন প্রহর পর্য্যন্ত হইলে ছয়টী গরু আর সারাদিন চালাইতে হইলে আটটী গরু দিয়া চালাইবে।" অত্রি সংহিতা ২১৮-২১৯॥ আজ কালের ব্যবস্থা নৃশংসেরই ব্যবস্থা—। ২টী গরু দিয়া সচরাচর একজন লোক ৬টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত হাল চালাইয়া থাকে। তাহা ধরিয়াই আমাদের হিসাব করিতে হয়। ভাড়া করিতে গেলে, মজুরের দরের মত হালের ভাড়াও মাসে মাসে পরিবর্ত্তিত হয়। পাটের খন্দে বিশেষতঃ 'জো' পড়িলে হালের ভাড়া অনেক বেশী হয়। তখন ৸৹ বার আনা রোজের কম একটী হাল (২টী গরু এবং একজন মানুষ এক বেলা) পাওয়া যায় না। জো না থাকিলে অনেক সময় গরুগুলিকে বসাইয়া খাওয়াইতে হয়—এজন্য তখন হয়ত আট আনা এমন কি ।৶৹ ছয় আনাতেও একটী হাল পাওয়া যায়। তবে 'জো' চলিয়া গেলে, সস্তায় হাল ভাড়া করিয়া পাটের চাষের কোন সুবিধা নাই। এজন্য পাটের চাষের হাল ভাড়াও আমাদিগকে রোজ ৸৹ বার আনা করিয়াই ধরিতে হইতেছে। দুটী গরুর খোরাকী খরচটা ধরিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে বেশী ধরা হয় নাই।

গরুর খাদ্য সম্বন্ধে জর্ম্মানি ও আমেরিকা নানাপ্রকার পরীক্ষা দ্বারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে তাহাই সংক্ষেপে এ স্থলে উল্লেখ করিতেছি। বার মণ (1000 lbs. liveweight) ওজনের একটী গরু দ্বারা কঠিন পরিশ্রম করাইতে হইলে তাহার খাদ্যের মধ্যে জলীয় ভাগ বাদে মোট শুষ্ক পদার্থ ১৪ সের এবং তন্মধ্যে সহজ পাচ্য সোরাজান মূলক পদার্থ (Digestible Proteids) শত করা ২·৮ ভাগ, সহজ পাচ্য অঙ্গারজান পদার্থ (Digestible carbohydrates) শত করা ১৩ ভাগ তৈল পদার্থ (Ether retract) ৮ ভাগ থাকা আবশ্যক। তদ্ভিন্ন ১ ভাগ সোরাজান মূলীয় পদার্থের অনুপাতে ৫·৩ ভাগ অঙ্গারজান পদার্থ থাকা আবশ্যক (nutrient ratio)। গরু ওজন করিবার আমাদের সুবিধা নাই। এই জন্য ওজন দৃষ্টে গরুর আহার ঠিক করিয়া আমাদের দেশে চলা কঠিন। আমাদের দেশীয় ছোট গরু ওজন পাঁচ মণ ধরিয়া হিসাব

* অষ্টাগবং ধর্ম্মহলং ষড়্গবং ব্যবহারিকং। চতুর্গবং নৃশংসানাং দ্বিগবং গব্যবধকৃৎ ॥২১৮॥ দ্বিগবং বাহয়েৎ পাদং মধ্যাহ্নং তু চতুর্গবং। ষড়্গবং তু ত্রিপাদোক্তং পূর্ণাহস্তু ষড়্ভিঃ স্মৃতং ॥২১৯॥ অত্রি॥ হলমষ্টাগবং ধর্ম্ম্যং ষড়্গবং জীবিতার্থিনাং। চতুর্গবং নৃশংসানাং দ্বিগবঞ্চ জিঘাংসিনাং ॥২৩-অ ১-আপস্তম্ব॥ হলমষ্টাগবং ধর্ম্ম্যং ষড়্গবং মধ্যমং স্মৃতং চতুর্গবং নৃশংস্যানাং দ্বিগবং বৃষঘাতিনাং ॥২॥ ক্ষুধিতং তৃষিতং শ্রান্তং বলীবর্দ্দং ন যোজয়েৎ। হীনাঙ্গং ব্যাধিতং ক্লীবং বৃষং বিপ্রো ন বাহয়েৎ ॥৪॥ স্থূলাঙ্গং নীরুজং দৃপ্তং বৃষভং ষণ্ডবর্জ্জিতং। বাহয়েদ্দিবসস্যার্দ্ধং পশ্চাৎ স্নানং সমাচরেৎ ॥৫॥ অ-২ বৃহস্পতি সংহিতা॥

করিলে দেখা যায় তাহার দ্বারা কঠিন পরিশ্রম করাইতে হইলে খড় /৬ সের, খৈল /১॥০ দেড় সের, ডাল /॥০ আধসের ও গমের ভুষি /॥০ আধ-সের করিয়া খাইতে দিতে হয়। খড়ে শতকরা ১০ কি ১২ ভাগ জল বাদ দিয়া /৫ সের স্থলে আনুমানিক /৬ সের ধরা গেল। খড় না দিয়া যদি কাঁচা ঘাস দেওয়া হয় তবে তাহারও শতকরা ৮০ ভাগ জল বাদ দিয়া ধরিতে হয়। তাহাতে /৫ সের শুষ্ক পদার্থ দিতে গেলে প্রায় আধ মণ ঘাস দিতে হয়। খরচ প্রায় সমান। যাহা হউক হিসাবের সুবিধার জন্য শুধু খড় /৬ সের ও খৈল /১॥০ দেড় সের যাহা সচরাচর গৃহস্থেরা গরুকে দিয়া থাকে, তাহা ধরিয়া হিসাব করিলেই দেখা যায় একটী হালের গরুকে কলিকাতার বাজার দরে কাটা খড় /৬ সের ৴১০ দুই পয়সা সের হিসাবে দিতে গেলে তিন আনা লাগে এবং /০ এক আনা সের হিসাবে /১॥০ সের খৈলে /১০ ছয় পয়সা লাগে। মোট ।১০ সাড়ে চারি আনা খোরাকি দিতে হয়। দুইটী গরুতে ॥/০ আনা দিতে হয়। তদ্ভিন্ন একজন লোকেরও এক বেলায় ।৵০ ছয় আনা দিতে হয়। এইরূপে দেখা যায় ৸৶০ পনর আনা রোজের কমে হালের খরচ পোষায় না। তবে মফঃস্বলে অনেক স্থলে কোন কোন খাদ্য বস্তুর মূল্য কম হইতে পারে অথবা অপর যে কোন কারণেই বল, একটী হালের খরচ কোন ক্রমেই ৸০ বার আনা রোজের কম ধরা যায় না। গরু কিনিতে যে ১০০৲ শত টাকা মূলধন লাগিয়াছিল, তাহার সুদও এস্থলে ধরা গেল না।

পাট চাষের মোট খরচ।

এখন দেখা যাউক এক বিঘা জমিতে পাটের চাষ করিতে মোটের উপর কত খরচ পড়ে। ৮০ হাত লম্বা এবং ৮০ হাত চৌড়া (৮০ × ৮০ = ৬৪০০ বর্গহাত) একখণ্ড ভূমি এক বিঘা। বিঘার মাপ দেশীয় কৃষকদের মধ্যে চলন নাই। তাহাদের মধ্যে কানির মাপই চলন। কিন্তু কানির মাপ দেশ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন। কোথায়ও বা ৭ হাতি নলের ১৪ নল দীর্ঘ এবং ১২ নল প্রস্থ (৯৮ × ৮৪ = ৮২৩২ বর্গ হাত) ভূমি খণ্ড এক কানি। কোথায়ও বা ১২ নল দীর্ঘ ১০ নল প্রস্থ (৮৪ × ৭০ = ৫৮৮০ বর্গ হাত) ভূমি-খণ্ড এক কানি। আবার কোথাও বা ঐরূপ ৩ (কর্ষা) কানিতে এক (সাহি) কানি হয়। বিঘা যদিও কোন দেশের কানি হইতে কিঞ্চিৎ বড় এবং কোন দেশের কানি হইতে কিঞ্চিৎ ছোট, বিঘার মাপ সর্ব্বত্রই এক। বিঘার হিসাব হইতে কানির হিসাব করাও সহজ।

একখণ্ড জমিতে কতবার লাঙ্গল করিলে তাহা পাটের চাষের যোগ্য হইতে পারে তাহা প্রধানতঃ ঐ জমীর মাটীর উপরে নির্ভর করে। বেলে মাটীতে ৫।৬ বার হাল দিলেই চলে। দোয়াঁস মাটীতে ৭।৮ বার হাল দেওয়া প্রয়োজন হয়। আটাল মাটীতে হয়ত ১০ দশবার হাল না দিলে চলে না। 'জো' হইলে, অর্থাৎ অতিরিক্ত শুষ্ক হইয়া কঠিন না হইলে, আটাল মাটিতেও হাল কম লাগে। ভদ্র-লোকেরা এবং অপর অনেক যাহারা নিজের হাল গরু রাখে না—চুক্তির খরচে পাটের হাল চাষ করাইয়া থাকেন। দেশভেদে কি মাটিভেদে ৪৲ ৫৲ চারি পাঁচ টাকাতে জমীটা লাঙ্গল করিয়া বুনিবার উপযুক্ত করিয়া দেয়। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি যে চুক্তির কার্য্যে খরচ কম হইলেও তাহা পাট চাষের উপযোগী হয় না। আবার ঠিক 'জো' মত চুক্তির হাল পাওয়া যায় না, কারণ কৃষক কখনও নিজের জমির কার্য্য শেষ না, করিয়া পরের জমির চুক্তি গ্রহণ করিবে না। ইতিমধ্যে হয়ত 'জো'

চলিয়া গিয়াছে। অর্দ্ধ ফসল মাত্র লইয়া ভাগে জমি চাষ করার ন্যায় নিতান্ত দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তি ভিন্ন কেহই বিনা লাভে কিম্বা ক্ষতি দিয়া চুক্তিতে আবদ্ধ হইবে না—অথবা আবদ্ধ হইলেও উপরভাসা কার্য্য করিয়া মালিককে ঠকাইবে। এই সকল কারণে চুক্তির হাল কখন পাট চাষের উপযোগী হইতে পারে না এবং আমরা কোন ক্রমেই চুক্তির চাষকে হিসাবের মধ্যে গণ্য করিতে পারি না। হিসাবের সুবিধার জন্য আমরা মাঝামাঝি ৮ বার হাল দেওয়াই প্রয়োজন ধরিয়া লইতেছি। আবার হাল দেওয়াও অনেক রকম আছে—উপরভাসা চালাইলে একদিনে দুই বিঘাও লাঙ্গল করা যায়—এবং ভালরূপ গভীর করিয়া চালাইলে, একহালে এক বিঘা সম্পূর্ণ করিতেও ২ দিন লাগে। সুস্থ সবল গরুরদ্বারা যে পরিমাণ জমি একদিনে ভালরূপ চাষ করা যায় অর্দ্ধভুক্ত, রুগ্ন, দুর্ব্বল গরুদ্বারা তাহার অর্দ্ধেক জমিও হয় না। আবার জমি দীর্ঘকাল পতিত থাকিলে লাঙ্গল খরচ বেশী লাগে। এজন্যই রবিশস্য উঠিয়া যাওয়া মাত্র পাটের প্রথম চাষ দিতে হয়। তদ্ভিন্ন প্রথম দুই একবার লাঙ্গল করিতে যে পরিশ্রম হয় ও সময় লাগে তাহার পরে তাহা অপেক্ষা অনেক কম লাগে। প্রথমবারে লাঙ্গল করিয়া মৈ দিতে হয় না—তাহার পরে প্রত্যেক লাঙ্গলের পর একবার মৈ দিতে হয়। তৃতীয় কি চতুর্থ চাষের পরেও যদি জমিতে শক্ত শক্ত ডেলা দেখা যায় তবে তাহা মুগুরে পিটিয়া ভাঙ্গিয়া দিতে হয় এবং জমির কোণগুলি কোদাল দিয়া সমান করিয়া কাটিয়া দিতে হয়। শেষ চাষের সময় জমি সম্পূর্ণ আগাছা শূন্য করিতে হয়। হিসাবের সুবিধার জন্য এই সমস্ত কার্য্যের পৃথক্ পৃথক ব্যয় না ধরিয়া, মোটামুটি এই ধরিয়া লইতে হইতেছে যে একহালে গড়ে একদিনে একবিঘা জমি সমস্ত আনুসঙ্গিক কার্য্য-সহ লাঙ্গল দিতে পারিবে। ইহাও ধরিয়া লইলে অন্যায় হইবে না যে লাঙ্গল করিতে যে সময় লাগে—বিদে বা আচড়া চালাইতে তাহার এক চতুর্থাংশ সময় লাগিবে। পাটের জমিতে দুইবার করিয়া আচড়া দেওয়াই যথেষ্ট। বীজ প্রতি বিঘাতে সওয়া সের করিয়া ধরা যায়। একজন মজুর এক-দিনে ৩ বিঘা জমিতে বীজ বুনিয়া একবার মৈ দিয়া বীজ ঢাকিয়া দিতে পারে। বীজের মূল্যসহ বিঘাপ্রতি বুনিবার খরচ ৷৷৹ আট আনা ধরা যায়। যাহা হউক পাটের প্রধান খরচ বাছাই ও নিড়ানির মজুরি। জমির অবস্থানুসারে এই মজুরি খরচের অনেক তারতম্য হয়। বীজ বুনিবার পর, পাটের চারাগাছ ছোট থাকিতেই যদি বৃষ্টি হয়, তখন আগাছার বীজগুলি অঙ্কুরিত হইয়া এত সতেজে বর্দ্ধিত হইতে থাকে যে পাটের চারাগুলি যেন না খাইতে পাইয়া নির্জ্জীব হইয়া পড়ে। সেই অবস্থাতে একবার বাছাই ও নিড়ানি করিতে বিঘাপ্রতি ১০।১৫ জন লোকের কমে হয় না। আবার বীজ-বোনার পর বৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে যদি পাটের চারাগুলি অপেক্ষাকৃত বড় হইয়া পড়ে, তখন বৃষ্টি হইলে পর পাটগাছগুলি এত সতেজে বর্দ্ধিত হইতে থাকে যে আগাছাগুলিই তখন যেন না খাইতে পাইয়া নির্জ্জীব ও মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে। ঐ একবিঘা জমিতে তখন বাছাই ও নিড়ানি করিতে ৫ পাঁচজন মজুরই যথেষ্ট। আবার কখনও বা জমি প্রস্তুতের পর এবং বীজ বুনিবার পূর্ব্বে বৃষ্টি হইয়া আগাছা-গুলি সতেজে অঙ্কুরিত হয়। তখন মাটি কথঞ্চিৎ শুকাইলে পর একবার লাঙ্গল করিয়া মাটি উল্টাইয়া আগাছাগুলি মারিয়া ফেলিয়া মৈ দিয়া সমান করিয়া বীজ বুনিলে বাছাই ও নিড়ানি খরচ আরও কমিতে পারে। যাহারা চুক্তিতে পাট চাষ করায়

তাহাদের পক্ষে এ সকল সুবিধা পাওয়া কঠিন। কারণ ঠিক সময় মত চুক্তির লোক পাওয়া যায় না —কেহই নিজের কার্য্য শেষ না করিয়া চুক্তি গ্রহণ করিবে না—হয়ত তখন 'জো' চলিয়া গিয়াছে। যাহা হউক হিসাব সহজ করিবার জন্য আমরা প্রথম বারের বাছাই ও নিড়ানি কার্য্যে ৮ জন এবং দ্বিতীয়বারের বাছাই কার্য্যে ৪ জন মজুর বিঘা প্রতি ধরিতেছি। এ কথা বলা বাহুল্য যে আগাছা বাছাই করিবার সঙ্গে সঙ্গেই পাটের চারাও অনেকগুলি উঠাইয়া দিয়া গাছ পাতলা করিয়া দিতে হয়। সময় মত বিদে বা আচড়া ব্যবহার করিলে হাতের বাছাই ও নিড়ানি কার্য্য অনেকটা হাল্কা হইয়া যায়। আবার সময় মত তাহা না দিতে পারিলে আগাছা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া ঐ খরচ অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। যাহারা হাল গরু ভাড়া করিয়া পাট চাষ করে তাহাদের পক্ষে ঠিক সময় মত বিদে দেওয়া অনেক সময় কঠিন হইয়া পড়ে। দুইবার বিদে এবং সেই সঙ্গে দুইবার হাতে বাছাই দিয়াও যাহা সামান্য অপূর্ণ থাকে, ভাল কৃষকেরা তাহা পূর্ণ করিবার জন্য আরও একবার হাতে বাছাই ও নিড়ানি করে। তাহাতেও বিঘা প্রতি ২ জন লোক লাগিবে। সেই শেষ বাছাই কার্য্য করিবার সময় ক্ষেতের পাট গাছ প্রায় এক হাত পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে। ইহার পর কিছুদিন বিশ্রাম। অবশেষে পাট কাটিবার যোগ্য হইলে পর, পাট কাটিয়া স্তূপ সাজাইয়া জলে ভিজাইতে জমি ভেদে বিঘা প্রতি ৭।৮ জন লোক লাগে। গড়ে ৭ জনই ধরা যায়। পাট পচা শেষ হইলে আঁস ছাড়াইয়া ধুইয়া তুলিতে দেশভেদে খরচের অনেক তারতম্য দৃষ্ট হয়। অনেক স্থলে শুধু বোলাগুলি পাইবার সর্ত্তেই দরিদ্র স্ত্রীলোক এবং বালকেরা বিনা পয়সায় আঁস ছাড়াইয়া থাকে। তখন শুধু ধুইয়া পরিষ্কার করিবার জন্য বিঘাপ্রতি দুই জন লোক ধরিলেই চলিতে পারে। যদি পয়সা দিয়া পাটের আঁস ছাড়াইতে হয় তখন বিঘাপ্রতি আঁস ছাড়াইবার জন্যই ছয় জন ধরা আবশ্যক। এতদ্ভিন্ন রৌদ্র খাওয়াইয়া শুকাইয়া পাটের বস্তা বান্ধিবার জন্যও ৩ জন লোক বিঘাপ্রতি লাগিবে। ফাঁস ব্যবহারের খরচও ধরা আবশ্যক। কৃষকেরা সাধারণতঃ বিঘা প্রতি ৩০।৪০ মণ গোবর সার ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহার অতিরিক্ত গোবরসার পাওয়াই কঠিন। গ্রামদেশে এই সারের মূল্য টাকায় ৮ মণ হিসাবে ৪৲।৫৲ টাকা হয়। বহন খরচ ও সমানভাবে জমিতে ছড়াইয়া দিবার খরচ বিঘা প্রতি ১৲ টাকা ধরা যায়। এতদ্ভিন্ন মালিকের খাজনা খরচও বিঘা প্রতি গড়ে ২৲ দুই টাকা ধরিতে হয়। এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে পাট ক্ষেতে পোকা লাগিলে তাহার প্রতিকারের জন্য গ্রন্থাদিতে যে কেরোসিনের ঘি (Kerosine emulsion) প্রভৃতির ব্যবহারের বিধান দৃষ্ট হয়, তাহার জন্য বিঘাপ্রতি ২৲।৩৲ দুই তিন টাকা খরচ এস্থলে ধরা গেল না। কৃষক সে খরচ করে না, কারণ পাটের চাষে তাহার তত কিছু লাভ হয় না। গায়ে খাটিয়া যতদূর করা যায় তাহার বেশী সে করিতে প্রস্তুত নয়। উপরে আমরা যে সকল খরচ দেখাইয়াছি তাহারই একটি তালিকা করিয়া দিতেছি। পাঠক দেখিতে পাইবেন পাট চাষে মোট খরচ বিঘাপ্রতি প্রায় আটত্রিশ কি উনচল্লিশ টাকা লাগে।

পাটচাষের বিঘাপ্রতি মোট খরচের তালিকা।

১। আটবার লাঙ্গল করা প্রতি লাঙ্গল ৮০ আনা হিঃবে ... ... ৬৲

২। বীজ /১৷ সওয়া সের হিসাবে বুনিয়া মৈ দেওয়ার খরচ ৷৷০
৩। দুইবার বিদে বা আচড়া দেওয়া একবার লাঙ্গল করার অর্দ্ধেক খরচ ... ।৶০
৪। প্রথমবারের হাতের বাছাই ও নিড়ানি খরচ বিঘাপ্রতি আটজন মজুর প্রতি জন ৵০ আনা ... ... ৬৲
৫। দ্বিতীয়বারের হাত বাছাই ও নিড়ানি চারিজন ও শেষ বাছাই দুই জন মোট ছয় জন মজুর জন প্রতি ৵০ আনা হিসাবে ৪৷৷০
৬। পাট কাটা এবং জলে ভিজানি বিঘাপ্রতি সাত জন মজুর জন প্রতি ৵০ আনা হিসাবে ... ... ৫।০
৭। আঁস ছাড়ানি বিঘাপ্রতি ছয় জন মজুর জন প্রতি ৵০ হিসাবে ৪৷৷০
৮। ধুইয়া পরিষ্কার করিতে বিঘাপ্রতি দুই জন শুকাইয়া বস্তা বান্ধিতে বিঘাপ্রতি তিন জন মোট পাঁচ জন মজুর জন প্রতি ৵০ আনা হিসাবে ৩৸০
৯। ফাঁস খরচ বিঘাপ্রতি ৪০ চল্লিশ মণ গোবর সার টাকায় ৮ আট মণ হিসাবে মূল্য ৫৲ টাকা এবং ফেলিবার মজুর ১৲ টাকা ৬৲
১০। খাজনা খরচ বিঘাপ্রতি ২৲ দুই টাকা হারে ... ... ২৲

———

৩৮৸৶০

প্রবাসী।

কৃষিদর্শন—সাইরেন্সেষ্টার কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ কৃষিতত্ত্ববিদ, বঙ্গবাসী কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত জি, সি, বসু, এম, এ, প্রণীত। কৃষক আফিস।



মাঘ—১৩১৬।

পুষায় কৃষির উন্নতি।

ভারত গভর্ণমেণ্ট ও স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট সমূহ হইতে আজকাল যে বিবিধ প্রকারে ভারতীয় কৃষির উন্নতির চেষ্টা হইতেছে তাহার কেন্দ্র স্থল পুষা। পুষায় কৃষি তত্ত্বানুসন্ধানাগার, কৃষি কলেজ ও কৃষি পরিক্ষা ক্ষেত্র এই কয়েকটিই অবস্থিত। কৃষি তত্ত্বানুসন্ধানাগারে ভারতীয় কৃষি বিষয়ক অত্যাবশ্যকীয় তথ্য সমূহের, মৌলিক গবেষণা হইয়া থাকে। সদাশয় মার্কিন ধন কুবের মিঃ ফিপসের প্রদত্ত অর্থ হইতে এই অনুসন্ধানাগারের উৎপত্তি। ইহাতে কৃষি-রসায়ন, কীটতত্ত্ব, ছত্রকতত্ত্ব, জীবাণুতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ক যন্ত্রাগার ব্যতীত একটি প্রাকৃতিক তত্ত্বেরও যন্ত্রাগার আছে। কৃষি কলেজ ১৯০৮ সাল হইতে খোলা হইয়াছে। ইহাতে ইতি পূর্ব্বে ২২টি ছাত্র শিক্ষা করিতেছিল। বিগত বৎসর ১৯টি ছাত্র প্রবেশ লাভ করিয়াছে। কলেজের সংশ্লিষ্ট একটী ছাত্রাবাসও খোলা হইয়াছে ইহাতে ৭০টি ছাত্র অবস্থান করিতে পারে।

পুষা কলেজ একটি সুবিস্তীর্ণ ভূমি খণ্ডের উপর অবস্থিত। উক্ত ভূমি খণ্ডের পরিমাণ ৪৫০০ বিঘা

এবং উহা তিন দিকে গণ্ডক নদী দ্বারা বেষ্টিত। জমিও গভীর পলিমাটি এবং এস্থলে সমস্ত বর্ষাতি ফসল ও উদ্যান জাত ফসল জন্মান যাইতে পারে। পুষা নিতান্ত কৃষিপ্রধান স্থানে অবস্থিত। ইহার চারি দিকে অনেক নীলকর সাহেবের বাগান বাগিচা। এই সমুদয় সাহেবের সহকারিতায় উন্নত কৃষি প্রণালী সাধারণ চাষীদিগের মধ্যে প্রচারিত হইতে পারে এই আশায় গভর্ণমেণ্ট এই এই স্থানে কৃষি ক্ষেত্র স্থাপন করিয়াছেন। বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষের সমাবেশে এবং ফলের 'বাগান ও উদ্ভিদ্‌তত্ব বিষয়ক উদ্যানের সান্নিধ্যে আজকাল পুষা একটি মনোহর স্থানে পরিণত হইয়াছে।

পুষা কৃষি পরীক্ষা ক্ষেত্রে নানাবিধ পরিক্ষার অনুষ্ঠান করা হইয়াছে। এস্থলে এতৎ সমুদয়ের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করা অসম্ভব। ক্রমাগত সার ও শস্য পর্য্যায় পরীক্ষার জন্য ২৭ বিঘা পরিমাণ দুইটী ক্ষেত্র নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অন্যান্য ফসলের মধ্যে গোধূম, যব, যই, ভূট্টা, ধান, নানাবিধ দাইল, তৈলশস্য, ইক্ষু, পাট, শণ ও তামাক লইয়াই বিশেষ পরীক্ষা চলিতেছে।

অপরাপর পরীক্ষার মধ্যে গবাদি পশুর বংশোন্নতি বিষয়ক পরীক্ষা সাধারণের পক্ষে যে বিশেষ হিতকর হইবে তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের যাবতীয় গোবংশের মধ্যে মণ্ট গোমারী' জাতীয় গরুই অধিক পরিমাণ দুগ্ধ প্রদান করে। এই জাতীয় গরুর একটি পাল পুষায় রাখা হইয়াছে এবং প্রত্যেক গাভীর দুগ্ধের পরিমাণের হিসাব রাখা হইতেছে। এই হিসাব হইতে অধিক দুগ্ধবতী গাভী নির্ব্বাচন করিয়া তাহাকে উপযুক্ত ষণ্ডের সহিত সম্মিলিত করিয়া বাছুর জন্মাইলে দুগ্ধের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা উচিত যে আজ কাল ভারতীয় গরু বিদেশে রপ্তানি করা একটি লাভ জনক ব্যবসা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রতি বৎসরই এতদ্দেশ হইতে দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও ষ্ট্রেট সেটল্‌মেণ্টে যথেষ্ট পরিমাণে গরু রপ্তানি হয়। স্থানীয় গরুর ন্যায় ভারতীয় গরু সমূহ, মশা, মাছি ও ডাঁস প্রভৃতি দ্বারা আক্রান্ত হয় না বলিয়া ইহাদের আদর এত অধিক। ভাল করিয়া নির্ব্বাচন করিয়া গোবংশের উন্নতি সাধন করিতে পারিলে দেশীয় ব্যবসায় ব্যতীত বিদেশীয় ব্যবসায়েও যে যথেষ্ট পরিমাণে লাভ হইতে পারিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

গোবংশের ন্যায় হাঁস, মুরগী প্রভৃতিরও বংশোন্নতির চেষ্টা হইতেছে। এখনও পর্য্যন্ত কোন্ জাতীয় হাঁস ও মুরগী ভারতের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযুক্ত হইবে তাহা স্থির হয় নাই, কিন্তু পুষা ব্যতীত অন্যান্য স্থানেও এ সম্বন্ধে বহুবিধ পরীক্ষা হইতেছে এবং পুষা হইতে ডিম ও শাবক লইয়া গিয়া মান্দ্রাজে ও ব্রহ্ম দেশে অনেকেই চাষ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

পুষা অনুসন্ধানাগারের যে সমুদয় বিভাগ রহিয়াছে তাহার মধ্যে ব্যবহারিক উদ্ভিদ্‌তত্ব অন্যতম। মিঃ হাউয়ার্ড এই বিভাগের কর্ত্তা। তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে প্রধানতঃ গোধূম সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতীয় গোধূমের নানা জাতি। এই জাতি গুলি প্রথমতঃ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নির্ণীত না হইলে ভবিষ্যত উন্নতি অসম্ভব। মিঃ হাউয়ার্ড ঐ সমুদয় নির্ণয় করিয়া গোধূম বংশের উন্নতির পথ প্রাসরিত করিয়া দিয়াছেন। গোধূমের সঙ্কর উৎপাদনের চেষ্টাও চলিতেছে। অধিক শস্য প্রদানকারী, সহজ আবাদের উপযুক্ত এবং ছত্রক রোগাক্রমণ সহিষ্ণু গোধূমের সম্বন্ধে এই কয়েকটি বিষয়ের দিকে বিশেষ

লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। ফল বৃক্ষের পরীক্ষা হইতেও কতিপয় বিষয় জানিতে পারা গিয়াছে তন্মধ্যে ফল সংরক্ষণ প্রণালী বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। পুষায় উদ্ভাবিত একটি প্রণালী দ্বারা পীচ রেলপথে অনেক দূর পাঠাইতে পারা যায়। পেনিন্‌সুলার টোবাকো কোম্পানির সাহায্যে পুষায় সিগারেট প্রস্তুতোপযোগী তামাক জন্মাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই কয়েকটি প্রধান প্রধান পরীক্ষা ব্যতীত সরিষার জাতি নির্ণয়, মেস্ত পাট ও শণের নির্ব্বাচন, মুর্গার চাষ ও যব, গাঁজা ও আফিং সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ তথ্য আলোচনায় ব্যবহারিক উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ আপাততঃ নিযুক্ত আছেন।

কৃষি রসায়ন বিভাগে ডাক্তার লেদার তাঁহার পূর্ব্বকৃত টব পরীক্ষার ফল লইয়া কতকগুলি ক্ষেত্র পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছেন। এই সকল পরীক্ষার ফলে বেহার অঞ্চলে কোন্ প্রকার জমিতে কি পরিমাণ ফস্ফেট প্রধান সার আবশ্যক তাহা অনেক পরিমাণে জানিতে পারা গিয়াছে। রসায়ন তত্ত্ববিদের অন্যতম পরীক্ষাধীন বিষয়—বীজ উপাদানের উপর জমি ও সারের প্রভাব। যদিও এতদ্বিষয়ে কতিপয় বিশেষ তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তথাপি পরীক্ষা এখনও সম্পূর্ণ না হওয়ায় তৎ সমুদয় আপাততঃ প্রকাশযোগ্য হয় নাই।

আমাদের দেশে ছত্রক রোগে প্রতি বৎসর যে বহুলক্ষ মুদ্রা মূল্যের শস্য বিনষ্ট হয় সে হিসাবে ছত্রক তত্ত্ব আমাদের পক্ষে অবশ্য আলোচ্য বিষয়। এপর্য্যন্ত ভারতীয় ছত্রক সমূহের কোন্ সুসংবদ্ধ ও বৈজ্ঞানিক বিবরণ ছিলনা এক্ষণে রাজকীয় ছত্রক—বিদের চেষ্টায় অতি সত্বরে ভারতীয় ছত্রক রোগ সম্বন্ধে একটি পুস্তক প্রকাশিত হইবে। আমরা উক্ত পুস্তক প্রকাশের জন্য যে বিশেষ উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছি তাহা বলা বাহুল্য। বর্ত্তমান সময় তুলা, নীল, অরহর ও ছোলা প্রভৃতির ছত্রক রোগ, ইক্ষুর ধসা, গোদাবরী নদীর দ্বীপে নারিকেল প্রভৃতির রোগ এবং তুঁতগাছের ব্যাধি প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ রোগের উৎপত্তি, কারণ ও নিবারণোপায় নির্দ্দেশের জন্য ছত্রক তত্ত্ব বিভাগ বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন।

ছত্রকতত্ত্বের ন্যায় কীটতত্ত্ব বিভাগও বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। বিগত বৎসর ভারতীয় কীট জীবন নামক লিফ্রয় সাহেবের একটি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত পুস্তক ভারতীয় কীটতত্ত্ব ক্ষেত্রে নবযুগ আনয়ন করিয়াছে। ভারতীয় কৃষি সমিতির তত্ত্বাবধানে ফসলের পোকা নামক আর একটি পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে। ইহা ইংরাজী অনভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে কত উপকারী হইবে তাহা বলা যায় না। পুস্তকাদি প্রকাশ দ্বারা কীটতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল উন্নতি সাধিত হইয়াছে কার্য্য ক্ষেত্রে তাহার শতাংশের এক অংশও হয় নাই। কারণ সমস্ত ভারতে মোট ১০ জন কীটতত্ত্ব বিষয়ক সহকারী রহিয়াছেন। ইহা সমুদ্রে বারি বিন্দুবৎ। কীট তত্ত্ব বিভাগের আর একটি বিশেষ কার্য্য এড়ি ও তসর পোকার চাষ। পুষা কৃষি ক্ষেত্রে এই উভয় কীট, লাক্ষা কীট ও মধু মক্ষিকার চাষ সম্বন্ধে নানাবিধ পরীক্ষা চলিতেছে। সংক্ষিপ্ত বিবরণ যুক্ত নানাবিধ কীটের রঙ্গিন ছবি প্রস্তুত হইয়াছে এবং প্রদর্শনী, বিদ্যালয় ও অন্যান্য স্থানে প্রদর্শিত হইবার জন্য বিতরিত হইয়াছে। বস্তুতঃ পুষার সমস্ত কয়েকটি বিভাগের মধ্যে কীটতত্ত্ব বিভাগই সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতিশীল বলিয়া বোধ হয় এবং তজ্জন্য সাধারণে মিঃ ম্যাক্সওয়েল লিফ্রয়কে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারেন না।

ভারতবর্ষে তুলার উন্নতি সাধন অত্যাবশ্যকীয় উপলব্ধি করিয়া ভারত গভর্ণমেণ্ট ১৯০৭ সালে মিঃ

জি, এ, গ্যামিকে রাজকীয় তুলাতত্ত্ববিৎ নিয়োগ করেন। তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে বিগত কয়েক বৎসরে নিম্নলিখিত কয়েকটি উপায়ে তুলার উন্নতির চেষ্টা হইতেছে (১) তুলা বীজ নির্ব্বাচন ও বিতরণ, (২) দেশীয় উৎকৃষ্টতর জাতি প্রবর্ত্তন এবং উন্নত প্রণালীতে চাষ, (৩) সঙ্কর উৎপাদন ও (৪) বিদেশীয় তুলা সম্বন্ধে পরীক্ষা। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় নাই। ফলতঃ সমস্ত পরীক্ষার ফলে দেখিতে পাওয়া যায় যে বিদেশীয় তুলা অপেক্ষা দেশীয় তুলার দ্বারা ভারতের অধিক উপকারের সম্ভাবনা। সুতরাং আমাদের দেশীয় যে সমস্ত উৎকৃষ্ট তুলার জাতি যত্নের অভাবে লুপ্ত প্রায় হইয়া আসিয়াছে তাহাদের উদ্ধার সাধনই এক্ষণে সকলের মুখ্য কার্য্য হওয়া উচিত।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণ হইতে পাঠকেরা ভারত গভর্ণমেণ্টের কৃষি বিষয়ক উন্নতি সাধনের চেষ্টার সংক্ষিপ্ত বিবরণ অবগত হইবেন। পুষার কৃষি-তত্ত্বানুসন্ধানাগার ও কলেজের এখন কেবল শৈশব মাত্র। কালক্রমে এইস্থান যে ভারতীয় কৃষির মহান কেন্দ্রে পরিণত হইবে তাহা সকল দেশ হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিই আশা করেন। কিন্তু সে উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তি বর্গেরও যথেষ্ট সহানুভূতি ও সাহায্য আবশ্যক। পুষা কৃষি কলেজে অধ্যয়ন করিবার সামর্থ্য আমাদের ন্যায় নিরর্থ দেশে সকলের নাই। কৃষি বিভাগের কর্ত্তা সলিমন্ সাহেব বলিয়াছেন যে বিগত কয়েক বৎসরে সরকার পক্ষ হইতে কৃষির জন্য অনেক টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। এখন ভারতীয় ধনশালী ব্যক্তি গণের পালা। পুষা কলেজে অবস্থাহীন ছাত্র দিগের অধ্যয়নের জন্য বৃত্তি স্থাপন অপেক্ষা ধনশালী ব্যক্তিগণের ধনের সাময়িক সদ্ব্যবহার আর কিছুই হইতে পারে না। আমরা সলিমন সাহেবের এই উক্তির সম্পূর্ণ সমর্থন করি। কৃষির উন্নতি ব্যতীত আমাদের জাতীয় উন্নতির আশা নাই। সুতরাং যাহাতে কৃষির উন্নতির দিকে দেশের গণ্য মান্য ব্যক্তিগণের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় তাহা সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়।

বঙ্গদেশে এখন এত অশান্তি কেন ?

বাঙ্গালীর মধ্যে অনেকে এক্ষণে প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন। কেহ ডাক্তারি, কেহ কবিরাজী কেহ আইন ব্যবসা, কেহবা অন্য ব্যবসা করিয়া আশাতিরিক্ত অর্থলাভ করিতেছেন কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কি সকলেই সুখী! বোধ হয় অনেকেই নন। সে কাহার দোষে? আমরা অনেকেই ভুলিতে বসিয়াছি যে সুখ অর্থোপার্জ্জনে নহে—সুখ, সংসারের শান্তিতে। সেই শান্তি কি এখন বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে দেখিতে পাওয়া যায়? বাল্যকালে পাঠ্য পুস্তকে পড়িয়াছিলাম যে "তদ্‌গৃহম ক্ষয়মায়াতি, নার্য্য যত্র অপুজিতা।" আরও স্মরণ হয় কি? যস্যৈকাপি গৃহে নাস্তি ধেনু বৎসানুসারিণী, মঙ্গলানি কুতস্তস্য তমঃ ক্ষয়ঃ॥"

এসকল মহাবাক্য কণ্ঠস্থ করিয়াও আমাদের কোন জ্ঞানই জন্মায় নাই। তাহা পুথিগতই রহিয়া গিয়াছে। আমরা বঙ্গনারীকে জগতের মাতা, জগতের ধাত্রী, জগতের শিক্ষয়িত্রী—সাক্ষাৎ মাতৃমূর্ত্তী রূপে পুজা করিতে বিস্মৃত হইয়াছি। এখন বঙ্গবধুকে দেখিয়া কবি হয়তঃ গাহিতে সাহস করিবে না ;—

"বুক ভরা মধু, বঙ্গের বধু,
জল ল'য়ে যায় ঘরে।
"মা" বলিতে প্রাণ, করে আন্ চান্
চোখে আসে জল ভ'রে ॥"

এক্ষণে শিক্ষিত সম্প্রদায় নিজ নিজ বধুকে নূতন সাজে সাজাইতে ব্যগ্র। তাঁহাদিগকে দেবী সাজে না সাজাইয়া, খেলার পুতুল অথবা সংসাজাইতে ইচ্ছুক। বধুগণ সুদুর পুষ্করিণী হইতে জল আনা দুরের কথা ঘরের সামান্য সামান্য কাজ গুলি করিতেও কুণ্ঠিতা, নিজ নিজ সন্তান পালনেও অসক্তা। তাঁহাদের কর্ত্তব্য কাজ গুলি করিবার জন্য গৃহে, দাস দাসী ও র াঁধুনি নিযুক্ত। সংসারের কাজের কথা দুরে থাক অনেকে এক্ষণে হয়ত নিজ নিজ দেহ ভার বহনেও অসক্তা, অবিধেয় আমোদ প্রমোদে অনুরক্তা, পল্লিগ্রাম অপেক্ষা সহর বাসে অভিলাষিণী, এমন কি নিকট আত্মীয় প্রায় সকলকে ছাড়িয়া পৃথক ভাবে স্বামীর সহিত সুদুর প্রবাস বাসে নিরতা। আমাদেরই দোষে এখন আমরা অনেকেই সহরবাসী, জমিদারের জমিদারী পল্লিগ্রামে কিন্তু তাঁহার বাস সহরে। সহরের শ্রী লইয়া কিন্তু বঙ্গদেশের শ্রী নহে। বঙ্গদেশ গ্রাম প্রধান দেশ। এই গ্রামগুলির অবস্থা শোচনীয় হইয়াছে। অন্নাভাবে, রোগে, শিক্ষার অভাবে, ধর্ম্মভাবের অভাবে, হিংসাদ্বেষজনিত দলাদলিতে গ্রামগুলি সর্ব্ব প্রকারে শ্রীহীন হইয়াছে। সহর বাণিজ্যের কেন্দ্র হইতে পারে। আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র সহরে হইতে পারে, যেখানেই হউক আমাদের বাসস্থান কিন্তু সেই পল্লিগ্রামেই নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত। পল্লিগ্রাম ব্যতীত কোথায় গোয়াল ভরা ধেনু, উঠান ভরা ধানের গোলা, পুকুর ভরা মাছ এবং ঘরে ঘরে সহাস্যবদনা কুলললনা দেখিতে পাইবে! আজ তোমার বাস গৃহ ভগ্নস্তূপে পরিণত, তোমার বাগবাগিচা, পুষ্করিণী সকলই বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। কৃষকগণ সুখ, দুঃখে, আপদে, বিপদে কাহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইবে এমন লোক খুঁজিয়া পায় না, তাই ত পল্লিগ্রামের এ দুর্দ্দশা। তখন কর্ম্ম হইতে অবসর পাইলেই স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিয়া সকলে মিলিত হইত, এখন শৈলাবাসগুলি ছুটীর সময় মিলনের কেন্দ্র হইয়াছে। আমরা সেখানে আমাদের সব অভাব ভুলিয়া আমাদের সমস্ত দায়িত্ব বিস্মৃত হইয়া ক্ষণস্থায়ী আমোদে নিরত থাকি। সেই জন্যই আজ বঙ্গের গৃহগুলি শিশুর ক্রন্দনে পরিপূর্ণ, শান্তির পরিবর্ত্তে অশান্তিময়। বিশুদ্ধ পায়না জলের অভাবে, উপযুক্ত খাদ্যাভাবে, দুগ্ধ ও মৎস্যাভাবে আমাদের না আছে স্বাস্থ্য, না আছে দেহে বল, না আছে মনে শান্তি, না আছে মুখে হাসি। আমাদের যাহাছিল তাহা সব যাইতে বসিয়াছে সেগুলির পুনরুদ্ধার না হইলে কি বঙ্গের সেই পুরাতন শ্রী আবার ফিরিয়া আসিবে। ভারতে কত কোটী বিঘা সুবিস্তৃত চাষের জমি বিদ্যমান সেই ভারতে গভর্ণমেণ্ট দশ পনরটা আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিতেছেন,—তাহাতে কি হইবে! ধনী জমিদার সকলেই এক বার পল্লিগ্রামের দিকে দৃষ্টিপাত করুণ, তাঁহাদের প্রত্যেক বাগান বাগিচা ক্ষেত্রাদি আদর্শ ক্ষেত্রে পরিণত হউক, তাঁহারা চাষীদের সঙ্গে সাক্ষাত সম্বন্ধ পাতান তবেত দেশের প্রকৃত কল্যাণ হইবে,

অবেত যাহা গিয়াছে তাহা ফিরাইয়া পাইবেন। শুধু সহরের সৌন্দর্য্য, সহরের শ্রী ও সমৃদ্ধি লইয়া কয় জন লোকের কতটুকু উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। এই সহর গুলির, মাতৃ ক্রোড় সদৃশ গ্রামগুলিকে ভুলিয়া থাকিলে চলিবে না। বাণিজ্যের প্রাধন আড্ডাগুলিই সহরে পরিণত হয় কিন্তু বানিজ্যের প্রাধন কর্ম্মকেন্দ্র সেই কৃষিক্ষেত্র গুলি কি ভুলিয়া থাকা উচিত।

এই সময় এই অসময়ে যদি আমরা আমাদের নিজ নিজ কন্যা ও বধুগণকে "মাতা," "জায়া" ও "ভগিনীর" প্রকৃত কর্ত্তব্যপালনে উপদেশ দিই এবং তাহাদিগকে সুসন্তান প্রসবিণী করিতে পারি, যদি আমরা প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে ভক্তিভাবে গাভী পরিচর্য্যায় নিরত হইয়া শিশুর অকালমৃত্যু নিবারণে সক্ষম হই, ও যদি আমরা আমাদের পতিত পৈতৃক বাসগুলি পুনঃ সংস্কারে যত্নবান হই, তবে আবার আমাদের হৃদয়ে নূতন আশার সঞ্চার হইলেও হইতে পারে। যাহার প্রাণ লইয়া টানাটানি তাহার প্রাণে স্বভাবতঃ বাঁচিবার আশা বলবৎ হইয়া উঠে। সেই জন্য আমরা সভা সমিতি করিয়া কিসে আত্মরক্ষা করিতে পারি সেই চেষ্টা প্রতি নিয়ত করিতেছি। কিন্তু যদি বাঁচিতেই চাই তবে মরিবার জন্য বাঁচিবার আবশ্যকতা নাই। কারণ আমাদের যাহাছিল সব গিয়াছে, অতীতের জ্ঞান গৌরব সকলই নষ্ট হইয়াছে, বাঙ্গালীর যাহা মেদ মজ্জা ছিল সে সকলই গিয়াছে। এখন আমাদের জীবনই মরণ গণনা করিতে হইবে। যদি বাঁচিবার সাধ থাকে তবে যেন বাঙ্গালীর মত বাঙ্গালী হইয়া, হিন্দু হই বা মুসলমান হই, বাঙ্গলার পল্লীসমাজ রক্ষা করিয়া খাঁটী বাঙ্গালী, সেই পূর্ব্বেরমত অল্পেতৃপ্ত, অল্পে সন্তুষ্ট, সচ্ছন্দ পল্লীবাসে সুখী বাঙ্গালী হইয়া যেন বাঁচিয়া থাকি। এই রূপ চেষ্টাতেই আমাদের রোগ শোক দূরে যাইবে, সহজে আহার মিলিবে এবং কথায় কথায় পরমুখাপেক্ষা করিতে হইবে না নচেৎ সভা কর বা সমিতিই কর কিছুতেই কিছু হইবে না এবং আমাদের এই নব সঞ্চারিত আশা ও একমাত্র ভরসা যে কৃষির সম্যক উন্নতি বিধান তাহা সুদূর পরাহত হইবে।

পত্রাদি।

শ্রীরমণী মোহন রায়, রাঙ্গামাটি।

উই পোকার উপদ্রব ঃ—

কৃষকের ১৩১৫ সালের আষাঢ় সংখ্যার প্রকাশিত "উই কীট" নামক প্রবন্ধে আপনার আবশ্যকীয় সমস্ত সংবাদ পাইবেন। কৃঃ সঃ।

শ্রীরমণ চন্দ্র চৌধুরী, পাহাড় তলী, চট্টগ্রাম ঃ—

ধুতুরার চাষ ঃ—

অত্যন্ত দুঃখের সহিত আপনাকে অবগত করিতেছি যে সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহা-

ভারতী অল্প দিবস হইল কাল গ্রাসে পতিত হইয়াছেন। চাষের সম্বন্ধে সাধারণতঃ এই মাত্র বলিতে পারা যায় যে বেলে দোয়াঁশ এবং দোয়াঁশ মাটিতে ধুতুরা উত্তমরূপ জন্মায়; বর্ষার প্রারম্ভে বীজ বপন করিতে হয় এবং চারা ৫।৬ অঙ্গুলি পরিমিত বড় হইলে ২৷৷০ কিম্বা ৩ হাত অন্তর ক্ষেত্রে বসাইতে হয়। সম্পূর্ণরূপে পরিপুর্ণ পত্র উঠাইয়া ছায়ায় শুষ্ক করিতে হয়। তাহা না হইলে পাতা বিবর্ণ হয় এবং সহজে গুঁড়াইয়া যায়। ধুতুরা কিম্বা আপনার দেশ জাত অন্যান্য ঔষধার্থ ব্যবহৃত গাছ গাছড়ার সম্বন্ধে বিশেষ সংবাদ কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোম্পানির নিকট পাইতে পারেন। আমরা আপনার নাম তাঁহাদিগকে প্রদান করিলাম। কৃঃ সঃ।

উই।

[উইএর প্রতিকারের প্রকৃত উপায় উইএর বাসা একবারে ধ্বংস করা। কিন্তু অনেক সময় যে স্থলে উইএর আক্রমণের চিহ্ন দেখা যায়, সে স্থান হইতে উইএর বাসা অনেক দূরে অবস্থিত। যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করিলে একটি পরিবারস্থ অর্থাৎ এক ঢীপির অন্তরস্থ সমস্ত কীট মরিয়া যায় তৎসমুদায়ই উই নিবারণের প্রকৃষ্ট উপায়। কয়েক প্রকারে এই রূপে এক পরিবারভুক্ত সমস্ত উই নষ্ট করিতে পারা যায়, যথা—(১) যথেষ্ট জল প্রয়োগদ্বারা; ইহাতে কীটসমূহ ডুবিয়া মরিয়া যায়। (২) বাসা খুঁড়িয়া অগ্নি প্রয়োগ দ্বারা বিনষ্ট করা—(৩) কার্ব্বণ-বাই-সল্‌ফাইড প্রয়োগ—(৪) গন্ধক ও আর্সেনিক ধুম প্রয়োগ।

ক্ষেত্রস্থ ফসলের উই নিবারণের প্রধান উপায় ঢীপি নষ্ট করা। যে স্থলে ঢীপি দেখিতে পাওয়া যায় না, সে স্থলে চাষের বিশেষ প্রণালী অবলম্বন আবশ্যক। সেচনের জলের সহিত বিষাক্ত দ্রব্য মিশাইয়া দিলে ক্ষেত্রের অনেক উই বিনষ্ট হয়। সেচনের জলের সহিত মিশাইতে হইলে যে স্থান হইতে জল ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে, সেই রূপ স্থলে বিষাক্ত পদার্থ (কঠিন হইলে থলের ভিতর ও তরল হইলে টিনে) রাখিয়া দিতে হয়, তাহা হইলে অল্প অল্প মাত্রায় উহা জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। গুজরাটে আকন্দ, কালজীরা, নিম ও রেড়ীর খৈল মিশ্রিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রয়োগ করা হয়। কচ্ তৈল মিশ্রণ, স্যানিটারি ফ্লুইড, কেরোসিন অথবা কেরোসিন মিশ্রণও টিনে করিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে। শুষ্ক অথবা অসম্পুর্ণভাবে বিগলিত ক্ষেত্রজ সার উইএর খাদ্য। যাহাতে ঐ প্রকার সার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা না হয় তৎসম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। বিস্তৃত বিবরণ কৃষক ৯ম খণ্ড আষাড় সংখ্যা দেখুন।]

মহাশয়,

আমার খামার বাড়ীতে অনেক গুলি নিচুর ও আমের কলম রোপণ করিয়াছি। সবই Indian Gardening Association, Union Nursery, Darbhanga ও কলিকাতার অন্যান্য ভাল চারা ব্যবসায়ী হইতে আনিত। উদ্যানটী পাহাড়ের উপর ও বর্ত্তমান সময়ে দল ঘাসের দ্বারা আবৃত। বরাবরই পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। উদ্যানের পূর্ব্ব দিকে সমস্তই আম্র ও পশ্চিম দিকে সমস্তই নিচু। আম্র চারা রোপণের পর কেবল ২টী মাত্র মরিয়া গিয়াছে। কিন্তু নিচু চারা প্রায় ২৫টী আপনা আপনি ও উই পোকার দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে। আম্রের চারায় জল সেচন ইত্যাদিতে এত তদ্বির করিতে হয় না কিন্তু নিচু চারাগুলিতে

প্রায় সর্ব্বদা জল সেচন ইত্যাদি করিতে হয়। তথাপি উই হইতে রক্ষা করিতে পারিতেছি না। সর্ব্বদা উস্কাইয়া দেওয়াও হয়। চারার গোড়ায় চতুর্দ্দিকের ছাল, প্রথম উই পোকারা খাইয়া ফেলে পরে জলাভাবে চারাটী নষ্ট হয়। আপনাদের এমন কোন ঔষধ আছে কি যাহার দ্বারা উইপোকা মরিয়া যায় অথচ চারার কোন প্রকার অনিষ্ট না হয়। অনুগ্রহ করিয়া এই প্রতীকারের উপায়টী কহিয়া দিলে বিশেষ উপকৃত হইব।

শ্রীরমণী মোহন রায়। মেম্বর, চট্টগ্রাম এগ্রি-কালচারেল এসোসিয়েসন।

বাণিজ্যবিষয়ক পুস্তকাগার।

পাঞ্জাবের ছোটলাট সার লুই ডেন লাহোরে একটি বাণিজ্য বিষয়ক পুস্তকাগার স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। ঐ পুস্তকাগারে বাণিজ্য সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিবরণপূর্ণ পুস্তকাদি রক্ষিত হইবে। কেহ ইচ্ছা করিলে ঐ সকল পুস্তক স্বগৃহে লইয়া গিয়াও পাঠ করিতে পারিবে। এই পুস্তকাগারের প্রতিষ্ঠা ও বাৎসরিক ব্যয় ভার গবর্ণমেণ্টই বহন করিবেন। ইউরোপ ও আমেরিকায় বীমা বিষয়ক এবং ব্যাঙ্কের কাজ কর্ম্ম বিষয়ক যে সকল পুস্তকাদি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা এই পুস্তকাগারে সংগৃহীত হইবে। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের বাণিজ্য দূতগণ, ভারতজাত দ্রব্যাদির কোথায় কিরূপ সমাদর তৎসম্বন্ধে যে সকল বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও সংগ্রহ করা হইবে। এই প্রস্তাবিত পুস্তকাগারটি পাঞ্জাব পব্লিক লাইব্রেরীর অংশ স্বরূপ হইবে কি পৃথক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ডাইরেক্টর অফ ল্যাণ্ড রেকর্ডস্বের অধীন হইবে তাহা এখনও স্থিরীভূত হয় নাই।

বিভিন্ন জাতীয় সব্জী তৈয়ার হইবার সময়।

অনেকেই জানিতে চান আলু, কপি, কলাই শুঁটী, সালগম প্রভৃতি সব্জীর কোন্‌টীর ফসল তৈয়ারি হইতে কত সময়ের আবশ্যক হয়। এই সম্বন্ধে একটা বাঁধাধরা তালিকা দেওয়া অসম্ভব। অনেক গুলি কারণে ফসল কখন বা বিলম্বে তৈয়ারি হইয়া উঠে। জমি সরস থাকিলে ফসল পাকিতে বিলম্ব হয়, আবার উষ্ণতা হেতু জমি নিরস হইয়া পড়িলে অকালেই ফসল তৈয়ারি হইয়া উঠে, আবহাওয়ার উপর ইহা অনেকটা নির্ভর করে। নাবী জলদি বীজ হিসাবে ফসল পাকিতে সময়ের তারতম্য হয়। চারা সতেজ হইলে ফল বিলম্বে ধরে এবং বিলম্বে পাকে। লাউ কুমড়া গাছে ইহা সাধারণতঃ প্রত্যক্ষ করা যায়। জমির উর্ব্বরতা, অনুর্ব্বরতার উপর কিম্বা নরম ও শক্ত অবস্থা অনুসারে ফসল উঠাইবার সময়ের কম বেশী হয়। তবে মোটামুটী যতটুকু কার্য্যতঃ দেখা গিয়াছে তাহাতে নিম্নলিখিত একটী তালিকা দেওয়া যাইতে পারে ঃ—

আলু	...	...	৪৫	হইতে	৬০	দিন
সালগম	...	...	৪০	„	৫০	„
মূলা	...	...	২০	„	৩০	„
মটর	...	...	৪০	„	৬০	„
সীম	...	...	৫০	„	৬০	„
বীট	...	...	৪০	„	৫০	„
কপি	...	...	১০০	„	১৩০	„
লাউ কুমড়া	...		১০০	„	১৫০	„
গাজর	...	...	৮০	„	৯০	„
ভুট্টা	...	...	৭০	„	৭৫	„
„ (কোন জাতীয়)			৪০	„	৫০	„
পিঁয়াজ	...	...	৮০	„	১০০	„

প্রাদেশিক কৃষি সংবাদ।

বঙ্গদেশে পাটের আবাদ।—১৯০৯ বঙ্গদেশে পাটের আবাদ যেমন দিন দিন বাড়িতেছিল এখন প্রতি বৎসরই কিছু কিছু কমিয়া যাইতেছে তাহা নিম্নের সরকারি তালিকা দেখিলে বেশ বুঝা যায়।

১৯০৫ সাল	...	৫৬৯,৩০০ একর
১৯০৬ "	...	৭৮০,৪০০ "
১৯০৭ "	...	৯৩১,২০০ "
১৯০৮ "	...	৫৪৮,৭০০ "
১৯০৯ "	...	৫১১,৫০০ "

সমুদায় প্রদেশে ১,৩২৯,৩৮০ বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছে। একটী বেলের ওজন ৫ মণ। যত পাট উৎপন্ন হওয়া উচিত তদপেক্ষা শতকরা ১৬ ভাগ কম হইয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম পাটচাষের একটী প্রধান স্থান, তথায়ও পাটের চাষ কমিয়া যাইতেছে।

১৯০৫ সালে	...	৩,১২৮,৩০০ একর
১৯০৬ "	...	৩,৪৮২,৯০০ "
১৯০৭ "	...	৩,৯৭৪,৩০০ "
১৯০৮ "	...	২,৮৫৬,৭০০ "
১৯০৯ "	...	২,২০১,৭০০ "

পূর্ব্ববঙ্গের কৃষি বিভাগের ডিরেক্টার অনুমান করেন যে তাঁহার অধীনস্থ জেলা সমূহে ৫,৮৭৭,২০৪ বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ, আসাম ও বঙ্গদেশে এই উভয় প্রদেশে মোটের উপর ৭,২০৬, ৫৮৪ বেল পাট জন্মিয়াছে।

অন্যান্য বৎসরের সহিত তুলনায় তথাপিও শতকরা ১২ ভাগ কম। কৃষি বিভাগের বিবরণী পাঠে জানা যায় যে এতদ্ব্যতীত নেপালে বর্ত্তমান বর্ষে ৪৮১,৮০০ বেল, উত্তর ভারতে ৬,১০০ বেল এবং মান্দ্রাজে ৯০০ বেল পাট জন্মিয়াছে। ১৯০৮ সালে কৃষি বিভাগের হিসাবের সহিত বঙ্গীয় বণিক সমিতির হিসাবের মিল হয় নাই। তাঁহাদের বিবরণীতে প্রকাশ যে, ১লা জুলাই ১৯০৮ হইতে ৩০ জুন ১৯০৯ পর্য্যন্ত ৪,৬৩০,৬১১ বেল বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে, এখানে যে সকল চটের কল আছে তাহাতে ৩,৬৪৯,৮৪৫ বেল এবং দেশের অন্যান্য কার্য্যে ৫০০,০০০ বেল ব্যয় হইয়াছে। এই হিসাবে ৮,৭৮০,৪৫৬ বেল পাট ১৯০৮ সালে উৎপন্ন হইয়াছিল। কৃষি বিভাগ অনুমান করিয়াছিলেন যে ১৯০৮ সালে ৬,৩৯৯,৫০০ বেল মাত্র পাট উৎপন্ন হইয়াছে। কৃষি বিভাগের, ডিসেম্বর ১৯০৭ সালের উদ্বৃত্ত পাটের পরিমাণ ঠিক অনুমিত না হওয়ায় ঐরূপ উভয় হিসাব গরমিলের কারণ বলিয়া তিনি অনুমান করেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে অনেক নাবী পাট জল অভাবে পচাইবার ও কাচিবার অসুবিধা হেতু নষ্ট হয় কিন্তু ১৯০৮ সালে দৈবক্রমে নদী, খাল, বিলে, জল বাড়াতে নাবী পাটের পরিমাণ অনুমান অপেক্ষা অনেক অধিক হইয়াছিল। যাহাই হউক মোটের উপর কিন্তু উৎপন্ন পাটের পরিমাণ বৎসর বৎসর কমিতেছে; ইহা দেশের পক্ষে সুভ কি অসুভ এ বিষয়ে অনেকের অনেক মত আছে তাহার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করা আমরা এস্থলে যুক্তি মনে করি না।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে হৈমন্তিক ধান্য।—১৯০৯-১০। বর্ত্তমান এতৎ প্রদেশে আবহাওয়া প্রায় সকল সময়ই হৈমন্তিক ধান্য আবাদের অনুকূল বলিতে হইবে। মধ্যে আশ্বিন মাসের ঝড়ে এবং অগ্রহায়ণ মাসে পোকার উপদ্রবে কিছু ক্ষতি

হইলেও উক্ত প্রদেশের কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর অনুমান করেন যে বর্ত্তমান বর্ষে উক্ত অঞ্চলে ষোল আনার উপর ফসল জন্মিয়াছে। একর প্রতি ৯।॥০ হন্দর ধান জন্মিয়াছে বলিয়া ধরিলে উৎপন্ন ধান্যের পরিমাণ ১১৭,৬০৭,২০০ হন্দর হইবে বলিয়া আশা করা যায়। বিগত বৎসর অপেক্ষা পরিমাণে শত করা ৩৭০ভাগ অধিক ইহা নিশ্চয়ই সুখের বিষয়। কিন্তু প্রবাদ আছে যে শস্যঞ্চ গৃহমাগতম্, অর্থাৎ গোলাজাৎ না হইলে বিশ্বাস নাই। এই পৌষ মাসের জলে ২৪ পরগণায় অনেক জায়গার পাকাধানে মই দেওয়া হইল। ক্ষেত্রস্থ কাটাধানে জল পাইয়া কল্ বাহির হইয়া অনেক ধান নষ্ট হইল এবং গরুর খাদ্য খড়ও অনেক নষ্ট হইল।

বঙ্গে তিলের আবাদ।—১৯০৯। সম্বলপুরই তিল চাষের প্রধান কেন্দ্র, প্রায় সমুদয় প্রদেশের অর্দ্ধেক তিল এই খানেই উৎপন্ন হয়। এবারে অনুমান এখানে আঠর আনা ফসল হইয়াছে। অন্যান্য জেলায়ও ফসল আশাপ্রদ হইয়াছে; খুলনা, গয়া, পাটনা, ভাগলপুর, বালেশ্বর প্রভৃতি ৭টী জেলায় ষোল আনা ও অপরাপর ১৩টী জেলায় বার আনা হইতে পোনের আনা তিল জন্মিয়াছে। কেবল যশহরে ছয় আনা মাত্র ফসল আশা করা যায়। বিগত বর্ষ অপেক্ষা তিলের আবাদী জমির পরিমাণও অধিক; বিগত বর্ষের জমির পরিমাণ ১৪৭,০০০ একর, ১৯০৯ সালে ১৯৩,৫০০ একর।

গড়ে একর প্রতি ৪½ মণ তিল উৎপন্ন হইয়াছে ধরিয়া লইলে মোটের উপর জলদি ও নাবী তিল দুই একত্রে ৩৩,৬০০ টন উৎপন্ন হইয়াছে। বিগত-বর্ষের উৎপন্ন তিলের পরিমাণ ২১,১০০টন মাত্র। একটন বঙ্গদেশের ওজনে প্রায় ২৭ মণ।

মাঘমাসে বঙ্গের চাষাবাদ।—মাঘ মাসের প্রথম হইতে বৃষ্টিপাত হয় নাই। হৈমন্তিক ধান্য ঝাড়া ও মাড়া হইতেছে। বিগত পৌষমাসের বৃষ্টিতে কোথাও কোথাও অদ্যাপিও ধান কাটার বিলম্ব ঘটিয়াছে এবং কতক কতক ধান্য নষ্টও হইয়াছে। নদীয়া, দার্জ্জিলিং, আঙ্গুল ও মুর্শিদাবাদে আশু জাতীয় তৈল শস্য ও কলাই আহরণ কার্য্য চলিতেছে। আখ মাড়াই হইতেছে ও চাষাগণ জমি চষিয়া, মেরামত করিয়া পরবর্ত্তী ফসলের জন্য প্রস্তত হইতেছেন। যে সকল রবিখন্দ এখনও ক্ষেত্রে আছে তাহার অবস্থা প্রায় সর্ব্বত্রই ভাল কেবল দারবঙ্গে ছোলাতে পোকা লাগিয়াছে। বর্দ্ধমান, বালেশ্বর, হাজারিবাগ এবং রাঁচিতে মোটা চাউলের দর চড়িয়াছে কিন্তু মেদিনীপুর, হাওড়া, ২৪ পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, কটক, গয়া, চম্পরাণ, মুঙ্গের, আঙ্গুল ও মানভূমে চাউলের দর কমিয়াছে। মেদনীপুর, নদীয়া, গয়া, মজঃফরপুর, মুঙ্গের, পুর্ণিয়া, সাঁওতাল পরগণা, সম্বলপুর এবং পালামাউরে গবাদি পশুর রোগাক্রমণের কথা শুনা যাইতেছে। সমগ্র প্রদেশে পশুখাদ্য ও পানীয় জলের সদ্ভাব দৃষ্ট হইতেছে।

সার-সংগ্রহ।

তেঁতুল।

তেঁতুল আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। ইহার পরিমাণ এতই অধিক যে ইহার চাষ সতন্ত্র করিতে হয় না ও করিবার প্রয়োজনও নাই। অধিকাংশ লোকই প্রায় প্রত্যহ তেঁতুল

ভক্ষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু কেবল অল্প সংখ্যক লোকই ইহার মধ্যে কি কি পদার্থ আছে জানেন। যাহা প্রত্যহ খাইতে হয় সে দ্রব্যটা কি তাহা সকল শিক্ষিত লোকেরই জানা থাকিলে ভাল হয়।

অনেকই জানেন যে তেঁতুলে তার্তরিক এসিড (tartaric acid) আছে এই জন্য ইহা অম্ল; কিন্তু ইহাতে তার্তারিক এসিড অপেক্ষা সাইট্রিক এসিড (citric acid) অনেক বেশী আছে। এতদ্ব্যতিত ইহাতে মলিক এসিড (walic acid) এসেটিক এসিড (acetic acid), চিনি ইত্যাদি আছে।

অনেকেই বোধ হয় লক্ষ করিয়া দেখিয়া থাকিবেন যে তেঁতুল hygroscopic, আরও দেখিয়া থাকিবেন কোনটা কম কোনটা বেশী। ইহার কারণ এই যে ইহার মধ্যে যে ম্যালিক এসিড আছে তাহা খুব hygroscopic এবং ঐ ম্যালিক এসিড কাঁচা তেঁতুলে বেশী ভাগ থাকে। অতএব যে তেঁতুলে অপক্কের ভাগ বেশী থাকে তাহা তত বেশী hygroscopic। সুতরাং প্রধানতঃ ইহাতে ম্যালিক এসিড আছে বলিয়া তেঁতুলের এই ধর্ম্মটী আছে।

তেঁতুলে এক প্রকার sponge এর ন্যায় ছোট ছোট পদার্থ আছে তাহা উদ্ভিদ cellulose। উপরোক্ত দ্রব্য গুলি ইহার সহিত জড়িত থাকে। ইহার স্বাভাবিক রং তেঁতুলের বর্ণের ন্যায়। বৈজ্ঞানিক পরিক্ষা করিতে হইলে ইহাকে নিম্ন লিখিত রূপে পরিষ্কার করিতে হয়। প্রথমে শতকরা ১০ ভাগ ব্রোমিন (Bromine) এর জল দ্বারা সিদ্ধ করিতে হইবে; পরে ছাঁকিয়া লইয়া শতকরা ২০ ভাগ য়্যামোনিয়ার (amonia) জল দ্বারা ১০ মিনিট সিদ্ধ করিতে হইবে; ইহাতে সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয় না। ঐরূপ আবার Bromine ও পরে amonia র দ্বারা পর পর সিদ্ধ করিতে হইবে। ইহাতেও যদি না হয় তবে তিন বার করিলে নিশ্চয়ই পরিষ্কার হইয়া যাইবে। এই cellulose অন্যান্য সাধারণ উদ্ভিদ cellulose অপেক্ষা বিশেষ স্বতন্ত্র নহে। একটা অণুবিক্ষণযন্ত্র, যাহার দ্বারা দ্রব্যকে ২০০ গুণ বড় দেখায় তাহার দ্বারা দেখিলে প্রত্যেক আঁসকে (fibre) এক একটী ফিতার মত দেখায়। ইহা দেখিতে স্বচ্ছ ও মধ্যস্থলটী সরু সরু fibres এর জালের মত দেখায়। ঐ ফিতার দুই প্রান্তে দুইটী ঘন পাড়ের ন্যায় আছে; এই পাড়ের ধার গুলি বেশ পরিষ্কার করিয়া আঁকা নহে। এই পাড় হইতেই যেন ঐ মধ্যস্থিত সরু fibre গুলি বাহির হইয়াছে। ইহার প্রস্থ প্রায় ·৫ milimitre দেখায়। ইহার খণ্ড (section) ঠিক ৪এর ন্যায় দেখায়। এই cellulose হইতে কাগজ তৈয়ারী হওয়া কিরূপ সম্ভব অসম্ভব তাহা পর পত্রে প্রকাশিত হইবে।

নিম্নে তেঁতুলের মধ্যে উপরোল্লিতি কতকগুলি দ্রব্য কত পরিমাণে আছে তাহা লিখিত হইল;—

Citric acid ...	শত করা	৯—৮	ভাগ
Tártaric acid	,,	১—৯	,,
Potassium bitartarate		৩—১	,,
Sugar ...	,,	১২—৫	,,
Malic acid ...	,,	—৫	,,(?)

এবং সহজ পাপ্য cellulose শত করা ৪৫ ভাগ।

শ্রীজিতেন্দ্র নাথ রক্ষিত।
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট,

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য।

লবণের কাট্তি।—বিগত এপ্রিল মাস হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত নয় মাসে ভারতে ৩,২৪, ৮৮,০০০ মণ লবণের কাটতি হইয়াছে, তৎপূর্ব্ব বৎসর ঐ সময়ে ভারতে মোট্ ৩,২৯,৯৯,০০০ মণ লবণের কাটতি হইয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আলোচ্য সময়ে ভারতে লবণের কাটতি অতি সামান্য পরিমাণে কমিয়াছে। দশ বৎসর পূর্ব্বে এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত নয় মাসে ভারতে ২৬,১৭,০০০ মণের অধিক লবণ বিক্রীত হয় নাই। লবণ শুল্ক হ্রাস করিবার পর এ দেশে লবণের কাটতি যেরূপ বাড়িয়াছিল, তাহা প্রায় একরূপই আছে।

প্রাদেশিক সমিতির শিল্পবিবরণী।—চারি বৎসর ধরিয়া যে স্বদেশী আন্দোলন ভারতীয় সমাজে প্রসার লাভ করিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে এক্ষণে দুই এক কথা বলা প্রয়োজন। আমার মনে হয় যে কোন বিবেচক ইংরাজই এই আন্দোলনের নিন্দাবাদ করিতে পারেন না। এই প্রদেশের শিল্পোন্নতির সম্বন্ধে মাননীয় মিঃ জে. জি, কমিং যে রিপোর্ট দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি অনেক আশার কথাই বলিয়াছিলেন। ২৫ পরগণার সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন যে, যে সকল কারখানায় বড় বড় কল কব্জার প্রয়োজন, সেই সকল কারখানা ইংরাজের মূলধনে পরিচালিত হইতেছে। গবর্ণমেণ্টই ইছাপুরে, কাশীপুরে, কাঁচরাপাড়ায়, বেলিয়াঘাটায়, শিয়ালদহে, চিৎপুরে, খিদিরপুরে, আলিপুরে ও ভবানীপুরে, অস্ত্রশস্ত্র, রেলওয়ে, পরিধেয় ও টেলিগ্রাফের দ্রব্যাদির জন্য বড় বড় কারখানা খুলিয়া অনেক শ্রমজীবীকে পোষণ করিতেছেন।

এই রিপোর্টে আমরা দেখিতে পাই যে, এই জেলায় গালার ২টী, কাগজের ২টী, বরফের ৩টী, সাবানের ১টী, চিনির ১টী, রেশমের ১টী, সোরার ১টী, পাথরের ১টী, গ্যাসের ১টী, দড়ির ২টী, ময়দার ১টী, গোশালা ১টী, গাড়ী তৈয়ারীর ১টী, চামড়ার ১টী কারখানা আছে। তাহার পর ট্রামওয়ের কারখানা ৩টি, ডকইয়ার্ড ২টি, লৌহ ও পিত্তলের কারখানা ১৩টী, তৈলের কল ২২টী, তৈলের ডিপো ৩টী, পাটের ৩৩টী, তুলার ৬টী, পাটের প্রেস ১১টী, মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্কসপ ১টী, ইলেকট্রিক ওয়ার্কসপ ১টী, ইলেকট্রিক সাপ্লাই ১টী ও রাসায়নিক দ্রব্যাদির ১টী কারখানা আছে। ইহা ছাড়া টালিগঞ্জে দেশালাইয়ের কারখানা, উল্টাডিঙ্গায় কালির কারখানা, বাগমারীতে পেন্সিল ও বোতামের কারখানা, এরোরুটের কারখানা (বেহালার নিকটেই), দমদমায় বিস্কুটের কারখানা আছে। ডায়মণ্ড-হারবার, খড়দহ, পানিহাটি ও শুকচরে যথেষ্ট মাদুর তৈয়ারী হয়। বারাসাত মহকুমায় চিকণের কাজ যথেষ্ট হয় এবং কাওড়াপুকুরে সতরঞ্চিও যথেষ্ট পরিমাণে হয়। এই সকলের অধিকাংশই স্বদেশী আন্দোলনের ফল।

কিন্তু ইহাতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা অনুচিত। নিত্য ব্যবহার্য্য অনেক দ্রব্য এখনও বিদেশ হইতে আসিতেছে ; সেগুলিও এইখানেই তৈয়ার করিতে হইবে। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে কয়েকটি স্বদেশী ব্যাঙ্কও হইয়াছে। এ সম্বন্ধে একটি কথা আমাদের বলিবার আছে। অনেক ইংরাজই এই আন্দোলনের উপর বিরক্ত। তাঁহারা তদন্ত করিলেই

জানিতে পারিবেন যে, স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্ব হইতেই ইউরোপের অন্যান্য দেশ বিলাতী দ্রব্যকে বাজার হইতে তাড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিল। শীতবস্ত্র, পেন্সিল, দেশলাই প্রভৃতি অন্যান্য দেশ হইতেই আসিতেছে, বিলাতে প্রস্তুত এই সকল দ্রব্যের প্রচলন প্রায় বন্ধ হইয়াছে। সুতরাং ভিন্ন দেশের বাণিজ্যের গতিরোধ করিয়া এ দেশে ঐ সকল দ্রব্যের উৎপাদন করিতে দেওয়া কি সঙ্গত নহে? হিতবাদী।

যাজপুর প্রদর্শনী।—উড়িষ্যার পুরাতন রাজধানী যাজপুরে বিগত ২২শে জানুয়ারী তারিখে বিভাগীয় কমিশনার মহোদয় কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন সম্পন্ন করিয়াছেন। কৃষিবিভাগের ডাইরেক্টার, কটকের কলেক্টার এবং ল্যাণ্ড রেকর্ডের ডাইরেক্টার উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রদর্শনী মন্দির উড়িষ্যার কৃষি ও শিল্প সম্পদ সম্ভারে সুসজ্জিত করা হইয়াছে। কৃষি বিভাগের ডাইরেক্টার মহোদয় প্রদর্শনী দেখিয়া বলিয়াছেন, তিনি এ পর্য্যন্ত ভারতের পল্লী প্রদেশে যত প্রদর্শনী দেখিয়াছেন, তন্মধ্যে যাজপুরের প্রদর্শনী শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে। উড়িষ্যার গুজরাট রাজ্য ও অন্যান্য রাজ্যের জনগণ প্রদর্শনীতে শিল্প ও কৃষি সম্ভার প্রেরণ বিষয়ে প্রতিযোগিতা করিয়াছেন। প্রদর্শিত দ্রব্যের মধ্যে কটকের কারুকার্য্য, ময়ূরভঞ্জের ও মুর্শিদাবাদের রেশম, কৃষ্ণনগরের মৃন্ময় পুত্তলিকাদি, শ্রীরামপুরের তাঁত, খাগড়া ও যাজপুরের তৈজস পাত্র, উৎকল ট্যানারির চর্ম্মশিল্প, উড়িষ্যার তৈলচিত্র, যাজপুর ও কেন্দ্রাপাড়ার দারুশিল্প, গুলনগরের কাপড় এবং কটকের হাতীর দাঁতের কাজ সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। কৃষি দ্রব্যের মধ্যে বনজাত বহু দ্রব্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

কাঠগোলায় আগুণ।—বিগত ৭ই মাঘ বৃহস্পতিবার নিমতলা দরমাহাটা ষ্ট্রীটস্থ কাঠগোলায় আগুণ লাগিয়া ৭৪টী গোলার সমস্ত কাষ্ঠ ভস্মীভূত হইয়াছে। আনুমানিক ৫০ লক্ষ টাকার কাঠ নষ্ট হইয়াছে। কলিকায় সেগুণ কাঠের দর ক্রমশঃ বাড়িতেছিল। বোধ হয় কিছু দিনের জন্য বাজারে কাষ্ঠ দুর্ম্মূল হইবে।

তুষার পাত।—'বেলুচিস্থান গেজেটে' প্রকাশ—"গত ৭ই মাঘ বৃহস্পতিবারে প্রাতঃকাল হইতে সমস্ত রাত্রি পর্য্যন্ত কোয়েটা সহরে অবিশ্রান্ত তুষার পাত হইয়াছে। রেলপথ তুষারে আবৃত হইয়া গিয়াছিল; সুতরাং এ দিন করাচী মেল যাইয়া পৌছিতে পারে নাই। সহরের পয়ঃপ্রণালী এবং জলের কলে বরফ জমিয়া গিয়াছিল। প্রায় তিন দিন পর্য্যন্ত সহরে জল সরবরাহ হয় নাই।" গত ১৭ই জানুয়ারি তারিখে পঞ্চনদ প্রদেশের ঝিলাম নদীতেও অত্যন্ত তুষারপাত হইয়া গিয়াছে। তুষার পতনের ফলে, নদীর জল প্রায় আট ইঞ্চি পরিমাণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ঝিলম নদীর উপর 'কুশব' নামক একটা সুন্দর নৌ-সেতু আছে। এই তুষার পতনের ফলে উক্ত সেতুর বাহুসখানা বোট ভাসিয়া গিয়াছে এবং এই তুষারপাত হেতু অনেক শস্য হানী হইয়াছে।

আফগানিস্থানের মহিমান্বিত অধিপতি নিজ রাজ্যের আকরিক সম্পদ সংগ্রহ করিয়া শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি সাধনে যত্নশীল হইয়াছেন, এ সংবাদ পাঠক অবগত আছেন। আফগানিস্থানের খনির কার্য্য পরিদর্শন এবং আবিষ্কারের জন্য খনিবিদ্যা বিশারদ মিঃ আলেকজাণ্ডার ডার্ব্বিকে মনোনীত করিয়া আমীর মহোদয় তাঁহাকে একখানি ফারমান বা নিয়োগ পত্র প্রদান করিয়াছেন। আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে ডার্ব্বিন সাহেব আফগানিস্থানে গমন করিবেন।

কাচের কারখানা।—মাদ্রাজে কাচের বাসন তৈয়ারির কারখানা বসিয়াছে। অতি অল্পদিন হইল এই কারখানা খুলিয়াছে। সেদিন বিস্তর সম্ভ্রান্ত দর্শকের সম্মুখে কারখানায় জর্ম্মনী মিস্ত্রীরা সোডাওয়াটারের বোতল আর এদেশী মিস্ত্রীরা মাঙ্গালোর ধরণের সার্সি তৈয়ার করাইয়া খুবই

রাহাবা পাইয়াছে। আশাকরি এই কারখানাটী স্থায়ী হইবে।

বিহারে শিল্প-প্রদর্শনী।—বিগত ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে বিহার কৃষি-শিল্পপ্রদর্শনীর উদ্বোধন উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। যে বিবরণী আমরা পাইয়াছি তাহাতে বিহার ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুলের অধ্যক্ষ মিঃ ওয়ালফোর্ডের মোটার নৌকা নির্ম্মাণ এবং মাননীয় মিঃ মজহরল হকের পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয়ে বিহারে চামড়ার কারখানা প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ আছে। মজঃফরপুরের উকীল বাসন্তীচরণ সেন একটি আম্র সংক্রান্ত কারখানার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মেণীর বোতামের কারখানারও অনেকটা উন্নতি হইয়াছে। শিল্পসমিতি পাটনায় পিত্তল ও জার্ম্মাণ রৌপ্যের কারখানা খুলিয়াছেন। ইঁহাদিগের উদ্‌যোগেই পাটনায় প্রথম পিত্তল ও জার্ম্মাণ রৌপ্যের কারখানা খোলা হইয়াছে। বাঁকীপুরে সাহেবদিগের জন্য সোলার টুপি প্রস্তুত হইয়াছে। সৈয়দ ইয়াসুফ ইমাম নামক একটি মুসলমান ভদ্রলোক জল তুলিবার কল প্রস্তুত করিয়াছেন। কলটি মিঃ হাসন ইমামের লোহার কারখানায় নির্ম্মিত হইয়াছে। বিহার অঞ্চলে এড়ির কারখানা চলিতেছে এবং অতি ক্ষিপ্রগতিতে এই শিল্পের প্রসার বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রদর্শনীতে এই রেশমের উৎপাদন প্রণালী প্রদর্শন করা হইতেছে। বিহারে এরণ্ডের চাষের উন্নতি ও প্রসার বৃদ্ধিরও চেষ্টা হইতেছে। কিছুদিনের মধ্যে এড়ি রেশমের চাষ বিহারের সর্ব্বত্র প্রচলিত হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে। বিহারের কৃষিসভা প্রদর্শনী দেখিবার জন্য ৩০০ কৃষককে আহ্বান করিয়াছেন এবং তাহাদিগের আহারাদির ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ২০০৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

ফাল্গুন মাস।

সব্জী বাগান।—তরমুজ, খরমুজ, শসা, ঝিঙ্গা প্রভৃতি যে সকল দেশী সব্জী চাষ মাঘ মাসে আরম্ভ হইয়াছে, তহা এই মাসে প্রায় শেষ করিতে হইবে। সব্জী ক্ষেত্রে জল সেচনের সুব্যবস্থা করিতে হইবে। চাঁপা নটে বীজ এই সময় বপন করিলে ও জল দিতে পারিলে অতি সত্বর নটে শাক পাওয়া যায়।

কৃষি-ক্ষেত্র।—ছোলা, মটর, যব, শরিষা, ধনে প্রভৃতি সমুদয় এতদিনে ক্ষেত্র হইতে উঠাইয়া গোলাজাৎ করা হইয়াছে। এই সময় ক্ষেত্র সকল চষিয়া ভবিষ্যতে পাট, ধান প্রভৃতি শস্যের জন্য তৈয়ারি করিয়া লইতে হইবে। ইক্ষু এই সময় বসান হইয়া থাকে।

ফলের বাগান।—ফলের বাগানে আম, লিচু, লকেট, পিচ প্রভৃতি ফল-বৃক্ষে জল দিবার ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কার্য্য নাই।

ফুলের বাগান।—এখন বেল, জুঁই, মল্লিকা প্রভৃতি ফুল গাছের গোড়া কোপাইয়া জল সেচন করিতে হইবে। কারণ এখন হইতে উক্ত ফুল গাছ গুলির তদ্বির না করিলে জলদি ফুল ফুটিবে না। জলদি ফুল না ফুটিলে ফুলে পয়সা হইবে না। ব্যবসার কথা ছাড়িয়া দিলেও বসন্তের হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুল না ফুটিলে ফুলের আদর বাড়ে না।

এই সময় টবে রক্ষিত পাতাবাহার, পাম প্রভৃতি ও মূলজ ফুল ও বাহারি গাছ সকলের টব বদলাইয়া দিতে হয়।

পান চাষ করিবার ইচ্ছা থাকিলে এই সময় পানের ডগা রোপণ করিতে হয়।

বাঁশ ঝাড়ের তলায় পাতা পড়িয়া সঞ্চিত হইয়া আছে, সেই পাতায় এই সময় আগুন লাগাইয়া পোড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। সেই ছাই বাঁশের গোড়ায় সারের কার্য্য করে, এবং নিম্ন-বঙ্গে যেখানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অধিক সেইখানে এই প্রকার বহুদূরব্যাপী অগ্নি জ্বালিলে গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি হয়।

ঝাড়ের গোড়া হইতে পুরাতন গোড়া ও শিকড় উঠাইয়া না ফেলিলে ঝাড় খারাপ হয়। আগুন দ্বারা পোড়াইলে এই কার্য্যের সহায়তা হয়। পুকুরের পাঁক মাটিতে বাঁশের খুব বৃদ্ধি হয়।

কৃষক

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসনের মুখপত্র

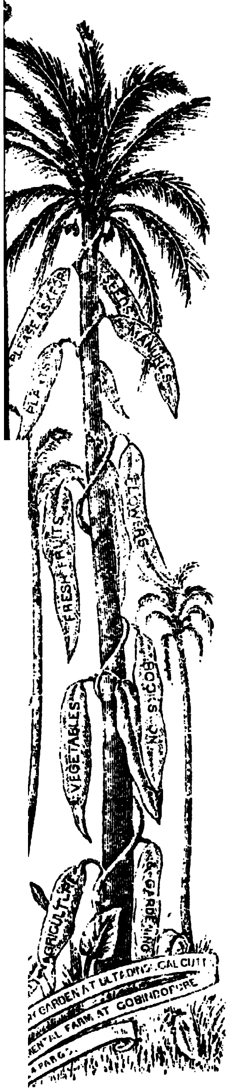
ফাল্গুন, ১৩১৬।

REGISTERED No. C. 192.

কৃষক।

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

দশম খণ্ড,—১১শ সংখ্যা।

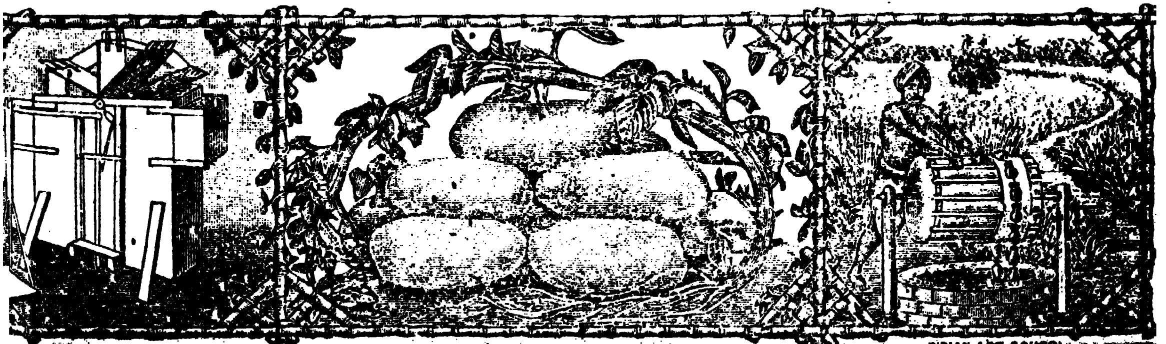


সম্পাদক—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস্।

ফাল্গুন, ১৩১৬।

কলিকাতা: ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েশন হইতে
শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা; ১৯৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, দি মিলার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
ই, স্পিরিটো দ্বারা মুদ্রিত।



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, স্থাপিত ১৩০১ বঙ্গাব্দ,

কৃষক।

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিকপত্র।

১০ম খণ্ড। | ফাল্গুন, ১৩১৬ সাল। | ১১শ সংখ্যা।

গবাদির রোগ।

গলাফুলা (Malignant Sorethroat)

শ্রীকুঞ্জবিহারি দে লিখিত।

গলাফুলা।—এই পীড়া স্থান বিশেষে গলঘটু, ঘটোরী, গলকণ্টক প্রভৃতি নামে কথিত হয়।

রোগ পরিচয়।—এই রোগ অতি সংক্রামক ও মারাত্মক। বাছুরের, ছোট ছোট গোরুর ও মহিষের এই রোগ হয়। সময়ে সময়ে বৃদ্ধ গোরুরও এই পীড়া হয়। মহামারি ১৫ দিনের বেশী থাকেনা। এই রোগে গলা ও জিহ্বা ফুলিয়া যায় এবং নিশ্বাস বন্ধ হইয়া রোগীর মৃত্যুঘটে। এই রোগ মানুষের হয় না। প্রধানতঃ এই রোগ মহিষগণকে আক্রমণ করে কিন্তু গোরুগুলিও ইহা হইতে নিষ্কৃতি পায় না।

কারণ।—ইহা বিশেষ বিষ জনিত। বর্ষা কালে এই রোগের প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয় কিন্তু বৎসরের যে কোন সময়ে এই রোগ হইতে পারে। জলাবৃত ভূমিতে ও জল নিঃসরণের বন্দোবস্ত না থাকাতে যে ভূমি কর্দ্দমাক্ত থাকে তাহাতে চরিয়া গোরু রোগগ্রস্তহয়।

রোগের অঙ্কুরায়মানাবস্থা।—কয়েক ঘণ্টা হইতে ৫।৬ দিন পর্য্যন্ত।

লক্ষণ।—অত্যুগ্র জ্বর; গলাফুলা; কর্ণের নিম্নস্থ প্রান্তে স্ফীতি; লালা নিঃসরণ; জিহ্বা স্ফীতি; কাশি; কষ্টে শ্বাস প্রশ্বাস নিক্ষেপ; আহারে কষ্ট; নাসিকা ও চক্ষুস্থ আবরক ঝিল্লি নিচয় লালবর্ণ। স্ফীতি ক্রমশঃই বৃদ্ধি পায়; রোগী আহার করিতে পারে না; প্রশ্বাসে ভয়ানক দুর্গন্ধ থাকে; জিহ্বা মুখের বাহিরে ঝুলিয়া পড়ে। জিহ্বা কালবর্ণ হয় ও জিহ্বাতে ক্ষত হয়। নাসিকা হইতে হরিদ্রাবর্ণ এক প্রকার শ্লেষ্মা নির্গত হয়।

লক্ষণ।—সময়ে সময়ে জিহ্বাতে গভীর ক্ষত হয়। স্ফীতি ক্রমশঃই বৃদ্ধি পায় এবং মুখ ও গলার সমস্ত অংশ ফুলিয়া যায়। এই সময়ে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া রোগীর প্রাণত্যাগ ঘটিতে পারে। এই রোগে স্ফীত স্থান বেদনাযুক্ত, কঠিন ও উত্তপ্ত হয়। চাপ দিলে কড় কড় শব্দ হয় না। কোন কোন রোগীর পাও ফুলিয়া যায়। কোন কোন স্থলে গলা ব্যতীত মুখে ও পায়ে ফুলা দেখা যায় এবং রোগী মৃদুভাবাপন্ন হয়। এই সময়ে রোগী কোঁথ পাড়িতে থাকে; পেটে বেদনা অনুভব করে; প্রস্রাব

রক্তবর্ণ হয় এবং উদরাময় ও আমাশয় হয়। রোগী ভয়ানক দুর্ব্বল ও নিস্তেজা হইয়া প্রাণত্যাগ করে। রোগের ভোগ কাল ১২ ঘণ্টা হইতে ১ দিন ; ৩।৪ ঘণ্টার মধ্যেও রোগী মরিতে পারে ; সময়ে সময়ে রোগী ৩।৪ দিন পর্য্যন্ত বাঁচে। শতকরা ৯০টী রোগী এই রোগে মরে। তড়কা ও বাদলা রোগের লক্ষণসকল প্রায় এই রোগের লক্ষণের ন্যায় বলিয়া উহাদের সহিত প্রায়ই এই রোগের ভুল হইতে পারে, দশ বার দিনের মধ্যে এই রোগের প্রাদুর্ভাব শেষ হয়।

চিকিৎসা—এই রোগে রোগী এত তাড়াতাড়ি মরে যে কাল বিলম্ব না করিয়া অগোণে চিকিৎসা করা উচিত।

রোগী গিলিতে পারিলে নিম্ন লিখিত ঔষধের যে কোনটী খাওয়াইয়া বিহিত করাইবে।

১। তৈল (মিঠা)	...	॥০	অর্দ্ধসের।
শুঁঠ চূর্ণ	...	८১০	কাঁচ্চা।
কুসুম কুসুম গরম ফেন	...	১¼	সের।
২। লবণ	...	৵০	ছটাক।
গন্ধক চূর্ণ	...	৵০	,,
গুড় (ইক্ষু)	...	৵০	,,
শুঁঠ চূর্ণ	...	८১০	কাঁচ্চা।
কুসুম কুসুম গরম জল		/২	সের।

অবস্থা বুঝিয়া নিম্ন লিখিত ঔষধের যে কোনটী ফেন ও ছাতুর সহিত খাওয়াইবে। ঐ ঔষধে রোগের আভ্যন্তরিক বীজ নষ্ট হইবে ও রোগী একটু বল পাইবে।

১। কার্ব্বলিক এসিড্ বা ফিনাইল		८১০	কাঁচ্চা।
দেশী মদ	...	৵০	পোয়া।
ফেন	...	১¼	সের।

একবারের ঔষধ—প্রতি ৩ ঘণ্টা অন্তর।

২। কাঠ কয়লার গুঁড়া	...	/০	ছটাক।
দেশী মদ	...	৵০	পোয়া।
ফেন	...	১¼	সের।

একবারের ঔষধ—প্রতি ৩ ঘণ্টা অন্তর।

৩। তার্পিন তৈল	...	८১০	কাঁচ্চা।
দেশী মদ	...	৵০	পোয়া।
ফেন	...	১¼	সের।

একবারের ঔষধ—প্রতি ৩ ঘণ্টা অন্তর।

৪। ধুতুরা	...	।৵০	আনা।
কর্পূর	...	৶০	আনা।
দেশী মদ	...	৵০	পোয়া।
ফেন	...	১¼	সের।

প্রথমোক্ত ১নং ঔষধটীতে অনেক স্থলে অধিক উপকার পাওয়া গিয়াছে।

গোগৃহে গন্ধক পোড়াইবে। স্ফীত স্থান গুলি উত্তপ্ত লৌহ দিয়া দাগাইয়া দিলে ফুলা আর বৃদ্ধি হইবে না। কাণের এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত ও চিবুক হইতে গলার পশ্চাৎ অংশ পর্য্যন্ত দাগাইয়া দিবে। পরে ঐ স্থানে নিম্ন লিখিত ফোস্কা কারক ঔষধের যে কোনটী মালিশ করিয়া দিবে। অধিক গভীর ভাবে স্ফীত স্থান গুলি পুড়িয়া গেলে পুঁজ জন্মিতে পারে এবং তাহাতে ক্ষতি হইতে পারে ইহা স্মরণ রাখিবে।

ফোস্কা কারক ঔষধ।

১। তেলা পোকা	...	১	ভাগ
মিঠা তৈল	...	৬	,,
মোম	...	৬	,,
২। জয়পালের তৈল	...	১	,,
মিঠা তৈল	...	১৬	,,

জিহ্বায় ঘা হইলে ১ ঘণ্টা অন্তর নিম্ন লিখিত ঔষধ দিয়া রোগীকে কুলকুচা করাইবে।

ফিটকারী	½ তোলা
সোহাগা	½ তোলা

হিরাকস	½	তোলা
গুড়	✓	ছটাক
জল	/১	সের

আধ ঘণ্টা অন্তর গুহ্য দ্বারে গরম জলের পিচকারী দিবে। ভাতের মাড়ের সহিত কিঞ্চিৎ লবণ মিশাইয়া রোগীকে খাইতে দিবে এবং খাদ্যের সহিত প্রত্যেক বারে /০ ছটাক দেশী মদ মিশাইয়া দিবে। রোগী খাইতে না পারিলে তরল পুষ্টিকর দ্রব্য খাওয়াইয়া দিবে। ঔষধ খাওয়াইবার সময় সাবধান হইবে যাহাতে রোগীর দম আটকাইয়া মৃত্যু না ঘটে।

দম আটকাইয়া প্রাণ হানির সম্ভাবনা দেখিলে পশু চিকিৎসকের সাহায্য লইবে।

অনেকে গুহ্য দ্বার দিয়া সংক্রামক বীজ নাশক উত্তেজক ঔষধ ও পুষ্টিকর বলকারক তরল খাদ্য বস্তুর পিচকারী দেয় এবং ইহাতে অনেক সময়ে উপকার পাওয়া যায়।

রোগ হওয়া মাত্রই পীড়িত পশুকে স্থানান্তরিত করিবে ও সংক্রামক রোগ নিবারক নিয়মাবলী সম্যক রূপে প্রতিপালন করিবে।

রোগ হওয়া মাত্র রাজদ্বারে পশু চিকিৎসকের জন্য আবেদন করিবে।

ভারতের দুরবস্থার কারণ।

শ্রীগুরুচরণ রক্ষিত লিখিত।

ভারতে দুর্ভিক্ষ নিত্য নৈমিত্তিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রতিবৎসর ভারতের একস্থানে না এক স্থানে দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই রহিয়াছে। এমন বৎসর গেলনা যে বৎসর হতভাগ্য ভারতীয় বহু প্রজা অনাহারে মরিলনা। "চির কল্যাণময়ী তুমি ধন্য, দেশ বিদেশে বিতরিছ অন্ন"। একথা আর ভারতের পক্ষে খাটেনা। ভারতের এখন আর সেদিন নাই ভারত এখন ভিখারিণী বেশে দ্বারে দ্বারে মুষ্টি ভিক্ষার জন্য লালায়িত। যে ভারত এক সময়ে আপন সন্তানদিগের অপর্য্যাপ্ত আহার যোগাইয়া দেশ বিদেশে শস্য প্রেরণ করিত আজ কিনা সেই চিরউর্ব্বরা শস্য শ্যামলা অন্নদায়িনী ভারত ভূমির সন্তানেরা 'হা অন্ন হা অন্ন" করিয়া জঠরানলে উন্মত্তবৎ দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। অতিথিবৎসল বলিয়া ভারতবাসীগণ চিরকাল পূজিত ও বিখ্যাত।

ভারতে কৃষি শিল্প বাণিজ্যাদির উন্নতি নাই। বিদেশী প্রতিযোগিতা ইহার কারণ বলিয়া অনেকে নির্দ্দেশ করেন কিন্তু ইহাই একমাত্র কারণ নহে। ইহার অন্যতম মূল কারণ "অতিরিক্ত সুদ গ্রহণ"। অতিরিক্ত হারে সুদ, সুদের সুদ, আবার তাহারই সুদ গ্রহণ করিয়া দাতা অধিকতর লাভবান হন বলিয়া ধনশালী ব্যক্তি তাঁহার সঞ্চিত অর্থ অপেক্ষাকৃত কম লাভের কার্য্য কৃষি বাণিজ্যে নিয়োজিত করিতে প্রস্তুত নহেন। এদিকে অতিরিক্ত হারে সুদের সুদ তাহার সুদ সহ গৃহীত ঋণের বহুগুণ আদায় দিতে বাধ্য হইয়া লক্ষ লক্ষ

সংসার সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে। ভারতে শতকরা বার্ষিক ১২৲ টাকা হইতে ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত হারে সুদ এবং তদুপরি সুদের সুদ তস্যসুদ আদালতে ডিক্রী হইতেছে এমনকি চুক্তি থাকিলে টাকা প্রতি দৈনিক /০ এক আনা হারে সুদও অবাধে ডিক্রী হয়। এরূপ অতিরিক্ত হারে সুদ গ্রহণই ভারতের সর্ব্বনাশ ঘটাইতেছে। যে সকল দেশে কৃষি বাণিজ্যাদির শ্রীবৃদ্ধি আছে, সে সকল দেশে এরূপ কসাই বৃত্তিতে সুদ গ্রহণের নিয়ম নাই। ব্যবসা বাণিজ্যে অর্জ্জিত লাভ অপেক্ষা সুদের হার সে সকল দেশে অনেক কম বলিয়াই তথায় ঋণের সাহায্যে বহুতর শিল্প বাণিজ্যাদির উন্নতি কল্পে অনুষ্ঠিত ব্যাপার হইয়া থাকে এবং শ্রমের বিনিময়ে লক্ষ্য লক্ষ্য ব্যক্তি অর্থোপার্জ্জনের সুবিধা পাইয়া থাকে। ভারতে শত করা ৮৬ জন কৃষি-জিবী এবং অন্ততঃ ৯ জন মধ্যবিত্ত। ইহাদের সংসার খরচের উপযোগী আয় অনেকেরই নাই, উদরান্নের অভাব এবং দৈব বিপদ হইতে তৎকালে রক্ষার জন্য ঋণ গ্রহণ তাহাদের পক্ষে অনিবার্য্য। ঋণ দাতা এই সময় সুযোগ মত অত্যধিক সুদ এবং সুদের সুদ চুক্তি করিয়া লয়। শ্রমের বিনিময়ে অর্থোপার্জ্জনের সুবিধা থাকিলে অনেকেই উপার্জ্জিত অর্থ হইতে ঋণ পরিশোধ করিতে সক্ষম হইবে।

এই রত্নগর্ভা ভারতভূমে স্বর্ণ, লৌহ, অভ্র, তাম্র, ইত্যাদি কত ধাতু, বহু পরিমাণ পাথুরিয়া কয়লা এবং মণিরত্নাদি নিহিত রহিয়াছে, তদ্ব্যতীত বহুবিধ কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন হইতে পারে। ভারত সন্তান বিদ্যাবুদ্ধি নিপুণতা দক্ষতায় অন্য কোন দেশবাসী অপেক্ষা নিকৃষ্টতর নহে। ভারতের আবশ্যকীয় অর্থ এখনও ভারতেই মিলিতে পারে, তবে সকলের নিকট অর্থ নাই। ব্যবসা বাণিজ্য ও শ্রম শিল্পাদির আবশ্যকীয় সর্ব্ববিধ দ্রব্যই যে রূপ বহুল পরিমাণে ভারতে পাওয়া যায় তদ্রূপ অন্য কোন এক দেশে পাওয়া যায় না। ভারতে শ্রমশীল লোকের অভাব নাই। অভাব কেবল শিক্ষা, উদ্যম,উদ্যোগ, আয়োজন এবং অনুষ্ঠানের। যাহাদের অর্থ আছে তাহাদের কেহ কেহ সঞ্চিত অর্থ লৌহ সিন্দুকের মধ্যে রাখিয়া সুখানুভব করিতেছেন। কৃষি বাণিজ্যাদিতে যাহাদের উৎসাহ এবং দক্ষতা আছে তাহাদের অর্থ নাই। যদিও সম্প্রতি ধনী ও দক্ষদলের সম্মিলন কিঞ্চিৎপরিমাণে ঘটিতেছে তথাপি বলাবাহুল্য এই উভয়ের সম্যক সম্মিলন ঘটাইতে না পারিলে ভারতের ভাগ্যে অর্থাগমের সম্ভাবনা নাই। জলাভাবে প্রতি বৎসর কতশস্য ননষ্ট হয়। ঐ সমস্ত উদ্যোগী লোকের হস্তে অর্থ থাকিলে তাহারা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াই পুষ্করণী, খাল, বিলাদির পঙ্কোধার করিয়া জল সেচনের ব্যবস্থা করিয়া লইত। অর্থাভাববশতঃই করিতে সক্ষম হয় না। জল সঞ্চিত রাখিবার তেমন ব্যবস্থা না থাকায় দুর্ব্বৎসরে শস্যোৎপাদনের ব্যাঘাত ঘটে এবং বৎসর বৎসর দুর্ভিক্ষ ভারতে অধিকার বিস্তার করিয়া থাকে। অর্থাভাববশতঃ অনেকের উদর পুরিয়া আহার মিলে না বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে বাস করিবার শক্তি নাই, কাজেই, ম্যালেরিয়া, বিসুচিকা, প্লেগাদি মড়ক তাহাদিগের বিনাশ সাধন করিয়া বংশ লোপের হেতু হইতেছে।

যদি ভারতবাসীকে বাঁচাইতে চান তবে ধনী ও জমিদারগণ সচেষ্ট হউন। যদি একক কেহ কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে না চান তবে জাতীয় ধন ভাণ্ডার হইতে কৃষি বাণিজ্যের উন্নতি কল্পে, কৃষি সৌকর্য্যার্থে বা রোগ নিবারণার্থে খাল বিলাদির সংস্কার ও জলাশয় প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ সাহায্য করা হউক এবং ধনভাণ্ডার অক্ষুন্ন রাখিবার

জন্য অর্থ সংগৃহীত হইয়া তাহাতে সঞ্চিত হউক। ভারতের সঞ্চিত অর্থ যাহাতে শ্রম-শিল্প, কৃষি বাণিজ্যাদিতে ব্যয় হয়, এরূপ ব্যবস্থার নিতান্ত প্রয়োজন। ভারতের শতকরা ৯৫ জন ব্যক্তি যাহাতে কয়েক জন ঋণ দাতার কবলে ধ্বংস না হয়, এবং ঋণ দাতৃগণ যাহাতে অতিরিক্ত ও অসঙ্গত হারে সুদ আদায়ের সুযোগ পাইয়া তাহাদের শোণিত শোষণে তৃপ্তিলাভ করিতে না পারে এরূপ ব্যবস্থাও অনতি বিলম্বে আবশ্যক। যে সকল দেশে কৃষি বাণিজ্যাদির শ্রীবৃদ্ধি আছে, সে সকল দেশে যে হারে সুদের প্রচলন আছে, তদতিরিক্ত হারে সুদ ও সুদের সুদ এবং আসলের অতিরিক্ত পরিমাণ সুদ যাহাতে আদালতে ডিক্রী না হয়, এরূপ আইন ব্যতীত ভারতবাসীকে রক্ষা করিবার জন্য উপায় নাই। রাজা ব্যতীত কেহ প্রজা রক্ষা করিতে পারে না। গভর্ণমেণ্ট এবিষয়ে কেন উদাসীন আমরা তাহার কারণ জানি না; যাহা হউক গভর্ণমেণ্ট যাহাতে বুঝেন যে সুদের দায়ে প্রজা অস্থির হইয়াছে, এরূপ আন্দোলন প্রয়োজন। কংগ্রেস যদি জন সাধারণের কংগ্রেস হয় তবে উহাতে ইহার তীব্র আলোচনা হওয়া আবশ্যক। যাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতবাসীর হিতৈষী এবং ভারতের কল্যাণ কামনা করেন তাঁহাদিগের নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। কেবল স্বদেশী আন্দোলনের হুজুগে মাতিয়া থাকিলে ভারতোদ্ধার হইবে না।

প্রাচীন ভারতে কাচ-প্রস্তুত।

এখন আমরা সকল কাজেই পিছাইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু এককালে সকল কাজেই ভারতবর্ষ অগ্রণী ছিল।

আজকাল কাচের শিশি, কাচের বোতল বা কাচের কোনও দ্রব্য আবশ্যক হইলে, প্রায়ই আমাদিগকে বিদেশের মুখাপেক্ষী হইতে হয়। কিন্তু কাচ-প্রস্তুত-প্রণালী যে কত প্রাচীন কাল হইতে ভারতবাসী বিদিত ছিলেন, তাহার ইয়ত্তা হয় না। এ কথা যে কেবল আমরা বলিতেছি, তাহা নহে। পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণও কখনও এ কথা অস্বীকার করিতে পারেন নাই।

প্লিনী প্রমুখ ইউরোপের প্রাচীন লেখকগণের গ্রন্থাদি পাঠে স্পষ্টতঃই প্রতীত হয়, পুরাকালে ভারতবর্ষ হইতেই পৃথিবীর সর্ব্বত্র কাচ-নির্ম্মিত উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি রপ্তানি হইত। ভারতবর্ষে আজিও যে সকল প্রাচীন কাচের দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে বেশ উপলব্ধি হয়,—কাচের ব্যবসায়ে ভারতবর্ষ কোন স্মরণাতীত যুগ হইতেই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। কি প্রণালীতে যে তৎকালে এদেশে কাচ প্রস্তুত হইত, তাহা নির্ণয় করা এখন দুঃসাধ্য বটে; কিন্তু কাচ-নির্ম্মিত যে সকল প্রাচীন দ্রব্যাদি এখন দৃষ্ট হয়, তাহাতে, প্রাচীন ভারতের কাচ-প্রস্তুত সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতারই পরিচয় পাওয়া যায়। কনিংহাম সাহেব রাউলপিণ্ডির নিকট একটী কাচের স্তম্ভ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। খৃষ্টজন্মের যে কত পূর্ব্বে উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাহা নির্ণয় করিতেই পারেন নাই। প্রাচীনকালের স্তম্ভসমূহে কাচের ছিপিযুক্ত

অনেকগুলি পাত্র পাওয়া গিয়াছে। সেগুলিও যে কত কালের, তাহা নির্ণয় হয় না। কাচের বালা বা চুড়ি বিগত তিন শত বৎসরের অধিক কাল এদেশে প্রচলিত। ভারতে মোগলরাজত্বের সময়ও কাচের চুড়ীর প্রচুর প্রচলন ছিল। পূর্ব্বে কাচের দ্রব্যাদির জন্য কখনও ভারতবর্ষকে বিদেশের মুখাপেক্ষী হইতে হয় নাই। তখন সামান্য সামান্য পুঁজিতেই লোকে কাচের ব্যবসার চালাইত এবং তদ্দ্বারা তাহারা জীবিকার্জ্জনে সমর্থ হইত। চুড়ি-প্রস্তুত-কার্য্যে ভারতবাসীরা তখন বিশেষ শিল্প-নৈপুণ্যেরই পরিচয় দিত। আজিও যুক্তপ্রদেশের নাজিরাবাদে, বেনারাসে ও নাগিনায়ে এবং এই বঙ্গদেশেরও নানাস্থানে সামান্য সামান্য লোকে কাচের যে সকল দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ করে, তাহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নাজিরাবাদ, বেনারস এবং নাগিনায় যে সকল কাচের শিশি প্রস্তুত হয়, ঔষধ, আরক এবং সুগন্ধি দ্রব্য রক্ষার পক্ষে তাহা বিশেষ উপযোগী। পানিপথ এবং কাশীতে যেরূপ ভাবে কাচের আরসী প্রস্তুত হয়, তাহাও প্রাচীন কালের স্মৃতিচিহ্নরূপে বিদ্যমান।

এতকাল পুরাতন পদ্ধতিক্রমেই চলিতে ছিল। কিন্তু গত পঁচিশ ত্রিশ বৎসর হইতে সকলই উল্টাইয়া গিয়াছে। আগে আগে সামান্য সামান্য মূলধনে সাধারণ লোকে তাহা সম্পন্ন করিতে-ছিল, এখন অধিকতর মূলধনে যৌথ কারবারে বৈদেশিক পদ্ধতিতে তাহাই সম্পন্ন করার চেষ্টা চলিয়াছে। পাশ্চাত্য পদ্ধতির অনুসারে প্রথমে বঙ্গদেশে সোদপুরে ও টিটাগড়ে দুইটী কাচ প্রস্তুতের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু অল্প-দিন মধ্যেই সে কল দুইটী উঠিয়া যায়। সে দুই-কলের সাজ-সরঞ্জাম কিনিয়া লইয়া গোয়ালিয়রে 'গ্লাস ওয়ার্কস্' কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সময় দেরাদুনেও একটী কাচের কল স্থাপিত হইয়া-ছিল। কিন্তু ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে সেটী উঠিয়া যায়। সেই কলও এক্ষণে পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলিয়াছে। অম্বালা এবং সিন্ধু প্রদেশের হায়দ্রাবাদে কাচ-নির্ম্মাণের কল দুইটী বসিয়াছিল; সেই দুইটী এক হইয়া এক্ষণে অম্বালার কাজ চলিতেছে। অন্যান্য কাচের কলের মধ্যে—মাদ্রাজের একটী কল তিন চারি বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছে; সেটীর কাজ এখন বেশ চলিতেছে। যুক্তপ্রদেশের ফেরোজাবাদের দুইটী কলও চলিতেছে ভাল। এতদ্ভিন্ন এখন আবার যশোবন্ত নগর, কালা-কাঙ্কার, পানিপথ, হরিদ্বার, বক্সার প্রভৃতি নানাস্থানে কাচ-প্রস্তুতের কল প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলিয়াছে। এখনও পর্য্যন্ত বহু টাকার কাচের দ্রব্য এদেশে আমদানী হইতেছে। ১৯০৫-০৬ খৃষ্টাব্দে এদেশে ৩৯ লক্ষ টাকার বিলাতি চুড়ী আসিয়াছিল। তৎপর বৎসর আরও বৃদ্ধি ৪৩ লক্ষ টাকার। ১৯০৬-০৭ সালে এক ক্রোর কুড়ি লক্ষ

টাকার কাচ নির্ম্মিত দ্রব্য এ দেশে আসিয়াছে। যে দেশের কাচের দ্রব্য এক কালে অন্য দেশে চালান যাইত সে দেশের এখন এই অবস্থা। তখন এত কল কারখানার বাড়াবাড়ি ছিল না। যাহা হউক এখন এদেশের আবশ্যক মত কাচের দ্রব্যাদি যদি এদেশেই প্রস্তুত হয় তাহাহইলে কত লাভ তাহা সহজেই অনুমেয়। এদিকে আমেরিকা ও ইউরোপ হইতে অনেকে কাচ প্রস্তুত প্রণালী শিখিয়া আসিতেছেন এবং বহু কল কারখানা প্রস্তুতের চেষ্টা হইবে। ইহাতে লাভ আছে বটে কিন্তু ক্ষতি ও যে নাই তাহা নহে। কালে ক্রমশঃ হাতের কাজ উঠিয়া যাইবে কলে প্রস্তুত কাচের দ্রব্য সহজে ও সুলভে মিলিবে। প্রকৃত শিল্পীর শিল্প নৈপুণ্য প্রকাশের অবসর থাকিবে না। সুবিখ্যাত শিল্পী বংশধরেরা আর সুনিপুণ শিল্পী হইবে না, কল চালাইবার জন্য কাজের লোক হইবেন মাত্র। ভারত চির দিনই হাতের কাজের জন্য গৌরবান্বিত। সেই গৌরব বোধ হয় অধিক দিন অক্ষুন্ন থাকিবে না। আবার পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় এই ভারতে শ্রমী সম্প্রদায়ের সহিত ধনী দলের দ্বন্দ্ব বাধিবে না বা নূতন হাহাকারের সৃষ্টি হইবেনা এ কথা বা কে বলিতে পারে? শ্রী ব,

মৎস্য সংখ্যা বৃদ্ধির উপায়।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

পাঠক বর্গের মধ্যে আড় মৎস্য অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন, কিন্তু কি কৌশলে আড় মৎস্যের ডিম্ব হয় ও ডিম্ব ফুটিয়া মৎস্যে পরিণত হয়, তাহা হয়ত অনেকেই জানেন না।

ডাক্তার ডে এবং টমাস সাহেব* উভয়ে, একত্রিত হইয়া প্রায় পঞ্চশত আড় মৎস্য পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, ইহারা মুখ গহ্বরে ডিম্বাণু রাখিয়া তা দিয়া থাকে। স্ত্রী জাতীয়া আড় কোন মৃত্তিকা গহ্বরে কখন ডিম্ব প্রসব করে না। ইহাদের উদর প্রদেশস্থ ডানা ঠিক বাটীর আকারে গঠিত, এবং ইহারা ঐ বাটী দ্বয়ে ডিম্ব প্রসব করে। ডিম্বাণু প্রস্ফুটিত হওয়া পর্য্যন্ত ঐ বাটীর মধ্যেই থাকে, প্রস্ফুটিত হইলে পর, পুংজাতীয় আড় মৎস্য ইহাদিগকে মুখ গহ্বরে রাখিয়া তা দিতে থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে পর্য্যন্ত ইহারা অৰ্দ্ধ ইঞ্চি পরিমিত না হয়, অর্থাৎ সম্পূর্ণ রূপে তা দেওয়ার কার্য্য সমাধা না হয়, ততক্ষণ ইহারা কিছুই আহার করে না। অনন্ত করুণাময়ের অনন্ত রাজ্যে যে কত প্রকার জন্তু আছে এবং প্রত্যেকের উৎপত্তি বৃত্তান্তই বা কি প্রকার, তাহা আলোচনা করিলে অবাক হইতে হয়!

ইতি পূর্ব্বেই স্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে যে, রোহিত, মিরগেল, কাতলা, বাটা প্রভৃতি সুখাদ্য মৎস্য স্থান অপরিবর্তনশীল শ্রেণীর অন্তর্গত। জেলেগণ বড় বড় নদী হইতে উল্লিখিত মৎস্য সমূহের ডিম্বাণু সংগ্রহ করিয়া থাকে। বর্ষা ঋতুতে যখন নূতন জলে নদী সমূহ পরিপূর্ণ হইয়া

* Vide, The Rod in India. Chapter XXI. page, 259.

যায় সেই সময়ে ইহারা ডিম্ব প্রসব করে। আষাঢ় মাসের প্রথমে কিম্বা অম্বুবাচীর সময়ে যে সকল ডিম্ব (দামোদর নদী হইতে) প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট; দেখা গিয়াছে, জেলেগণ ঐ সময়ে কয়েক দিন যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিয়া ডিম্বাণু সংগ্রহ করিয়া থাকে, এবং অন্যান্য সময়ের ধৃত ডিম্বাণু অপেক্ষা এই সময়ের ডিম্বাণু ইহারা অত্যন্ত বেশী মূল্যে বিক্রয় করে। আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি এই সময়ের সংগৃহীত ডিম্ব বেশ সতেজ ও সজীব, জলাশয়ে ছাড়িলে ইহার প্রায় একটীও নষ্ট হয় না, সমস্তই ফুটিয়া থাকে এবং পোনা সমূহ শীঘ্র শীঘ্র পরিবর্দ্ধিত হয়। অতএব সেই সময়ে ডিম্বাণু সংগ্রহ করা উচিত। আবার গঙ্গার ডিম অপেক্ষা দামোদরের ডিমের মাছ শীঘ্র বাড়ে ইহাও জেলেরা বহু পরীক্ষা দ্বারা জানিয়াছে, ডিম্বাণু সকল জলের ফেণার সহিত মিশ্রিত হইয়া জলোপরি ভাসিতে থাকে, কাপড় কিম্বা এই উদ্দেশ্যে যে এক রকম জাল প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহা দ্বারা ধরিতে হয়। নূতন জল প্রাপ্ত হইয়া নানা জাতীয় মৎস্য এই সময়ে ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে, অতএব মৎস্য বিশেষের ডিম্ব বাছিয়া লওয়া বড় সহজ কথা নহে, সকল ডিমই একত্রিত হইয়া জলোপরি ভাসিতে থাকে। আমাদিগের বহু দর্শনের দ্বারা এবং এতদ্দেশীয় জেলেদিগের নিকট হইতে ডিম্ পরীক্ষা সম্বন্ধে যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি তাহাতে জানা যায় যে, যত জাতীয় ডিম্ব হউক না সমস্তই সংগ্রহ করিয়া একটি জল পাত্রে রাখিয়া দিতে হয়, তৎপর জল পাত্রের উপর একখানি কাপড় বিছাইয়া যদি ক্ষণকাল বন্ধ করিয়া রাখা যায়, তবে দেখা যায়, রোহিত, মিরগেল, কাত্‌লা বাটা প্রভৃতি সুখাদ্য মৎস্যের ডিম্বাণু হইলে ইহারা অল্প সময়ের মধ্যেই এক স্থলে মিলিত হইয়া জমাট বাঁধিবে, যদি কোন প্রকার পোকা কি অন্যান্য মৎস্যের ডিম্ব হয়, তাহা হইলে তাহারা একত্রে কখনই জমাট বাঁধে না। এতদ্ভিন্ন রোহিত মিরগেল কাত্‌লা, বাটা প্রভৃতি মৎস্যের ডিম্বাণুর বর্ণ বিশুদ্ধ তাম্রের ন্যায়। আমাদিগের পরিচিত কোন এক ব্যক্তি জেলেদিগের নিকট হইতে এক ভার ডিম্ব ক্রয় করিয়া স্বীয় পুকুরে ছাড়িয়াছিলেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই; ১৫ দিবস পরে দেখা গেল, ঘুসোচিংড়িতে পুকুরটি একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক উল্লিখিত উপায়ে ডিম্বাণু সংগ্রহ ও পরীক্ষা করিয়া ভাল ভাল সুখাদ্য মৎস্যের ডিম্ব পুকুরে ছাড়িলে অনায়াসে মৎস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

প্রায় সকল পুকুরেই ডিম্ব ফুটিয়া থাকে, তবে যে সকল পুকুরের জল অত্যন্ত পরিষ্কার, এবং মৎস্যের খাদ্যোপযোগী কোন পদার্থই থাকে না, অধিকন্তু শোল, শাল, বোল, চিতল প্রভৃতি হিংস্র জাতীয় মৎস্য থাকে, তাহাতে ডিম্ব ফুটনের আশা করা যাইতে পারে না। নূতন পুকুরে ডিম্ব সহজে ফুটে, কারণ, পুকুর কাটিলে কিম্বা পঙ্কোদ্ধার করিলে, মৃত্তিকা হইতে যবক্ষারাম্ল, প্রস্ফরস্যামিল-তাম্ল ইত্যাদি পার্থিব পদার্থ অনায়াসে চুয়াইয়া জলের সঙ্গে মিশ্রিত হইতে পারে এবং হিংস্রক মৎস্যাদি একেবারেই থাকে না। মৎস্যের চাষ করিতে হইলে জলাশয়ের প্রতি মনোযোগ রাখা কর্ত্তব্য। জলাশয়ের জল বিশ্লেষণ করিয়া লইতে পারিলে খুব ভাল হয়। এতদ্ভিন্ন মধ্যে মধ্যে পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করা কর্ত্তব্য, এবং যাহাতে কোন প্রকার বিষাক্ত পদার্থ জলে না থাকে কিম্বা কোন রকম বিষাক্ত গাছ গাছড়া পুকুরের তটে না থাকিতে বা জন্মাইতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করা উচিত। শাল, শোল, বোল প্রভৃতি কতক গুলি

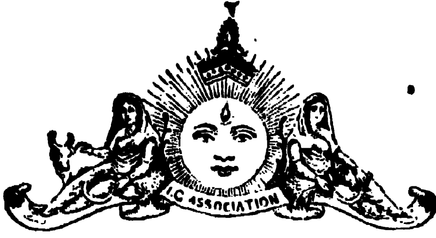
হিংস্র জাতীয় মৎস্য আছে, ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য ও মৎস্যের পোনার প্রতি বড় অত্যাচার করিয়া থাকে। যে পুকুরে মৎস্যের চাষ করিতে হইবে, তাহাতে উল্লিখিত হিংস্র জাতীয় মৎস্য যাহাতে বাস না করিতে পারে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। হিংস্র জাতীয় মৎস্য, মৎস্য চাষের পুকুরে থাকা, আর মেষের পালে ব্যাঘ্র থাকা একই কথা।

ডিম্ব ফুটাইয়া মৎস্যের পোনা জন্মাইবার আর একটি সহজ উপায় আছে। একটু বড় রকমের একটি চৌবাচ্চা প্রস্তুত করিয়া তাহার তলা এবং চতুর্দ্দিক ইষ্টকের দ্বারা বান্ধাইয়া, তৎপর এক ভাগ বিলাতী মৃত্তিকা ও নয় ভাগ বালু মিশ্রিত করিয়া তাহা দ্বারা পলাস্তার্ করিতে হইবে। চৌবাচ্চাটির তলাতে কি অন্য কোন দিকে কৌশল করিয়া এমন ভাবে দুটি ছিদ্র রাখা উচিত যে তাহা দ্বারা অনায়াসে চৌবাচ্চায় জল আনয়ন ও পুরাতন জল বাহির করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। এই জল পরিবর্ত্তন করিবার সময়ে মৎস্যের পোনার উপর যেন কোন রকম অত্যাচার না হয়। এই জন্য চৌবাচ্চার এক পার্শ্বে একটি দরজা *(Penstock)* রাখা আবশ্যক, উক্ত দরজা উত্তোলন করিলে জলের সঙ্গে পোনা সমূহ অনায়াসে সন্নিকটস্থ অন্য আর একটি জলপাত্রে যাইতে পারে। উল্লিখিত উপায় অবলম্বন করিলে ডিম্বাণু নষ্ট হইবার আশঙ্কা খুব কম। চৌবাচ্চাতে ডিম্ব ছাড়িবার সাত আট দিন পরে, ডিম্বাণু সকল ফুটিলেও, পরিবর্দ্ধিত করিবার জন্য কয়েক দিন চৌবাচ্চাতে রাখা আবশ্যক। এই সময়ে পোনার খাদ্যের জন্য ময়দা, চাউলের গুঁড়া কি নানা প্রকার ছাতু প্রদান করা উচিত। ইহার পর অনায়াসে অন্য পুকুরে স্থানান্তরিত করা যাইতে পারে। এইরূপ চৌবাচ্চা প্রস্তুত করিয়া সকলেই যে ডিম ফুটাইতে পারিবেন এরূপ আশা করা যাইতে পারে না, অতএব অন্য আর একটি উপায় নিম্নে লিখিত হইল।

প্রথমতঃ, ফাল্গুন কি চৈত্র মাসে, পুকুরে পাঁক থাকিলে তাহা উদ্ধার করিতে পারিলে ভাল হয়। যদি একান্তই পঙ্কোদ্ধার করিতে পারা না যায়, তবে সে সময়ে পুকুরে যে কোন জাতীয় মৎস্য থাকুক না, তাহা ধরা উচিত। ইহার পর সুবিধা ও সময়ানুসারে নানা জাতীয় সুখাদ্য মৎস্যের ডিম্বাণু কিম্বা পোনা সংগ্রহ করিয়া পুকুরে ছাড়িতে হইবে। অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে, প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপে ডিম্বাণু সমূহ একেবারে শুষ্ক হইয়া কি পুড়িয়া যায়, এবং কখন কখন অত্যন্ত বৃষ্টি হওয়াতে ডিম্বাণু সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে কিম্বা শীতে প্রস্ফুটিত হইবার অনেক ব্যাঘাত জন্মায়, অতএব পুকুরে মৎস্যের ডিম্ব ছাড়িয়া ইহাদিগকে শীতোত্তাপ হইতে রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য। শীতোত্তাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য পুকুরের মধ্য প্রদেশেই হউক, কি অন্য কোন প্রান্তে হউক চারিটি খুঁটি পুঁতিয়া একটি "মাচা" প্রস্তুত করিয়া দিলেই হইতে পারে। চৌবাচ্চার ন্যায় পুকুরেও ডিম্ব ছাড়িবার সাত আট দিন পরে ডিম্বাণু সকল ফুটিলে পর, মৎস্যের পোনা একটু বৃদ্ধি হওয়া পর্য্যন্ত ঐ পুকুরে রাখিলেই ভাল হয়, এবং

এই সময়ে পোনার খাদ্যের জন্য ময়দা, চালের গুঁড়া ও নানা প্রকার ছাতু প্রদান করা আবশ্যক। তৎপর অন্য কোন পুকুরে স্থানান্তরিত করা উচিত, এইরূপ স্থানান্তরিত করাকে এতদ্দেশে "মাছ চালা" বলে। মৎস্য চালিয়া অন্য পুকুরে ফেলিবার পূর্ব্বে, পুকুর পূর্ব্বলিখিতানুরূপ সংস্কার করিয়া নানা জাতীয় হিংস্র মৎস্য দূর করিতে যেন ভুল না হয়। জলাশয়ের জলকর অনুসারে মৎস্যের পোনা ছাড়া এবং মধ্যে মধ্যে খাদ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। খাদ্য সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা বারান্তরে করা যাইবে।

আহারের ন্যায় অঙ্গ সঞ্চালন বা ব্যায়াম শরীর বৃদ্ধির আর একটি প্রধান উপায়। শ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্য হইতে ইতর প্রাণী কীটাণু পর্য্যন্ত সকলেই ন্যূনাধিক স্ব স্ব শরীর চালনা করিয়া থাকে। করুণাময় পরমেশ্বর নিকৃষ্ট প্রাণীদিগকে কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়মের বশবর্ত্তী করিয়া রাখিয়াছেন। ইহারা তদনুসারে স্ব স্ব শরীর চালনা করিয়া পরিবর্দ্ধিত হয় ও সুস্থ থাকে। ইহাদিগকে আহার অন্বেষণ করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য, যতটুকু পরিশ্রম করিতে হয়, তাহাতেই এক রকম ব্যায়ামের কার্য্য সাধিত হয়। যাহা হউক পুকুরে মৎস্য জন্মাইয়া শুধু আহার দিলে চলিবে না, মধ্যে মধ্যে পুকুরে জাল ফেলিয়া কি অন্য কোন প্রকারে ইহাদিগকে তাড়া দেওয়া উচিত্। কারণ, ইহারা অনায়াসে আহার প্রাপ্ত হয় বলিয়া বেশী অঙ্গ সঞ্চালন করে না, কাজেই নিতান্ত অলস হয়, এবং তজ্জন্য ইহাদিগের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিবর্দ্ধিত হয় না। সময়ে সময়ে তাড়া দিলে ইহারা ভয়ে পুকুরে দৌড়াইতে থাকে। অনেকেই হয়ত দেখিয়া থাকিবেন, রেলওয়ের নিকটস্থ পুকুরগুলির কিম্বা জলপুকুরের মৎস্য অত্যন্ত পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। রেলগাড়ীর যাতায়াতের ভয়ানক শব্দ শুনিয়া বা দিবানিশি তালবন্তের "খড় খড়" শব্দে ইহারা ভয়ে পুকুরে দৌড়াইতে থাকে। এই ধাবন বা অঙ্গ সঞ্চালনই ইহাদিগের শরীর বৃদ্ধি হইবার প্রকৃত কারণ। মৎস্য সমূহ জলচর জীব বলিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন যে, ইহাদিগকে শীতে ক্লেশ পাইতে হয় না। স্থলচর কিম্বা জলচর যে জাতীয় জন্তুই বল না কেন, শীতের হস্ত হইতে কেহই পরিত্রাণ পায় না, এবং শীতকালে সাধারণতঃ সকল জন্তুই একটু বেশী নিস্তেজ হয়, অতএব শীত ঋতুতে মৎস্যদিগকে বেশী তাড়া দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে যে, পুকুরের নিকট রজকের বাসস্থান থাকা ভাল, রজকের দ্বারা দুইটি কার্য্য সাধিত হইতে পারে; রজকগণের কাপড় "কাচার" শব্দে মৎস্যকুল ভীত হইয়া সাধারণতঃ দৌড়াইয়া থাকে, এবং এই অঙ্গচালনায় ইহারা বেশ পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন মলিন বস্ত্রের ময়লা, ক্ষার প্রভৃতি খাদ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বড় বড় দীর্ঘিকায় এক খানি ছোট রকমের নৌকা রাখিয়া সময়ে সময়ে বেড়াইলে, জলক্রীড়া ও মৎস্যকে তাড়া দেওয়া উভয় কার্য্যই অনায়াসে সাধিত হইতে পারে।



ফাল্গুন—১৩১৬।

সঙ্কর উৎপাদন।

আমরা সাধারণতঃ বৃক্ষের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই না। আম গাছ সেই এক ভাবেই অঙ্কুর হইতে উৎপাদিত হইয়া পরিপুষ্ট হয় এবং পরিপুষ্ট হইলে বৎসরের সেই এক সময়েই একই প্রকার ফল উৎপাদন করে। কিন্তু সচরাচর কোন পরিবর্ত্তন দৃষ্টিগোচর না হইলেও পরিবর্ত্তন যে হয় না তাহা নহে। পরিবর্ত্তনগুলি প্রথমতঃ অতি সামান্য বলিয়া আমাদের গোচরীভূত হয় না। প্রত্যেক বৃক্ষ অথবা প্রত্যেক প্রাণীর জীবনে দুইটি মহান শক্তি কার্য্য করিতেছে। প্রথমটির উদ্দেশ্য, নবজাত প্রাণী অথবা উদ্ভিদের বংশগত লক্ষণ সমূহের পুনরাবৃত্তির এবং দ্বিতীয়টির উদ্দেশ্য, পারিপার্শ্বিক অবস্থা সমূহের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া জীবের স্বভাব ও গঠনের পরিবর্ত্তন। স্থান কাল পরিবর্ত্তনের সহিত সকল উদ্ভিদেরই অল্প বিস্তর পরিবর্ত্তন হয়। আলু, কপি প্রভৃতি ফসল আজ কাল যেরূপ ভাবে পরিপুষ্ট হইয়াছে ইহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সেরূপ ছিল না। বস্তুতঃ বন্য কপি ও আলুর সহিত কর্ষণোৎপাদিত আলু ও কপির তুলনা করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

একটি একটি উদ্ভিদ্ কিরূপ ও কত প্রকার বিবর্ত্তন স্তরের মধ্য দিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে তাহা এক এক সময় তাহাদিগের হঠাৎ পরিবর্ত্তন হইতে বুঝিতে পারা যায়। একটি গোলাপ ফুলের পাপড়ির স্থানে পত্র হইয়া গেল। কেন এরূপ হইল। ইহার দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে পাপড়ি পত্রের রূপান্তর মাত্র। এস্থলে গোলাপ ফুল বিবর্ত্তনের পথে অগ্রসর না হইয়া পুনরাবর্ত্তনের পথে পশ্চাদ্গামী হইয়াছে। এইরূপে উদ্ভিদ্ দেহে বহুকাল সঞ্চিত শক্তি সমূহের নানা প্রকার সমাবেশে এক এক সময় আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ফল উৎপাদিত হইয়া থাকে। যাঁহারা কোন নির্দ্দিষ্ট উদ্ভিদের জীবন ইতিহাস অবগত নহেন তাঁহাদের পক্ষে উক্ত উদ্ভিদে পূর্ব্বোক্ত প্রকার পরিবর্ত্তন, প্রকৃতির অব্যবস্থিত চিত্তের উদাহরণ বলিয়া মনে হয়।

আজ কাল যে উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদ সমূহ দেখিতে পাওয়া যায় সে সমুদয় বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদের সঙ্কর উৎপাদন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সকলের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া থাকিবার শক্তির দ্বারা উৎপাদিত হইয়াছে। হয়তঃ কোন নির্দ্দিষ্ট জাতীয় দুই প্রকারের দুইটি গাছ আদৌ পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য করিয়া থাকিবার উপযোগী নয়, কিন্তু তাহাদিগের দ্বারা উৎপাদিত সঙ্কর উক্ত অবস্থায় টিকিয়া থাকিতে পারে। এরূপ স্থলে উক্ত দুই প্রকার উদ্ভিদের বংশ রক্ষার একমাত্র উপায় সঙ্কর উৎপাদন। উদ্ভিদ্ ইতিহাসে পূর্ব্বকালে এরূপ অসংখ্য সঙ্কর উৎপাদিত হইয়াছে এবং বর্ত্তমান সময়ে আমাদের অলক্ষ্যে হইতেছে। আমরা বলিতেছি অলক্ষ্যে হইতেছে, কিন্তু জগতের সকলেই দৃষ্টি শূন্য নহে। আমেরিকাবাসী লুথার বরব্যাঙ্ক প্রায় অমানুষিক দৃষ্টির বলে উদ্ভিদ্ জগতের সমস্ত পরিবর্ত্তনই দেখিতে পান এবং অদ্ভুত কৌশল, অধ্যবসায় ও মার্জ্জিত বুদ্ধির বলে উক্ত পরিবর্ত্তন

শক্তির দ্বারা বিস্ময়কর ফল উৎপাদন করিতে পারেন। আজকাল সেই জন্য সভ্য জগতে তাঁহাকে উদ্ভিদ্ জগতের যাদুকর বলিয়া গণ্য করিয়া থাকে।

আমরা অগ্রেই বলিয়াছি যে পূর্ব্বে লোকে, উদ্ভিদ্ সমূহের বর্ণ, আকৃতি, গঠন প্রণালী কিম্বা গন্ধের পরিবর্ত্তন সমূহকে প্রকৃতির খেয়াল বলিয়া মনে করিত। কিন্তু এই খেয়ালের মধ্যে যে নির্দ্দিষ্ট প্রণালী আছে কিম্বা কোন বিপুল বুদ্ধি সম্পন্ন উদ্ভিদ্ তত্ত্ববিদ উক্ত প্রণালীর সাহায্যে যে কোন নির্দ্দিষ্ট উদ্ভিদের স্বভাব, অবয়ব প্রভৃতি স্ববশে আনিতে পারেন এবং দুইচারিটি জাতির সাহায্যে একটি অদৃষ্টপূর্ব্ব জাতির উদ্ভাবনা করিতে পারেন তাহা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এই সকল কল্পনাতীত বিষয়ও প্রত্যক্ষ প্রমাণের সাহায্যে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

আখের দৃষ্টান্ত লইয়া এই বিষয়টী একটু বিশদ-রূপে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। ইক্ষুদণ্ড হইতে নূতন ইক্ষুদণ্ডের উৎপত্তি হয় সকলেই জানে এবং তাহাই এতাবৎকাল হইয়া আসিতেছে। কিন্তু যে দিন ইক্ষু বীজ হইতে ইক্ষুচারা উৎপন্ন করিবার প্রথা আবিষ্কৃত হইল সেই দিন হইতে বীটের ন্যায় ইক্ষুচাষে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। একর প্রতি অধিক মাত্রায় চিনি উৎপন্ন করাই বর্ত্তমান যুগে ইক্ষুচাষের প্রধান উদ্দেশ্য। তিনটী উপায়ে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে;—(ক) প্রতি একরে অধিক পরিমাণে ইক্ষু উৎপন্ন হইলে; (খ) যে ইক্ষুর চাষ করা যায় তাহা হইতে অধিক মাত্রায় বিশুদ্ধ রস প্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে শর্করার ভাগ সমধিক পরিমাণে থাকিলে;—(গ) ইক্ষুদণ্ড গুলি রোগদুষ্ট বা অন্য কোন কারণে নষ্ট না হইলে। একাধারে যে ইক্ষুতে এই তিনটী গুণই বর্ত্তমান তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা আদরের এবং সেই ইক্ষু উৎপন্ন করার চেষ্টা চারিদিকে চলিতেছে। কুইন্সল্যাণ্ড, মরিসস্, ওয়েষ্টইণ্ডিস্, জাভা যেখানে যেখানে প্রচুর ইক্ষুর আবাদ আছে তথায় (১) ক্রমাগত স্থানীয় ইক্ষু নির্ব্বাচন (২) বিদেশ হইতে নূতন ইক্ষুবীজের আমদানী (৩) স্থানীয় ইক্ষুর সঙ্কর উৎপাদন এবং (৪) স্থানীয় ও বৈদেশিক ইক্ষুর পরস্পর সঙ্কর উৎপাদন প্রভৃতি উপায় কয়টী অবলম্বিত হইয়া থাকে। এই চেষ্টার ফলও অত্যাশ্চর্য্য হইতেছে। নিম্নে আমরা যবদ্বীপে ইক্ষুসম্বন্ধে রাসায়নিক নির্ব্বাচন ফল সন্নিবেশিত করিলাম;—

১। প্রত্যেক ইক্ষুদণ্ডের প্রত্যেক পাপে চিনির মাত্রার তারতম্য হয়।

২। বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া যে ইক্ষু-দণ্ড তৈয়ারি হয়, তাহাতে প্রথম কয়েক বৎসর চিনির মাত্রা কম থাকে, পরে ক্রমান্বয়ে প্রতি বৎসর চাষে ইক্ষুদণ্ড মোটা হইলে তাহাতে চিনির মাত্রা বাড়িতে থাকে।

৩। ইক্ষুদণ্ডের ওজনের সহিত চিনির মাত্রার সাক্ষাত সম্বন্ধ আছে।

৪। খুব মোটা ও নিরেট ইক্ষুদণ্ড হইতেই যে বীজ-ইক্ষু উৎপন্ন হয় তাহা হইতেই মোটা ও নিরেট ইক্ষুদণ্ড তৈয়ারি হয়।

৫। যে ইক্ষুতে অধিক চিনি জন্মায় তাহারই বংশধর ইক্ষু হইতে অধিক চিনি পাওয়া যায়।

৬। ইক্ষুদণ্ডগুলি খুব তেজাল হইলে তাহা হইতে অধিক চিনি প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে এবং সেই ইক্ষুতে বড় সহজে 'ধসা' লাগে না।

উপরের উল্লিখিত বিষয়গুলি লক্ষ্য করিয়া সঙ্কর উৎপাদিত নূতন নূতন বীজ-ইক্ষু হইতে যবদ্বীপে আখের চাষ করা হয় বলিয়া আজ আমরা ভারত-বর্ষে, সুধু ভারতবর্ষ কেন পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও এত জাভা চিনির প্রচলন দেখিতে পাই।

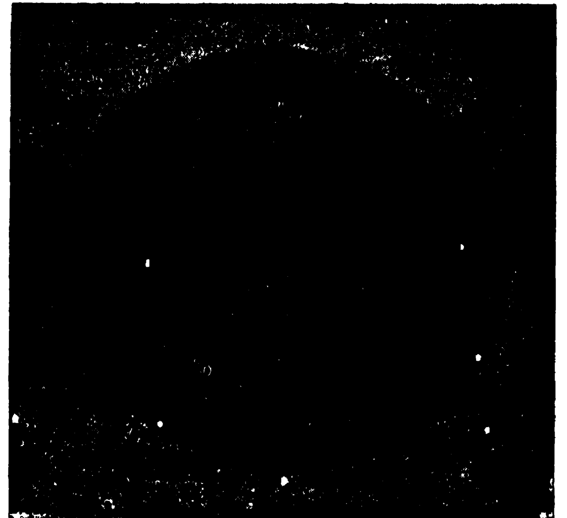
যে সমুদয় গবেষণা ও পরীক্ষার সাহায্যে বরব্যাঙ্ক বর্ত্তমান নব উদ্ভিদ্ জাতি সমূহ উদ্ভূত করিয়াছেন সে সকল প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ হয়। আমেরিকা মহাদেশের পশ্চিম প্রান্তস্থিত ক্যালিফর্ণিয়া প্রদেশের সনোমা জেলায় স্যাণ্টারোজা উপনগরে বরব্যাঙ্ক প্রায় ৩৫ বৎসর বাস করিতেছেন। এই কয়েক বৎসর তিনি উক্ত স্থানের জল, হাওয়া, মৃত্তিকা প্রভৃতি সম্বন্ধে কোন প্রকার অনুসন্ধান করিতে বাকি রাখেন নাই। বরব্যাঙ্কের বাস স্থানের চতুর্দ্দিকস্থ জমি আমাদের দেশের গঙ্গার উভয়তীরস্থ বালি জমির ন্যায়। তুষারপাত কদাচিৎ হইয়া থাকে এবং অপরাপর অবস্থা সমুহ সমস্তই উদ্ভিদ্ দেহের পূর্ণ পরিপুষ্টির পক্ষপাতী।

এই রূপ ক্ষেত্রেই বরব্যাঙ্কের যাবতীয় পরীক্ষা নির্ব্বাহিত হইয়াছে। আমরা এস্থলে দুই একটি পরীক্ষার উল্লেখ করিয়া পাঠকবর্গকে দেখাইব যে সুদক্ষ বৈজ্ঞানিকের হস্তে সাধারণ দ্রব্যাদি হইতে কিরূপ অসাধারণ ফল লাভ করিতে পারা যায়। প্রথমেই বলা আবশ্যক যে বন্য ফুল সমূহে কমই পরিবর্ত্তন দৃষ্টি গোচর হয়। এক সহস্র এমন কি দশ সহস্র ফুলের মধ্যে হয়ত কেবল মাত্র একটি ফুল পরিবর্ত্তনশীল হইতে পারে। আবার এই পরিবর্ত্তন অগ্রগামী অথবা পশ্চাদ্গামী উভয় প্রকারেরই হইতে পারে। সঙ্কর উৎপাদকের তাহা দেখিবার আবশ্যক নাই। একটি মাত্র গাছ পরিবর্ত্তনশীল হইলেই হইল। উক্ত গাছটিকে রাখিয়া অপর সমস্ত গাছ তুলিয়া ফেলা হয় এবং সেই গাছেরই চাষ হইতে থাকে। চাষের পূর্ব্বে, মৃত্তিকা এবং সার উভয়কেই বিশেষ যত্নের সহিত জীবাণু শূন্য করিয়া ফেলা হয়। এইরূপ জমিতে চাষ করিয়া এবং গাছের যে অংশ যে রূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে তাহার উপর লক্ষ্য রাখিয়া মিঃ বরব্যাঙ্ক অক্লান্ত ভাবে কার্য্য করিতে থাকেন এবং অবশেষে তাঁহার পরিশ্রম সফল হয় ও তিনি অভিলষিত উদ্ভিদ্ পাইয়া থাকেন।

পর পৃষ্ঠায় যে ছবিটি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে উহা আমাদের দেশীয় মনসা সিজের* ছবি। মধ্য আমেরিকায় এরিজোনা, টেক্সাস্, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশে ইহা অনেক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। অনেকেই এই সিজের তীব্র কণ্টকের বিষয় অবগত আছেন এবং এই জন্য অনেকেই ইহা বেড়ার ধারে লাগাইয়া থাকেন। সিজের বেড়া অতিক্রম করিয়া আসিবার সাধ্য কোন পশুরই নাই। কিন্তু যদি কাঁটা না থাকে, তাহা হইলে সিজ একটি উৎকৃষ্ট পশুখাদ্য হয় এবং ইহার চাষও অতি সহজে করা যায়। যদি কোন ব্যক্তি বিজ্ঞানের সাহায্যে ভয়ঙ্কর কণ্টকযুক্ত সিজকে কণ্টক বিহীন, মসৃণ খাদ্য বৃক্ষে পরিণত করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার কৌশল যে আশ্চর্য্য তাহা স্বীকার করিতে হইবে। মিঃ বরব্যাঙ্ক উক্ত পরীক্ষা করিয়াছেন এবং তাহাতে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। কি প্রকারে এই কার্য্য সমাধা হইল আমরা নিম্নে তাহা বিবৃত করিতেছি। মধ্য আমেরিকার কোন কোন স্থানে এক প্রকার কণ্টকহীন সিজ আছে। এই জাতীয় সিজে কেবল পাতার মধ্যস্থল ভিন্ন আর কোথাও কাঁটা নাই। মিঃ বরব্যাঙ্ক উক্ত সিজ আনাইয়া কণ্টকযুক্ত সিজের সহিত সঙ্কর উৎপাদন করেন। প্রথম ফসলের সিজ হইতে দ্বিতীয় ফসল হয় এবং এই রূপে পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ ফসলের সময় কণ্টক একবারে অদৃশ্য হইয়া যায়। কণ্টক তিরোহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গাছ অধিকতর স্থূল হয় এবং ফলও প্রায় আনারসের মত বড় ও

* মনসা সিজ = মনসা গাছ।

সুগন্ধযুক্ত হয়। এক্ষণে এই প্রকার সিজ ক্যালিফর্ণিয়ায় অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা যে ছবিটি দিয়াছি তাহা প্রথম ফসলের ছবি। ইহাতে কণ্টকশূন্য ও কণ্টকযুক্ত উভয় প্রকারের মধ্য অবস্থাপন্ন কয়েকটি গাছ দেখা যাইতেছে। ইতি মধ্যেই ২।৪টি গাছ প্রায় একবারেই কণ্টকশূন্য হইয়া পড়িয়াছে।



আমরা আর একটি উদাহরণ দিতেছি। সাধারণ আপেলের রং লাল কিম্বা হরিদ্রাভ হইয়া থাকে। পার্শ্বস্থিত চিত্রে যে আপেলটি দেখা যাইতেছে উহার অর্দ্ধেক লাল এবং অর্দ্ধেক

হরিদ্রাবর্ণ। দুইটি বিভিন্নজাতীয় লাল ও হরিদ্রাবর্ণ বিশিষ্ট আপেলের সংযোগে ইহা উৎপাদিত হইয়াছে। উহা উৎপাদন করিতে অনেক পরিশ্রম ও সময় ব্যয় হইয়াছে। একটি সামান্য রক্তাভ দাগ বিশিষ্ট আপেল হইতে নির্ব্বাচন করিয়া প্রথমতঃ পূর্ণ রক্তবর্ণ আপেল উদ্ভূত হয়। তাহার পর আবার উহার সহিত হরিদ্রাভ আপেলের সঙ্কর উৎপাদন করিয়া অর্দ্ধ হরিদ্রাভ অর্দ্ধ রক্তবর্ণ আপেল উদ্ভূত হইয়াছে।

মিঃ বরব্যাঙ্ক আরও যে সমুদয় খাদ্যশস্য, ফুল অথবা ফলবৃক্ষের উন্নতি সাধন করিয়াছেন, তৎসমুদয়ের এস্থলে উল্লেখ করা অসম্ভব। পূর্ব্বোক্ত দুইটি উদাহরণ হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে বিজ্ঞানের সাহায্যে কি প্রকার অভূতপূর্ব্ব ফল পাওয়া যাইতে পারে। মনে করুন এখন প্রত্যেক গম, যব কিম্বা যইয়ের শীষে ১০টী করিয়া শস্য উৎপন্ন হইতেছে। মিঃ বরব্যাঙ্ক বলেন যে, সঙ্কর-জনন বিদ্যার সাহায্যে এমন গম, যব ও যই উৎপাদন করা আশ্চর্য্য নহে যে যাহার প্রত্যেক শীষে একটি করিয়া অধিক শস্য, এমন আলু যাহার প্রত্যেক গাছে একটি অধিক আলু অথবা এমন আপেল, বাদাম অথবা কমলা লেবু যাহাতে একটি করিয়া অধিক ফল থাকিবে।

যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে মোট ফল কি দাঁড়াইবে? এক মার্কিন রাজ্যের হিসাব করিয়া মিঃ বরব্যাঙ্ক দেখাইয়াছেন যে প্রতি বৎসরে অধিক সার খরচ না করিয়া ৫,২০০,০০০ বুসেল অধিক ভুট্টা, ১৫,০০০,০০০ বুসেল অধিক গোধূম, ২০,০০০,০০০ বুসেল অধিক যই, ১,৫০০,০০০ বুসেল অধিক যব ও ২১,০০০,০০০ বুসেল অধিক গোল আলু পাওয়া যাইবে। এই বৃদ্ধি এক বৎসরের জন্য, অথবা বর্ত্তমান যুগ অথবা বর্ত্তমান মানবের জন্য নয়। ইহা চিরকালই থাকিবে এবং যুগে যুগে যে সমস্ত নরনারী ও বালকবালিকা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবে তাহারা সকলেই এই মহান সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হইবে। এই অভিলষিত স্বর্ণযুগ বিজ্ঞানই জগতে আনয়ন করিবে।

ডিমের ব্যবসা।

আমাদের দেশের অনেক ছোট ছোট অথচ লাভজনক ব্যবসাগুলি প্রায়ই ইতর লোকের করায়ত্ত। তাহারা ব্যবসা চালাইয়া কিসে দুপয়সা রোজগার হয় তাহার চেষ্টা সতত করে বটে কিন্তু ব্যবসায়ের ভাবী উন্নতির দিকে তাহাদের তত নজর নাই। সাধারণতঃ হাঁস ও কুক্কুটের ডিম খাদ্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। বঙ্গদেশের নানা স্থানে অনেক পল্লিতে ইতর লোকেরা ব্যবসায়ের জন্য হাঁস মুরগী পুষিয়া থাকে। কিন্তু এই সকল হাঁস মুরগী প্রকৃত প্রতিপালনের অভাবে ক্রমশঃ নিকৃষ্ট হইতে নিকৃষ্টতর হইয়া পড়িতেছে। তাহাদের বংশোন্নতির জন্য ঐ সকল লোকের কোন দৃষ্টি নাই। সেই জন্য ঐ সমস্ত নিকৃষ্ট পক্ষীর ডিমও ভাল হয় না। চট্টগ্রাম অঞ্চলের মুরগী অন্যান্য স্থানের মুরগী অপেক্ষা অনেক বড় ও বিখ্যাত। চট্টগ্রাম হইতে এমন কি বিলাত হইতেও ভাল জাতীয় মুরগী আনাইয়া নানা স্থানে সঙ্কর উৎপাদন বা ভাল জাতীয় মুরগীর বংশ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিকৃষ্ট মুরগী কুলের বিনাশ সাধন করিয়া মুরগী বংশের উন্নতি করা যাইতে পারে। রাজ হাঁস বা পাতি হাঁস গুলি ক্রমশঃ নির্ব্বাচন দ্বারা বা রাজ হাঁস, রাজ হাঁস অপেক্ষা কিছু নিকৃষ্ট এবং পাতি হাঁস অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জাতীয় হাঁস, বা পাতি হাঁসে পরস্পর সঙ্কর করিয়া তাহাদের বংশোন্নতি করা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। এইরূপ উপায় অবলম্বন করিতে পারিলে উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতর ডিম পাওয়া যাইতে পারে এবং সেই সকল ডিম বাজারে অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যে বিক্রয় হওয়া সম্ভব। ডিম গুলিও বাজারে পাঠাইবার

পূর্ব্বে নির্ব্বাচন করা আবশ্যক। আমাদের দেশের লোক নির্ব্বাচন কাহাকে বলে বড় একটা বুঝে না। ভাল মন্দ এক সঙ্গে মিশাইয়া বাজারে পাঠায় তাহাতে সমস্ত জিনিষ গুলিরই কিছু কম দর হইয়া যায়। তাহারা তাহাতেই সন্তুষ্ট, কিন্তু নির্ব্বাচন করিয়া ১নং, ২নং ইত্যাদি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পাঠাইলে যে, অপেক্ষাকৃত অধিক পয়সা আসে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বিলাতে অনেক স্থানে এক একটা ডিম ব্যবসায়ের আড্ডা আছে। সেই আড্ডার ছাপ থাকিলে বাজার দরের অধিক মূল্যে সেই ডিম বিক্রয় হইবে। এক একটী আড্ডার এত যশ যে তাহাদের ছাপ থাকিলে লোক অকুতোভয়ে তাঁহাদের জিনিষ কেনে। তাহারাও তাহাদের যশ অথুন্ন রাখিবার যথেষ্ট চেষ্টা করে।

ডিম ছোট বড় ত সহজেই বাছা যায় কিন্তু ডিমের মধ্যে কোনটী পচিয়াছে বা পচিবার উপক্রম হইয়াছে তাহা ধরা একটু কঠিন, কিন্তু যাহারা সুনিপুণ তাহাদের পক্ষে ইহা অতীব সহজ। অন্ধকার ঘরের ভিতর একটী আলোর সম্মুখে ডিম গুলি ধরিলেই ভাল মন্দ সহজেই বুঝা যায়।

ডিমের ব্যবসা করিতে গেলে যাহাতে ডিম গুলি অধিক দিন অবিকৃত অবস্থায় থাকে তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা নোয়াখালি প্রভৃতি জিলা হইতে বিস্তর ডিম ব্রহ্মদেশে রপ্তানি হয়। ডিম ব্যবসায়ীরা গ্রাম হইতে ডিম কিনিয়া আনিয়া চুণের জলের গোলা করিয়া উহাতে ডিম ডুবাইয়া লয়। চুণের গোলায় ডুবাইলে মাসাবধি ডিম নষ্ট হয় না।

পূর্ব্ববঙ্গের "কৃষি সমাচার" গ্রন্থে ডিম রক্ষার দুইটী উপায়ের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। সাধারণের জ্ঞাতার্থ তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) চুণের ও লবণের জলে ডুবাইয়া রাখা। ৫ সের জল ফুটাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া উহাতে আধ্ সের কলিচুণ (Unslaked lime) ও এক পোয়া লবণ ছাড়িয়া দেও। চুণ গলিয়া পড়িলে জলের সহিত মিশাইয়া দেও; কিছুক্ষণ পরে চুণ নীচে পড়িয়া গেলে, উপরের পরিষ্কার জল ঢালিয়া লইয়া উহাতে ডিমগুলি রাখ ও উহার উপর ঢাকনী চাপা দেও। ডিমের উপর ২।৩ ইঞ্চি জল থাকা চাই। পাত্রটী মাটী বা পাথরের বা কাচের বা "গ্যালভানাইজ" লোহার হওয়া চাই; সচরাচর ধাতুপাত্রে নুনের জল রাখা যায় না। এইরূপ ভাবে সংরক্ষিত ডিম খাইতে একটু চুণা আস্বাদ লাগে মাত্র।

(২) তরল-কাচে ডুবাইয়া রাখা। তরল-কাচ বলিলে সিলিকেট্ অভ্ সোডিয়াম নামক দ্রব্য বুঝায়। ইহা কলিকাতায় কিনিতে পাওয়া যায়। তরল-কাচ দেখিতে গাঢ় তরল, চট্‌চটে ও স্বচ্ছ। শক্ত ঢেলা ও গুঁড়ার আকারেও সোডিয়াম-সিলিকেট পাওয়া যায়, কিন্তু সেরূপ দ্রব্যে ডিম রাখার কাজ হয় না। মাপে এক ভাগ তরল-কাচের সহিত ৯ ভাগ ফুটন্ত বা চোঁয়ান জল মিশাইয়া উহাতে ডিমগুলি রাখিয়া, ঢাকনি চাপা দিয়া রাখিতে হয়; ডিমের উপর ২।৩ ইঞ্চি তরল-কাচ থাকা চাই। মাটীর বা পাথরের বা কাচের বা "গ্যালভানাইজ" লোহার পাত্রে রাখিতে হয়। এই উপায়ে ডিম বৎসরাবধি ভাল রাখা যাইতে পারে।

প্রায়ই ঝুড়িতে উপর্য্যুপরি সাজাইয়া ডিমগুলি বাজারে পাঠান হয় ইহাতে কখন বা চাপে কখন বা ঘর্ষণে ডিম খারাপ হইবার সম্ভবনা। ডিমগুলি, ঘাষ বা অন্য তৃণ বা তুষ দিয়া স্তরে স্তরে সাজাইয়া বাজারে পাঠাইলে, খারাপ হইবার সম্ভাবনা খুব কম হয়। যে কোন্ কাজে একটু যত্ন বা পরিশ্রম করা যাউক না কেন তাহার ফল নিশ্চয় পাওয়া যায়।

পত্রাদি।

ধান্য চাষে গোবর সারের পরিমাণ।

শ্রী উদয়চন্দ্র পালিত, হলুদপুকুর, সিংভূম হইতে লিখিতেছন :—

সদাশয় বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রকাশিত কটক কৃষিশালার ১৯০৮।০৯ সালের বাৎসরিক রিপোর্টে নবম পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে যে "So far there is no economical advantage in applying more than 50 maunds of cowdung per acre," এবং কৃষি বিভাগের ১৯০৭ সালের ৩নং পত্রে (leaflet no 3 of 1907.) লিখিত হইয়াছে যে During period of 16 years cowdung applied at the rate of 50 maunds per acre has given an average outturn of 40½ maunds grain and 55¾ maunds of straw, cowdung applied at the rate of 100 maunds per acre has given an average 41⅓ maunds of grain and 55⅛ maunds of straw. These results are particularly interesting, as showing that 50 maunds cowdung practically gives the same result as 100 maunds and therefore it is merely waste of manure to give havier application for paddy." উহাতেই পরিশেষে উল্লিখিত হইয়াছে যে, এ বিষয়ের পরীক্ষা কটক, ডুমরাঁও ও বর্দ্ধমান এই তিন কৃষি-ক্ষেত্রেই সমান প্রতিপন্ন হইয়াছে। সুতরাং কৃষি বিভাগের মন্তব্য এই যে ধান্য ক্ষেত্রে একার প্রতি ৫০ মণ গোবর সারই যথেষ্ট ইহা অপেক্ষা অধিক সার প্রয়োগে কেবল মাত্র সারের অপচয় করা মাত্র।

আমাদের এস্থলে গোবর সার অপেক্ষাকৃত সুলভ। এক গাড়ী গোবরের মূল্য দুই আনা হইতে চারি আনা মাত্র। সরকারী কৃষি বিভাগের উপদেশানুসারে বিঘা প্রতি ১৬।১৭ মণ সার প্রয়োগই যথেষ্ট। আমরা সাধারণতঃ প্রতি বিঘা জমীতে ৪০/ হইতে ৫০/ পঞ্চাশ মণ অর্থাৎ ৪।৫ গাড়ী করিয়া গোবর সার প্রদান করিয়া থাকি। ইহাতে কি সারের অপচয় করা হয়? গবর্ণমেণ্টের প্রচারিত তথ্য সত্য হইলে যেখানে সার দুর্ম্মূল্য সেখানের কৃষকগণের পক্ষে বিশেষ সুবিধার কথা। সুবিখ্যাত কৃষি বিশারদ প্রবোধ বাবু তাঁহার কৃষিক্ষেত্র গ্রন্থে ধান্যের জমীতে "প্রাণীজ সার বিঘা প্রতি ৫।৭ গাড়ী হইতে ১০ দশ গাড়ী দিতে পারা যায়" বলিয়া লিখিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মতানুযায়ী একার প্রতি ১৫০ শত হইতে তিন শত মণ পর্য্যন্ত গোবর ধান্যের জমীতে সার রূপে ব্যবহার করিতে পারা যায়। কৃষি বিভাগের সুপ্রসিদ্ধ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও তাঁহার কৃত সরল কৃষি-বিজ্ঞান পুস্তকে "ধান, পাট ইত্যাদি সাধারণ ফসলের জন্য বিঘা প্রতি ৪০/ হইতে ৫০/ মণ পচা গোবর সার ব্যবহার করা উচিত" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এরূপ স্থলে ধান্যের জমীতে সার প্রয়োগ সম্বন্ধে প্রকৃত নিয়ম কি? ধান্যের চারা রোপণ সম্বন্ধেও তাঁহারা প্রতি গর্ত্তে এক ফুট অন্তর কেবল মাত্র একটী করিয়া রোপণ করিবার পরামর্শ প্রদান করিয়াছেন এবং পরীক্ষার দ্বারা উহাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম রোপণ প্রণালী বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের ও এবিষয়ের আপনাদের ও অন্যান্য অভিজ্ঞ কৃষকগণের অভিপ্রায় কৃষক পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে আমাদের ন্যায় গরীব প্রধান দেশে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা।

[জমীর উর্ব্বরতা অনুর্ব্বরতা অনুসারে সার প্রয়োগের তারতম্য হওয়া উচিত। বিঘাতে ৭০/ হইতে ৫০/ মণ গোময় সার প্রয়োগ অনেক সময় অনাবশ্যক নহে বরং হিতকর ও লাভজনক। দেশ, কাল ও জমির শক্তি অনুসারে ঘন ও পাতলা করিয়া ধান্য রোপণ করিতে হয় এবং প্রতি গর্ত্তে এক বা ততোধিক চারা রোপণ করিতে হয়। এ বিষয়ে স্থানীয় অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। এই সম্বন্ধে কৃষকে পূর্ব্বে আলোচনা হইয়াছে ও সময়ান্তরে পুনরালোচনার ইচ্ছা রহিল।] কৃঃ সঃ।

শঠির পালো প্রস্তুতের কল।

[আমরা উক্ত বিষয় সম্বন্ধে কয়েকখানি পত্র পাইয়াছি। শঠির পালো প্রস্তুত অনেকটা আরারুট প্রস্তুতের ন্যায়। সুতরাং আরারুট প্রস্তুতের কারখানায় যে সমস্ত যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হয় সেই সমস্ত শঠির পালো প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ কলকব্জার উন্নতি হইয়াছে তাহাতে দিনে প্রায় ৪৫ মণ আরারুট প্রস্তুত হইতে পারে। উক্ত পরিমাণ পালো প্রস্তুত করিবার কলের মূল্য বিশ হাজার টাকা হইবে। যদি কোন ব্যক্তি শঠির পালোর ব্যবসা করিতে চাহেন অথচ উক্ত পরিমাণ মূলধন ব্যয় করিতে না ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তিনি সামান্য পরিমাণে অর্থাৎ দিবসে ২-২॥০ মণ আন্দাজ পালো প্রস্তুত করিতে পারেন। এই পরিমাণ পালো তৈয়ারী করিবার কল এক হাজার টাকার কমে পাওয়া যাইবে না। অর্ডার দিলে আবশ্যকীয় কলকব্জাদি সমিতির কার্য্যালয়ে পাওয়া যাইতে পারে।] কৃঃ সঃ

সঞ্চিত শস্যে কীট।

শ্রীবিনোদবিহারী অধিকারী, রাধানগর,—পাবনা।

চাউল, গোধুম, ডাউল প্রভৃতি শস্য নানাপ্রকার কীট দ্বারা আক্রান্ত হইয়া নষ্ট হয়। এই সমুদয় কীটের উপদ্রব নিবারণ করিতে হইলে নিম্ন লিখিত কয়েকটি উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক:—(১) যে গুদামে অথবা পাত্রে শস্য সঞ্চিত হইবে তাহা উত্তম রূপে পরিষ্কৃত করিয়া চুণ অথবা আল্‌কাত্‌রা প্রয়োগ করা আবশ্যক—(২) গুদাম অথবা পাত্র উত্তমরূপে বন্ধ করিতে হয়—(৩) সঞ্চয় করিবার পূর্ব্বে শস্য গুলিকে পাতলা করিয়া রৌদ্রে দিয়া ঝাড়িয়া লইতে হইবে—(৪) আক্রান্ত শস্য বাছিয়া বাদ দেওয়া প্রয়োজন—(৫) গুদামে অথবা পাত্রের মুখে গোবর ও কাদার উত্তমরূপে লেপ দিতে হয়—(৬) সঞ্চিত শস্যের কীট নিবারণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় কার্ব্বন-বাই-সল্‌ফাইড প্রয়োগ। ইহা কিন্তু অত্যন্ত সহজ দাহ্য পদার্থ। সুতরাং ইহা প্রয়োগ করার বিশেষ নিয়ম অবগত হওয়া আবশ্যক।—কৃঃ সঃ।

প্রাদেশিক কৃষি সংবাদ।

বঙ্গদেশে ইক্ষুর আবাদ।—১৯০৯।

বিহারেই আখের চাষ বেশী। তথায় আখ বসাইবার সময় বৃষ্টির অভাব হইয়াছিল কিন্তু তার পর সময় মত বৃষ্টি হওয়ায় ফসল মন্দ হয় নাই। উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরে সমস্ত বৎসরই আবহাওয়া ইক্ষু-চাষের অনুকূল ছিল এবং আখও জন্মিয়াছে ভাল। দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গে ভাদ্রমাসে অতি বৃষ্টিতে এবং প্রেসিডেন্সি বিভাগে প্রথম কার্ত্তিকে ঝড়ে আখ চাষের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। সম্বলপুরে পোকা লাগিয়া আখ নষ্ট হইয়াছে।

এই বৎসর ৩৫১,৬০০ একর জমিতে ইক্ষুর আবাদ হইয়াছে, বিগত বর্ষের ইক্ষু চাষের আবাদী জমির পরিমাণ ৩৭৫,২০০ একর। সাধারণতঃ ৪২৬৭০০ একর পরিমাণ জমিতে ইক্ষুর আবাদ হয়। আখ বসাইবার সময় সুবৃষ্টি না হওয়ায় ইক্ষুর আবাদী জমির পরিমাণের হ্রাস হইয়াছে বলিতে হইবে। যেরূপ আখ জন্মিয়াছে, তাহাতে যদি এক একরে (৩ বিঘাতে) ২২ হন্দর (হন্দর ১ মণ ১৪ সের) গুড় জন্মিয়াছে বলিয়া ধরিয়া

লইলে সমগ্র প্রদেশে ৬,১৮৮,২০০ হন্দর গুড় উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যায়। বিগত পূর্ব্ব বর্ষে ৫,১১৭,৭০০ হন্দর গুড় জন্মিয়া ছিল। ইক্ষুগুড় ব্যতীত এবৎসর খেজুর গুড় ১,৩৫০,৩৬৫ হন্দর এবং তালের গুড় ১৪,৭৬৬ হন্দর উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, মোট উৎপন্ন গুড়ের পরিমাণ ৭,৫৫৩,৩৩১ হন্দর দাঁড়াইবে।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে তুলার আবাদ।

১৯০৯-১০। ১৯০৭-০৮ সালের পূর্ব্ব ৫ বৎসরের গড় হিসাব ধরিলে জানা যায় যে সমগ্র ভারবর্ষে যে পরিমাণ তুলা জন্মে তাহার শতকরা ০·৩ ভাগ মাত্র পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে জন্মিয়া থাকে।

পূর্ব্বে যাহা অনুমান করা হইয়াছিল সিলেটে তদপেক্ষা কিছু অধিক পরিমাণে তুলার চাষ হইয়াছে এবং কিছু অধিক তুলাও জন্মিয়াছে। পার্ব্বত্য ত্রিপুরায় তুলা ভালরূপ জন্মায় নাই। সমগ্র প্রদেশে ৯৮,০০০ একর জমিতে বীজ শূন্য পরিষ্কৃত তুলা ১৭,১০০ বেল উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যায়।

পঞ্জাবে ইক্ষু।—১৯০৯। বিগত পাঁচ বৎসরের গড়হিসাবে জানা যায় যে পঞ্জাবে সমগ্র ভারতে যে পরিমাণ ইক্ষু জন্মায় তাহার শতকরা ১২·৩ ভাগ পঞ্জাবে উৎপন্ন হয়।

বর্ত্তমান বিবরণীতে জানা যায় যে এবৎসর পঞ্জাবে অপেক্ষাকৃত অধিক জমিতে আখ চাষ হইয়াছে, এবৎসর তথায় ৪১১,৭০০ একর জমিতে ইক্ষু উৎপন্ন হইয়াছে, বিগত বর্ষের জমির পরিমাণ ৩৬৫,৭০০ একর মাত্র। মোটের উপর ৩৩৩,৯৯২ টন গুড় উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। বিগত বর্ষ অপেক্ষা প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ গুড় অধিক জন্মিবে।

বঙ্গে তুলার আবাদ।—১৯০৯। জলদী জাতীয় তুলার অবস্থা এবার প্রথম হইতেই ভাল। সাঁওতাল পরগণায় সমুদয় বঙ্গের প্রায় এক তৃতীয়াংশ তুলা জন্মে। তথায় এবৎসর অনুকুল আবহাওয়ার গুণে তুলা সুন্দর জন্মিয়াছে। নাবী তুলার পক্ষে আবহাওয়া তাদৃশ অনুকুল ছিল না। তুলা চাষের দুইটী প্রধান জেলা সারণ ও মজঃফরপুরে ভাদ্রমাসে অতি বৃষ্টিতে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল।

এবৎসর জলদী তুলার আবাদী জমির পরিমাণ ৩৪,০৪৫ একর. বিগত বর্ষের ৩১,২৩০ একর। নাবী তুলার আবাদী জমির পরিমাণ ৩৩,০৮৩ একর, বিগত বর্ষের ৩২,৮৬৯ একর।

অনুমান উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ জলদী তুলা ৭,০৬৬ এবং নাবী তুলা ৯,৫১২ বেল; বিগত বর্ষে ক্রমান্বয়ে ৪,৬৫৬ এবং ৯,৩৫৪ বেল মাত্র। ইহার উপর দেশীয় রাজাগণের রাজ্যের উৎপন্ন তুলা শতকরা ৫ ভাগ ধরিয়া লইলে মোট ৭,৪১৯ জলদী এবং নাবী ৯,৯৮৮ বেল তুলা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়।

পঞ্জাবে তুলার চাষ।—১৯০৯-১০। বঙ্গদেশের প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ তুলা পঞ্জাবে জন্মায়। এখানে এবৎসর ১,২৮৪,৬০০ একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে এবং ৩৫০,৮৮১ বেল তুলা উৎপন্ন হইয়া বলিয়া অনুমান করা যায়। অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা অধিক তুলা উৎপন্ন ইয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে তৈলশস্য।—গোয়ালপাড়া ও কামরূপে প্রচুর সরিষার চাষ হয়। মোটের উপর বর্ত্তমান বর্ষে এখানে সরিষা চাষের অবস্থা ভাল। তবে নভেম্বর মাসে অতিবৃষ্টিতে সিলেট এবং কাছাড়ে এবং অক্টোবর ও নভেম্বর

মাসে বৃষ্টির অভাবে উত্তর আসামে কিছু ক্ষতি হইয়াছে।

বঙ্গে ভাদুই শস্য।—১৯০৯। আশু ধান্যাদিই সাধারণতঃ ভাদুই শস্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। সমগ্র ভারতের প্রায় শতকরা ৫৭ ভাগ ভাদুই শস্য বঙ্গদেশেই উৎপন্ন হয়।

এবৎসর ভাদুই শস্যের আবাদা জমির পরিমাণ ৯,৫৯৬,১০০ একর, বিগত বর্ষের জমির পরিমাণ ৯,০৩১,২০০ একর। জলহাওয়া অনুকূল থাকায় আবাদী জমির পরিমাণ অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা কিছু অধিক হইয়াছে।

উৎপন্ন চাউল ৩৪,৭৯৫,১০০ হন্দর দাঁড়াইবে। বিগত পূর্ব্ব বর্ষে ২১,৯২৩,১০০ হন্দর মাত্র চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল।

সার-সংগ্রহ।

হিন্দুর খনিবিদ্যা।

আমাদের মধ্যে অনেকের এখনও বিশ্বাস আছে যে ভারতবর্ষে খনিকার্য্য পূর্ব্বে তেমন ভালরূপ হইত না। কিন্তু সম্প্রতি লাহোরের শ্রমশিল্পপ্রদর্শনীতে ভারতীয় ভূতত্ত্ববিভাগের লেটুস্ সাহেব ভারতের পুরাতন খনিবিদ্যার পরিচায়ক একটি সুন্দর সন্দর্ভ পাঠ করিয়াছেন। এই সন্দর্ভে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিত হইয়াছে। লেটুস্ সাহেব বলেন যে, অতি পুরাকাল হইতে ভারতবর্ষের নানা স্থানের খনিজ পদার্থ হইতে ধাতু প্রস্তুতের বিদ্যা প্রচলিত ছিল। ভারতবর্ষের সকল পার্ব্বত্য প্রদেশেই আদিম খনি সকলের চিহ্ন এখনও পরিলক্ষিত হয়। ধারওয়ারে, ছোটনাগপুরে, দক্ষিণাত্যের বহুস্থানে স্বর্ণখনির গহ্বরাদি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। সে সকল খাতে এখন আর স্বর্ণ পাওয়া যায় না বটে, তবে খাতের খননপদ্ধতি দেখিয়া বুঝা যায় যে, বহু পূর্ব্বকাল হইতেই ভারতবাসী খনির কার্য্যে পারদর্শী ছিলেন। সিংহভূমে, উদয়পুরের পর্ব্বতমালায় এবং অন্য নানা স্থানে তাম্রখনির পুরাতন খাত এখনও পাওয়া যায়। সিংহভূমের এক পর্ব্বতমালায় আশী মাইল ব্যাপিয়া পুরাতন তাম্র খনির চিহ্ন সকল এখনও দেদীপ্যমান আছে। অনেক স্থান এখন অতি দুর্গম হইয়াছে বটে, পরন্তু পুরাকালে যে ঐ সকল স্থানে মনুষ্য বসতি ছিল এবং খনির কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত, তাহার নিদর্শনের অভাব নাই। চিতোরে টিন, লক্ষীপুরে রূপা প্রভৃতি ধাতুর খনি এখনও আছে। তবে এ সকল খনিতে ধাতু থাকিলেও আর কাজ হয় না। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের পর্ব্বতমালাতেই আদিম খনি কার্য্যের চিহ্ন পাওয়া যায়। পুরাতন ভারতবাসী বহু ধাতুর পরিচয় জানিতেন, বহু অভিনব জারজ ধাতুর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পিত্তল ও কাংস্য এই দুই ধাতু ভারতেই প্রথমে প্রচলিত হয়।

লৌহ ও ইস্পাতের কার্য্যে ভারতবাসীর পারদর্শিতা জগতে অতুল্য। জর্ম্মণ খনি বিদ্যাবিদ্‌গণ এই সমাচার সর্ব্বাগ্রে সভ্য জগতে প্রচার করেন। বীরভূমে, ছোটনাগপুরে এবং মান্দ্রাজ প্রদেশে যে পদ্ধতি অনুসারে ইস্পাত তৈয়ারী হইত, সেই পদ্ধতি গত ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে পরিগৃহীত হয়, এবং তাহার ফলে শেফিল্ডের ও সুইডিস্ ইস্পাত এখন জগন্মান্য হইয়াছে। স্যার টমাস হল্যাণ্ড মান্দ্রাজের সালেম প্রদেশে যে পদ্ধতি অনুসারে ইস্পাত তৈয়ারী দেখিয়াছিলেন, তাহা বেসেমরের পদ্ধতির তুল্য ও বিজ্ঞানসম্মত। শুনিতে

পাই, এই পদ্ধতি অনুসারে জর্ম্মণ দেশে বড় বড় কামান বন্দুকের ইস্পাত ঢালাই হইয়া থাকে। মধ্য-যুগের দামাস্কসের ও টোলেডোর জগদ্বিখ্যাত তরবারির ফলক ভারতীয় ইস্পাত হইতে প্রস্তুত হইত। তেমন ইস্পাত এখন আর কলকব্জার সাহায্যে তৈয়ারি হয় না। সে গুপ্ত পদ্ধতি হয় ভারতবাসী একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছে, নহে ত যাহারা উহা জানে, তাহারা এখন অবজ্ঞাত।

লেটুস্ সাহেব এই ভাবের কথা কহিয়া বলেন যে, বিলাতী তথা ইউরোপীয় প্রতিযোগিতায় ভারতের খনিশিল্প নষ্ট হইলেও, ভারতে খনিজ ধাতু সকল এতই প্রচুর পরিমাণে সর্ব্বত্র বিদ্যমান এবং রোজ মজুরী ও খরচা এত অল্প যে, অপেক্ষাকৃত অল্প মূলধন সঞ্চয় করিয়া খনির কার্য্য করিলে তাহার দ্বারা দেশে অর্থাগম সু-কর হইতে পারে। ভারতবাসীকে সস্তার মুখে ইউরোপীয় প্রতিযোগিতাকে নষ্ট করিতে হইবে। বীরভূমে এখনও যে পদ্ধতি অনুসারে খনি হইতে লৌহ তোলা হয়, সেই পদ্ধতির কিঞ্চিৎ উন্নত সাধন করিয়া, দুচারি লাখ টাকা মূলধন রাখিয়া কাজ করিলে বেশ লাভের কাজ হইতে পারে। কেননা বীরভূমের লৌহ নরম ও নির্ম্মল এবং ছুরি কাঁচি প্রভৃতি তৈয়ারির পক্ষে বড়ই উপযোগী। মান্দ্রাজের উজনামক ইস্পাতের নির্ম্মাণ পদ্ধতি এখনও ইউরোপ শিখিতে পারে নাই, অথচ উজের আদর সভ্য-জগতের সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান। উজ নির্ম্মাণের কারিকরগণ এখনও জীবিত আছে। অপেক্ষাকৃত অল্প মূলধন লইয়া উজের কাজ চালাইলে বেশ লাভ হইতে পারে। পরন্তু এ সকল কার্য্যে মধ্যবিত্ত ভদ্রবংশীয় যুবকগণ উদ্‌যোগী না হইলে কোন ফলোদয় হইবে না। ইউরোপের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইলে বিদ্যা চাই, পুরুষকার চাই। স্বর্ণভূমি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ধনদৌলত ছড়ান রহিয়াছে। মানুষ থাকিলে তবে সে ঐশ্বর্য্য সংগ্রহ করিতে পারে।

গরু মহিষের সাংঘাতিক পীড়া।

(পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের কৃষি-বিভাগ হইতে প্রকাশিত গরু ও মহিষের পীড়া সম্বন্ধীয় ১ নং পত্রিকা।)

গরু ও মহিষের যে সব সাংঘাতিক পীড়া হয় সেই গুলির নাম ও বিশেষ বিশেষ লক্ষণ নীচে দেওয়া গেল :—

নাম।

১। বসন্ত বা গুটি ... (Rinderpest).
২। খুরুয়া বা আইযু বা বাদলা* (Foot-and-mouth disease).
৩। গলা ফুলা ... (Haemorrhagic septicaemia).
৪। তড়্কা ... (Anthrax).
৫। বাদলা* ... (Black quarter).

(ক) বসন্ত বা গুটির লক্ষণ।—অন্যান্য পীড়ার ন্যায় এই পীড়াতেও জ্বর হয়, ক্ষুধা কমিয়া যায়, জন্তুটী নিস্তেজ হইয়া পড়ে, পিপাসা বাড়ে, কিন্তু ইহা ছাড়া আরও যে কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ এই পীড়াতে দেখা দেয় তাহা এই :—

(১) চোখ, নাক ও মুখ দিয়া খুব ঘন আটা আটা ক্লেদ বাহির হইতে থাকে।
(২) দাতের মাড়িতে ও জিহ্বার তল পিঠে সাদা সাদা দাগ পড়ে ও ছোট ছোট ঘা হয়।
(৩) প্রথমে কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে কিন্তু অল্প পরেই দাস্ত হইতে থাকে এবং আমাশয় হয়। মল অত্যন্ত

* দ্বিতীয় রোগের ও এক নাম বাদলা অথচ পঞ্চম রোগের নামও বাদলা।

পাতলা ও দুর্গন্ধ হয় এবং তাহার সহিত রক্ত ও আম মিশ্রিত থাকে।

(৪) কখনও কখনও গায়ে গুটি বাহির হয়।

(খ) খুরুয়া পীড়ার বিশেষ লক্ষণ—দাঁতের মাড়িতে, জিহ্বাতে এবং পায়ের খুরের মাঝ খানে ফোস্‌কা উঠে, এই সব ফোস্‌কাতে জল থাকে এবং তাহা ফাটিয়া ঘা হয়। মুখ দিয়া জল পড়িতে থাকে এবং পশুটী ক্রামাগত ঠোট চাটিতে থাকে। এই পীড়া ও বসন্তের মধ্যে এই প্রভেদ যে এই পীড়াতে দাস্ত কি আমাশয় হয় না এবং বসন্ত পীড়াতে পায়ে খুরের মাঝ খানে ঘা হয় না।

(গ) গলা ফুলা পীড়ার বিশেষ লক্ষণ।—তড়্‌কা ও বাদলা রোগের কতক লক্ষণের সহিত এই পীড়ার কয়েকটা লক্ষণের মিল আছে। কাজেই লোকে এই সব পীড়ার মধ্যে কি প্রভেদ তাহা সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারে না, এক পীড়া হইলে অন্য পীড়ার নাম বলে। এই জন্য এই পীড়া হইলে নীচের লিখিত লক্ষণ গুলির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়া দেখা উচিত ঃ—

এই পীড়াতে জ্বর অত্যন্ত বেশি হয় এবং গলা ফুলিয়া উঠে। কোনও কোনও স্থলে জিহ্বা ফুলিয়া যায়, কাজেই শ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে ও গিলিতে কষ্ট হয়। গলার ফুলা অতি শীঘ্র বাড়িতে থাকে এবং ক্রমশঃ ঘাড় এমন কি বুক পর্য্যন্ত ফুলিয়া উঠে এবং অবশেষে শ্বাস বন্ধ হইয়া জন্তুটী মরিয়া যায়। গলার কি বুকের ফুলা জায়গায় খুব বেদনা হয় ও হাত দিলে অত্যন্ত গরম বোধ হয় এবং টিপিলে শক্ত লাগে কিন্তু কর্‌ কর্‌ করিয়া শব্দ করে না। কোনও কোনও স্থলে মল মূত্রে রক্তের দাগ দেখা যায়। এই পীড়া হইলে পশু সম্ভবতঃ কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মরিয়া যাইবে, তবে যদি তিন দিনের মধ্যেও মৃত্যু না হয় তাহা হইলে বাঁচিয়া উঠিতে পারে।

(ঘ) তড়্‌কা পীড়ার লক্ষণ।—(১) অনেক স্থলে এমন হয় যে বাহিরে কোনও লক্ষণই প্রকাশ পায় না অথচ হঠাৎ জন্তুটী মরিয়া যায়।

(২) অন্যান্য স্থলে অত্যন্ত জ্বর হইয়া পশুটী অস্থির হইয়া পড়ে এবং যেন শুল বেদনায় ছট্‌ ফট্‌ করিতে থাকে। দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না, টলিয়া পড়িয়া যায় এবং কখনও কখনও মুখ, নাক ও মল দ্বার দিয়া অল্প অল্প রক্ত মিশ্রিত জলের মত বাহির হয়।

(৩) কোনও কোনও স্থলে গায়ে গোল গোল বড় বড় গুটির মত ফুলিয়া উঠে এবং তাহাতে অত্যন্ত বেদনা হয়। এই গুলি গায়ের যে কোনও জায়গায়ই হইতে পারে, কিন্তু প্রায়ই গলায়, ঘাড়ে এবং তল পেটের উপরে দেখা যায়।

(ঙ) বাদলা পীড়ার লক্ষণ।—সর্ব্ব প্রথমেই পশুকে খোঁড়াইতে দেখা যায়, তার পরে উরুর উপরিভাগে, ঘাড়ে, কাঁধে অথবা কোমরে এবং পিঠে ছোট ছোট ফুলা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সব ফুলাতে প্রথমে বেদনা হয় কিন্তু পরে থাকে না এবং যদিও প্রথমে ফুলা ছোট থাকে কিন্তু পরে অতি শীঘ্রই বাড়িয়া আড়াই প্রহরের মধ্যে ভয়ানক আকার ধরিতে পারে। তাহাতে হাত দিয়া টিপিলে কর্‌ কর্‌ শব্দ হয়; মনে হয় যেন তাহা বায়ুতে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। এই পীড়া হইলে পশু অতি শীঘ্র দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং মরিয়া যায়। ইহার ফুলা স্থান ঠাণ্ডা থাকে, তাহাতে বেদনা থাকে না এবং বায়ুতে পূর্ণ হইয়া থাকে, এই লক্ষণের দ্বারা গলা ফুলা পীড়া হইতে ইহার কি প্রভেদ তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

উপরের লিখিত পীড়া গুলির যে যে লক্ষণ লিখা হইল তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিলে গৃহস্থেরাও তাহাদের গরু মহিষ ইত্যাদির কখন কি পীড়া হয় তাহা ঠিক ভাবে বুঝিতে পারিবে, এবং সরকার বাহাদুরের কাছে যাহারা এরূপ পীড়ার সংবাদ দিয়া থাকেন তাহারাও যখন যেখানে যে পীড়া হয় তাহা ঠিক ভাবে জানাইতে পারিবেন।

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য।

নূতন কর।—গভর্ণমেণ্ট এবার আয় বৃদ্ধির জন্য বিদেশ হইতে আমদানী মদ্য, তামাক, রৌপ্য ও খনিজ তৈলের উপর আমদানীর মুখে কর বৃদ্ধি করিয়াছেন।

"এদেশে দরিদ্র প্রজার কর ভার বৃদ্ধি হইলে কৃষ্ণাঙ্গদিগের পক্ষ হইতেই প্রধানতঃ আপত্তি ধ্বনি উত্থিত হয়, কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে বিদেশী ব্যবসায়ী দিগের পক্ষ হইতেই প্রধানতঃ আপত্তি পরিশ্রুত হইয়াছে। বিদেশী মদ্য ব্যবসায়ী, রৌপ্য বিক্রেতা, সিগারেট ও চুরুট প্রভৃতির ব্যবসায়ী এবং বৈদেশিক কেরোসিন তৈলের আমদানীকারারা নূতন করের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন। আমরা নূতন কর গুলির পোষকতা করিয়াছি, এখনও করিতেছি। বিদেশী মদ্যের মূল্য বাড়িবে, দেশী তামাক ও বিড়ী প্রভৃতির প্রচলন অধিক হইবে, দেশের পয়সা দেশে কিছু থাকিবে সুতরাং সেরূপ করে আমাদের আপত্তি হইবে কেন? তবে কেরোসিনের করটা আমাদিগকে কিঞ্চিৎ বহন করিতে হইল। কিন্তু তাহা অতি সামান্য। ছয় বোতল তৈলে দুই পয়সা মাশুল বসিল। ব্রহ্ম-দেশের তৈল ঐ করের আমলে আসিবে না।"—হিতবাদী।

"পেট্রোলিয়ম্ অর্থাৎ কেরোসিন তৈলের উপর কর না বসাইয়া বরং চিনির উপর সেই কর বসান হউক। কেরোসিন তৈলের উপর কর ধার্য্য করিলে গরীব লোকের বড়ই কষ্ট হইবে; কারণ, আজ কাল গরীব লোকেরা প্রায় সকলেই ঐ তৈল ব্যবহার করিয়া থাকে। চিনি প্রধানতঃ বড়লোকে-রাই ব্যবহার করিয়া থাকেন।"—মিঃ চিতনবীশ।

"জীবন রক্ষার পেট্রোলিয়ম অপেক্ষা চিনিই বেশী প্রয়োজনীয়। সুতরাং পেট্রোলিয়ামের পরিবর্ত্তে চিনির উপর কর ধার্য্য হইলে জন-সাধারণের অসুবিধা বৈ সুবিধার সম্ভাবনা আদৌ নাই।"—মিঃ কার্লাইল।

"রৌপ্যের উপর কর স্থাপনের আপত্তি জানাইয়াছিলেন। দেশে যে কাপড়ের কল সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, রৌপ্যের উপর কর বসিলে, সেই সকল কলওয়ালাদের অনিষ্টের সম্ভাবনা।"

মিঃ ভিটালদাস থ্যাকারে।

"তর্ক-বিতর্কে অনেক কথাই উঠিয়াছিল। বজেট-সম্বন্ধে স্থূল কথা এই, রাজপুরুগণ বহু বিচার বিতর্কের পর যাহা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে করিবেন, তাহাই ধার্য্য হইবে। বজেটের শেষ আলোচনার দিন তাহাই জানা যাইবে।" বঙ্গবাসী।

বজেটে জলসংস্থানের ব্যবস্থা।—জলাভাবে ভারতবর্ষের বহুপ্রদেশে চাষ-আবাদে বিঘ্ন ঘটে। আমরা তাই প্রায়ই খাল খনন ও জল সরবরাহের বিষয় আলোচনা করিয়া থাকি। আগামী-বর্ষে (১৯১০-১১ খৃষ্টাব্দে) গভর্ণমেণ্ট ঐ সম্বন্ধে এক কোটী ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। চলিত বর্ষের (১৯০৯-১০ খৃষ্টাব্দে) জন্য যে ব্যয় মঞ্জুর ছিল, তাহা অপেক্ষা ১০ লক্ষ টাকা অধিক দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। পুরাতন খাল সমূহের সংস্কারা-দির জন্য ২৭ লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে,৩৭ লক্ষ টাকা ঐ সংক্রান্ত বিবিধ কার্য্যে ব্যয় হইবে। পঞ্জাব প্রদেশে এবার তিন দিকে খাল খননের ব্যবস্থা হইতেছে; তাহাতেই এক কোটী টাকা ব্যয় হইবে। তদ্ভিন্ন ব্রহ্মপ্রদেশের জন্য ১৩ লক্ষ, বোম্বে প্রদেশের ২৭ লক্ষ, যুক্তপ্রদেশের জন্য ১৬৷৷০ লক্ষ, মধ্যপ্রদেশের জন্য ১৭ লক্ষ, বঙ্গদেশের জন্য ৯৷৷০ লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর হইয়াছে।

স্বাস্থ্যোন্নতি।—"গবর্ণমেণ্ট যে দেড় কোটী টাকা ঋণ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তাহার পরিবর্ত্তে ১ কোটী ৮৭ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করা হউক; আর সেই অতিরিক্ত টাকাটা দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ব্যয়িত হউক। ৩৭ লক্ষ টাকা অধিক ঋণ গ্রহণ করিয়া দেশের স্বাস্থ্যোন্নতিতে মোটমাট এ বৎসর ৮৬ লক্ষ ৮৮ হাজার ৫ শত টাকা ব্যয় মঞ্জুর করুন।"—মিঃ গোখলে।

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু এবিষয়ে মিঃ গোখলের মতের সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু গোখেলের প্রস্তাবও গ্রাহ্য হয় নাই।

"We do not in the least underrate the importance of improved sewers and a

better water supply, but we doubt whether these alone would have produced such an extraordinary reduction in the death rate."—Statesman.

"উন্নত প্রণালীর জল-নিকাশ ও জল-সরবরাহের ব্যবস্থা যে বিলাতে মৃত্যুসংখ্যা হ্রাসের একটা উপায়, সহযোগী ষ্টেটসম্যান তাহা অস্বীকার করেন না; পরন্তু ইহার গুরুত্বই স্বীকার করেন।"—বঙ্গবাসী।

"What has happened is that the poorer classes of society in the United Kingdom are now earning better wages than they were, and can therefore feed their children better and generally take better care of their health."—Statesman.

"সহযোগী ষ্টেটসম্যান যে জলসরবরাহ ও জল-নিকাশের কথা বলিয়াছেন, তাহা খাঁটি কথা। তাহার পর বিলাতের স্বাস্থ্যোন্নতি সম্বন্ধে তিনি যে কথা বলিয়াছেন, তাহাও খাঁটি কথা। বিলাতে গরীব লোকে পূর্ব্বে যাহা উপার্জ্জন করিত, এখন তাহা অপেক্ষা বেশী উপার্জ্জন করে; সুতরাং তাহারা শিশুদিগকে ভাল করিয়া খাইতে এবং তাহাদের স্বাস্থ্যোন্নতি সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন লইতে পারে।

এবার পোষ্টাফিস-সমূহের কন্‌ট্রোলার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল দত্ত মহাশয় তথ্য-নির্ণয়ে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি যেরূপ সুদক্ষ, তাহাতে একটা উপায় নির্দ্ধারিত হইবার আশা রহিয়াছে; তবে জানিনা, ফলে কি হইবে। ফল কথা, দেশের আহার্য্য শস্যের মূল্য বৃদ্ধিতে যে দেশের অনিষ্ট হইতেছে, রাজপক্ষ এ কথা বুঝিয়াছেন।—বঙ্গবাসী।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

চৈত্র মাস।

সব্জী বাগান।—উচ্ছে, ঝিঙ্গে, করলা, শসা, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি দেশী সব্জী চাষের এই সময়। ফাল্গুন মাসের জল পড়িলেই ঐ সকল সব্জী চাষের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হয়। তরমুজ, খরমুজ প্রভৃতির চাষ ফাল্গুন মাসের শেষে করিলেই ভাল হয়। সেই গুলিতে জল সিঞ্চন এখন একটী প্রধান কার্য্য। ঢেঁড়স ও স্কোয়াস বীজ এই সময় বপন করিতে হয়। ভুট্টা দানা মাসের শেষ করিয়া বসাইলে ভাল হয়। গবাদি পশুর খাদ্যের জন্য অনেক সময় গাজর ও বীটের চাষ করা হইয়া থাকে। সেগুলি ফাল্গুনের শেষেই তুলিয়া মাচানের উপর বালি দিয়া ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দিতে হইবে। ফাল্গুনে ঐ কার্য্য শেষ করিতে না পারিলে চৈত্র মাসের প্রথমেই উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করা নিতান্ত আবশ্যক। আশু বেগুনের বীজ এই সময় বপন করিতে হয়। কেহ কেহ জলদী ফলাইবার জন্য ইতিপূর্ব্বে বেগুন বীজ বুনিয়া থাকে।

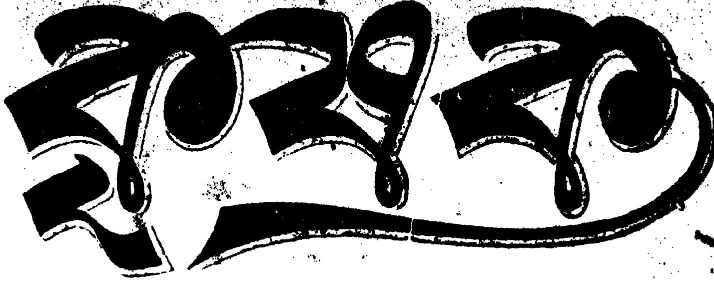
কৃষিক্ষেত্র। এই মাসে বৃষ্টি হইলে পুনরায় ক্ষেত্রে চাষ দিতে হইবে এবং আউস ধানের ক্ষেত্রে সার ও বাঁশ ঝাড়ে, কলা গাছে ও কোন কোন ফল গাছে এই সময় পাঁকমাটী ও সার দিতে হয়। এখানে বাঁশের পাইট সম্বন্ধে একটী প্রবাদবাক্য মনে পড়িয়া গেল। "ফাল্গুনে আগুন, চৈতে মাটী, বাঁশ রেখে বাঁশের পিতামহকে কাটি।" বাঁশের পতিত পাতায় ফাল্গুন মাসে আগুন দিতে হয়, চৈত্র মাসে গোড়ায় মাটী দিতে হয় এবং পাকা বাঁশ না হইলে কাটিতে নাই।

এই মাসেই ধঞ্চে, পাট, অরহর, আউস ধান বুনিতে হয়। চৈত্রের শেষে ও বৈশাখ মাসের প্রথমে তুলা বীজ বপন করিতে হয়। ফাল্গুন মাসেই আলু তোলা শেষ হইয়াছে, কিন্তু নাবী ফসল হইলে এবং বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত শীত থাকিলে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা যাইতে পারে।

ফুলের বাগান।—বিলাতী মরসুমী ফুলের মরসুম শেষ হইয়া আসিল। শীতেরও শেষ হইল, গোলাপেরও ক্রমে ফুল কমিয়া আসিতেছে; এখন বেল, মল্লিকা, জুঁই ফুটিতেছে। এই ফুলের ক্ষেত্রে জল সেচনের বিশেষ বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। শীতপ্রধান পার্ব্বত্য প্রদেশে মিগ্নোনেট, ক্যাণ্ডিটাফ্‌ট, পপি, ষ্ট্যাষ্টারসম, ফ্লক্স প্রভৃতি ফুলবীজ এই সময় বপন করা চলে। পার্ব্বত্যপ্রদেশে এই সময় সালগম, গাজর, ওলকপি প্রভৃতি বীজ বপন করা হইতেছে, আলু বসান হইতেছে।

ফলের বাগান।—ফলের বাগানে জল সিঞ্চন ব্যতীত এখন অন্য কোন বিশেষ কার্য্য নাই। জলদী লিচু যাহা এই সময় পাকিতে পারে, সেই লিচু গাছে জাল ঘিরিতে হইবে।

REGISTERED No. C. 192.



ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসনের মুখপত্র

চৈত্র, ১৩১৬।

REGISTERED No C. 192.

কৃষক

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।



দশম খণ্ড,—১২শ সংখ্যা।

সম্পাদক—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস্।

চৈত্র, ১৩১৬।

কলিকাতা; ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন হইতে
শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা; ১৯৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, দি মিনার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
ই, স্পিরিটো দ্বারা মুদ্রিত।



কৃষক

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিকপত্র।

১০ম খণ্ড। | চৈত্র, ১৩১৬ সাল। | ১২শ সংখ্যা।

মৎস্যের খাদ্য।

জীব মাত্রেরই আহার প্রয়োজন, আহার ব্যতিরেকে কোন জন্তুই জীবন ধারণ করিতে পারে না। আহার সম্বন্ধে প্রাণী জগৎই বল আর উদ্ভিদ জগৎই বল সকলেরই প্রায় এক নিয়ম *। মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি জন্তু সকল যেরূপ এক মাত্র বায়ুর সাহায্যে জীবন ধারণ করিতে অক্ষম, মৎস্য কুলও সেই রূপ এক মাত্র জলের সাহায্যে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না; বায়ু ও জলের সঙ্গে আহারেরও প্রয়োজন। মৎস্যের খাদ্য নিরূপণ করিবার পূর্ব্বে কি কি পার্থিব উপাদানে মৎস্য শরীর গঠিত, তাহা নির্ণয় করা কর্ত্তব্য।

পৃথিবীতে এযাবৎ ৬৮টি মূল পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং এই সকলেরই পরস্পর সংযোগে এই বিচিত্র জগতের যাবতীয় পদার্থের সৃষ্টি। এই সকল মূল পদার্থের আর এক নাম রূঢ় পদার্থ, এই রূঢ় পদার্থ সমূহের পরস্পর সংযোগে অন্য কোন মিশ্র বা যৌগিক পদার্থ নির্ম্মিত হইতে পারে, কিন্তু ইহারা স্বয়ং অন্য কোন পদার্থ হইতে উদ্ভূত নয়। লৌহ, স্বর্ণ, রৌপ্য, পারদ, পটাশিয়ম, সোডিয়াম, এবং অম্লজান, উদজান, যবক্ষারজান, অঙ্গার, গন্ধক, ক্লোরিন্ প্রভৃতি প্রত্যেকেই এক একটি রূঢ় পদার্থ। জড় জগৎই বল আর প্রাণী জগৎই বল, এই সকল পদার্থের সংমিশ্রণে এবং এই মিশ্রিত পদার্থের আবার পরস্পর সংমিশ্রণে সৃষ্ট হইয়াছে। রসায়ন শাস্ত্রের সাহায্যে আমরা সকল বস্তুর উপাদান স্থির করিতে পারি।

১২॥০ মণ মৎস্য রাসায়নিক প্রক্রিয়া অনুসারে বিশ্লেষণ করিলে তাহাতে ২০ ভাগ নাইট্রোজেন, ৮॥০ সাড়ে আট ভাগ প্রফ্ রস মিশ্রিত অম্ল, ও ৪।০ ভাগ ক্ষার দেখা যায় এবং এই সকল ভিন্ন তৈলজ পদার্থ শতকরা ১৯ ভাগ থাকে। অতএব উল্লিখিত এই কয়েকটি রূঢ় পদার্থ দ্বারা মৎস্য শরীর গঠিত হইয়াছে বলিতে হইবে। মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি অন্যান্য জন্তু অপেক্ষা মৎস্যের এই এক সুবিধা যে,

* "Sir J. B. Lawes, the greatest living authority on scientific and practical agriculture, points out that in order to any manufacture, whatever, there must be raw material provided. This is a truth which applies to all produce, whether vegetable or animal, to the manufacture, in fact, of the fishes of the Sea as well as that of the fruits of the Earth."

Indian Agricultural Gazette.
Vol. 1., page, 32.

ইহাদের শরীরের উত্তাপ (animal heat) রক্ষা করিবার জন্য বেশী খাদ্যের প্রয়োজন হয় না। পুকুর, খাল, বিল, নদী প্রভৃতি জলাশয়ে যে সকল গলিতপত্র, শেওলা, দাম এবং অন্যান্য প্রাণী সমূহের মল মূত্রাদি থাকে বা পড়ে তাহাতে পূর্ব্বোক্ত নাইট্রোজেন্ প্রস্ফুরস-মিলিত অম্ল ও ক্ষার আছে বলিয়া তাহা আহার করিয়া ইহাদিগের শরীর পরিপোষিত হয় ও শরীরের ভার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মৎস্যের চাষ করিতে হইলে, প্রথমতঃ খাদ্য সম্বন্ধে বিশেষ বন্দোবস্ত করা উচিত। অনেকে হয়ত মনে করিতে পারেন যে জলের মাছ জলে থাকিয়া বৃদ্ধি হইবে তাহার আবার খাদ্য কি? তাঁহাদিগের এই মত যে নিতান্ত যুক্তি বিরুদ্ধ ও ভ্রমাত্মক তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। এতদ্দেশীয় দুই একটি মিউনিসিপাল পুকুরের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে সহজেই প্রতিপন্ন হয় যে, ঐ সকল পুকুরের মৎস্য, আকারে প্রায় বৃদ্ধি হয় না। বৃদ্ধি না হওয়ার কারণ আর কিছুই নয়, মিউনিসিপাল পুকুর গুলি এত পরিষ্কার যে মৎস্যের খাদ্যোপযোগী গলিত পত্র, দাম, শেওলা কিম্বা জীব শরীরের পরিত্যক্ত মল ইত্যাদি কোন পদার্থই থাকে না, বা পড়িতে পায় না। অতএব ইহাতেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে শুধু এক মাত্র জলের সাহায্যে মৎস্য কখনই বৃদ্ধি হইতে পারে না। যে সকল পুকুরে বস্ত্রাদি ও থালা বাসনাদি ধৌত করা হয়, দেখা গিয়াছে ঐ সকল পুকুরের মৎস্য আকারে অত্যন্ত বড় হইয়া থাকে। এ বিষয়ে সার্ জে, বি, লজ্ সাহেব কি বলেন তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

"যে সকল নদী প্রস্তরময় মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন হইয়া ক্রমাগত প্রস্তর ও অঙ্গারময় জমির উপর দিয়া বহিয়া যায়, ঐ সকল নদীতে মৎস্যের সংখ্যা খুব কম। ইহা গ্রেট ব্রিটেনের প্রায় অধিকাংশ নদী ও হ্রদের জল বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে। স্কট্‌লণ্ডের প্রস্তরময় উচ্চ ভূমি হইতে যে সমুদায় নদী বহির্গত হইয়াছে, ঐ সকল নদীর জলে যবক্ষার অম্ল মাত্রেই নাই। ঐ জলে মৎস্যের আহারোপযোগী এমন কোন পদার্থ দৃষ্ট হয় না, যাহার সাহায্যে জলচর জন্তু মৎস্যকুল কিম্বা জলজ উদ্ভিদ্ সমূহ পরিপোষিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে। স্কট্‌লণ্ডের অধিকাংশ সুন্দর ও মনোরম নদী কি হ্রদে কোন জাতীয় মৎস্য দেখা যায় না। ঐ প্রদেশের উচ্চ ভূমিস্থিত একটি বিভাগের কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবাহ আছে, তন্মধ্যে ট্রাউট্ জাতীয় এক রকম মৎস্য দৃষ্ট হয়, ইহার এক একটি ওজন করিলে অর্দ্ধ ছটাক কি এক ছটাকের বেশী কদাচিৎ হইয়া থাকে। কিন্তু অপর দুইটি প্রবাহের মৎস্য অত্যন্ত বড় হইতে দেখা গিয়াছে, কারণ, একটির সঙ্গে কুক্কুর সমূহের খোঁয়াড় বা বাস স্থান হইতে এবং অপরটির সহিত আলুর চাষ হয় এমন কোন জমি হইতে নর্দ্দামা আসিয়া মিলিত হইয়াছে।

তিনি বলেন যে হার্টফোর্ডশায়ারে আমার বাস-স্থানের নিকটে একটি ফোয়ারা আছে, চক্ বা খড়ি মৃত্তিকা হইতে ইহার উৎপত্তি। তথায় অল্পবারিপাত হয় বলিয়া প্রবাহের তলা অল্প জলপূর্ণ। যদিও প্রচুর পরিমাণে জল নাই এমন কি জল দ্বারা মৎস্য সমূহের পৃষ্ঠদেশ না ডুবুক, কিন্তু ইহাতে যে পূর্ব্বোক্ত ট্রাউট্ জাতীয় মৎস্য জন্মে, তাহা এক একটি ওজন করিলে প্রায় দুই সের হয়। উক্ত ফোয়ারা প্রবাহের জল খড়ি মৃত্তিকা চুয়াইয়া উঠে বলিয়া ঐ জলে প্রচুর পরিমাণে যবক্ষার অম্ল থাকে, এবং এই যবক্ষার অম্লের গুণেই মৎস্য সমূহ এতাধিক পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হয়।

ইহাতেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, উপযুক্ত খাদ্য ভিন্ন মৎস্য কখনই বৃদ্ধি হইতে পারে না। খাদ্যের মধ্যেও অধিক পরিমাণে নাইট্রোজেন মিশ্রিত পদার্থ গুলি মৎস্যের বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ সহায়তা করে। নাইট্রোজেন মিশ্রিত খাদ্যের সাহায্যে এক একটি মৎস্য যে চল্লিশ গুণ বৃদ্ধি হইতে পারে, উপরি উক্ত হার্টফোর্ডশায়রের ফোয়ারার মৎস্য সকল তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। যাহাহউক মৎস্যের খাদ্যের পক্ষে এতদ্দেশীয় কোন্ কোন্ পদার্থ গুলি বিশেষ উপযোগী তাহা নির্ণয় করা উচিত।

জলের মধ্যে যত প্রকার রূঢ় বা যৌগিক পদার্থ আছে তদ্ব্যতীত খৈল, পশু পক্ষ্যাদির মল মূত্র, জন্তু শরীরের ও বৃক্ষ লতা পাতার পচানী, মনুষ্যের খাদ্য ভাত, ডাল প্রভৃতি এই সকলই মৎস্যের খাদ্যের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে।

১। খৈল—সর্ব্বপ্রকার উদ্ভিদের পক্ষে যেরূপ উপযোগী মৎস্যের পক্ষেও তদ্রূপ। অন্যান্য দ্রব্য অপেক্ষা খৈলে নাইট্রোজেন ও প্রস্ফরস্ মিলিত অম্লের ভাগ অত্যন্ত বেশী। এই জন্য প্রায় সর্ব্বত্রই ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য খৈল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন গাভী কুলের দেহের পুষ্টি সাধনের পক্ষে খৈল বিশেষ উপযোগী। সর্ষপ, তিসি. রেড়ি, পোস্ত, তিল, নারিকেল ও কার্পাস বীজের খৈল এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহার মধ্যেও অন্যান্য খৈল অপেক্ষা কার্পাস বীজের খৈল অত্যুৎকৃষ্ট, ইহাতে হাজার করা নাইট্রোজেন ৬৬.০ ভাগ ও প্রস্ফরস্ মিলিত অম্ল ৩১.২ ভাগ থাকে *। এতদ্দেশে ছিপ্ ফেলিয়া মাছ ধরিবার সময়ে, অনেকে কার্পাস বীজ চূর্ণ চার রূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। খৈল, মৃত্তিকা কি অন্য কোন মৎস্য খাদ্যোপযোগী দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া পচাইয়া জলে ফেলা উচিত।

২। পশু পক্ষ্যাদির মল—গোময় মৎস্যের পক্ষে একটি উৎকৃষ্ট খাদ্য; ইহা ভিন্ন অশ্ব, ছাগল, শূকর, মেষ, কুকুর প্রভৃতি পশু সকলের বিষ্ঠাদি ব্যবহার করা যাইতে পারে। বিষ্ঠার মধ্যেও অনেক প্রভেদ আছে যে সকল গরু কি ঘোড়া অধিক পরিমাণে খৈল, ছোলা, কি অন্য কোন সার পদার্থ খাইতে পায় এবং অত্যন্ত পরিশ্রম

* Manurial constituents in 1000 parts of ordinary food.

	Drymatter.	Nitrogen.	Potash.	Acid-pho
Cotton cake (decorticated)	900	66.0	15.0	31.2
Rape cake	900	48.0	13.2	24.6
Linseed cake	800	45.0	14.7	19.6

করিয়া থাকে, ঐ সকল গরু কি ঘোড়ার বিষ্ঠাতে বেশী পরিমাণে সার পদার্থ থাকে। দুগ্ধবতী গাভীর মলে বেশী পরিমাণে সার পদার্থের আশা করিতে পারা যায় না *। যাহা হউক গোময় যে মৎস্যের পক্ষে একটি সুলভ উৎকৃষ্ট খাদ্য তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। যখন ইচ্ছা তখন ইহা পুকুরে ফেলিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

৩। জন্তুর চর্ম্ম, মাংস, নাড়ী ভুঁড়ি প্রভৃতি পচা কিম্বা পচিয়া মৃত্তিকাবৎ হইলে মৎস্যের উত্তম খাদ্যের মধ্যে পরিগণিত করা যাইতে পারে। কেঁচো, ছোট ছোট অব্যবহার্য্য মৎস্য পচাইয়া সময়ে সময়ে দেওয়া যাইতে পারে। এতদ্দেশে অনেকে চাষ করিতে কেঁচো পচা ব্যবহার করিয়া থাকেন। অনেকেই হয়ত দেখিয়া থাকিবেন যে, কতকগুলি মৎস্য আছে, যাহারা সাধারণতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য ভক্ষণ করিয়া থাকে, অতএব আমাদিগের অব্যবহার্য্য এমন অনেক ছোট ছোট মৎস্য আছে, যাহা পুকুরে ছাড়িলে অনায়াসে মৎস্যের খাদ্য হইতে পারে।

৪। শম্বুক—সচরাচর জলে থাকে, এবং মৎস্যের ইহা একটি প্রধান খাদ্য। মৎস্যের পোনার পক্ষে শম্বুক ও গেঁড়ি ভাঙ্গা বিশেষ উপযোগী।

৫। ভাত, ডাল প্রভৃতি মনুষ্যের খাদ্য দ্রব্য—অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন খিড়কীর পুকুরের মৎস্য সাধারণতঃ খুব বড় হয়। বড় হইবার কারণ আর কিছুই নয় খিড়কীর পুকুরে সর্ব্বদা থালা, বাসন ধোয়া হইয়া থাকে, তাহাতে যে সমস্ত ভুক্তাবশিষ্ট দ্রব্যাদি থাকে, মৎস্যগণ ঐ সকল পদার্থ খাইয়া অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইহা ভিন্ন সময়ে সময়ে পর্য্যুষিত ডাল, ভাতও পুকুরে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। অতএব যে পুকুরে মৎস্যের চাষ করা যা‑বে, তাহাতে সময়ে সময়ে আমাদিগের আহারীয় পদার্থ ফেলা উচিত এবং থালা বাসন ধুইতে নিষেধ করা উচিত নয়।

৬। দাম—সমস্ত পুকুর ব্যাপিয়া দাম থাকিলে মাছের অনিষ্ট বই ইষ্ট হয় না, কিন্তু পুকুরে খানিকটা দাম রাখা উচিত। অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন যে পুকুরে দাম আছে, তাহার মৎস্য সমূহ খুব বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন পুকুরে পানীফলের চাষ করিতে দেওয়া মন্দ নয়, অনেকের বিশ্বাস ইহাতে মৎস্যের বর্ণ কাল হয়; এ বিশ্বাস নিতান্ত অমূলক নহে, কিন্তু নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিলে মৎস্য কাল হওয়ার আর কোন আশঙ্কা থাকে না। পুকুরে পানীফলের চাষ করিতে দিলে, চারি প্রান্তে যেন চাষ করা না হয়, পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রান্ত খোলা রাখা নিতান্ত উচিত, কারণ কতকগুলি পুষ্পের ন্যায় মৎস্যেরও স্বাভাবিক ধর্ম্ম এই যে, ইহারা সূর্য্যোদয় হইলে

---

* "The composition varies according to the character of the animals contributing to it, the quality of their food, the nature and proportion of straw and other foreign matters. In the case of an adult animal, say a working bullock, the excrements will contain the same quantity of valuable constituents of manure as was present in the food consumed. If, however, the animals are young and increasing in size, producing young, or giving milk, the excrements will contain less valuable matter. The manure made from the latter class of excrements will therefore be of less value than that made from the first class. A cow in full milk for instance can never give rich manure. If all the valuable constituents of food are used up in building up the body of a thriving young animal, the excrement can hardly be expected to contain any thing of importance as manure."

Indian Agricultural Gazette, Vol. I, page, 26.

জলাশয়ের পশ্চিম প্রান্তে এবং অস্ত যাইবার সময়ে পূর্ব্ব প্রান্তে যাইয়া ক্রীড়া বা বিচরণ করিতে থাকে। আলো হইতে বঞ্চিত থাকা কোন জীবেরই প্রাকৃতিক ধর্ম্ম নহে। আলোক না পাইলে কোন জিনিষেরই রঙ্ খুলে না।

৭। মৃত্তিকা—মৃত্তিকায় যবক্ষারজান, পটাস, ফস্‌ফরিক অম্ল প্রভৃতি যৌগিক ও রূঢ় পদার্থ আছে, সময়ে সময়ে গোময় ও মৃত্তিকা একত্র মিশ্রিত করিয়া পুকুরে ফেলা যাইতে পারে।

উপরে যতগুলি খাদ্য লিখিত হইল, তদ্ভিন্ন কুঁড়ো, মদের কাট, পনির, পাঁউরুটি, মুড়ি, আলু পচা, গলিত পত্র, পাঁক, গেঁড়ী প্রভৃতি অনেক রকম পদার্থ আছে, যাহা মৎস্যের খাদ্যের পক্ষে উপযোগী হইতে পারে। কুঁড়ো, আলু পচা, মদের কাট, পনির, সরিসা ভাজা, মেথি ভাজা ও পাঁউরুটি অনেকে চাররূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

মিশ্রিত পদার্থ—নানাবিধ জন্তুর মল মূত্র, উদ্ভিদ পচা ইত্যাদি ময়লা কলিকাতা, বম্বে প্রভৃতি বড় বড় সহরের ড্রেন বা নর্দ্দামা দ্বারা স্থানীয় নিকটবর্ত্তী নদীতে বহির্গত হইয়া যাওয়ার বন্দোবস্ত আছে। এই মিশ্রিত তরল পদার্থ মৎস্যের একটি প্রধান খাদ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। ইহাতে মনুষ্য, গরু, অশ্ব প্রভৃতি নানাবিধ জন্তুর মল, মূত্র মিশ্রিত থাকাতে নাইট্রোজেনের ভাগ বেশী পরিমাণ থাকে। অনেকেই অবগত আছেন যে কলিকাতা মহানগরীর সন্নিকটস্থ ধাপার নীচে যে নদী আছে, তাহার মৎস্য অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এবং খাইতে খুব সুস্বাদু; ইহার কারণ আর কিছুই নয়, কলিকাতা মহানগরীর ময়লা সকল প্রণালী দ্বারা ঐ নদীতে বহির্গত হইয়া যায়। এই কারণে জলাশয়ের নিকট গোশালা সংস্থাপিত হওয়া মন্দ নয়, এবং গোশালা হইতে দুই একটি প্রণালী জলাশয়ের সঙ্গে সংযুক্ত থাকা আবশ্যক।

যে পুকুরে মৎস্যের চাষ করিতে হইবে তাহার নিকটে রজকের বাসস্থান থাকিলে ভাল হয়, রজকগণ যে সকল মলিন বস্ত্র পুকুরে ধৌত করিবে তাহাতে মৎস্যের উপকার ভিন্ন অপকারের আশঙ্কা নাই।

এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে, যে পুকুরে মিশ্র পদার্থ প্রভৃতি দ্বারা মৎস্যের রীতিমত চাষ করিতে হইবে, তাহার জল মনুষ্যের পক্ষে ব্যবহার না করাই ভাল। সময়ে সময়ে পুকুরে মৎস্যের জন্য যে সকল খাদ্য দেওয়া হয়, সেগুলি অথবা সেই পুকুরের জল মৎস্যের পক্ষে উপকারী বটে কিন্তু মনুষ্যের পক্ষে অনুপকারী।

শ্বেতসার বা পালো ও শর্করা।

শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী লিখিত।

(অঙ্গার ৫. হাইড্রোজেন ১০, অক্সিজেন ৫)।—আমাদের উদ্ভিজ্জ আহারের মধ্যে শ্বেতসার বা পালো প্রধান জিনিস। প্রধান প্রধান খাদ্যদ্রব্যে শতকরা কত ভাগ শ্বেতসার আছে, তাহা নিম্নলিখিত তালিকা দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে:—

শস্য	চাউল	গম	যই	যব	মকাই	জুয়ার	আলু	কলাই
পালো	৭৭	৬৮	৬০	৭০	৭০	৭০	১৬	৬০

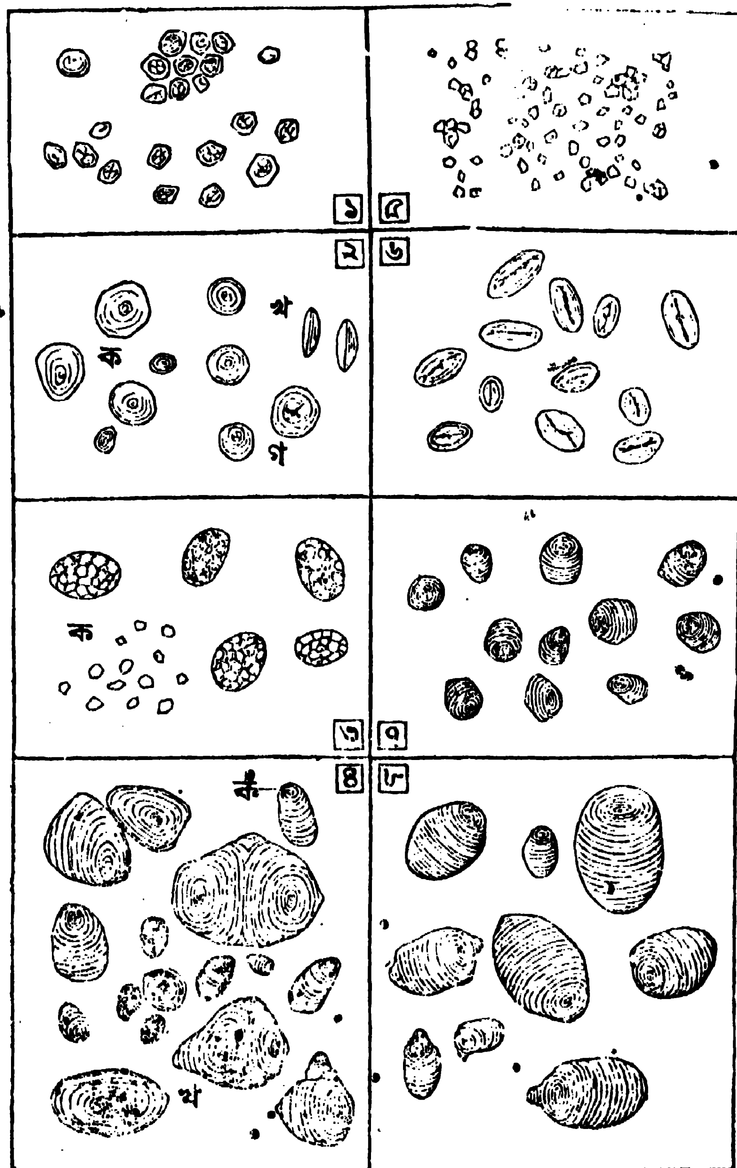
ভিন্ন ভিন্ন শস্যের পালো ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি বিশিষ্ট। পর পৃষ্ঠায় কয়েক প্রকার পালোর চিত্র প্রদত্ত হইল। উদ্ভিদদিগের মূলে ও বীজেই সাধারণতঃ পালো সঞ্চিত থাকে।

বিশুদ্ধ পালোর কোন গন্ধ কিম্বা স্বাদ নাই। ফুটন্ত জলে ইহা কিঞ্চিৎ পরিমাণে দ্রব হয় বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু শর্করায় পরিণত না করিয়া, ইহাদ্বারা দ্রাবণ প্রস্তুত করা যায় না। ক্ষারের সহিত উত্তপ্ত করিলেও ইহা দ্রবণীয় হয়। ইহা লঘু পথ্য বলিয়া খ্যাত। মুখের অমৃত ইহাকে শর্করায় পরিণত করিতে পারে। জলে মিশ্রিত করিয়া কিঞ্চিৎ এসিডসংযোগে উত্তাপ দিলে পালো হইতে একরূপ স্বল্পমিষ্ট শর্করা (ডেক্সট্রোয্) প্রস্তুত করা যায়। এই চিনিদ্বারা সুরা ও ভিনিগার প্রস্তুত হয়।

পালো প্রস্তুত করা বড় কঠিন নহে। বরিশাল জেলায় অনেক গৃহস্থ শটী হইতে পালো প্রস্তুত করিয়া থাকে। স্থানীয় চিকিৎসকগণ এই পালো ব্যারামের সময়ে পথ্যরূপে ব্যবস্থা করেন। ইহা দ্বারা নানারূপ মিষ্টান্নও প্রস্তুত হইয়া থাকে। কার্ত্তিক হইতে চৈত্রমাস পর্য্যন্ত শটী তুলিয়া সংগ্রহ করা হয়। বৃষ্টি পাইয়া শটী গজাইলে তাহা হইতে অধিক পালো পাওয়া যায় না; কারণ তখন পালো মূল হইতে গাছের নূতন বর্দ্ধনশীল অংশে পরিব্যাপ্ত হয়। শটীর বাকল ফেলিয়া প্রথমত জলে ধৌত করিয়া ঢেঁকিতে কুটীয়া লওয়া হয়। পরে এই কোটা শটী জলে চট্‌কাইয়া একটা চট দ্বারা ছাঁকিয়া লইতে হয়। এই জল প্রায় ৩ ঘণ্টা কোন পাত্রে রাখিয়া দিলে, পাত্রের তলায় শুভ্র বর্ণের পালো জমা হইয়া পতিত হয়। তৎপরে পালোর উপরিস্থিত জল ফেলিয়া দিয়া, ইহা জল মিশ্রিত করিয়া পূর্ব্ববৎ পাত্রে রাখিয়া দেওয়া হয়। এইরূপ ৭ বা ৮ বার ধৌত করিলে পরিষ্কৃত পালো প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভালরূপ ধৌত না করিলে শটীর তিক্ত রস সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় না। কিঞ্চিৎ কষ্টিক সোডার দ্রাবণ যোগ করিলে সহজে এই পালো পরিষ্কৃত হইবে। তাহার পর ইহা রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লওয়া হয়।

বিলাতে গম, যব, মকাই, চাউল, আলু, এরোরুট প্রভৃতির পালো বাহির করা হয়। গম, যব প্রভৃতি, এক দিন জলে ভিজাইয়া রাখিয়া, পেষণ করা হয়। এই পেষিত গম বা যব জলে মিশ্রিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ছাঁকিয়া লওয়া হয়। এই জল এক প্রকার কলের মধ্যে ঘুরাইলে জল

ও পালো পৃথক হইয়া পড়ে। বলা বাহুল্য যে, এই কল দ্বারা পালো ছাঁকিয়া লইলে, শীঘ্র শীঘ্র ধৌত কার্য্য সমাধা হয়। তাহা না করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকার পাত্রে রাখিয়া দিলে, পালো পাত্রের নীচে জমা হয়। তৎপরে জল ফেলিয়া দিয়া, পুনরায় ইহার সহিত জল মিশ্রিত করিয়া, কষ্টিক সোডার ক্ষীণ দ্রাবণ যুক্ত করা হয় এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পালো পাত্রের তলে জমা হইলে, জল ফেলিয়া দেওয়া হয়। তৎপরে দুই তিন বার জলে ধৌত করিলে, কষ্টিক সোডার ক্ষার চলিয়া যায়। অতঃপর ইহা শুষ্ক করিলেই বিশুদ্ধ পালো প্রাপ্ত হওয়া যায়। চাউল হইতে পালো প্রস্তুত করা তত সহজ নহে। চাউল প্রথমত কষ্টিক সোডার ক্ষীণ দ্রাবণে এক দিন সিক্ত করিয়া রাখিতে হয়,



বিভিন্ন শস্যের পালোর প্রতিকৃতি।

১। ভুট্টার পালো।
২। গমের পালো।
৩। যইর পালো, (ক) বিযুক্ত।
৪। আলুর পালো, (খ) যুক্ত।
৫। চাউলের বিযুক্ত পালো।
যই ও চাউলের পালো দেখিতে একরূপ।
৬। শিমের।
৭। য়্যারোরুটের পালো।
৮। ক্যানার পালো।

পরে ধৌত করিয়া, উত্তমরূপে পেষণ করা হয়। পরে এই পিষ্টকে পুনঃ ক্ষার-দ্রাবণ যোগ করিয়া ২৪ ঘণ্টা জলে আন্দোলিত করিতে হয়। অতঃপর পূর্ব্বোক্ত প্রণালীমত পালো জমাইয়া বিভক্ত করিয়া লওয়া হয়। নিম্নে লিখিত অন্য প্রণালী অপেক্ষাকৃত সহজ। এই প্রণালীমতে প্রথমতঃ চাউল এক দিন জলে মিশ্রিত করিয়া, ইহাতে হাইড্রোক্লোরিক এসিডের দ্রাবণ যোগ করিয়া কয়েক ঘণ্টা রাখিয়া দিলে পালো ব্যতীত পিষ্টকের অন্যান্য পদার্থ দ্রবীভূত হয়। তৎপরে পালো জমাইয়া জলে ধৌত করিয়া লইয়া পালো বাহির করা যায়।

আলুর পালো প্রস্তুত করিতে হইলে, আলুর ছাল ফেলিয়া ঢেঁকী দ্বারা কিম্বা অন্য কোন উপায়ে পিষিয়া লইতে হইবে। পরে সালফিউরিক এসিডের দ্রাবণযুক্ত জলে ইহা মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইতে হয়। ঐ জল কোন পাত্রে রাখিলে, পূর্ব্বের ন্যায়, পালো এই পাত্রের তলায় জমা হয়। ইহার পর, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে, কষ্টিক সোডা (অভাবে সোডা) মিশ্রিত জলদ্বারা ইহা ধৌত করিতে হইবে। ইহাতে তৈলাদি পদার্থ দূরীকৃত হয়। স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, কষ্টিক সোডা মিশ্রিত জল ও পরে পরিষ্কৃত জল দ্বারা ধৌত না করিলে, কোন পালোই বিশুদ্ধ হইতে পারে না।

আলু (সুলভ হইলে), ভুট্টা ও জুয়ার হইতে পালো বাহির করা খুব লাভজনক ব্যবসা হইতে পারে।

এরোরুট ও সিমুলিয়া আলুর মূল হইতেও পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পালো বাহির করা যাইতে পারে।

আইওডিন ও ব্রোমিণ্ দ্বারা পালো পরীক্ষা করা যায়।

শর্করা।—নানা প্রকার চিনি আছে; যথা,—ফল চিনি, যব চিনি, ইক্ষু চিনি ইত্যাদি। ইহাদের বিবরণ সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা যাইতেছে।

ফলচিনি, (অঙ্গার ৬, হাইড্রোজেন ১২, অক্সিজেন ৬)।—ফলের মধ্যে যে চিনি পাওয়া যায় তাহাকে ফলচিনি বলা যাইতে পারে। ফলচিনি দুই প্রকার, যথা—(১) গ্লুকোষ্ বা ডেক্স্ট্রোষ্, (২) লেভুলোষ্। ডেক্স্ট্রোষ্ অতি স্বল্পমিষ্টবিশিষ্ট শর্করা, কিন্তু লেভুলোষ্ ইক্ষুশর্করার ন্যায় মিষ্ট। মাত গুড় ও মধুতে অধিকাংশই লেভুলোষ্, কিন্তু ফলে ইক্ষুচিনিও সাধারণত প্রাপ্ত হওয়া যায়। ফলচিনি হইতে সুরা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

পালো সালফিউরিক এসিডের ক্ষীণ দ্রাবণের সহিত উত্তাপ দিলে ফলচিনিতে (ডেক্স্ট্রোষ্) পরিবর্ত্তিত হয়। ইহার অম্লত্ব নষ্ট করিবার নিমিত্ত চাখড়িচূর্ণ সংযোগ করা আবশ্যক। তাহার পর, এই রসকে ফ্লানেলে ছাঁকিয়া পুনঃ উত্তাপ দ্বারা গাঢ় করিলেই, ফলচিনি প্রস্তুত হয়।

ডেক্স্ট্রোষ্ ফল ব্যতীত ডিম্বে, জন্তুর যকৃতে এবং বহুমূত্র-রোগীর মূত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইক্ষুশর্করা সাল্‌ফিউরিক্ এসিড্ যোগে কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হয় কিন্তু ডেক্স্ট্রোষে তাহা হয় না।

যবচিনি (মলটোষ্), **দুগ্ধচিনি** (ল্যাক্‌টোষ্) এবং **ইক্ষুচিনি** (সুক্রোষ্), (অঙ্গার ১২, হাইড্রোজেন ২২, অক্সিজেন ১১)।—এই সকল শর্করা সমসংখ্যক অঙ্গার, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন ধারণ করে। কিন্তু ইহাদের গঠনপ্রণালী বিভিন্ন; এই জন্য ইহাদের গুণাবলীও বিভিন্ন।

ইক্ষুচিনি।—ইক্ষুচিনি ও খেজুর চিনি উভয়কেই আমরা ইক্ষুচিনি বলিয়া বর্ণনা করিব; বাস্তবিক ইহাদের গঠনপ্রণালীও একইরূপ। কিন্তু আমরা গন্ধ এবং স্বাদ দ্বারা এই উভয় চিনিকে বিভক্ত করি; তাহার কারণ এই যে, প্রস্তুত করিবার সময়ে বিশুদ্ধ শর্করা ব্যতীত অন্যান্য অনাবশ্যক পদার্থ ইহাদের সহিত মিশ্রিত থাকিয়া যায়। বৈজ্ঞানিক প্রণালী মতে চিনি প্রস্তুত করিবার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ইক্ষুর রস করিয়া তৎক্ষণাৎ ফ্লানেল দ্বারা ছাঁকিয়া লইয়া ইহাতে কলিচুণ (১) এমন ভাবে মিশ্রিত করিবে, যেন ইহা এই রসের অম্লত্ব বিনষ্ট করিতে পারে। (২) নীল বর্ণের লিটমাস্ কাগজ এই রসে সিক্ত করিলে যদি ইহা লোহিতবর্ণ প্রাপ্ত হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, রস অম্লযুক্ত। তাহা হইলে আরো চুণ মিশ্রিত করিতে হইবে। যখন দেখিবে যে, লোহিত বর্ণের কাগজ কিঞ্চিৎ নীলবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন জানিবে যে চূর্ণ-মিশ্রণ ঠিক হইয়াছে। পরে অগভীর (চেপ্টা) কড়াতে রস জ্বাল দিবে। এই রস উত্তপ্ত হইলে, ইহার সহিত সালফিউরাস্(৩) এসিড-দ্রাবণ মিশ্রিত করিবে, যেন নীল-লিটমাস্ কাগজ ঈষৎ লোহিত বর্ণ ধারণ করে। যদি চুণ অতিরিক্ত হইয়া থাকে, তবে লোহিত বর্ণের কাগজ নীলবর্ণ প্রাপ্ত হইবে। তাহা হইলে, আর একটু সাল্‌ফিউরাস্ এসিড মিশ্রিত করিতে হইবে। চুণের ভাগ অপেক্ষা এসিডের ভাগ কিঞ্চিৎ অধিক রাখিবে; চুণের ভাগ অধিক হইলে গুড়ের বর্ণ নিশ্চয়ই কাল হইবে। কিয়ৎক্ষণ জ্বাল দিলে, রসের দ্রবণীয় অনেক পদার্থ কঠিনাকার ধারণ করে। তখন রস নামাইয়া কিয়ৎক্ষণ মৃত্তিকা বা কাঠের পাত্রে রাখিলে রসের ময়লা অধঃপতিত হয়। পরে ছাঁকিয়া পুনরায় জ্বাল দিলে, বিশুদ্ধ গুড় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। এই সময়ে পুনরায় কিঞ্চিৎ সালফিউরাস এসিড যোগ করিলে রসের কৃষ্ণবর্ণ সম্পূর্ণরূপে দূর হয়।

এই প্রণালীতে গুড় প্রস্তুত করিলে, অধিক দানাদার গুড় প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং ইহার বর্ণও অতিশয় শুভ্র হয়। এই গুড় শীঘ্র মদাইয়া যায় না। উড়িষ্যা দেশে কৃষকগণ রসে কলিচুণ মিশ্রিত করে বটে, কিন্তু তাহা এত অতিরিক্ত পরিমাণে ব্যবহৃত হয় যে, গুড় অত্যন্ত কাল হয়। উত্তাপ-কালীন ২ বা ১ বার দুগ্ধের জল রসে দিলে ইহার ময়লা উত্তমরূপে গাদের সহিত উঠিয়া যায়; এবং গুড়ের বর্ণও উজ্জ্বল হয়। বেহার প্রদেশের কোন কোন স্থলে লিচরা ফলের আঠা অথবা ইহার পাতার রস গুড় কিম্বা চিনির রসের সহিত মিশ্রিত করা হয়। ইহাতেও বেশ গাদ উঠিয়া থাকে। অনেক স্থানে চাষীগণ গুড় প্রস্তুত করিবার সময়ে গাদ কাটে না। গাদের সহিত অতি সামান্যই গুড় নষ্ট হয়, কিন্তু অন্যদিকে, এই অপরিষ্কারের জন্য যে মূল্য নিতান্ত কম হয়, সে বিষয়ে তাহারা চিন্তা করে না।

কড়াইয়ের ধারে যাহাতে রস পুড়িতে না থাকে তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে; এই জন্য, মধ্যে মধ্যে জল-সিক্ত কাপড়ের টুকরা দ্বারা কড়াই পুঁছিয়া দিতে হয়। রস পুড়িতে থাকিলে গুড় কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইবে। প্রচলিত গভীর মৃত্তিকা-পাত্রে গুড় প্রস্তুত করিতে সকলে পারে না, এবং ইহাতে গুড়ের বর্ণও খুব উজ্জ্বল হয় না; কারণ

(১) চুণের পরিবর্তে সোডাও ব্যবহার করা যায়।

(২) এক শত গ্যালন রসে প্রায় ২ আউন্স চুণের প্রয়োজন হয়।

(৩) সালফিউরাস এসিডের অভাবে সালফিউরিক বা ফস্ফরিক এসিড ব্যবহার করা যাইতে পারে।

এই প্রণালীতে রস অল্পবিস্তর পুড়িতে থাকে। গুড় হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে দুই বা একবার কিঞ্চিৎ সোডার জল দিলে, গুড়ের বর্ণ অতি শুভ্র হয়।

পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে প্রস্তুত গুড়ের মাদ বাহির করিয়া দিলে উত্তম চিনি প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতি উত্তম চিনি প্রস্তুত করিতে হইলে, গুড় জলে দ্রব করিয়া ইহাতে পূর্ব্বোক্ত প্রণালীমত চূণ ও সালফিউরাস্ এসিড্ যোগ করিয়া দানাদার গুড় প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। রস কয়লা চূর্ণের* ভিতর দিয়া ফিল্টার করিয়া লইলে, চিনির বর্ণ অতিশয় উজ্জ্বল হইবে। কেহ কেহ সাল্‌ফার-ডাই-অক্সাইড্ (গন্ধক পোড়াইলে যে ধূম উত্থিত হয়) দ্বারাই রসের বর্ণ নষ্ট করিয়া থাকেন। এই রস "ভ্যাকুয়াম্" কড়াতে গাঢ় করিয়া চিনি প্রস্তুত করিলে, ইহা অতিশয় শুভ্র বড় বড় দানা-বিশিষ্ট হইয়া থাকে। "ভ্যাকুয়াম্" কড়াই ব্যবহার ব্যতীত কখনও চিনি এইরূপ শুভ্র কিম্বা মোটা দানাযুক্ত হইতে পারে না, কারণ, ইহাতে রস মোটেই পুড়িতে পায় না। কিন্তু ভ্যাকুয়াম্ পাত্রে চিনি প্রস্তুত করা অতিশয় ব্যয়সাধ্য।

ইক্ষুচিনি জলে মিশ্রিত করিয়া কিঞ্চিৎ এসিড-দ্রাবণ সহযোগে উত্তাপ দিলে, ইহা † ফলচিনিরূপে পরিবর্ত্তিত হয়।

---

* উদ্ভিজ্জ কয়লা অপেক্ষা জান্তব কয়লার অঙ্গারীয় পদার্থের বর্ণ নষ্ট করিবার গুণ অধিক; এই জন্য সাধারণতঃ জান্তব কয়লাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

† চূণ বা সোডা দ্বারা রসের অম্লত্ব দূরীভূত না করিয়া গুড় প্রস্তুত করিলে, ইহার ইক্ষু চিনিও লেভুলোষ্ (রাব) হইয়া যায় এবং এই গুড় দানা বাধে না

কৃষক।

শ্রীরাজনারায়ণ বিশ্বাস লিখিত।

আমাদের দেশে এক্ষণে যে কৃষিকার্য্যের অবনতি হইয়াছে ইহার কারণ কৃষকদিগের মধ্যে উন্নত প্রণালীর কৃষিজ্ঞানের বিস্তার নাই। জ্ঞান বিস্তারের উপর যে কৃষিকার্য্যের উন্নতি নির্ভর করিতেছে, তাহার প্রমাণ হল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি। ঐ সকল দেশের মৃত্তিকা সাধারণতঃ উর্ব্বর নহে। তথাপি বিজ্ঞান বলে ইউরোপীয়েরা দিন দিন ইহার প্রভূত উন্নতি সাধন করিতেছেন। তাঁহারা যেরূপ যত্ন, দৃঢ় পরিশ্রম এবং অবিচলিত অধ্যবসায় সহকারে কৃষিকার্য্য করিয়া থাকেন, ভারতীয় কৃষকগণ সেই রূপ যত্ন সহকারে কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিলে ভারত মৃত্তিকায় যে কত শস্য উৎপন্ন হইত তাহা মনে ধারণা করা যায় না। "ভারতের মাটিতে সোণা ফলে" এই যে প্রবাদ-বাক্য বহু দিন হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, প্রাচীন কালের কৃষকগণ ইহার অর্থ বুঝিয়াছিলেন। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় কৃষক শ্রেণীর যেরূপ আদর, ভারতবর্ষের কৃষকদিগের প্রতি যদি সেরূপ আদর যত্ন, উৎসাহ ও সম্মান প্রদর্শিত হইত, তাহা হইলে ভারতের কৃষির এত অবনতি ঘটিত না। যে সময়ে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এতদ্দেশের গবর্ণর-জেনারেলের পদে অভিষিক্ত ছিলেন, সেই সময়ে কৃষকদিগের উন্নতির জন্য তাঁহার আন্তরিক যত্ন ছিল। তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী লেডি উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এগ্রিকল্‌চারাল সোসাইটীতে উপস্থিত হইয়া উৎসাহ ও অতি আনন্দের সহিত সামান্য কৃষক ও মালীদিগকে স্বহস্তে পারিতোষিক বিতরণ করিতেন। মহাত্মা বেণ্টিঙ্ক যে কৃষিকার্য্য আন্তরিক ভাল বাসিতেন, তাহার সহস্র সহস্র

উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি আপনাকে কৃষক বলিয়া পরিচয় দিতে অতি গৌরব বোধ করিতেন। মহারাজ রণজিৎ সিংহের সহিত কৃষি সম্বন্ধে তাঁহার যে পত্র বিনিময় হয়, তাহাতে তিনি রণজিৎ সিংহকে লিখিয়াছিলেন, "মহারাজ অবশ্য জ্ঞাত থাকিবেন, যে তাবৎ সম্পত্তির মূলই, ভূমি এবং ভূম্যুৎপন্ন দ্রব্যের ও তাহার গুণের বৃদ্ধি হয়, তৎপক্ষে সাহায্য ও পোষকতা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।"

ভারতের যে রূপ দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে, অন্নকষ্ট ও দুর্ভিক্ষ দিন দিন যেরূপ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ কৃষিকার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিলে দেশের মঙ্গলের আশা দেখা যায় না। দেশের কৃতবিদ্যগণ যেরূপ রাজপুরুষগণের বিরাগভাজন হইতেছেন, দেশে চাকরী যেরূপ দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে দেশীয় কৃতবিদ্য-গণের আর চাকরীর মুখ তাকাইয়া থাকিলে চলিবে না; এখন তাঁহাদিগের উদরান্নের সংস্থান ও দেশের মঙ্গল জন্য উপায়ান্তর গ্রহণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছে। দেশীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তি-গণ যদি এ সময়ে কৃষি, বাণিজ্য, শিল্পাদি কার্য্যে প্রবিষ্ট হন, তাহা হইলে অনেকটা উন্নতির আশা করা যাইতে পারে।

যাহারা স্বহস্তে চাষ করিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে অনেকেরই চাষের কায়েমী স্বত্ব বিশিষ্ট ভূমি নাই। তাহারা ভাগজোতে অথবা কোরফা বন্দোবস্ত করিয়া চাষের জন্য জমি লইয়া থাকে। ঐ সকল জমিতে প্রচুর পরিমাণে সারাদি প্রদান করিয়া, ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিতে পারে না; তাহার কারণ ২।১ বৎসর পরেই ঐ জমি ছাড়াইয়া লইয়া থাকে। নিঃস্ব কৃষকগণের প্রচুর মূল্য দিয়া কায়েমী স্বত্ব বিশিষ্ট ভূমি ক্রয় করিবারও শক্তি নাই। এরূপ স্থলে দেশের কৃষির উন্নতি নিতান্ত সুদূরপরাহত।

প্রত্যেক দেশের কৃষিজাত দ্রব্য তত্তৎদেশে আবদ্ধ থাকিলে, ধন বৃদ্ধি ও দেশের উন্নতি হয় না। কৃষিজাত দ্রব্য শিল্প বাণিজ্যে পরিণত না করিলে অভিলষিত ফল লাভ করিতে পারা যায় না। ভারতের শস্যাদি যতই বিদেশে বাণিজ্যার্থ প্রেরিত ও শিল্পাদি কার্য্যে নিয়োজিত হইবে, ততই দেশের ধন বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইবে। পূর্ব্বাপেক্ষা তণ্ডুলের মূল্য যে এত বৃদ্ধি হইয়াছে, বিদেশে রপ্তানীই তাহার মূল কারণ। তবে ইহার দ্বারা এই অপকার দেখা যায়, দেশীয় শস্যাদি অধিক পরিমাণে বিদেশে প্রেরিত হইলে, দেশ মধ্যে শস্যাদি সঞ্চিত থাকে না; এক বৎসর যদি কোন কারণ অজন্মা হয়, তাহা হইলে চারিদিকে হাহাকার ধ্বনি উঠে এবং শস্যের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ঐ অনিষ্ট নিবারণেরও উপায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। যে পরিমাণে শস্য বিদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে তাহা অপেক্ষা যদি অধিক পরিমাণে অতিরিক্ত শস্য উৎপাদনের চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে সে অপকার বহু পরিমাণে নিবারিত হইতে পারে। কিন্তু সাতিশয় দুঃখের বিষয় এই যে, দেশীয় লোক-দিগের কৃষিকার্য্যের প্রতি যে রূপ অশ্রদ্ধা ও অযত্ন, তাহাতে শস্যাদি অধিক পরিমাণে উৎপাদন করা দূরে থাকুক, পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে শস্যাদির উৎপন্নের হার দিন দিন কমিয়া আসিতেছে।

ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশের মৃত্তিকা, ভারতের মৃত্তিকা অপেক্ষা অধিক উর্ব্বরা নহে। তথায় ভারতবর্ষ অপেক্ষা গোধূম ও ধান্য অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। "ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচারিষ্ট" নামক কৃষি বিষয়ক পত্রে এক ব্যক্তি লিখিয়াছিলেন যে "সমস্ত ইউরোপে গড়ে প্রতি বিঘায় ৬৫০ মণ

আর ভারতবর্ষে গড়ে ২৮৹ মণ মাত্র গোধুম উৎপন্ন হয়। ইটালীতে প্রতি বিঘায় ১০।৹ মণ, আমেরিকায় প্রতি বিঘায় গড়ে ৮।৹ মণ আর ভারতবর্ষে গড়ে ৩।৹ মণ মাত্র ধান্য জন্মিয়া থাকে। আমেরিকায় প্রতি বিঘায় ১৴ মণ, মিশর দেশে প্রতি বিঘায় ১।৹ মণ হইতে ২ মণ আর ভারতবর্ষে গড়ে ॥৹মণ মাত্র তুলা হয়।" এই দেশে যে এত অল্প শস্য উৎপন্ন হয়, তাহা ভূমির দোষে না কৃষিকার্য্যের দোষে?

যে কোন কার্য্যে আন্তরিক উৎসাহ না থাকিলে তাহা সুন্দর রূপে সম্পন্ন হয় না। যে সকল কার্য্য অবলম্বন করিলে, স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারা যায় সেই সকল কার্য্য অর্থাৎ কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি স্বাধীন কার্য্য সমূহে দেশীয়দিগের আদৌ উৎসাহ নাই। এই উৎসাহ অভাব নিবন্ধন দেশের এত দুরবস্থা। কয়েক বৎসর হইতে দেখা যাইতেছে যে দেশীয় কৃষির উৎসাহ দান জন্য স্থানে স্থানে এক একটী কৃষি প্রদর্শনী সংস্থাপিত হইতেছে। এই অনুষ্ঠানের যে মহৎ উদ্দেশ্য তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু যে প্রকারে উক্ত মেলা হইয়া থাকে, তদ্বারা অভীষ্ট-সিদ্ধ হওয়া সুকঠিন। আমরা দেখিয়া আসিতেছি, মেলা উপলক্ষে কেবল কতকগুলি টাকার শ্রাদ্ধ করা হইয়া থাকে। মেলাতে স্থায়ী উৎসাহজনক কোন পুরস্কার দেওয়া হয় না। যে ২।৪ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইয়া থাকে, তদ্বারা কোন মতেই অভীষ্টসিদ্ধ হইতে পারে না। মেলার উদ্দেশ্য, কৃষি জগতের উন্নতি অর্থাৎ বর্ত্তমান কৃষি প্রণালীতে যে সকল দোষ আছে, তাহার পরিহার ও দেশ মধ্যে নানা প্রকার লাভ জনক নূতন নূতন কৃষির অনুষ্ঠান এবং শস্যাদি উৎপাদনের হার বৃদ্ধি সহিত কৃষিজাত দ্রব্যের উন্নতি বিধান। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই মেলাতে ইহার একটীও উদ্দেশ্য সুসাধিত হয় না। তবে মেলা উপলক্ষে নৃত্য গীত প্রভৃতি আমোদ প্রমোদে বিস্তর টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। যে সকল ব্যক্তিদিগকে লইয়া মেলা সংস্থাপিত হইয়া থাকে, যাঁহারা কৃষকদিগকে পুরস্কার দান করিয়া থাকেন, তাঁহারা হয়ত কৃষিকার্য্যের কোন ধারই ধারেন না। সুতরাং কৃষি সম্বন্ধীয় দোষ সংশোধনে তাঁহারা বিশেষ পারদর্শী নহেন। যে সকল ব্যক্তি কৃষিকার্য্যের কিছু না কিছু সংস্রব রাখিয়া থাকেন, এরূপ লোক হইতে মেলার সভ্য নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত।

দেশীয় কৃষকগণ শারীরিক পরিশ্রম করিতে অক্ষম নহে। তাহারা রৌদ্র, বৃষ্টি, শীতে ভূতের ন্যায় খাটিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলে। দেশ কাল পাত্র বিবেচনা না করিয়া কেবল মাত্র পরিশ্রম করিলে সফল মনোরথ হইতে পারা যায় না। বিশেষতঃ সভ্যাবস্থায় পরিশ্রম তত আবশ্যক হয় না। দেশ মধ্যে বিদ্যার জ্যোতি বিকীর্ণ হইলে বিজ্ঞান ও রসায়ন জ্ঞান দ্বারা নানাবিধ সহজ সহজ উপায় প্রকাশিত হয়, তদ্বারা সহস্র সহস্র ব্যক্তির পরিশ্রম জনক কার্য্য অল্প সময়ে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। অতএব যে কোন বিষয়ের উন্নতি সাধন শিক্ষার উপর একান্ত নির্ভর করে। পৃথিবীর চারিদিকে চাহিয়া দেখ, যে সকল দেশে শিক্ষিত শ্রেণী যে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই দিনদিন উন্নতির পথে ধাবিত হইতেছেন। ইউরোপ ও আমেরিকা যে এক্ষণে কৃষি বিষয়ে শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছে, আর পৃথিবীর মধ্যে উর্ব্বর ক্ষেত্র ভারতভূমি যে দিন দিন কৃষিকার্য্যে পশ্চাৎবর্ত্তী হইতেছে, ইহার কারণ আর কিছুই নহে—ঐ সকল দেশে সুশিক্ষিত জনগণ সম্মান ও শ্রদ্ধারকার্য্য জ্ঞান করিয়া কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন।

কৃষক দিগের উন্নতি বিধান জমিদারবর্গের উপর সমধিক নির্ভর করিয়া রহিয়াছে। তাঁহারা যদি স্ব স্ব জমিদারী মধ্যে নানাবিধ কৃষির উপায় বিধান করেন, তাহা হইলে তাঁহাদেরও আয় বৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে দুঃখী প্রজাবর্গেরও অবস্থা ভাল হইতে পারে। বিশেষতঃ জমিদারগণ কৃষিকার্য্যের যে পরিমাণে অনুসন্ধান লইতে পারেন, অন্যের পক্ষে তাহা সুকঠিন। জমিদার মহোদয়গণ যদি স্বীয় স্বীয় জমিদারী মধ্যে কৃষিকার্য্যের জন্য জলসেচনের সুব্যবস্থা করিয়া দেন, তাহা হইলে দুস্থ প্রজাগণের যে অবস্থা বহুল পরিমাণে উন্নত হয় তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অনেক স্থলেই জলসেচনের সুব্যবস্থা নাই,—পুষ্করিণী জলাশয়াদি যাহা কিছু আছে, সে সমুদয় ভরাট হইয়া যাওয়ায়, বর্ষাকাল ব্যতীত সেই সকল জলাশয়ে সেচনোপযোগী বা মোটেই জল থাকে না; সুতরাং সে সকল জলাশয় হইতে জলসেচন করিয়া ফসল রক্ষা করিবারও কোন উপায় নাই। তাঁহারা যদি দয়া করিয়া সেই সকল পুরাতন জলাশয়াদির পঙ্কোদ্ধার এবং স্থানে স্থানে নূতন জলাশয় খনন করিয়া দিয়া শস্য রক্ষার জন্য জল সেচনের ও পানীয় জলের সুব্যবস্থা করিয়া দেন, তাহা হইলে দেশের মহদুপকার সাধিত হয়। ইহাতে তাঁহাদের ধর্ম্ম অর্থ দুই সাধিত হয়। দেশ মধ্যে জলসেচনের সুব্যবস্থা থাকিলে কৃষকদিগের এরূপ শোচনীয় অবস্থা কদাচই থাকিত না এবং দুর্ভিক্ষের পরাক্রমও বহুল পরিমাণে মন্দীভূত হইত।

কৃষিকার্য্যে উৎসাহ প্রদান করাও জমিদার মহোদয়গণের একটী প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তাঁহারা যদি আপন আপন জমিদারী মধ্যে কৃষি প্রদর্শনী সংস্থাপন করিয়া কৃষকদিগের উৎসাহ প্রদান করেন, তাহা হইলে প্রচুর ফল লাভ হয়। দেশ মধ্যে এই রূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেলা স্থাপিত হইলে, কৃষকগণ তাহা স্বচক্ষে দেখিতে পারে এবং মেলার উদ্দেশ্য বুঝিয়া কৃষিকার্য্যে সমধিক যত্নবান হয়। এক্ষণে যে সকল মেলা, জেলায় অথবা সবডিবিসনে হইয়া থাকে, সাধারণ কৃষকদিগের ভাগ্যে তাহা দর্শন ঘটিয়া উঠে না। যাহাদিগের জন্য মেলা স্থাপিত তাহাদের দেখিবার ব্যবস্থা করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। দেশ মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেলা স্থাপিত হইলে সাধারণের পক্ষে দ্বার উদ্‌ঘাটিত থাকে। দূরে স্থাপিত হইলে কার্য্য বন্ধ এবং পথ খরচ করিয়া অধিকাংশ কৃষক মেলা স্থলে যাইতে পারে না। তবে জেলার বা অন্য কোন স্থানে বড় আকারের মেলা করিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেলা গুলি লইয়া ২।১ বৎসর অন্তর স্থাপন করিলে চলিতে পারে। দেশস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেলা গুলি ঐ বৃহৎ মেলার শাখা স্বরূপ গণ্য করা উচিত। এই যে কংগ্রেস সংলগ্ন মহামেলা সে দিন কলিকাতায় সংস্থাপিত হইয়াছিল, সেই মেলা দেখিয়া শিক্ষালাভ করিবার জন্য সুদূর মফঃস্বলস্থ কয়জন কৃষক দেখিতে উপস্থিত হইয়াছিল?

আজকাল মফঃস্বলে অনেক ভদ্র গ্রামে মিউনিসিপ্যালিটী এবং প্রত্যেক জেলায় ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও প্রত্যেক মহকুমায় লোকেল বোর্ড স্থাপিত হইয়া পথ ঘাট প্রভৃতি দেশ হিতকর বহুবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে। কেবল মাত্র পথ ঘাটের সৌষ্ঠব সম্পাদন করিলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল করা হয় না। দেশীয় লোকের খাদ্যের উপায় অবধারণ করা সকল কার্য্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। দেশের, স্বজাতির, বংশের শ্রীবৃদ্ধি করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে অন্নের সংস্থান করা আবশ্যক। দেশের অভাব মোচন ও দেশের প্রকৃত উন্নতি করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে দেশীয় কৃষকগণের অবস্থার উন্নতি করা

এবং তাহাদিগকে কৃষি-বিদ্যায় সুশিক্ষিত করা নিতান্ত আবশ্যক। আমাদের বিবেচনায় প্রত্যেক লোকালবোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটীর অধীনে এক একটী আদর্শ কৃষিক্ষেত্র সংস্থাপিত হওয়া আবশ্যক। আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে নানাবিধ ফল, ফুল, শস্যাদির চাষের ব্যবস্থা করিয়া কৃষকদিগকে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে শিক্ষা দিলে দেশের যথার্থ হিত সাধন করা হয়। যদিও দেশ মধ্যে ২।১টী আদর্শ কৃষিক্ষেত্র সংস্থাপিত হইয়াছে বটে, তদ্বারা আশানুরূপ শুভ ফল দৃষ্ট হইতেছে না। জেলায় জেলায়, মহকুমায় মহকুমায়, প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটীতে কৃষির উৎসাহ, কৃষির অনুষ্ঠান, কৃষির অনুশীলন, দরিদ্র কৃষকগণের অবস্থোন্নতির বিধান এবং বিনা সুদে বা সামান্য সুদে ঋণ দানের ব্যবস্থা হইলে ভারতের আবার সম্পূর্ণ শ্রী হয়, ভারতের দুঃখ অমানিশা দূরে চলিয়া যায়।

দেশীয় কৃষির উন্নতি গবর্ণমেণ্টের উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। রাজপুরুষদিগের কটাক্ষপাত ভিন্ন কোন মতেই উহা উন্নতিপথে গমন করিবে না। রাজপুরুষদিগের মধ্যে অনেকেই সময়ে সময়ে কৃষিকার্য্য করিবার উপদেশ দিয়া থাকেন, কিন্তু কার্য্যের ব্যবস্থা না করিয়া কেবল মাত্র প্রস্তাবে কোন ফল দর্শে না। সময়ে সময়ে স্থানে স্থানে কৃষি প্রদর্শনী উদ্ঘাটন ভিন্ন রাজপুরুষদিগের আর কোন বিশেষ চেষ্টা দেখা যায় না। এক্ষণে কৃষির যেরূপ দুরবস্থা, তাহাতে মেলা স্থাপন অপেক্ষা মফঃস্বলে স্থানে স্থানে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়া সাধারণের পক্ষে শিক্ষার দ্বার উদ্ঘাটন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। স্থানে স্থানে আদর্শ কৃষি ক্ষেত্র সংস্থাপিত হইয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী মতে কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হইলে, মফঃস্বলস্থ কৃষকগণ তাহা দেখিয়া তাহার উপকারিতা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবে। মফঃস্বলস্থ অজ্ঞ কৃষকগণ সোরা, অস্থি চূর্ণ, চুণ প্রভৃতি যে সার রূপে ব্যবহৃত হয়, তাহা তাহারা জ্ঞাত নহে, এবং ঐ সকল দ্রব্য সাররূপে ব্যবহার করিবার জন্য উপদেশ দিলেও তাহারা উপহাস করিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। যদি তাহারা নিকটস্থ আদর্শ কৃষি ক্ষেত্রে ঐ সকল সারের উপকারিতা স্বচক্ষে দর্শন করে, তাহা হইলে ঐ সকল দ্রব্য সার রূপে ব্যবহার করিবার বিষয়ে তাহাদের আর কোন রূপ আপত্তি থাকিবে না। দেশ মধ্যে নানাবিধ নূতন নূতন লাভ জনক কৃষি-কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে, কেবল যে কৃষি জগতের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, এরূপ নহে তদ্দ্বারা বাণিজ্যের অঙ্গ বিস্তৃত হইয়া দেশের ধন বৃদ্ধি হইতে থাকে। কৃষি-জাত দ্রব্য শিল্পকার্য্যে নিয়োজিত হইলে, এবং সেই শিল্প-জাত দ্রব্য দেশে বিদেশে প্রেরিত হইলে যে দেশের প্রচুর ধন বৃদ্ধি হইয়া বহুল পরিমাণে দুঃখ দারিদ্রতা দূরীভূত হইবে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কৃষি-জাত ও শিল্প-জাত দ্রব্যাদি দেশে বিদেশে আমদানী রপ্তানীর সংখ্যা বাড়িয়া উঠিলে, শুল্ক বাবদে গবর্ণমেণ্টেরও বিস্তর লাভ হইতে পারে। ফলতঃ দেশ মধ্যে কৃষি ও শিল্পকার্য্য বিস্তৃত হইলে কি প্রজা কি আপামর সাধারণ লোক সমূহ কি গবর্ণমেণ্ট সকলেরই লাভের পথ পরিষ্কৃত হইয়া আইসে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই গবর্ণমেণ্ট হইতে এ সম্বন্ধে কোন বিশেষ উপায় এ পর্য্যন্ত অবধারিত হয় নাই।

দেশ মধ্যে সুবিস্তৃত রূপে জল সেচনের সুব্যবস্থা করা দেশীয় জমিদারগণের সাধ্যাতীত। এবিষয়ে দয়ালু গবর্ণমেণ্টের কৃপাদৃষ্টি একান্ত প্রয়োজনীয়। সত্য বটে, গবর্ণমেণ্ট কৃষি বাণিজ্যের সুবিধা জন্য স্থানে স্থানে খাল খনন করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে আশানুরূপ ফল লাভের সম্ভাবনা নিতান্ত কম। গবর্ণমেণ্ট যদি দয়া করিয়া কৃষি প্রধান দেশে বিস্তৃত রূপে খাল খননের সুব্যবস্থা করিয়া দেন তাহা হইলে কৃষি বাণিজ্যের উন্নতি বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হয়। সেই সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের লাভের পথ ও সুবিস্তৃত হইয়া উঠে। দেশে অনাবৃষ্টি প্রযুক্ত দুর্ভিক্ষের আশঙ্কাও বহুপরিমাণে দূরীভূত হয়।

গবাদির রোগ।

শ্রীকুঞ্জবিহারি দে লিখিত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

টেবিস মেসেণ্টারিকা।

শরীরাভ্যন্তরস্থ "মেসেণ্টারিক নামক গ্লাণ্ড সমূহে ঢেলা পানা পদার্থ উদ্ভুত হইয়া এই রোগ জন্মায়। এই রোগে শরীর ক্রমশঃই দুর্ব্বল হয়, তলপেটে বেদনা থাকে। কাশি, অল্প অল্প আহার ও দুর্নিবার্য্য উদরাময় ও দুর্ব্বলতা এই রোগের প্রধান প্রধান লক্ষণ। ছোট ছোট বাছুরদিগের এই রোগ অধিক হয়। এই রোগ অন্ত্রের যক্ষ্মা পীড়া বিশেষ। ফুসফুসের যক্ষ্মা রোগসহ এই পীড়া দৃষ্ট হয়।

আনুসঙ্গিক উপদেশ।—যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত পশুদিগের মাংস ভক্ষণ করিলে যক্ষ্মা রোগ হয় এই রূপ অনেক ডাক্তারের ধারণা। পীড়াগ্রস্ত গাভীর দুগ্ধ খাওয়া উচিত নহে।

চিকিৎসা।—রাজ যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসা দেখ ও উপসর্গানুযায়ী চিকিৎসা করিবে।

ধনুষ্টঙ্কার।

এই পীড়া কোনও বিশেষ বিষজনিত। এই রোগের বিষ শরীরের কোন স্থানে ক্ষত থাকিলে তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া রোগ জন্মায়। এই পীড়াতে অনিচ্ছাসত্বেও ঐচ্ছিক মাংস পেশী সমূহের আকুঞ্চন দৃষ্ট হয়।

লক্ষণ।—সমস্ত শরীরটী শক্তপ্রায় দেখায়। মস্তকটী কোন দিকে নোয়াইতে পারে না, রোগীর মুখ ও চোয়াল আটকাইয়া যায়। রোগী খাইতে পারে না, কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে। শরীরস্থ মাংস পেশীর আক্ষেপ প্রথমে দৃষ্ট হয়, পরে রোগীর পায়ের মাংসে আক্ষেপ দৃষ্ট হয়। রোগী মাটীতে পড়িয়া যায় এবং মাথা ও পা সোজা করিয়া শুইয়া থাকে। পৃষ্ঠদেশ খিলানের ন্যায় দেখায় অর্থাৎ রোগী শিরদাঁড়া বক্র করিয়া শোয়। লেজ পিছুন দিকে টানিয়া লয় এবং চক্ষু কোঠরগত হয় ও কাচের ন্যায় স্বচ্ছ দেখায়। মুখ হইতে লাল নিঃসৃত হয় এবং চক্ষুস্থ "হ" নামক এক খণ্ড মাংস বাহির হইতে দেখা যায়।

চিকিৎসা।—রোগীকে নির্জ্জন স্থানে ও অন্ধকার গোশালাতে রাখিবে। পুষ্টিকর খাদ্য খাইতে দিবে। শুইবার জন্য পোয়াল বা শুষ্ক খড় দিয়া বিছানা করিয়া দিবে। রোগীকে তরল খাদ্য খাইতে দিবে। রোগী খাইতে পারিলে কোষ্ঠ পরিষ্কারক ঔষধ দিয়া বাহ্যে করাইবে। রোগী খাইতে না পারিলে দিবসে ২।৩ বার গুহ্য দ্বার দিয়া তরল পুষ্টিকর দ্রব্য পিচকারী দিবে। নিম্ন লিখিত ঔষধ প্রত্যহ ২।৩ বার খাওয়াইয়া দিবে। যদি খাওয়াইতে না পারা যায় গুহ্য দ্বার দিয়া পিচকারী দিবে।

তামাক	১ ভাগ
জল	২০ ভাগ

রোগীকে /৩ সের পরিমাণ উক্তজল খাওয়াইয়া দিবে।

উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা ক্ষতস্থান উত্তমরূপে পোড়াইয়া দিবে। কার্ব্বলিকএসিড দিয়াও ঘা পোড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

জলাতঙ্ক।

এই রোগ বিশেষ বিষ জনিত। এই রোগে রোগী প্রায়ই বাঁচে না। কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি

ক্ষেপা অবস্থায় কামড়াইলে এই পীড়া হয়। সাধারণতঃ তিন সপ্তাহের মধ্যে এই পীড়ার লক্ষণ দৃষ্ট হয়। ক্ষেপা জন্তুর লালাতে এই রোগের বিষ থাকে।

লক্ষণ।—দংশনের পরে রোগ অঙ্কুরায়মান অবস্থায় ২ সপ্তাহ হইতে ১ বৎসর পর্য্যন্ত থাকিতে পারে। নিস্তেজতা, নিঃসরণ, অস্থিরতা; সাঙ্কর্য্যের জন্য প্রবল ইচ্ছা; ভয়ানক জল তৃষ্ণা কিন্তু রোগী জল দেখিয়া ভয় পায় ও জল পান করিতে পারে না; রোগীর নিকটে কেহ যাইবার সময়ে রোগী শান্ত-মূর্ত্তি ধারণ করে কিন্তু হঠাৎ আগন্তুককে কামড়ায়। অস্থিরতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়; রোগী গোঁ গোঁ শব্দ করে; কিন্তু গলার স্বর ভাঙ্গা ভাঙ্গা বোধ হয়; চক্ষু লাল হয় ও বড় দেখায়। দংশিতস্থান উত্তেজনা হেতু কামড়ায় এমন কি ঐ স্থানের মাংসকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলে। ভয়ানক আক্ষেপ আরম্ভ হয়, পরে পক্ষাঘাত হয় এবং রোগী দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইতে থাকে। অবশেষে দম আটকাইয়া রোগী প্রাণত্যাগ করে।

চিকিৎসা—এই রোগের চিকিৎসাতে কোন উপকার হয় না। দংশিতস্থান গরম লৌহ দিয়া পোড়াইয়া দিবে, পরে মিঠা তৈল লাগাইয়া দিবে। রোগীর সেবা ও শুশ্রূষা অতি সাবধানে করিবে।



চৈত্র—১৩১৬।

কৃষি উন্নতি সমস্যা।

কৃষির উন্নতি বলিতে গেলে প্রধানতঃ দুইটি বিষয় বুঝায় প্রথমতঃ বিজ্ঞানের সাহায্যে মৃত্তিকা, সার, বীজ প্রভৃতির গুণাগুণ নির্ণয় করিয়া অধিক পরিমাণ ফসল উৎপাদন করা এবং দ্বিতীয়তঃ উক্ত অবধারিত তথ্যসমূহ জনসমাজে প্রচার করিয়া কৃষককুলকে উন্নত প্রথায় চাষ করিতে প্রবৃত্ত করা। নানা কারণ বশতঃ দ্বিতীয় বিষয়টি আমাদের দেশে এখন একটি গুরুতর সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রাজপুরুষগণের সহিত সাধারণ মধ্যবিত্ত লোকের এবং শিক্ষিত সাধারণ মধ্যবিত্ত লোকের সহিত কৃষক ও শ্রমজীবীগণের ঘনিষ্ট সম্পর্কের অভাবেই উন্নত কৃষিজ্ঞান দেশময় ছড়াইয়া পড়িতে পারিতেছে না। অবশ্য সাধারণ শিক্ষার অভাবও যে একটা গুরুতর অন্তরায় তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

আমরা অনেক সময়েই অনেক বিদেশীয় সুশিক্ষিত ব্যক্তির ভারতীয় কৃষির উপর আলোচনা পাঠ করিয়াছি। অনেকগুলিই পাঠ করিয়া বোধ হয় যে তৎসমুদয়ের লেখকেরা ভারতীয় কৃষির অবস্থা আদৌ অবগত নহেন এবং অপর

কতকগুলি লেখকগণের উক্ত অবস্থা সমূহ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলেও তাঁহাদের পরামর্শ আদৌ কার্য্যকর নয়। কিন্তু বিগত জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত এগ্রিকলচারল্ জর্ণাল অব্ ইণ্ডিয়ায় ডাক্তার ম্যান যে "ভারতীয় কৃষিতে উন্নতির প্রবর্ত্তন" নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে উপরোক্ত দুই শ্রেণীর দোষের কোন প্রকারই নাই। ডাক্তার ম্যান ইতিপূর্ব্বে অনেক সময় ভারতবাসীগণের সহিত সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যে তাঁহার প্রবন্ধে বর্ত্তমান কৃষিপ্রণালী প্রবর্ত্তনের মূল দোষগুলি দেখাইতে পারিয়াছেন, তাহার অন্যতম কারণ তাঁহার এই সহৃদয়তা। ভারতবাসীর স্বভাব চরিত্র বোধাতীত বলিয়া অনেক বড় বড় ইংরাজ উহার আলোচনা ছাড়িয়া দিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক ভারতবাসী বোধাতীত (Inscrutable) নহে। ভারতবাসীকে সহৃদয়তার চক্ষে দেখিলে অনেক বোধাতীত বিষয় বোধগম্য হয়, অনেক জটিল জিনিষ সরল হইয়া যায়।

যাঁহারা ভারতীয় কৃষককে নেহাত রক্ষণশীল ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা নিতান্তই ভ্রান্ত। অপরাপর দেশের ন্যায় তাহাদের উন্নতির আকাঙ্ক্ষা যথেষ্ট প্রবল এবং তাহাদিগকে বুঝাইয়া ও দেখাইয়া দিতে পারিলে তাহারা উন্নত প্রথা অবলম্বন করিতে আদৌ পশ্চাৎপদ নহে। কিন্তু ভারতীয় কৃষকের প্রধান শত্রু দারিদ্র্য। অপর দেশের কৃষকের কিছু না কিছু সম্বল আছে। যদি কোন কারণে একটি নূতন প্রথা আশানুরূপ ফল প্রদান না করে, তাহা হইলে অন্য দেশীয় কৃষক কেবলমাত্র কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। কিন্তু একেবারেই সম্বল বিহীন ভারতীয় কৃষকের পক্ষে কোন নূতন প্রথায় নিষ্ফল হওয়া মানে অনসন। তাহার মূলধন উচ্চ সুদের হারে মহাজনের নিকট কর্জ্জ করা, সুতরাং অকৃতকার্য্য হইলে তাহার চাল চুলা উভয়ই যাইবে। এই সমস্ত কারণে সে আগে স্বচক্ষে কোন উন্নত প্রথার উপকারিতা নির্ভুলরূপে দেখিতে চায়, তাহার পর নিজের ক্ষেত্রে উহা প্রবর্ত্তনবিষয় বিবেচনা করে। যখন কেহ উন্নত কৃষি প্রথা প্রবর্ত্তন করিতে কৃষককে অনুরোধ করেন, তখন তাঁহার ভাবিয়া দেখা আবশ্যক যে শুধু নব প্রথায় শতকরা ১০ গুণ কি বিশগুণ ফসল বেশী হইলে চলিবে না। কৃষকের দেনার সুদ এক এক সময় শতকরা ৭৫৲ টাকা পর্য্যন্ত। সুতরাং উন্নত প্রথায় এত অধিক পরিমাণ ফসল উৎপাদন হওয়া আবশ্যক যে, তাহাতে উক্ত পরিমাণ সুদ পোষায় এবং তদ্ভিন্ন ঐ প্রথা অবলম্বনের জন্য যে অধিক টাকা খরচ করা আবশ্যক হইবে, তাহারও সুদ পোষায়। এতদ্বারা বোধ হয় যে, নব কৃষি-প্রথা প্রবর্ত্তনের জন্য দু'টি জিনিষের মধ্যে একটি জিনিষ আবশ্যক—হয় উক্ত প্রথানুসারে উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ এত অধিক হইবে যে উহার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত দেনা সুদ সমেত পরিশোধ হইতে পারে, কিম্বা যৌথ কারবার প্রভৃতির দ্বারা মূলধন এত সস্তা করা আবশ্যক যে, কৃষকেরা সামান্য হারে আবশ্যকীয় মূলধন পাইতে পারে। ডাক্তার ম্যানের এই সমস্ত কথা গুলি যে বিশেষ রূপে সত্য তাহা যিনিই ভারতীয় কৃষি সম্বন্ধে সামান্য পরিমাণ চিন্তা করিয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন।

কৃষি উন্নতির অতিব্যগ্র সমর্থকদিগের প্রতি ডাক্তার ম্যানের এই উপদেশ যে তাঁহারা যেন উন্নতিটি বাস্তবিক উন্নতি কিনা তাহা পূর্ব্বে ভাবিয়া দেখেন। আমরা 'কৃষকে' এসম্বন্ধে অনেকবার আলোচনা করিয়াছি এবং দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, ঐই শ্রেণীর লোকদ্বারা কৃষি উন্নতির পথ পরিষ্কৃত হওয়া দূরে থাকুক বরং অধিক কণ্টকিত হইয়া পড়ে। কারণ উন্নত প্রথা বলিয়া কোন প্রথা কৃষকের সম্মুখে যদি উপস্থিত করা যায় এবং অবশেষে তাহা একবারেই মূল্যহীন বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে প্রবর্ত্তকের উপর কৃষকের আস্থা থাকে কোথায়? যখন ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাংশে সরকার হইতে আমেরিকান তুলার প্রবর্ত্তন হয়, তখন অনেক কৃষকেই আগ্রহের সহিত উক্ত তুলার চাষ করে। কিন্তু যখন সেই তুলার পরীক্ষা নিষ্ফল হইল, তখন কৃষক ভাবিল যে সরকারী লোক গুলা একেবারেই বিষয়বুদ্ধিহীন। অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া লোককে কেবল ক্ষতিগ্রস্ত করায়।

ইহার পর আরও ভাবা আবশ্যক যে একার্য্যে

যে প্রথায় ফল হইয়াছে অন্যস্থানে সে প্রথায় ফল না হইতে পারে। স্থানীয় অবস্থার উপর ফলাফল অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। সরকারী পরীক্ষা ক্ষেত্রে যাহা সুফল প্রসব করিয়াছে, তাহা পরীক্ষা ক্ষেত্রের বাহিরে হয়তঃ তেমন লাভকর হইবে না। লোক বল ও ধন বল সরকারের যেমন আছে, তাহা সাধারণ কৃষকের থাকিতে পারে না। সেই জন্য তাহাকে অনেক সময় বলিতে শুনা যায় যে, গভর্ণমেণ্ট যে প্রথা লাভজনক বলিয়া প্রচার করেন, তাহা কেবল গভর্ণমেণ্টের পরীক্ষা ক্ষেত্রেই লাভজনক—উহার বাহিরে উক্ত প্রথা হইতে লাভ হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ লৌহ লাঙ্গলের বিষয় বলিতে পারা যায়। উহাতে চাষ ভাল হয় এবং তজ্জন্য ফসলও ভাল হয় সত্য কিন্তু উহার কোন একটি অংশ ভাঙ্গিয়া গেলে তাহা আর সারাইবার উপায় নাই। সরকার অবশ্য নানা দূরস্থানে পাঠাইয়া সারাইতে পারেন কিম্বা আবশ্যকীয় অংশসমূহ স্বতন্ত্র ভাবে অধিক পরিমাণে আনাইতে পারেন কিন্তু কৃষক তাহা পারে না, সুতরাং মোটের মাথায় লৌহ লাঙ্গলে তাহার লোকসান ভিন্ন লাভ নাই। এইরূপ আরো দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। এই সমস্ত কারণে কোন বিশেষ স্থানের কৃষকগণের কোন বিশেষ প্রথা অবলম্বনে সম্বন্ধে কি কি অন্তরায় তাহা দেখিয়া এবং পূর্ব্ব হইতে তাহার ব্যবস্থা না করিয়া কোন প্রথা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করা অসঙ্গত।

অনেক উপায়েই কৃষকের বিশ্বাসভাজন হইতে পারা যায়। এই উদ্দেশ্যে সম্প্রতি যে সমস্ত উপায় অবলম্বিত হইয়াছে তন্মধ্যে বেসরকারি কৃষি সমিতি স্থাপন অন্যতম। বঙ্গদেশে যে প্রাদেশিক কৃষি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা অনেকেই জানেন। উহাদ্বারা কিন্তু আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নাই। এ পর্য্যন্ত যাবতীয় স্থানে কৃষি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তন্মধ্যে মধ্য-প্রদেশের কৃষি সমিতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কার্য্যকর হইয়াছে। কৃষি সমিতির উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে তিনটি বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। (১) জন সাধারণ সাক্ষাৎ অথবা অসাক্ষাৎ ভাবে কৃষি সমিতি স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ না করিলে কিম্বা কৃষি বিভাগ সমিতির কার্য্য সুচারু-রূপে পরিদর্শন করিতে সক্ষম না হইলে সমিতি স্থাপন করা আদৌ উচিত নহে (২) কৃষক, কৃষি কার্য্যে সাক্ষাত ভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও কৃষি বিভাগের উচ্চতর কর্ম্মচারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক (৩) বিশেষ বিশেষ সদস্যের স্বয়ং বিশেষ বিশেষ কার্য্যের ভার গ্রহণ করা ও যথা সময়ে সভায় উপস্থিত হইয়া সভার ও বিবরণী প্রকাশের কার্য্য নির্ব্বাহিত করা আবশ্যক।

কৃষি সমিতি স্থাপন ব্যতিরেকে বিশেষ বিশেষ স্থানে প্রদর্শন ক্ষেত্র স্থাপন করিয়া উক্ত স্থলে বিশেষ বিশেষ প্রথার উপকারিতা প্রদর্শিত হয়। কিন্তু অনেক সময়ে প্রদর্শন ক্ষেত্রের কর্ত্তারা নিকটস্থ কৃষকগনের সহিত বড় একটা মেশেন না এবং সাধারণ কৃষক অবলম্বিত প্রথা হইতে অন্যতর প্রথা অবলম্বন করেন। প্রদর্শন ক্ষেত্রের পক্ষান্তরে উদ্দেশ্য হওয়া আবশ্যক যে অপরাপর বিষয় সাধারণ-কৃষক-অবলম্বিত প্রথার সহিত সমান থাকিয়া কোন বিশেষ প্রথার বিশেষ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা করিতে হইলে একজন কৃষিজীবী দ্বারাই প্রদর্শন ক্ষেত্র চালিত হওয়া আবশ্যক এবং প্রদর্শনের বিষয়ীভূত নব প্রথা ব্যতিরেকে অপরাপর সমস্ত প্রথাই সাধারণ প্রচলিত প্রথার সহিত এক হওয়া প্রয়োজনীয়। ফলতঃ প্রদর্শন কার্য্যই হউক অথবা সাধরণ ভাবে কৃষকগণকে পরামর্শ দেওয়ার কার্য্যই হউক সকল প্রকার কার্য্যেই কার্য্যভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারীগণের মনে রাখা উচিত যে তাঁহারা সাধারণের এবং এমন কি কৃষককুলেরও ভৃত্য। ইহাই বিশ্বাস ভাজন হইবার প্রকৃষ্ট উপায়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কৃষকের কি কি বিষয়ে বাস্তবিক অভাব অথবা অভিযোগ আছে তাহা প্রথমে স্থির করিয়া তাহার পর উন্নতি বিধান কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত। উহাই প্রথম কার্য্য এবং তাহার পর উক্ত অভাব অথবা অভিযোগের প্রতিবিধান দ্বিতীয় কার্য্য। ডাক্তার ম্যান বলেন যে প্রদর্শনী মেলা প্রভৃতি দ্বারা অনেক উপকার সাধিত হয় বটে কিন্তু প্রদর্শনী হইতে পূর্ণমাত্রায় কার্য্য লইতে হইলে কৃষি বিভাগের উচ্চতম

কর্ম্মচারীগণের দ্বারা কৃষি প্রদর্শনী দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হওয়া আবশ্যক। যে সমুদয় ফসল কৃষকের নিজের ক্ষেত্রে জন্মান যায় না সেরূপ ফসল প্রদর্শন করিবার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। সংবাদপত্রে কৃষি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ প্রকাশ, কৃষি সংবাদ সহ পুস্তিকাদি বিতরণ প্রভৃতি উপায়ে কৃষিজ্ঞান অনেক পরিমাণে পরিব্যাপ্ত হয়। কিন্তু সরলভাবে পুস্তিকার বিষয়ীভূত তথ্য সমূহ বুঝাইয়া দিতে পারেন এরূপ ব্যক্তিও বিতরণ স্থলে উপস্থিত না থাকিলে বিতরণের বিশেষ ফল পাওয়া যায় না।

আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে ডাক্তার ম্যানের প্রচারিত সমস্ত বক্তব্যেরই সমালোচনা করিলাম। তিনি তাঁহার প্রবন্ধের উপসংহারে বলিয়াছেন But, whatever methods be adopted the actual process must be the same. To find the cultivators' real dfficulties to discover a practical and certain method of meeting those difficulties, to gain the confidence of the people, these all must precede any definite attempt at a propaganda. If the attempt is made to introduce so-called improvements without these necessary preliminaries, then not only will faillure result, but what confidence there may be will be undermined, and progress in the future will be made harder. Recognise the necessary order of events, try to satisfy the cultivators' need and not something you imagine he ought to need, let your experiment be based on the requirements of the ryot and success, though slow, will, if past experience be any guide, serve" অর্থাৎ যে কোন প্রথাই অবলম্বিত হউক না কেন প্রকৃত উপায় কিন্তু মূলে একই প্রকার। কৃষকের প্রকৃত অসুবিধা নির্ণয়, উক্ত অসুবিধা দূর করিবার সঠিক ও কার্য্যকর প্রথা নির্দ্ধারণ এবং সাধারনের বিশ্বাষ লাভ করা—কোন পূর্ব্ব নির্দিষ্ট কার্য্যে বিশেষ ভাবে প্রবৃত্ত হইবার আগে এই সমুদয় করা আবশ্যক। এই আবশ্যকীয় উদ্যোগ ধার্য্য না করিয়া যদি যথা কথিত উন্নতিসমূহ সাধন করার চেষ্টা করা হয় তাহা হইলে কেবলই যে কার্য্য নিষ্ফল হইবে তাহা নহে অধিকন্তু আপাততঃ যে টুকু বিশ্বাষ লাভ করা হইয়াছে সে টুকুও চলিয়া যাইবে এবং ভবিষ্যতের কার্য্যকে আরও কঠিনতর করিয়া তোলা হইবে। কার্য্যের আবশ্যকীয় সৃঙ্খলা হৃদয়ঙ্গম কর, তোমার কল্পনায় কৃষকের যাহা অভাব তাহা দূর করিতে না গিয়া তাহার প্রকৃত অভাব দূর করিতে চেষ্টা কর, তোমার পরীক্ষা কৃষকের অভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত হউক তাহা হইলে সফলতা সময় সাপেক্ষ হইতে পারে বটে কিন্তু অতীতের বহুদর্শিতা হইতে যদি ভবিষ্যতের কোন আভাস পাওয়া যায় তবে উহাও লাভ হইবে স্থির নিশ্চয়।

ডাক্তার ম্যানের মত কৃষি বিভাগের অপরাপর কর্ম্মচারীগণ যদি এইরূপ সমিচীন ভাবে প্রণোদিত হইয়া কৃষি উন্নতি কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন তাহা হইলে এত দিনে ভারতীয় কৃষি যে বাস্তবিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইত তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। আমরা আশা করি কৃষির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সকল ব্যক্তিই ডাক্তার ম্যানের এই প্রবন্ধ পাঠ করিবেন।

পত্রাদি।

গোমূত্র কি প্রকারে সার রূপে ব্যবহার করা যায়?

শ্রীরামতারণ রায়, আঙ্কারবেলমা; বর্দ্ধমান।

[আমাদের দেশে গোমূত্রের ব্যবহার অপেক্ষা অপচয়ই অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। গোমূত্র সঞ্চয় করিবার ব্যবস্থা বড় দেখা যায় না। যদি গোয়াল-ঘর পাকা হয় তবে গোমূত্র ও গোয়াল ঘর ধোঁয়া জল যাহাতে পরোনলো দ্বারা সারগর্ত্তে আসিয়া পড়ে তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। সারগর্ত্তটিও রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহার উপর চাল বা কোন রূপ আচ্ছাদন থাকা আবশ্যক। গোয়াল ঘরের মেজে মাটির হইলে তাহাতে চোনা

শুষিয়া যাইবার সম্ভাবনা। সেই জন্য মেজেতে শুষ্ক মৃত্তিকা বা ছাই ছড়াইয়া রাখিতে হয়, মাটিতে চোনা শুষিয়া লইলে উহা সুরাইয়া লইয়া সারগর্ত্তে ফেলিয়া রাখিতে হয়। চোনা পর্য্যাপ্ত জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সদ্য বৃক্ষ লতাদিতে দেওয়া যায়।] কৃঃ সঃ।

শ্রীহেমাঙ্গচন্দ্র তরফদার, বেহালা, ২৪ পরগণা।

ফসলে ছাই।

অনেক ফসলে ছাই প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে এবং আমরা কচু প্রভৃতিতে পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ ছাই ব্যবহার করিয়া থাকি। ছাই ব্যবহারে যে উপকার হয় তাহা আমাদের ধারণা, কিন্তু কেন উপকার হয় জানিতে পারিলে সুখী হইব।

[প্রত্যেক ফসলে নাইট্রোজেন, ফস্ফরিক অম্ল ও পটাস এই তিনটি পদার্থ লতা, গুল্মাদি রসাকর্ষণ দ্বারা মৃত্তিকা হইতে আহার রূপে সংগ্রহ করিয়া থাকে। কাষ্ঠ পুড়াইয়া যে ছাই হয় সেই ছাই হইতে প্রধানত এবং সহজে পটাস পাওয়া যায়। আশানুরূপ ফসল উৎপাদনের জন্য ক্ষেত্রে পটাস দেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক, এমন কি অন্যান্য সার ক্ষেত্রে যথেষ্ট মাত্রায় থাকিলেও পটাসের অভাবে সেই সকল সার পূর্ণ মাত্রায় কার্য্য করিতে পারে না।] কৃঃ সঃ।

প্রাদেশিক কৃষি সংবাদ।

বঙ্গদেশে বর্ত্তমান সময়ের শস্য।—২৬শে মার্চ ১৯১০ সাল। কুচবিহার এবং পুর্ণিয়া ও দার্জ্জিলিঙ্গের স্থানে স্থানে সুবৃষ্টি হইয়াছে। বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগের কোথাও কোথাও সামান্য বারিপাত হইয়াছে। চম্পারণ, মজঃফরপুর, বালেশ্বর ও আঙ্গুলেও সামান্য বৃষ্টি হইয়াছে। মুর্শীদাবাদ ও পুর্ণিয়ায় এই বারিপাতের পর জমি কর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে। মুর্শীদাবাদে এবং যশোহরে আরও বৃষ্টির আবশ্যক হইয়াছে। রবি খন্দ আহরিত হইতেছে ও পরবর্ত্তী ফসলের জন্য জমিতে লাঙ্গল দেওয়া চলিতেছে। মুর্শীদাবাদ অঞ্চলের কাঁদি বিভাগে শীলাবৃষ্টিতে রবিখন্দের ক্ষতি করিয়াছে। সর্ব্বত্র রবিখন্দ ভালরূপ জন্মিয়াছে। বর্দ্ধমান, খুলনা, গয়া, সারণ, চম্পারণ, দ্বারবঙ্গ, কটক, বালেশ্বর, সম্বলপুর ও রাঁচিতে মোটা চাউলের দর কিঞ্চিত চড়িয়াছে কিন্তু হুগলি, পাটনা, মুঙ্গের, ভাগলপুর, পালামাউ এবং সাঁওতাল-পরগণায় চাউলের দর কমিয়াছে। বর্দ্ধমান, মেদনীপুর, নদীয়া, গয়া, চম্পারণ, দ্বারবঙ্গ, মুঙ্গের পুর্ণিয়া, সাঁওতালপরগণা, সম্বলপুর, ছোটনাগপুর বিভাগ হইতে পশুরোগের কথা শুনা যাইতেছে। সর্ব্বত্রই এবৎসর পানীয় জল ও পশুখাদ্য প্রচুর আছে কেবল আঙ্গুলে এই দুইয়েরই অভাব বোধ হইতেছে।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম।—বিগত ২৮শে মার্চ পর্য্যন্ত আসাম, বোগরা, এবং মৈমনসিংহের অধিকাংশ স্থানে সুবৃষ্টি হইয়াছে। শিবসাগরে ইতি মধ্যেই প্রায় ৫ ইঞ্চি বারিপাত হইয়াছে। তথায় আশু ধান্য এবং পাট বোনা হইতেছে। হৈমন্তিক ধান্যের ও ভাদুই ফসলের জন্য জমি চষা হইতেছে। ক্ষেত হইতে তামাক আহরণ করা চলিতেছে। চা, ইক্ষু, তিসি, আলু ও তিল চাষের অবস্থা ভাল। গম ও তামাকের অবস্থা মন্দ নহে। মোটা চাউলের দাম সামান্য মাত্রায় বাড়িয়াছে। কামরূপ ও ঢাকা হইতে পশুরোগের কথা শুনা যাইতেছে।

বঙ্গদেশ, প্রেসিডেন্সি বিভাগ।—এখানেও অনেক স্থানে বৃষ্টি হইয়াছে কিন্তু অধিকাংশ স্থানে বৃষ্টির অভাব অনুভূত হইতেছে। আশুধান্য, পাটের জন্য জমি তৈয়ারি হইতেছে। হৈমন্তিক ধান্যের জমিও চাষ হইতেছে।

সার-সংগ্রহ।

বৃষ্টি-বিজ্ঞান।

খনার বচন বলিয়া বঙ্গদেশে বহুসংখ্যক বচন প্রচলিত আছে। ঐ সকল বচনগুলির যে সকল গুলিই খনার বচন, তাহা বোধ হয় না। খনা কে, তিনি কোন সময়ের লোক, ঐ সকল বচন তাঁহার

রচিত কি না? এ সকল পুরাতত্ত্বের আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। খনার বচন বা অন্যের রচিত বচন গুলির মধ্যে যে গুলি কৃষির অনুকূল সেগুলি কৃষকের পাঠকগণের জানা থাকিলে কৃষি বিষয়ে অনেক উপকার দর্শিতে পারে। বচনগুলি যে ভূয়োদর্শনের ফল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

"আষাঢ় নবমী শুকল পাখা।
কি কর শ্বশুর লেখা জোখা॥
সকালে শুকা, বিকালে বান।
মধ্যে বর্ষে প্রচুর ধান॥
যদি বর্ষে সাটে, চাষীর গরু বিকায় হাটে।
যদি বর্ষে মূষল ধারে।
সমুদ্রেতে বগা চরে॥
যদি বর্ষে ফণা ফণা।
পর্ব্বতে জন্মে কেলে মনা॥
যদি বর্ষে রুণি-ঝুনি।
শস্যের ভারে কাঁপে মেদিনী॥

আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের নবমী কৃষকদিগের কৃষি বিষয়ের শুভ দিন। ঐ দিনে হিন্দুরা ভাবী শস্যের মঙ্গল কামনায় সুবৃষ্টি হইবার জন্য ইন্দ্রাদি দিকপালগণের ভক্তির সহিত পূজা অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। ঐ দিনে হিন্দু কৃষকমাত্রেই লাঙ্গল ধরে না। তাহারা ঐ দিনের বৃষ্টি দেখিয়া ভাবী বৃষ্টির ও শস্যের শুভাশুভ ফল নির্ণয় করিয়া থাকে। শুক্লপক্ষের আষাঢ়-নবমীর দিন সকালে (পূর্ব্বাহ্নে) বৃষ্টি হইলে শুকা, অপরাহ্নে বৃষ্টি হইলে বন্যা এবং মধ্যে অর্থাৎ মধ্যাহ্নে বর্ষণে প্রচুর পরিমাণে ধান্য জন্মিয়া থাকে। যে বৎসর শুক্লপক্ষের আষাঢ়-নবমীতে মূষল ধারায় বৃষ্টি হয়, সে বৎসর অনাবৃষ্টি জন্য ধান্যাদি জন্মে না। তজ্জন্য চাষার গরু হাটে বিক্রয় হয় এবং অনাবৃষ্টি জন্য সমুদ্রের ন্যায় জলাশয়েও কম জল বা জলশূন্য থাকায় বক চরে বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যদি বিন্দু বিন্দু বৃষ্টিপাত হয়, তবে সে বৎসর এত অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হয় যে, পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চভূমিতেও কেলেমনা নামক ধান্য জন্মিয়া থাকে এবং এত অধিক পরিমাণে ধান্য জন্মে যে, শস্যের ভরে মেদিনী কম্পিত হয়।

" পাঁচ রবি মাসে পায়।
ধারা কিম্বা খরায় যায়॥"

বৎসরের মধ্যে যে কোন এক মাসে যদি পাঁচটী রবিবার হয়, তবে সে বৎসর হয় অতিবৃষ্টি কিম্বা অনাবৃষ্টি ঘটিয়া থটিয়া থাকে।

" মধু মাসে, প্রথম দিবসে,
হয় যে সে বার।
রবি চোষে, মঙ্গল বর্ষে,
দুর্ভিক্ষ হয় বুধবার॥
সোম, শুক্র, গুরুবার।
পৃথিবী না সহে শস্যের ভার॥
পাঁচ শনি পায় মীনে।
শকুনি মাংস না খায় ঘৃণে॥

যদি চৈত্র মাসের ১লা রবিবার হয়, তবে তৎপরবর্ত্তী বর্ষে অনাবৃষ্টি ঘটে। চৈত্র মাসের প্রথম দিবসে মঙ্গলবার হইলে, সে বৎসর সুবৃষ্টি হইয়া থাকে। যদি বুধবার হয়, তবে দুর্ভিক্ষ ঘটে। সোম, শুক্র, বৃহস্পতিবার হইলে, প্রচুর পরিমাণে শস্য জন্মিয়া থাকে। চৈত্র মাসের প্রথম দিবসে শনিবার হইলে, সে মাসে অবশ্যই পাঁচটী শনিবার হইবে, এরূপ হইলে সে বৎসর মড়ক উপস্থিত হইয়া বহুলোকের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

" মধুমাসে ত্রয়োদশ দিনে যদি রয় শনি।
সে বৎসর শস্য হানি খনা বলে গণি॥"

যদি চৈত্র মাসের ১৩ই তারিখে শনিবার হয়, তাহা হইলে, তৎপরবর্ত্তী বর্ষে শস্য হানি হইয়া থাকে।

" দিনে মেঘ রেতে তারা।
এই দেখবে শুখায় ধারা॥

দিনমানে মেঘাচ্ছন্ন থাকিয়া রাত্রিকালে আকাশ পরিষ্কার থাকিয়া নক্ষত্র উঠিলে, বৃষ্টি হয় না।

" পৌষে গরমি বৈশাখে জাড়া।
প্রথম আষাঢ়ে ভরিবে গাড়া॥
খনা বলে শুনহে স্বামী।
শ্রাবণ ভাদর নাহিক পানি॥"

যে বৎসরের পৌষ মাসে শীত কম হইয়া গরম বোধ হইবে তৎপরবর্ত্তী বর্ষের বৈশাখ মাসে শীতানুভব হইবে এবং আষাঢ় মাসে অতিবৃষ্টি হইয়া পুষ্করিণী আদি জলপূর্ণ হইয়া যায়। শ্রাবণ ভাদ্র মাসে অনাবৃষ্টি হইয়া থাকে।

"কি কর শ্বশুর লেখা জোখা।
মেঘেই বুঝবে জলের লেখা॥
কোদালে কুড়ুলে মেঘের গা।
এলোমেলো দিচ্ছে বা॥
কৃষককে বল বাঁধতে আ'ল।
আজ না হয় ত, হবে কাল॥"

খনা স্বীয় শ্বশুরকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, লেখা জোখার অর্থাৎ গণনা করিবার আবশ্যকতা নাই। মেঘ দেখিলেই জলের লক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। যদি কোদালে কুড়ুলে মেঘ দেখিতে পাওয়া যায় কিম্বা এলোমেলো বায়ু অর্থাৎ একবার পশ্চিমদিক দিয়া একবার উত্তরদিক দিয়া একবার পূর্ব্বদিক দিয়া বায়ু প্রবাহিত হইতেছে দেখিলেই বুঝিতে হইবে যে, শীঘ্রই বৃষ্টি হইবে। সুতরাং এই সময়ে কৃষকের ভাল করিয়া আইল বাঁধিয়া রাখা উচিত। কারণ আইল বাঁধা না থাকিলে, সমস্ত জল জমি হইতে বাহির হইয়া যাইবে।

"ধন্য রাজা পুণ্য দেশ।
যদি বর্ষে মাঘের শেষ॥"

রাজার পুণ্যফলে রাজ্যমধ্যে সুবৃষ্টি হইয়া প্রচুর পরিমাণে ফল শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। পুরাণাদি হিন্দুশাস্ত্রে ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে রাজার রাজ্যে প্রচুর ফল শস্য উৎপন্ন হয়, তিনি পুণ্যবান, সুতরাং তিনি ধন্য! পুণ্যবান রাজার রাজ্যের অধিবাসীগণও পুণ্যবান হইয়া থাকেন। মাঘ মাসের শেষে বৃষ্টি হইলে, তৎপরবর্ত্তী বৎসরে প্রচুর পরিমাণে শস্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। মাঘ মাসের শেষে ভূমিকর্ষণ করিতে পারিলে, ভূমির মৃত্তিকা এত উর্ব্বরা হয় যে, বিনা সারেও প্রচুর ধান্যাদি শস্য জন্মিয়া থাকে। এ কারণ এ প্রদেশের কৃষকেরা "মাঘের মাটী, সোণার পাটী" কহিয়া থাকে। তদ্ব্যতীত তিল, ইক্ষু প্রভৃতি ফসল বপনের বিশেষ সুবিধা হয়।

"চৈত্রেতে থর থর।
বৈশাখে ঝড় পাথর॥
জ্যৈষ্ঠতে তারা ফুটে।
তবে জানবে বর্ষা বটে॥"

চৈত্র মাসে শীত বোধ হইলে, বৈশাখ মাসে ঝড় ও শিলাবৃষ্টি হইলে এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে আকাশ পরিষ্কার থাকিলে অর্থাৎ মেঘ বৃষ্টি না হইলে, সে বৎসর সুবর্ষা হইয়া থাকে।

"দূর শোভা, নিকট জল।
নিকট শোভা রসাতল॥"

চন্দ্রের চতুর্দ্দিকে গোলাকার ভাবে, ইন্দ্রধনুর ন্যায় নানাবর্ণে রঞ্জিত যে ছায়া পড়ে; সেই ছায়া যদি দূরবর্ত্তী হয়, তবে শীঘ্রই জল হইয়া থাকে। আর সেই ছায়া যদি নিকটবর্ত্তী হয়, তবে অনাবৃষ্টি প্রযুক্ত দুর্ভিক্ষ হইবার সম্ভাবনা।

"পূবেতে উঠিল কাড়।
ডাঙ্গা ডোবা একাকার।"

বর্ষাকালে পূর্ব্বদিকে ইন্দ্রধনু উদয় হইলে, অতিবৃষ্টি হইয়া ডাঙ্গা ডোবা জলমগ্ন হইয়া একাকার হইয়া যায়।

"বৎসরের প্রথম ঈশানে বয়।
সে বৎসর বর্ষা খনায় কয়॥"
"বহিলে বায়ু ঈশানে।
কাঁধে কোদাল নাচে কৃষাণে॥"

বর্ষারম্ভে ঈশান কোণ হইতে বায়ু প্রবাহিত হইলে প্রচুর বৃষ্টি হইয়া আবাদের উপযোগী হয়। ঈশান কোণ হইতে একটু জোরে বায়ু বহিলে নিশ্চয়ই বৃষ্টি হইয়া থাকে। বর্ষারম্ভে ঈশান কোণ হইতে বায়ু বহিলে, কৃষাণেরা কোদাল কাঁধে করিয়া আইল বান্ধিবার জন্য আনন্দিত মনে মাঠপানে ধাবমান হয়। কারণ তাহারা জানে ঈশান কোণে বায়ু বহিলে নিশ্চয়ই প্রচুর বৃষ্টি হইবে তজ্জন্যই তাহারা আইল বাঁধিবার জন্য আনন্দিত মনে মাঠপানে ধাবমান হয়। গত সন ১৩১৪ সালের আষাঢ় মাসের প্রথমেই এ প্রদেশে ঈশান কোণ হইতে বায়ু বহিয়া এত বৃষ্টি হয় যে, মাঠ প্লাবিত হইয়াছিল।

"পৌষের কুয়া আষাঢ়ের ফল।
য দিন কুয়া ত দিন জল॥

পৌষ মাসের যে দিন কুয়াসা হইবে, আষাঢ় মাসের সে দিন নিশ্চয়ই প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া

থাকে। ইহা আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। যত কুয়াসা হয়, ততদিন বৃষ্টি হইয়া থাকে।

"শনির সাত, মঙ্গলের তিন।
আর সকলের দিন দিন॥"

শনিবারে বৃষ্টি আরম্ভ হইলে সাত দিন ধরিয়া বৃষ্টি হইয়া থাকে, অর্থাৎ সপ্তাহ বাদল হয়। মঙ্গলবারে বৃষ্টি আরম্ভ হইলে তিন দিন বাদল হয়। শনি মঙ্গলবার ব্যতীত অন্যান্য বারে বৃষ্টি হইলে বাদল না হইয়া সেই দিনেই বৃষ্টি হইয়া বন্ধ হইয়া যায়।

"বেঙ ডাকে ঘন ঘন।
জল হবে শীঘ্র জান॥"

বেঙ যদি ঘন ঘন ডাকে, তবে শীঘ্রই বৃষ্টি হইয়া বর্ষারম্ভ হয়।

"ভাদুরে মেঘে বিপরীত বয়।
সে দিন বৃষ্টি নিশ্চয়ই॥"

ভাদ্র মাসে যে দিকে মেঘের উদয়, যদি তাহার বিপরীত দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়, তবে নিশ্চয়ই বৃষ্টি হইয়া থাকে।

"শামুক যদি ধানগাছ বায়।
বৃষ্টি তবে নিশ্চয় হয়॥"

শামুক যদি ধানগাছের গা বহিয়া উপরদিকে উঠিতে থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহাও আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি।

"আষাঢ় শ্রাবণে পূবে বাও।
হল তুলে দিয়ে বাণিজ্যে যাও।"

আষাঢ় শ্রাবণ মাসে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া জমিতে জল দাঁড়ান নিতান্ত আবশ্যক। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে পূর্ব্বদিক দিয়া বায়ু বহিলে, বৃষ্টি খুব কম হয়। মধ্যে মধ্যে এক একখানি মেঘ উঠিয়া সামান্য সামান্য বৃষ্টি হইয়া, উড়িয়া পশ্চিমদিকে চলিয়া যায়। সে মেঘের পরিসরও খুব কম। অনেক সময়ে মাথার উপর দিয়া বৃষ্টি হইতে হইতে চলিয়া যায়, কিন্তু উভয় পার্শ্বের আকাশ পরিষ্কার থাকে। পূর্ব্বদিক দিয়া বায়ু বহিলে বৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু সে বৃষ্টি এত সামান্য যে, তাহাতে অনেক সময়ে কৃষিকার্য্যের বিশেষ উপকার হয় না। তজ্জন্য লাঙ্গল তুলিয়া দিয়া বাণিজ্যে যাইবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

"ভাদরে আশ্বিনে পূবে বাও।
আল কেটে দিয়ে ঘরে যাও॥"

ভাদ্রমাসে পূর্ব্বদিক দিয়া বায়ু বহিলে অপেক্ষাকৃত অধিক বৃষ্টি হয়। ভাদ্র আশ্বিন মাসে ধানের জমিতে প্রায়ই জল দাঁড়াইয়া থাকে। সে সময়ে অল্প জল হইলেও জমি জলপূর্ণ হইয়া থাকে। ভাদ্র আশ্বিনে পূর্ব্বদিক দিয়া বায়ু বহিলে, নিশ্চয়ই প্রায় বৃষ্টি হইয়া থাকে। তজ্জন্য আইল কাটিয়া দিয়া বৃষ্টির জল বাহির করিয়া দিলেও কোন ক্ষতি হয় না। বিশেষতঃ ভাদ্রমাসে ধানের জমিতে অল্প জল থাকা বিশেষ আবশ্যক। ভাদ্র আশ্বিন মাসে পূর্ব্বদিক দিয়া বহিলে প্রায়ই নিষ্ফল হয় না, প্রচুর বৃষ্টি হয়।

শ্রীরাজনারায়ণ বিশ্বাস।

বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য।

শিল্পোন্নতি কল্পে প্রবাস।—শুনিতেছি ৭ই মে তারিখে ময়ূরভঞ্জের মহারাণী কুচবিহারের মহারাজ ও মহারাণীর সহিত ইংলণ্ড যাত্রা করিবেন। ময়ূরভঞ্জের মহারাজ জাপান ও এমেরিকার প্রধান প্রধান শিল্পক্ষেত্র সমূহ পরিদর্শনান্তে ইংলণ্ডে পত্নী ও আত্মীয়গণের সহিত মিলিত হইবেন। ময়ূরভঞ্জের মহারাজ একজন উদ্যোগী পুরুষ, সুধু আমোদ আহ্লাদের জন্য বিদেশ যাত্রায় প্রচুর অর্থ ব্যয় না করিয়া যদি শিল্পোন্নতি তাঁহার আন্তরিক কল্পনা হয় তাহা হইলে ভাল বলিতে হইবে।

যুদ্ধের জন্য অশ্বপালন।—বিলাতের সমর-সচিব যুদ্ধের জন্য অশ্বরক্ষার এক অভিনব উপায় বাহির করিয়াছেন। তিনি সমৃদ্ধ ভদ্রলোকের গৃহে

সামরিক অশ্বসকল বিনা মূল্যে রাখিতে প্রস্তুত আছেন। গৃহস্থকে অশ্বের পালন ভার গ্রহণ করিতে হইবে অর্থাৎ ঘোড়ার অধিকারী গবর্ণমেণ্ট থাকিবেন, গৃহস্থ সে ঘোড়া লালন করিবে ও ব্যবহার করিবে, তবে সরকারের প্রয়োজন হইলে তাহা প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। ইহাতে গৃহস্থের লাভ ঘরের টাকায় ঘোড়া কিনিতে হইল না গবর্ণমেণ্টও অশ্বপালনে অব্যাহতি পাইলেন। হিতবাদী বলিতেছেন—"গৃহস্থের বাড়িতে ঘোড়া মরিলে দায়ী হইবে কে?"

বাগানের মাসিক কার্য্য।

বৈশাখ মাস।

সব্জীবাগান।—মাখন সীম, বরবটি, লবিয়া প্রভৃতি বীজ এই সময় বপন করা উচিত। টেপারি কেহ কেহ ইতি পূর্ব্বেই বপন করিয়াছেন, কিন্তু টেপারি বীজ বসাইবার এখনও সময় যায় নাই। শসা, বিলাতি কুমড়া, লাউ, স্কোয়াস বা বিলাতী কদু, পালা ঝিঙ্গা, পুঁই, ডেঙ্গো, নটে প্রভৃতি শাক বীজ এখনও বপন করা চলে। কিন্তু বৈশাখের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ঐ সমস্ত বীজবপন কার্য্য শেষ করিতে পারিলে ভাল হয়। ভুট্টা, ধুন্দুল, চিচিঙ্গা বীজ বৈশাখের শেষ পর্য্যন্ত বসাইতে পারা যায়। আশুবেগুনের চারা তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে। বৈশাখ মাসে ২।১ দিন একটু ভারি বৃষ্টি হইলে উহাদিগকে বীজ-ক্ষেত্রে হইতে উঠাইয়া রোপণ করে।

কৃষিক্ষেত্র।—বৈশাখ মাসের শেষ ভাগে আউসধান্ত, ধনিচা, অরহর, পাট প্রভৃতি বীজ বপন করিতে হয়। গবাদি পশুর খাদ্যের জন্যও এই সময় রিয়ানা ও গিনি ঘাস প্রভৃতি ঘাস বীজ বপন করিতে হইবে। কিন্তু বলা বাহুল্য বৃষ্টি হইয়া জমিতে "যো" হইলে তবেই ঐ সমস্ত আবাদ চলিতে পারে। ভুট্টা, জোয়ার প্রভৃতি বীজ বৈশাখের প্রথমেই বপন করা উচিত যদি উক্ত কার্য্য শেষ না হইয়া থাকে, তবে বৈশাখের শেষ পর্য্যন্ত বপন করা চলিতে পারে।

কিঞ্চিৎ অধিক বারি পতন হইলেই চৈত্রের শেষে বা বৈশাখের প্রথমেই উহাদের বীজ বপন করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে বৈশাখের শেষ ভাগে গাছ গুলি বড় হইয়া তাহাদের গোড়ায় মাটি দিবার উপযুক্ত হইয়া উঠে। চৈত্র মাসের মধ্যেই বীজ-ইক্ষু বা আকের টাঁক বসাইবার কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। ইক্ষু ক্ষেত্রে বৈশাখ মাসে মধ্যে মধ্যে আবশ্যক মত জল সেচন করিতে হইবে। দুই শ্রেণী আকের মধ্যস্থল হইতে মাটি উঠাইয়া আকের গোড়ায় দিয়া গোড়া বাঁধিয়া দিতে হইবে।

ফুল বাগান।—বৈশাখ মাসে কৃষ্ণকলি, আমারান্থাস্, দোপাটী, গ্লোব আমারান্থস্, কনভলভিউলাস, আইপোমিয়া, সনফ্লাওয়ার বা রাধাপদ্ম, লজ্জাবতী, মার্টিনিয়াডায়াণ্ড্রা, মেরীগোল্ড, সূর্য্যমুখী, জিনিয়া, ধুতুরা প্রভৃতি দেশী মরসুমী ফুলবীজ বপন করিতে হয়। বেল ও যুঁইফুলের ক্ষেতে এখন জল সিঞ্চনের সুব্যবস্থা চাই। উপযুক্ত পরিমাণে জল পাইলে অপরিষাপ্ত ফুল ফুটিবে।

ফলের বাগান।—আম, লিচু, কাঁঠাল, জাম প্রভৃতি গাছে আবশ্যক মত জল সেচন ও তাহাদের ফল রক্ষণাবেক্ষণ ভিন্ন অন্য কোন বিশেষ কাজ নাই। আনারস গাছগুলির গোড়ায় এই সময় মাটি দিয়া তাহাতে জল দিতে পারিলে শীঘ্র ফল ধরে ও বর্ষা পাইলে ফলগুলি বড় হয়।

আদা, হলুদ, আর্টিচোক যদি ইতিপূর্ব্বে বসাইয়া দেওয়া না হইয়া থাকে তবে সেগুলি বসাইতে আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে।